হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
অ্যাডভেঞ্চার
সমগ্র

অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র | হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
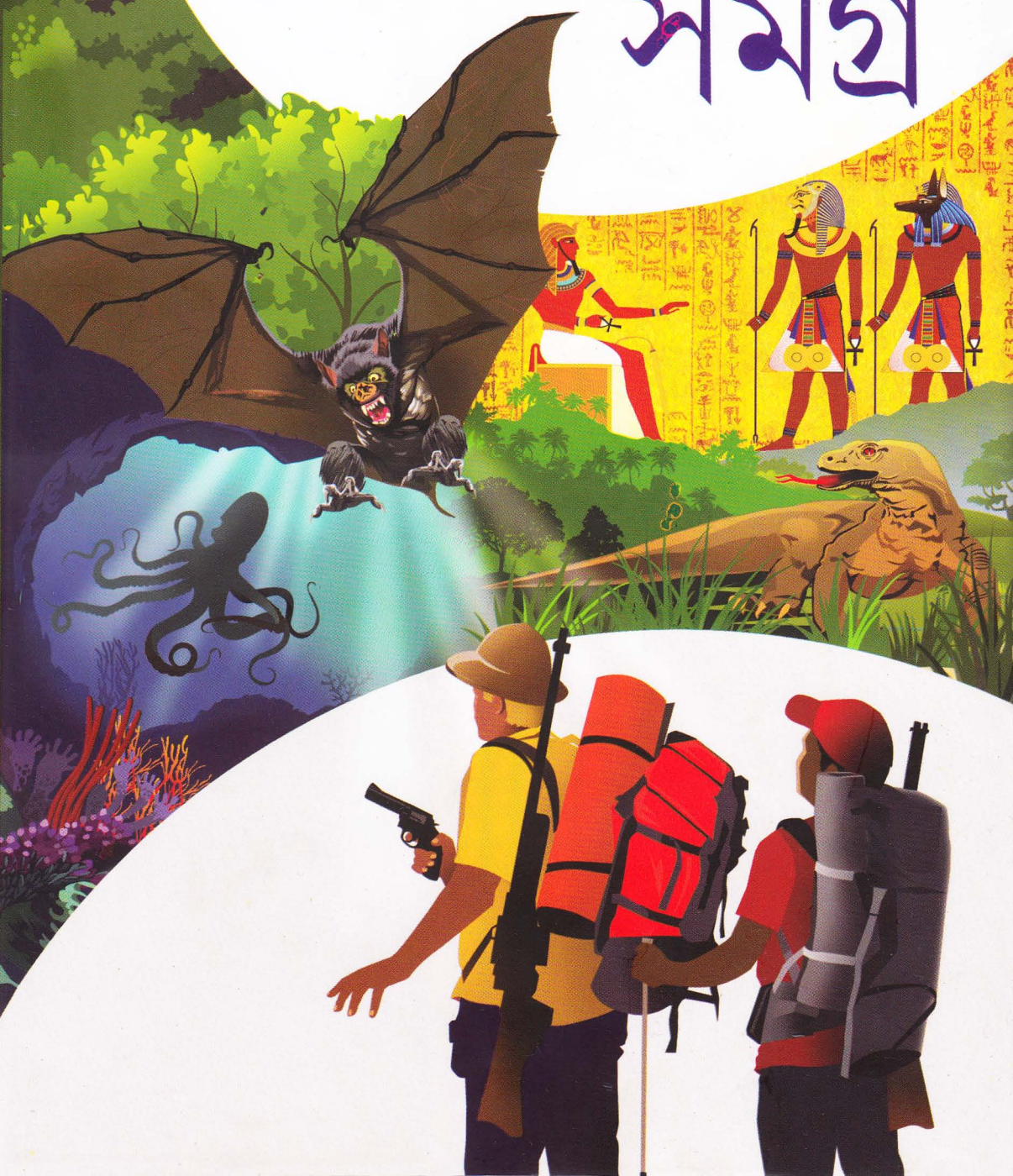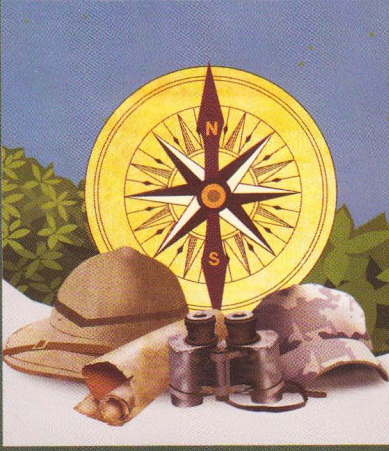
আফ্রিকার বুরুন্ডির গহন অরণ্যে সত্যি কি লুকিয়ে আছে কোন সবুজ দানব বানর? যাকে পুজো করে পাহারা দেয় বিষমাখানো তির হাতে পিগমির দল!

কমোডো ড্রাগনরা বহুদূর থেকে বাতাসে রক্তর গন্ধ পেয়ে ছুটে আসে। নরমাংসেও তাদের অরুচি নেই। সে দ্বীপে নাকি আছে এক সোনার ড্রাগন! প্রাচীন মিশরীয়দের জাদুবিদ্যার দেবী 'থথ'। তার রক্ষী ছিল নাকি সিংহমানুষরা। কী রহস্য লুকিয়ে আছে দেবী থথের প্রাচীন মন্দিরে?

প্রাচীন নাবিকদের গল্পকথায় আছে এক দানব অক্টোপাসের কথা। যে অক্টোপাস তার শুঁড়ে টেনে জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে মুক্ত ডুবুরিদের কি টেনে নিয়ে সেই অক্টোপাস?

বোর্নিওর আদিম জঙ্গলে মৃত আগ্নেয়গিরির মাথায় চাঁদের আলোতে উড়ে বেড়ায় এক বিশাল উড়ন্ত দানব। অন্ধকার অরণ্যে তার শঙ্খের মতো ডাক শোনা যায়—'আ-হু-ল!' সেই হিংস্র দানব নাকি কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর বংশধর!

এদের খোঁজেই সুদীপ্ত-হেরম্যানের অভিযান কখনও শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে, অচেনা দ্বীপরাজ্যে, পর্বত কন্দর, সমুদ্রতল অথবা লুপ্ত নগরীর প্রাচীন মন্দিরে। জীবনকে বাজি রেখে কখনও হিংস্র প্রাণী, আবারও কখনো বা তার চেয়েও হিংস্র মানুষের মরণ আলিঙ্গনকে উপেক্ষা করে বারবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে একের পর এক রোমাঞ্চকর অভিযানে শামিল হয় দুই বন্ধু। আর তারপর?

ISBN : 978-81-295-2489-8

অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭৩

উৎসর্গ

প্রয়াত পিতৃদেব শৈলেন্দ্রকিশোর দাশগুপ্তকে
—শৈশবে যিনি আমাকে প্রথম অজানা পৃথিবীর গল্প শুনিয়েছিলেন

ভূমিকা

বিপুলা, বিচিত্র এই পৃথিবী মানুষের-জীবজগতের রঙ্গমঞ্চ। এই ইন্টারনেট-স্যাটেলাইটের যুগেও কত অজানা রহস্যর আঁতুড়ঘর এই পৃথিবী! সভ্য পৃথিবীর মানুষ যার সব রহস্যভেদ এখনও করতে পারেনি। জীবনের, প্রকৃতির কত রহস্য এখনও লুকিয়ে আছে তুষারাবৃত দুর্গম পর্বতমালা কন্দরে, আদিম অরণ্যে অথবা সমুদ্রর অতল জলরাশির নীচে। বাঙালি যুবক সুদীপ্ত আর জার্মান প্রাণীবিদ হেরম্যান দুই বন্ধু খুঁজে বেড়ায় প্রকৃতির তেমন এক বিশেষ রহস্যকে। বিভিন্ন দেশের রূপকথায়, উপকথায় এমনকী ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক প্রাণীর সন্ধান মেলে বর্তমান পৃথিবীতে যাদের উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ না মিললেও দীর্ঘদিন ধরে তাদের কথা শুনে আসছি আমরা। হিমালয়ের তুষারমানব 'ইয়েতি', আফ্রিকার 'সিংহ মানুষ', স্কটল্যান্ডের 'লেক নেসির জলদানব', মাদাগাস্কারের 'নরখাদক গাছ' এমনকী বোর্নিওর জঙ্গলে 'টেরোডাকটাইলের' মতো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর উপস্থিতি আছে বলে আজও অনেকের ধারণা। এ সব গল্প-কথার উপকথার প্রাণীদের বলা হয় 'ক্রিপটিড'। আর যারা তাদের খুঁজে বেড়ান তাদের বলে 'ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্ট'। একটা সময় ছিল যখন সভ্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তাচ্ছিল্য করতেন 'ক্রিপটিড' নামের 'আলেয়া'র পিছনে ছুটে বেড়ানো মানুষদের। কিন্তু তারাই একদিন পৃথিবীর সামনে হাজির করে ইন্দোনেশিয়ার দানব গিরগিটি 'কমোডো ড্রাগন' বা প্রশান্ত মহাসাগরের দানব অক্টোপাসকে। এখনও নিত্য নতুন তারা আবিষ্কার করে চলেছে কত বিচিত্র প্রাণী, উদ্ভিদ। সুদীপ্ত আর হেরম্যান খুঁজে ফেরে তাদেরকেই। কখনো তারা ইয়েতির মতো আর এক বিশাল দো-পেয়ে 'সবুজ মানুষের' খোঁজে হানা দেয় আফ্রিকার বুরুন্ডির পিগমি অধ্যুষিত গ্রেট রিফটে, কখনো ইন্দোনেশিয়ার সুন্দাদ্বীপমালায় হিংস্র সরীসৃপের বিচরণভূমিতে 'সোনার ড্রাগনের' খোঁজে, কখনো ইজিপ্টের হারিয়ে যাওয়া প্রাচীননগরীতে 'সিংহ মানুষের' সন্ধানে, কখনো আবার তাদের গন্তব্য অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে 'দানব অক্টোপাসের' খোঁজে বা বোর্নিওর গভীর অরণ্যবেষ্টিত আগ্নেয় পাহাড়ে প্রাগৈতিহাসিক উড়ন্ত দানব 'আহুলের' খোঁজে। পাহাড়, মরুভূমি, অরণ্য

থেকে সাগরতল, সর্বত্র অভিযানে সামিল হয় তারা। কখনো প্রকৃতিক প্রতিকূলতা, কখনো আদিম জনগোষ্ঠীর হানা, হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ, আবার কখনো বা তারচেয়েও ভয়ংকর মুখোশধারী তথাকথিত সভ্য মানুষের চক্রান্ত-হিংস্রতাকে উপেক্ষা করে মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে বিচিত্র প্রাণীদের খুঁজে বেড়ায় সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সুদীপ্ত হেরম্যানের সহযোগী নয়, বিপদসঙ্কুল অভিযানে তারা সহযোদ্ধা।

সুদীপ্ত হেরম্যানের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু করে 'সন্দেশ' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় আনন্দমেলা, শুকতারা, বসুমতীসহ বিভিন্ন পত্রিকাতে। এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে প্রথম পর্যায়ে মোট পাঁচটি উপন্যাস—বুরুন্ডির সবুজ মানুষ, সুন্দাদ্বীপের সোনার ড্রাগন, শেবা মন্দিরের সিংহমানুষ, অক্টোপাসের লাল মুক্তো ও আহুল। অন্য কাহিনিগুলো স্থান পাবে পরবর্তী খণ্ডে। দীর্ঘদিন ধরে লেখকের ইচ্ছা ছিল এ কাহিনিগুলোকে এক মলাটে গাঁথার। 'দে'জ পাবলিশিং' সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন বলে তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই 'উপন্যাস সমগ্র' পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সমাদর লাভ করলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

ডিসেম্বর ২০১৫ হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

সূচি

বুরুন্ডির
সবুজ মানুষ

রোজউড গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সামনের বিশাল হ্রদের দিকে তাকিয়ে ছিল সুদীপ্ত। হ্রদ তো নয়, যেন সমুদ্র! 'লেক-তাঙ্গানিকা!' আফ্রিকা মহাদেশের ভুবনবিখ্যাত হ্রদ। সুদীপ্ত ভূগোলের বইতে কত পড়েছে এই হ্রদের কথা! আজ তার চোখের সামনে সেই হ্রদ! ফ্রেডরিখ হেরম্যান কখন যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা খেয়াল করেনি সুদীপ্ত। তিনি তার কাঁধে হাত রাখতেই সুদীপ্ত একটু চমকে উঠে পিছনে ফিরে তাকাল। হেরম্যান তাঁর দীর্ঘ দাড়িতে হাত বুলিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'কি, রাতে তাঁবুতে ঘুম ভালো হয়েছিল তো?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'ভালো। আপনার?'

তিনি বললেন, 'আমি মাঝরাতে উঠে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে তুতসি কুলিদের সঙ্গে বসেছিলাম। চাঁদের আলোয় কত জন্তু দলে দলে জল খেতে এল হ্রদে। জেব্রা, ওয়ার্টহগ, ইম্পালা, কুডু! একবার ভাবলাম তোমাকে ডাকি, তারপর মনে হল, তোমার দু-দিন টানা ধকল গেছে। বিশ্রামের দরকার। তাছাড়া আজ থেকে আমাদের হাঁটা শুরু হবে। তোমাকে তাই ডাকিনি। এরপর তিনি হ্রদের ওপাশে দিক-চক্রবালের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'হ্রদের ও-পাড়ে হল, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো।' আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি রিপাব্লিক অফ বুরুন্ডির পশ্চিম সীমানায়। এই হ্রদই হল দু-দেশের সীমারেখা।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'আমরা কোন দিকে এগোব?'

হেরম্যান বললেন, 'বুরুন্ডির ম্যাপটা তাহলে তোমাকে আগে বলি, মধ্য আফ্রিকার ভূখণ্ড বেষ্টিত এই দেশের উত্তরে অবস্থিত আরও এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র 'রোয়ান্ডা'। আর তার ওপাশে, উগান্ডা। বুরুন্ডির পূর্ব থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সবটাই তাঞ্জেনিয়ার সীমানা ঘেরা। দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে তাঙ্গানিকা, আর উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে রুজিজি নদী। তাঙ্গানিকার মতো রুজিজি নদীর ওপাশেও, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো। আমরা প্রথমে এগোব, আরও পশ্চিমে রুজিজির জলধারা যেখানে তাঙ্গানিকার সাথে মিশেছে সে দিকে। তারপর রুজিজির তীর বরাবর কিছুটা পশ্চিম ঘেঁষে উত্তরে গ্রেট রিফট্ পার্বত্য অঞ্চলের উদ্দেশ্যে এগোব আমরা। ওই পার্বত্য অঞ্চলের পিছনেই আছে গভীর অরণ্য আচ্ছাদিত অনেক মালভূমি। তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে রুভ্‌ভু নামের এক নদী। ওই নদীর পশ্চিম উপত্যকাই আমাদের গন্তব্যস্থল। কঙ্গো, রোয়ান্ডা, আর বুরুন্ডি—এই তিন দেশ দিয়ে ঘেরা সে জায়গা। গোরিলাদের বাসস্থান। আর মানুষ বলতে আদিম পিগমি জনজাতি।'

সুদীপ্ত তাঁর কথা শুনে বলল, 'আপনি ও-অঞ্চলে গেছেন এর আগে? আগেও তো আপনি আফ্রিকাতে এসেছেন বলে শুনেছি!'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আগে আমি একবার এ দেশে এলেও, এমনকী কঙ্গোতে

গেলেও, গ্রেট রিফ্ট উপত্যকার দিকে যাইনি। আসলে, সেবার এসেছিলাম নিছক পর্যটক হিসাবে, আর এবারের আসা সত্যিকারের অভিযাত্রী হিসাবে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে লুকিয়ে থাকা রহস্যের সন্ধানে। এই বলে হাসলেন হেরম্যান।

সুদীপ্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলি হেরম্যান। আমি নয় এখানে আপনার সাথে এসেছি বহু আকাঙ্ক্ষিত আফ্রিকা দেখব বলে। আপনি আমাকে যেখান নিয়ে যাবেন, যা দেখাবেন, তা সবটাই আমার কাছে নতুন, সবই আমার ভালো লাগবে। নতুন কোনো জায়গাতে বেড়াতে গেলে যেমন লাগে। কিন্তু আপনার ব্যাপারটা তো ঠিক তেমন নয়, আপনি যার সন্ধানে এবার এদেশে এসেছেন, তার ব্যাপারটা নিছক গল্প কথা নয়তো?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর হেরম্যান বললেন, 'সম্ভবত ব্যাপারটা তা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, গত পঞ্চাশ বছর ধরে তার কথা বিভিন্ন সময় শোনা গেছে। শুধু স্থানীয় মানুষেরাই নয়, বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান ইওরোপীয় অভিযাত্রীও দূর থেকে তাকে দেখেছে। এঁরা সকলে মিথ্যে কথা বলবেন, এমনটা ভাবা ঠিক নয়।'

হেরম্যান এ প্রসঙ্গে আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কিছু দূরে তাঁবুর কাছ থেকে তুতসি কুলিদের সর্দার ও পথপ্রদর্শক টোগো বলে লোকটা ডাক দিল তাঁকে। হেরম্যান তার ডাক শুনে সুদীপ্তকে বললেন, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখো, আমি ওদের কাছে যাই। আর আধঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা শুরু করব আমরা। তার আগে কুলিদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।' এই বলে তাঁবুর দিকে এগোলেন হেরম্যান।

তাঙ্গানিকার বিপুল জলরাশির দিকে তাকিয়ে মনে মনে হেরম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সুদীপ্ত। তিনি তাঁর সঙ্গী হবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ না জানালে বহুশ্রুত এই রহস্যময় মহাদেশে পদার্পণের সৌভাগ্য হত না সুদীপ্তর। হেরম্যান থাকেন মিউনিখে আর সুদীপ্ত কলকাতাতে। কত দূরত্ব দুই শহরের মধ্যে। সুদীপ্ত একটা বেসরকারি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। ভ্রমণের শখ আছে তার। একলা যুবক, সময় পেলেই সে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। বছর দু-এক আগে বন্ধুদের সাথে নেপালে বেড়াতে গেছিল সে। সেখানে কাঠামাণ্ডুর এক হোটেলে লবিতে হেরম্যানের সাথে কাকতালীয়ভাবে সুদীপ্তর পরিচয় হয়। হেরম্যানের সাথে ঘটনাচক্রে সেবার হিমালয়ের গভীরে এক প্রাচীন বৌদ্ধ গুম্ফায় ইয়েতি বা তুষার মানবের খোঁজে অভিযানে সামিল হয় সুদীপ্ত। আর তার পর থেকেই সুদীপ্তর সাথে অসম বয়সি বছর পঞ্চাশের হেরম্যানের সম্পর্ক প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আসলে, হেরম্যান তাকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। সেই সম্পর্ক গত দু-বছর ধরে ফোন মারফত আলাপ ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও দৃঢ় হয়, যার ফলশ্রুতি সুদীপ্তকে তাঁর বুরুন্ডি অভিযানের সঙ্গী হবার জন্য আমন্ত্রণ ও তাতে সাগ্রহে সাড়া দিয়ে সুদীপ্তর এই অচেনা দেশে আসা। একে তো আফ্রিকা ভ্রমণ, তার ওপর আবার হেরম্যানের সাহচর্য! এ দুয়ের অমোঘ আকর্ষণ সুদীপ্তকে এনে দাঁড় করিয়েছে এই লেক তাঙ্গানিকার ধারে।

হেরম্যানের প্রতি সুদীপ্তর যে আকর্ষণ তাদের দুজনের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের পর্যায়ে

উন্নীত করেছে, সে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল হেরম্যানের অদ্ভুত শখ বা কৌতূহল, যা তারুণ্যে ভরপুর পঞ্চাশ বছরের যুবক অকৃতদার হেরম্যানকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে সে-প্রান্তে। হেরম্যান কিন্তু সে অর্থে নিছক গ্লোবট্রটার নন। 'আমি একজন ক্রিপটোজুলজিস্ট'—এভাবেই সুদীপ্তর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন হেরম্যান। 'জুলজিস্ট' শব্দের অর্থ সকলের মতো সুদীপ্তর জানা থাকলেও 'ক্রিপটোজুলজিস্ট' শব্দের অর্থ তার জানা ছিল না। হেরম্যানই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন চমকে দেবার মতো বিষয়টা। ক্রিপটোজুলজি নিয়ে যাঁরা চর্চা বা অনুসন্ধান করেন তাঁদের বলা হয় 'ক্রিপটোজুলজিস্ট।' 'ক্রিপটোজুলজি' এ শব্দের প্রবক্তা জীববিজ্ঞানী বার্নাড হুভেলম্যানস। এ শব্দের অর্থ 'ধাঁধা প্রাণীবিদ্যা'। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। এই বিশাল পৃথিবীর আনাচে কানাচে অনেক সময় এমন অনেক জীবের কথা শোনা যায় প্রচলিত জীববিজ্ঞান যাদের উপস্থিতি প্রমাণের অভাবে স্বীকার করে না। পর্যটকদের বিবরণ, স্থানীয় উপকথা, বা গল্প কাহিনিতে ওইসব জীবের খোঁজ মেলে। কিন্তু তাদের উপস্থিতির কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। যেমন, হিমালয়ের 'ইয়েতি', ক্যালিফর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের ইয়েতির সমগোত্রীয় 'বিগফুট'। বা মালয়ের জঙ্গলের 'লোমশ মানুষ', স্কটল্যান্ডের লেক নেসির লম্বা গলার জলদানব 'নেসি', এ সবই হল সেসব প্রাণীর উদাহরণ। যাদের অনেকেই দেখেছেন বলে দাবি করেন, কিন্তু কেউ কোনোদিন তাদের খাঁচায় পুরে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলের সামনে হাজির করতে পারে না। কাজেই প্রচলিত জীববিজ্ঞান এই সব প্রাণী বা 'ক্রিপটিড'দের মানে না, এবং যারা তাদের অন্বেষণ করে বেড়ান, তাঁদেরকেও প্রাপ্য সম্মান দেয় না। হেরম্যানদের মতো ক্রিপটোজুলজিস্টরা এমনকী অনেক সময় পাগল বা প্রবঞ্চক বলেও আখ্যায়িত হন। ক্রিপটোজুলজিস্টদের কাজে অর্থ বা সম্মান কোনোটাই জোটে না। তাঁরা এ কাজ করেন এ ব্যাপারে আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। যেমন এই হেরম্যান। বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন একদা। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটা ডিগ্রি আছে তাঁর। অনায়াসে তিনি একটা অধ্যাপনার চাকরি জোটাতে পারতেন। অথবা পৈত্রিক ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যবসাতে মন দিয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেসব কিছু না করে পৈত্রিক কারবার বেচে দিয়ে সেই পয়সাতে 'ক্রিপটিড' নামের আলেয়ার পিছনে ধাওয়া করে বেড়ান সারা পৃথিবী। কাঠমাণ্ডুতে যেবার সুদীপ্তর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল, সেবার তিনি গেছিলেন ইয়েতি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের জন্য। নেপাল হিমালয়ের বেশ কিছুটা অঞ্চলও তিনি চষে বেড়িয়ে ছিলেন ইয়েতির খোঁজে!

হেরম্যানের এই আশ্চর্য কর্মকাণ্ডই তাঁর প্রতি সুদীপ্তর সংগ্রহ বা আকর্ষণের কারণ। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। খুব সুন্দর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি বলতে পারেন হেরম্যান। এ ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই সুদীপ্তর দুর্বলতা আছে। অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পড়তে শুনতে ভালোবাসে সে। এটাও তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পিছনে একটা কাজ করেছে।

ইতিপূর্বে হেরম্যান যতগুলো অভিযানে গেছেন, তার কোনোটাতেই তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেননি। কোনো ক্রিপটিডেরই সাক্ষাৎ পাননি তিনি। হেরম্যানের এবারের অভিযানও এক ক্রিপটিডের সন্ধানে। বুরুন্ডির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রেট রিফট উপত্যকায় রুভ্ভু নদীর বনাঞ্চলে নাকি এক দানবাকৃতির সবুজ বানর আছে। মানুষের মতো নাকি দু-পায়ে চলাফেরা করে সে। বুরুন্ডি দেশটা হল পিগমিদের আদি বাসস্থান। সর্বত্রই তাদের কম-বেশি দেখা মেলে। যে গহীন বনাঞ্চলে ওই সবুজ বানর থাকে, সে অঞ্চলে নাকি পিগমিদের একটা অসভ্য গোষ্ঠী বাস করে। তারা পুজো করে ওই প্রাণীকে। বিষাক্ত তির হাতে ওই বনাঞ্চল পাহারা দেয়। বাইরের কোনো মানুষকে তারা সে অরণ্যে প্রবেশ করতে দিতে চায় না। আফ্রিকার এ হেন দুর্গম অঞ্চলে ওই সবুজ বানরের সন্ধানে হেরম্যানের সঙ্গী হয়ে অভিযানে অংশ নিতে চলেছে সুদীপ্ত। পদব্রজে এই অভিযান। হেরম্যান সুদীপ্তকে বলেছেন, গাইডের কথা অনুসারে জায়গাটায় পৌঁছতে দিন চারেকের মতো সময় লাগার কথা।

হেরম্যান চলে গেলেন তাঁবুর দিকে। সুদীপ্ত দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। লেকের ধারে কাদা মাটিতে নানা ধরনের জন্তুর পায়ের ছাপ আঁকা হয়ে আছে। বিচিত্র সব চিহ্ন! সুদীপ্ত দেখতে লাগল সেগুলো। একটু পরই হেরম্যান হাঁক দিলেন তাকে। সুদীপ্ত ফিরল তাঁবুর দিকে। তুতসি কুলিরা ততক্ষণে তাঁবু গোটাতে শুরু করেছে। সুদীপ্ত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই একজন লোক তার আর হেরম্যানের জন্য প্রাতরাশ সাজিয়ে আনল। বেশ বড় একছড়া কলা, অনেকগুলো মোটা মোটা মিষ্টি রুটি আর কফি। প্লেটে খাবারের পরিমাণ দেখে সুদীপ্ত বলল ; 'এই ভোরবেলা এত খাবার খাব কী করে?'

হেরম্যান বললেন, 'যতটা পারো খেয়ে নাও। এটা নিছক প্রাতরাশ নয়। সারাদিন এর ওপর ভরসা করেই কাটাতে হবে আমাদের। সন্ধ্যায় তাঁবু পড়ার পর আবার খাবার মিলবে। এ পথে একটু কষ্ট করতে হবে আমাদের। আশা করি এ ব্যাপারটা একটু মানিয়ে নেবে।'

সুদীপ্ত বলল, 'না না, এসব ব্যাপার নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। একটু কষ্ট না থাকলে তো যে কোনো অভিযানের আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়।

হেরম্যান হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। কষ্ট, রোমাঞ্চ যদি না থাকে, তাহলে আবার অ্যাডভেঞ্চার কিসের?' এরপর একটা রুটি ছিঁড়ে মুখে দিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে তিনি বললেন, 'যত ভোর ভোর যাত্রা শুরু করা যায় ততই ভালো। আফ্রিকার সূর্য বড় প্রখর। যত বেলা বাড়বে, এগোতে তত বেশি অসুবিধা হবে আমাদের।' এরপর আর কথা না বলে খেতে শুরু করল সুদীপ্তরা।

তাদের যখন খাওয়া শেষ হল, ততক্ষণে তাঁবু গুটিয়ে ফেলেছে কুলিরা। সুদীপ্তদের এরপর আরও মিনিট দশেক সময় লাগল একদম তৈরি হয়ে নিতে। যাত্রা শুরুর আগে সকলে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল একটা গাছের নীচে। সব মিলিয়ে দলে দশজন লোক। হেরম্যান, সুদীপ্ত ছাড়া, অভিযানের পথ প্রদর্শক টোগো, চারজন তুতসি মালবাহক কুলি আর চারজন হুটু বন্দুকধারী রক্ষী বা আস্কারি। সুদীপ্ত লক্ষ করে দেখল, আস্কারি চারজন ছাড়াও অন্যদের কাছেও কিছু না কিছু অস্ত্র আছে। পথপ্রদর্শক টোগোর কাঁধে একটা

নতুন রাইফেল। মনে হচ্ছে সবাই যেন যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। অরণ্য আফ্রিকার অরণ্য প্রদেশে অভিযানে যেতে হলে সঙ্গে অস্ত্র রাখাটা একটা আবশ্যিক ব্যাপার। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে টোগো, কিসোয়াহিলি ভাষাতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কি যেন বলল, কুলি আর আস্কারিদের উদ্দেশ্যে। সম্ভবত যাত্রা শুরুর আগে সে প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলো জানিয়ে দিল সকলকে। এর পর একজন তুতমি একটা মাটির সরাতে ধুনো জাতীয় কোনো কিছু জ্বালিয়ে গাছের গুঁড়ির নীচে নামিয়ে রাখল। অন্য তুতসিরা কি যেন বলতে বলতে ডান হাতে গাছের গুঁড়িটা ছুঁয়ে বারতিনেক গাছটাকে প্রদক্ষিণ করল। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'কোনো লৌকিক দেবতার উদ্দেশ্যে পুজো নিবেদন করল ওরা।' তারপর কুলিরা মালপত্র উঠিয়ে নিল পিঠে। এক সুন্দর সকালে যাত্রা শুরু হল সুদীপ্তদের। ভাঙ্গানিকার ধার ঘেঁষে পায়েদলে এগোতে থাকল সবাই। বাঁ-পাশে হ্রদ, ডান-পাশে ঘাসে ছাওয়া দীগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। সেই প্রান্তরে কিছু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছ। কিছু ঝোপঝাড়ও আছে। সারবেঁধে চলেছে সবাই। সবার প্রথমে পথপ্রদর্শক টোগো আর দুজন আস্কারি। নিজেদের মধ্যে কিসোয়াহিলি ভাষায় অবিরাম কথা বলে চলেছে তারা। তারপর সুদীপ্ত আর হেরম্যান। আর তাদের পিছনে তুতসি কুলিরা ও অন্য দুজন আস্কারি। হেরম্যান বেশ উৎফুল্ল। মাঝে মাঝে তিনি গুন গুন শব্দে গান করছেন। পথ চলতে চলতে একসময় তিনি বললেন, 'অজানার উদ্দেশ্যে এই পথ চলার মধ্যে কিন্তু আলাদা একটা আনন্দ আছে। কত কিছু জানা যায়, শেখা যায়! অনেক অভিমান হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ ঘরে ফেরে তাকে কাঞ্চন মূল্যেও পরিমাপ করা যায় না। সেই অভিজ্ঞতাই মানুষকে আবার উৎসাহিত করে মানুষকে ঘর ছাড়তে, প্রস্তুত করে নতুন অভিযানের জন্য।'

এরপর তিনি বললেন, 'যেন সুদীপ্ত, আমরা যারা ক্রিপটিডের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই তাদের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা অনেকেই বিদ্রুপ করেন, এমনকী পাগলও পর্যন্ত বলে থাকেন। কিন্তু এই জীবজগতে এমন অনেক প্রাণী আছে, যাদের সন্ধান কিন্তু আমার মতন ভবঘুরে ক্রিপটোলজিস্টরাই 'ঘরে বা ল্যাবরেটরিতে বসে পুঁথি পড়া বা টেস্টটিউব-ফানেল নিয়ে নাড়াচাড়া করা' পণ্ডিত বিজ্ঞানীকুলকে প্রথম দিয়েছিলেন।

সুদীপ্ত উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইল, 'ব্যাপারটা কীরকম?'

হেরম্যানও উৎসাহের সাথে বলতে শুরু করলেন, 'যেমন ধর সিলাকান্থ মাছের কথা। একচল্লিশ কোটি বছরের প্রাচীন জীবাশ্মতে তার খোঁজ পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর প্রথমেও পুঁথিপড়া জীববিজ্ঞানীরা বলতেন ও মাছ বহুকোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! কিন্তু কোমোরাস দ্বীপের জেলেদের কাছ থেকে ক্রিপটোজুলজিস্টরা যখন প্রথম এ মাছের কথা জানতে পেরে তা পৃথিবীর কাছে বললেন, তখন 'এ ব্যাপারটা নাকি সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজী!' —এমনই মত প্রকাশ করলেন পুঁথিপড়া বিজ্ঞানী মহল। তাঁদের কেউ কেউ আবার বিবর্তনবাদের কূটব্যাখ্যায় বুঝিয়ে দিলেন কেন পৃথিবীতে আর টিকে থাকতে পারে না তারা! অথচ কোমোরাস দ্বীপের নিরক্ষর জেলেরা কিন্তু বংশপরম্পরায় জানত তাদের কথা! সেই জেলেরা ও মাছকে ডাকত 'গামবোসা' বলে। অর্থাৎ 'দানব

মাছ'। শেষপর্যন্ত ১৯৩৮ সালে সে মাছ হাজির করা হল পণ্ডিত প্রবর বিজ্ঞানীদের সামনে। তখনও তারা কিন্তু, 'কিন্তু-কিন্তু' করছেন। ১৯৮৮ সালে জলের তলায় গিয়ে যখন তাদের জীবন্ত ছবি তুলে আনা হল। তখন বিজ্ঞানীর পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন ব্যাপারটা। অথচ এরাই একদিন বলেছিলেন, ক্রিপটোলজিস্টরা প্রতারিত করতে চাইছে বিজ্ঞানী মহলকে।' বোঝো একবার ব্যাপারটা!

একই রকম ব্যাপার বলা যায় অক্টোপাসের দানবীয় রূপ 'জায়েন্ট স্কুইড' সম্বন্ধে। যারা মানুষকে জেলে ডিঙি থেকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে টেনে নিয়ে হত্যা করতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গভীর সমুদ্রে যাওয়া নাবিকরা বলে আসছিল তাদের কাহিনি। গল্পগাথায় তাদের কথা চিত্রায়িতও করে আসছিল। আর তাদের কথা বার বার করে বলে আসছিল ক্রিপটোজুলজিস্টরা। প্রচলিত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকুল জায়েন্ট স্কুইডের ব্যাপারটাকে ভাবতেন রূপকথা বর্ণিত কোনো প্রাণী। তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিতেন তার কথা। ২০০৪ সালে জাপানের 'ন্যাশানাল সায়েন্স মিউজিয়ামের' একদল লোক যখন গভীর সমুদ্রে গিয়ে প্রথম জায়েন্ট স্কুইডের ছবি তুলে আনলেন তখন বোবা হয়ে গেল বিজ্ঞানী মহল। পরের এক্সপিডিশনটা হল ২০০৬ সালে। মুভি ফিল্ম তুলে আনা হল জায়েন্ট স্কুইডের। ক্রিপটোজুলজিস্টরা যদি বারবার তার উপস্থিতির কথা না বলবেন, তাহলে নিছক রূপকথার প্রাণী হয়েই থেকে যেত জায়েন্ট স্কুইড।

'রূপকথার' কথা শুনে সুদীপ্ত চলতে চলতে বলল, জানেন, আমাদের রূপকথাতে 'ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী' বলে দুটো পাখির কথা আছে। যারা নাকি মানুষের মতো কথা বলতে পারত! গল্প করতে পারত!'

হেরম্যান বললেন, 'তাই নাকি! এটা আমার জানা ছিল না। টিয়া, কাকতুয়া ইত্যাদি প্যারাকিট প্রজাতির পাখিরা তো এমনিতেই মানুষের কণ্ঠস্বর নকল করতে পারে। হয়তো সেই পাখি সত্যি গল্পও করতে পারত। শতাব্দী প্রাচীন রূপকথা যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের কল্পনার কোনো ভিত্তি থাকে। এমনি এমনি কল্পনা করা যায় না। হয়তো সে পাখি সত্যি একদিন ছিল বা এখনও আছে। আমরা তার খোঁজ জানি না। সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে কোনো ক্রিপটোলজিস্ট তুলে ধরবে তার কথা। সে পাখি হাজির হয়ে চমকে দেবে পৃথিবীকে। পাথফাইন্ডার বা ইন্টারনেটের যুগ হলেও যে জীবজগতের সব রহস্য আমরা জেনে গেছি এমন ভাবা ভুল। ইন্দোনেশিয়ার দানবাকৃতির সরীসৃপ 'কোমোডো ড্রাগন' বা তাসমেনিয়ার হংসচঞ্চু ডিমপাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী 'প্লাটিপাস'-এর প্রথম খোঁজ পাওয়া গেছিল রূপকথাতেই। পরবর্তীকালে সত্যিই এদের সন্ধান মিলল। আর এ ব্যাপারে ক্রিপটোলজিস্টরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। রূপকথার প্রাণী বাস্তবে আবির্ভূত হয়েছে, এমন আরও উদাহরণ আমি তোমাকে দিতে পারি।'

সুদীপ্ত এরপর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথাটাও বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে ভেবে আর বলল না।

হেরম্যান সুদীপ্তকে এসব প্রসঙ্গে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ অগ্রবর্তী টোগো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আঙুল তুলে কী যেন দেখাল। দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। সুদীপ্তদের

যাত্রাপথের কিছু দূরে একটা বিরাট গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সকালের নতুন সূর্যের আলোয় লম্বা গলা বাড়িয়ে গাছটার মগডাল থেকে কচিপাতা খাচ্ছে দুটো জিরাফ! এখানে এসে এই প্রথম ওয়াল্ড লাইফ দেখতে পেল। সকলে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। হেরম্যান বললেন, 'কী সুন্দর দৃশ্য!' সুদীপ্ত রুকস্যাক খুলে ক্যামেরা বার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভোরবেলা এই দুপেয়ে প্রাণীগুলোর অবাঞ্ছিত উপস্থিতি মনে হল পছন্দ হল না জিরাফ দুটোর। সুদীপ্তকে ছবি তোলার সুযোগ না দিয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘাসবনের ভিতর দিয়ে তারা ছুটতে শুরু করল মাঠের অন্য দিকে।

সুদীপ্ত একটু আক্ষেপের সুরে বলল, 'ইস্, এত সুন্দর ছবিটা তোলা গেল না!

হেরম্যান বললেন, 'আক্ষেপ কোরো না। এমন আরও অনেক দৃশ্য আমাদের যাত্রাপথে পড়বে।'

আবার চলতে শুরু করল সবাই। সুদীপ্তদের এক পাশে তাঙ্গানিকার কাদামাটি মাখা পাড়, অন্যপাশে ঘাসবন, প্রান্তরের সীমারেখা। মাঝের একচিলতে শক্ত মাটি ধরে এগোচ্ছে তারা।

চলতে চলতে সুদীপ্ত এক সময় প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা এখানে সিংহ আছে?'

প্রশ্নটা সে হেরম্যানকে করলেও টোগো তা শুনতে পেয়ে বলল, 'সিংহ তো আফ্রিকার সব জঙ্গলেই কমবেশি আছে। তবে আমরা এখন যে পথে হাঁটছি তার খুব কাছাকাছি নেই বলেই মনে হয়। ওরা সাধারণত বড় জলাশয় থেকে দূরে দু-একটা গাছওলা ফাঁকা জমিতে দল বেঁধে ঘোরে। ছোট ঘাসওলা শক্ত জমি তাদের পছন্দ। আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে প্রচুর সিংহ আছে।'

এরপর একটু থেমে বলল, 'কিন্তু এই ঘাসবনে চিতা আছে। মাঝে মাঝে মাটিতে ওদের পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। তবে সচরাচর এই রকম ফাঁকা জায়গাতে দিনের বেলায় ওরা মানুষকে আক্রমণ করে না। আফ্রিকার সিংহ গোরিলা আর হাতি ছাড়া জঙ্গলের অন্যসব প্রাণী মানুষকে কমবেশি ভয় পায়। ওই তিন প্রাণীর কথা অবশ্য আলাদা। আপনার হাতে রাইফেল থাকলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায় না সত্যিকারের কে শিকারী আর কেই বা শিকার? নিজের বনে ওরা হল রাজা।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ওই তিন রাজার মধ্যে লড়াই বাঁধে না?'

টোগো জবাব দিল, 'হাতি আর গোরিলার মধ্যে সাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে। গোরিলা থাকে গভীর অরণ্য আচ্ছাদিত পাহাড়ের ঢালে বা তার পাদদেশের অরণ্যে। হাতি সেখানে যায় না। কিন্তু সিংহর গতিবিধি সর্বত্র। মাঝে মধ্যেই তার সাথে অন্য দুই প্রাণীর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। কলেবরে হাতির শক্তি বেশি। স্বভাবসুলভ রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে চলে। সচরাচর অহেতুক কোনো প্রাণীকে সে আক্রমণ করে না। গোরিলার মধ্যে কিন্তু হিংস্রতা আর আক্রমণের প্রবণতা আছে। নিজের রাজ্যে তারা অন্য কারো উপস্থিতি সহ্য করে না। আর সিংহ যেমন হিংস্র, তেমনই ধূর্ত। সর্বত্রই এ প্রাণীর অবাধ গতিবিধি। মাঝে মাঝেই অন্য দুই প্রাণীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তখন প্রলয় ঘটে। বনের সব প্রাণী জেনে যায়, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে। সে লড়াই চলে আমৃত্যু।'

এগিয়ে চলল সুদীপ্তরা। সময় যত এগিয়ে চলল সূর্যের তেজও তত বাড়তে লাগল। আফ্রিকার প্রখর সূর্য! তা-ও আবার মধ্য আফ্রিকা! সুদীপ্তদের সকলেরই পরনে হালকা পোশাক, কিন্তু তা-ও ঘামে ভিজে যেতে লাগল। একটা গাছের তলায় এরপর দুটো অ্যান্টিলোপ চোখে পড়ল তাদের। আফ্রিকার ঝলসানো ধু ধু প্রান্তরে প্রচণ্ড সূর্যের তেজ থেকে বাঁচতে গাছের ছাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে ওরাও। সুদীপ্ত দেখল তার ঘড়িতে সবে দশটা বাজে। অর্থাৎ মাত্র ঘণ্টা তিন-চারেক হেঁটেছে তারা। এর মধ্যেই এই অবস্থা! তবে টোগোর কথা বলার বিরাম নেই। সে আস্কারির সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে সুদীপ্তদের এটা-ওটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। তাতে পথশ্রমের ক্লান্তি তাদের কিছুটা লাঘব হচ্ছে। আরও বেশ কিছুটা চলার পর একপাল হিপো দেখতে পেল তারা। লেকের পাড়ের কাদামাটিতে গা ডুবিয়ে বসে ছিল দলটা। সুদীপ্তরা তাদের কাছাকাছি যেতেই প্রাণীগুলো প্রথমে উঠে দাঁড়াল। গোল গোল লাল চোখ দিয়ে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল তাদের। একটা প্রাণী একবার একটা বিরাট হাঁ করল। ততক্ষণে অবশ্য তাদের বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিয়েছে সুদীপ্ত। টোগো বলল, 'বিরাট কলেবরের হলেও এ প্রাণীগুলো সাধারণত অন্য প্রজাতির প্রাণীদের সাথে ঝঞ্ঝাটে যায় না। তবে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই লড়াই করে। ওভাবে মারাও যায় অনেকে। জলহস্তীগুলোকে দেখায় ও তাদের ছবি তুলতে পারায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও সুদীপ্তর চলার একটা উৎসাহ ফিরে এল। চারপাশে তাকাতে তাকাতে টোগোর পাশে পাশে তাকে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করতে করতে এগোল সে।

বেলা বারোটা নাগাদ একটা গাছের তলায় বিশ্রামের জন্য তারা থামল। আধ ঘণ্টার জন্য একটু জিরিয়ে নেওয়া, একটু জলপান, তারপর আবার পথ চলা। এবার সূর্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য যতদূর সম্ভব ঝোপঝাড় ঘেঁসে চলতে থাকল সকলে। তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে চলছে টোগো, সামান্য কোনো শব্দ জঙ্গলের মধ্যে শুনলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। থেমে যাচ্ছে অন্যরাও। এ দফায় পথ চলতে একটু যেন সতর্ক টোগো। হেরম্যান তার কারণ জানতে চাওয়াতে সে বলল, 'এখানে চিতার আড্ডা আছে। মাটিতে মাঝে মাঝেই পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।' তার কথা শুনে সতর্ক হয়ে গেল সকলে। আস্কারিরা বন্দুক কাঁধ থেকে হাতে নিল। ঘণ্টা তিনেক চলার পর এক সময় সূর্যের তাত কমে এল। টোগো হেরম্যানকে বলল, 'এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে "হুট" উপজাতীয়দের একটা গ্রাম আছে। এ তল্লাটে আমাদের যাত্রাপথে ওটাই শেষ গ্রাম। তাড়াতাড়ি পা চালালে সন্ধ্যার আগেই ওখানে পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে। তাহলে আর জঙ্গলে তাঁবু ফেলার হ্যাঙ্গামা থাকে না। জায়গাটা জঙ্গলের তুলনায় নিরাপদও বটে। তবে সেখানে যেতে হলে তাঙ্গানিকার পাড় ছেড়ে সামান্য পুবে এগোতে হবে। তাতে কাল সকালে শুধু সামান্য বাড়তি হাঁটতে হবে আমাদের।'

হেরম্যান শুনে বললেন, 'তাহলে তাই চলো। এদিককার কিছু খবরও পাওয়া যেতে পারে সেখানে গেলে।'

তাঁর সম্মতি পাওয়ার পর সামান্য গতিপথ পরিবর্তন করল টোগো। তারা এবার এগোল ঝোপঝাড় ছেড়ে ঘাসে ভরা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। তাদের সাথে সাথে মাথার

ওপর সূর্যদেবও পশ্চিমে পরিক্রমণ শুরু করলেন। চলতে চলতে বড় ঘাসের জঙ্গল অতিক্রম করে এক সময় তারা এসে উপস্থিত হল এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। সূর্যের আলো নরম হয়ে এসেছে তখন। সুদীপ্ত আশ্চর্য হয়ে দেখল, অসংখ্য জেব্রা, আর অনেকটা বড় বাছুরের মতো দেখতে দাড়িওলা প্রাণী চরে বেড়াচ্ছে সেখানে। দূর থেকে দুটো জিরাফও চোখে পড়ল তার। টোগোর মুখ থেকে সুদীপ্ত শুনল, ওই দাড়িওলা প্রাণীগুলোর নাম নাকি 'উইল্ডা বিস্ট' (wilde beast)। আফ্রিকার অন্য প্রদেশের সর্বত্রই প্রায় এদের দেখা মেলে। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পাশের রাজ্য তাঞ্জেনিয়ার সেরেঙ্গেটিতে। জুলাই মাস নাগাদ আফ্রিকার তৃণভোজী প্রাণীদের বিখ্যাত মাইগ্রেশন পর্ব শুরু হয়। সেসময় হাজার হাজার 'উইল্ডা বিস্ট' সার বেঁধে সেরেঙ্গেটি থেকে যাত্রা শুরু করে কেনিয়ার মাসাইমারা অরণ্যের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ সেই যাত্রাপথে তাদের একটা বড় অংশ নদী পার হতে গিয়ে কুমিরের পেটে আর সাভানাতে সিংহ চিতার পেটে যায় বলে বাঁচোয়া। নইলে নাকি ওই প্রাণীতে সারা আফ্রিকা ছেয়ে যেত!

জেব্রা আর উইল্ডা বিস্টের দঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সেই প্রান্ত অতিক্রম করতে ঘন্টাখানেক সময় লাগল। অবশেষে তারা এসে উপস্থিত হল সেই গ্রামের কাছে। গ্রাম মানে, তিনটে বড় গাছের নীচে গোটা পনেরো মাটির দেওয়াল আর শন ছাওয়া ঘর। তাকে বেষ্টন করে গাছের গুঁড়ির প্রাচীর। সুদীপ্তরা গ্রামের বাইরে উপস্থিত হতেই গ্রামের ভিতর থেকে পিলপিল করে লোক বেরিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল তাদের। তার মধ্যে বৃদ্ধ-নারী-শিশু সবই আছে। অধিকাংশর পরনে মলিন বস্ত্র, খালি পা, শিশুগুলো উলঙ্গ। দেখলেই বোঝা যায় এরা ভীষণ গরিব। শুধু তার মধ্যে একজন বিশালবপু মানুষের পোশাক একটু ঝলমলে। গলায় নানা রঙের পাথরের মালা। একটা চিতার মাথা সমেত ছাল সে শালের মতো জড়িয়ে রেখেছে ঊর্ধ্বাঙ্গে। তার গা ঘেঁসে একজন বর্শাধারী রক্ষীও আছে। সুদীপ্ত লক্ষ করল লোকটার পায়ে একজোড়া নতুন হাই হিলবুট। টোগো লোকটাকে ইশারায় দেখিয়ে বলল ওই লোকটাই এ গ্রামের মোড়ল ও পুরোহিত। লোকটা বেশ কিছুক্ষণ সতর্ক চোখে দেখল সুদীপ্তদের, তারপর সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল! টোগো তার জবাব দিল, তারপর পোশাকের ভিতর থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স বার করে সেটা খুলল। তার মধ্যে সাজানো আছে চুরুট। সুদীপ্ত টোগোকে ধূমপান করতে দেখেনি। সে একটু অবাক হল বাক্সটা দেখে। টোগো এরপর বাক্সটা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেটা ধরল মোড়লের সামনে। লোকটা একটা চুরুট তুলে নাকের কাছে নিয়ে কিছুক্ষণ শুকল, তারপর চুরুটের বাক্সটা তার হাত থেকে নিয়ে টোগোর সাথে অজানা ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। সুদীপ্তরা তাদের দুজনের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। সুদীপ্ত, হেরম্যানের দিকে তাকাতেই, তিনি চাপাস্বরে বললেন, 'চুরুটগুলো ওকে খুশি করার জন্য টোগো উপঢৌকন দিল। তামাক জিনিসটা এরা ভারী পছন্দ করে। আফ্রিকার বনাঞ্চলে তামাক চাষ হয় না। তাই অরণ্য উপজাতিদের কাছে তামাক বড় লোভনীয়। একটা সময় ছিল, যখন ইওরোপীয়রা এসব গ্রামে ঘুরে ঘুরে আদিবাসীদের সিগার বা চুরুট উপহার দিত। আর সামান্য তামাকের পরিবর্তে তারা এদের কাছ থেকে

কী পেত জানো? আনকাট ডায়মন্ড! যার মূল্য লক্ষ টাকা! টোগো মিনিট পাঁচেক ধরে কথা বলল মোড়লের সাথে। সে লোকটা কথা বলতে বলতে তুতসি কুলিদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে টোগোকো কী যেন বলল, তার নতুন জুতো পরা পা-টাও তুলে টোগোকে একবার দেখাল।

টোগো তার সঙ্গে কথা শেষ করে সুদীপ্তদের কাছে এগিয়ে এসে হেরম্যানকে বলল, 'মোড়ল আমাদের আজ রাতে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে। তবে ওরা কুলিদের গ্রামে ঢুকতে দেবে না। ওদের বাইরে থাকতে হবে।'

সুদীপ্ত তার কথা শুনে প্রশ্ন করল, 'ওদের ঢুকতে দেবে না কেন?'

'ওরা তুতসি বলে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল টোগো।

উত্তরটা সুদীপ্তর কাছে পরিষ্কার না হওয়ায় সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল হেরম্যানের দিক।

তিনি ব্যাপারটা ধরতে পেরে সুদীপ্তকে বুঝিয়ে বললেন, 'বুরুন্ডিতে হুটু-তুতসি, এ দুই উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ভয়ংকর বিরোধ চলছে। বুরুন্ডির আদি অধিবাসীরা হল পিগমি। হুটু গোষ্ঠীরা বাইরে থেকে প্রথম এখানে এসে চাষাবাদ-বসবাস শুরু করে। তাদেরও পরে উগান্ডা থেকে তুতসিরা এ ভুখণ্ডে আসে। তারা আসার পরপরই বিরোধ শুরু হয় উভয়ের মধ্যে। বুরুন্ডি প্রথমে জার্মানির, পরে বেলজিয়ামের দখলে ছিল। ১৯৬২ সালে মূলত তুতসিরাই এ দেশের স্বাধীনতা আনে। কিন্তু তারপর থেকেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রবল লড়াই শুরু হয় দুই উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে। উভয়েরই বহু রক্ত ঝরে এতে। ১৯৮৮ সালে তুতসি সেনারা, তিন হাজার হুটু পরিবারকে হত্যা করে। হুটু উপজাতির ষাট হাজার মানুষকে সে সময় দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। ১৯৯২ সালে এ দেশে নতুন সংবিধান রচিত হয়। রাষ্ট্রসংঘ এ দেশে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু করে, কিন্তু তবুও আজও এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা বর্তমান। মাঝে মাঝেই চোরা-গোপ্তা খুনোখুনি হয় উভয় উপজাতির মধ্যে। এ জন্যই ওরা তুতসিদের গাঁয়ে প্রবেশ করতে দেবে না।'

হেরম্যান আর টোগো এরপর কর্মপন্থা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিল। ঠিক হল, কুলিরা বাইরেই থাকবে তাঁবু ফেলে। তাদের আর মালপত্রের নিরাপত্তার জন্য দুজন আস্কারিও তাদের মধ্যে থাকবে। টোগো সঙ্গের লোকদের বিষয়টা বুঝিয়ে দিল। তারপর মোড়লের পিছন পিছন দুজন আস্কারিকে নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করল। তাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা গাছের নীচে শনের নীচু ছাদওলা কুটিরে। তার ঠিক সামনেই মাটিতে পোঁতা একটা লম্বা খুঁটিতে টাঙানো আছে বিরাট সিংহ-সহ একটা হরিণ জাতীয় প্রাণীর সাদা খুলি। আশেপাশের অন্য ঘরগুলোর সামনেও খুঁটির মাথায় এ জাতীয় নানা প্রাণীর খুলি টাঙানো আছে। সম্ভবত এটা এদের গ্রাম সাজানোর রীতি। সুদীপ্তদের তাদের থাকার আস্তানাটা দেখিয়ে দিয়ে, টোগোর উদ্দেশ্যে কী যেন বলে মোড়ল পা বাড়াল অন্যত্র। তাদের পিছনে আসা বয়স্ক লোকরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল নানা দিকে। শুধু বাচ্চারা সুদীপ্তদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল। নানাবয়সি

বাচ্চা, অপুষ্টিতে ভোগা দেহ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা উদর। যারা একটু বড় তাদের পরনে নামমাত্র বস্ত্রখণ্ড, আর ছোট শিশুরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'এ দেশটা খুব গরিব। পৃথিবীর সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর একটি। অল্প সংখ্যক শহরবাসী শুধু খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগ পায়। যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। পুরুষদের গড় আয়ু মাত্র ৪৩ বছর। নারীদের সামান্য বেশি ৪৬।' হেরম্যান এরপর একটু আক্ষেপের সুরে বললেন, 'আগে এখানে আসব জানলে অন্তত সামান্য লজেন্স-টজেন্স, আনতাম এই বাচ্চাগুলোর জন্য। খুশি হত ওরা।'

হঠাৎ বাচ্চাদের দঙ্গলের ভিতর থেকে একটু বড় একটা ছেলে এসে দাঁড়াল সুদীপ্তদের সামনে। ছেলেটার কোলে অদ্ভুত দেখতে ছোট্ট একটা প্রাণী। প্রাণীটার মুখ ও লেজ বেজির মতো, তবে শরীরের গঠনটা অন্য ধরনের। প্রাণীটাকে দেখিয়ে ছেলেটা কী যেন বলল সুদীপ্ত হেরম্যানের উদ্দেশ্য।

টোগো সুদীপ্তদের বলল, 'ও বলছে এই প্রাণীটা ওর পোষা। আপনারা চাইলে ও প্রাণীটাকে আপনাদের কাছে বিক্রি করতে পারে।'

সুদীপ্ত প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'এটা কী প্রাণী?'

টোগো বলল, 'এরা একে 'মোয়া' বলে ডাকে। বনবিড়াল ও বেজির সংকর। এ রকম অনেক উদ্ভট প্রাণীর দেখা মেলে আফ্রিকার অরণ্যে।'

সুদীপ্তদের ওই প্রাণীর প্রয়োজন নেই শুনে একটু হতাশ হয়ে অন্যদিকে চলে গেল ছেলেটা। বাচ্চাদের দঙ্গলটাকে এরপর হটিয়ে দিল টোগো। ঘরের ভিতর ঢুকল সুদীপ্তরা। মেঝেতে খড়ের বিছানা পাতা। ভিতরে ঢুকেই সেখানে শুয়ে পড়ল সুদীপ্ত। টোগো বলল, 'আপনারা বিশ্রাম নিন। আমি মোড়লের কাছে গিয়ে দেখি, আমরা যেদিকে যাচ্ছি সে-দিক সম্বন্ধে কোনো খবর সংগ্রহ করা যায় কিনা। তাছাড়া রান্নার ব্যবস্থাও করতে হবে।' এই বলে টোগো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে সন্ধ্যা নামছে। সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খড়ের বিছানাতে ঘুমিয়ে পড়ল সুদীপ্ত।

হেরম্যানের ডাকে সুদীপ্ত যখন উঠে বসল, তখন রাত ন'টা বাজে। খাবার নিয়ে এসেছে টোগো। আর তার সঙ্গে বাইরের তাঁবু থেকে একটা ছোট পেট্রোম্যাক্স বাতি। তারই আলোতে তিনজন খাবার নিয়ে বসল। খাওয়া শুরু করার পর টোগো বলল, 'কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু করব আমরা। কুলিদের সেইমতো তাঁবু গোটাতে বলে এসেছি। ভোরে রওনা হলে আমরা ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে রুজিজি নদীর মোহানায় পৌঁছে যাব। তারপর ঠিকমতো চলতে পারলে সন্ধ্যা নাগাদ "গ্রেট রিফট্" উপত্যকার মুখে পৌঁছে যাব। অন্তত ঘণ্টা দশ-বারো কাল হাঁটতে হবে। গ্রেট রিফটের কাছে জঙ্গলটা ভালো নয়। সিংহের উৎপাত খুব! যতটা সম্ভব দিনের আলো থাকতে থাকতেই ওখানে পৌঁছতে হবে।'

হেরম্যান বললেন, 'পরিশ্রম করতে আমার আপত্তি নেই। যেভাবেই হোক গন্তব্যে পৌঁছতে হবে আমাকে। তার জন্য জীবন বাজি রাখতেও রাজি।'

টোগো জানাল, রুজিজি নদীর মোহানা অতিক্রম করার পরই, কার্যত সভ্য পৃথিবীর

সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তারপর শুধু আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল গহীন অরণ্য আর দুর্গম পাহাড়। সেসব অতিক্রম করে তবে পৌঁছনো যাবে পিগমিদের সেই রহস্যময় উপত্যকাতে।

রুটি খেতে খেতে হেরম্যান এরপর তাকে বললেন, 'মোড়লের সাথে আর কোনো কথা হল? কিছু জানতে পারলে ওদিককার খবর?'

টোগো বলল, 'হ্যাঁ হয়েছে। একটা আশ্চর্য খবর পেলাম। সেটাই আপনাকে দিতে যাচ্ছিলাম।'

খাওয়া থামিয়ে হেরম্যান বললেন, 'কী খবর?'

টোগো বলল, 'আমরা যেদিকে যাচ্ছি, গতকাল একটা বেশ বড় দল গেছে সে দিকে। জনা পঁচিশেকের দল। একজন খুব লম্বা আফ্রিকান্ডার ওই দলের নেতা। পনেরো জন মাসাই আস্কারি আছে ওই দলে। গতকাল দুপুরে গ্রামের ঠিক বাইরে বিশ্রামের জন্য থেমেছিল দলটা। তখন মোড়লের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয় তাদের দলনেতার সঙ্গে। মোড়লের পায়ের নতুন জুতোটা ওই আফ্রিকান্ডারই উপহার দিয়েছে। সে নাকি গ্রেট রিফট উপত্যকার জঙ্গলে সিংহ শিকারে যাচ্ছে। আফ্রিকান্ডার নাকি ওই অঞ্চল সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করছিলেন মোড়লের কাছ থেকে। আশ্চর্যর বিষয় হল সে লোকটা নাকি সবুজ দানব বানরের সম্বন্ধেও বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে মোড়লকে! যদিও সে ব্যাপারে মোড়ল কোনো জবাব দিতে পারেনি তাকে কারণ, মোড়ল বা এ গ্রামের কোনো লোক ওদিকে কখনো যায়নি। লোকমুখে আমাদের মতোই ওই বানরের কথা শুনেছে মাত্র, তার বেশি মোড়লের কিছু জানা নেই।' একটানা কথাগুলো বলে থামল টোগো।

"আফ্রিকান্ডার কাদের বলে?" জানতে চাইল সুদীপ্ত। এ শব্দটা প্রথম শুনল সে।

হেরম্যান প্রথমে সুদীপ্তর কথার জবাবে বললেন, "আফ্রিকাজাত শ্বেতকায় ব্যক্তিদের বলা হয়, 'আফ্রিকান্ডার'। এদের পূর্বপুরুষরা প্রায় সকলেই ভাগ্যান্বেষণে ইওরোপ থেকে এদেশে এসেছিলেন।" এরপর তিনি টোগোকে বললেন, 'ও লোকটা সবুজ বানরের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিল কেন? সিংহ শিকারের সাথে সবুজ বানরের সম্পর্ক কী?"

টোগো জবাব দিল, 'জানি না। গল্পটা সে কোথাও শুনেছে। এমনও হতে পারে ওদিকে সে যাচ্ছে বলে নিছক কৌতূহলবশত বানরের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছে মোড়লের কাছে।'

সুদীপ্ত এরপর বলব না-বলব না করেও বলেই ফেলল, 'ব্যাপারটা এমন নয়তো যে, ওই লোকটাও আমাদের মতোনই ওই সবুজ বানরের খোঁজে যাচ্ছে? যদি সত্যিই ও প্রাণী ওখানে থেকে থাকে, আর ওই আফ্রিকান্ডার আমাদের আগেই তার খোঁজ পেয়ে যায়, তাহলে তো আমাদের পরিশ্রমটাই মাটি হবে।'

সুদীপ্তর কথা শুনে হেরম্যান কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মৃদু হেসে বললেন, 'আমার মতো পাগলের সংখ্যা পৃথিবীতে বেশি নেই। মনে হয় সে সত্যিই সিংহ শিকার বা অন্য কোনো কাজে ওদিকে যাচ্ছে। যদি আমাদের সাথে তার দেখা

হয়, তাহলে পরস্পর পরস্পরের কাজে অসুবিধা সৃষ্টি না করলেই হল।' এরপর আর কোনো কথা না বলে খেতে শুরু করলেন হেরম্যান। সুদীপ্তর কিন্তু হেরম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি মনে হল, মুখে যাই বলুন না কেন, সুদীপ্তর কথাটা পুরোপুরি তিনি উড়িয়ে দিতে পারছেন না!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্তদের খাওয়া শেষ হল। হেরম্যান পরদিনের যাত্রা সম্পর্কিত কিছু টুকিটাকি কথা সেরে নিলেন। পরদিন খুব ভোরে উঠতে হবে। তাই এরপর রাত আর না বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল তারা।
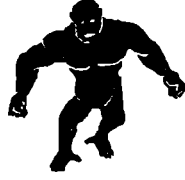
সেদিন ভোরে সূর্য ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা শুরু হল। প্রথমে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল তাঙ্গানিকার পাড়ে, তারপর আগের দিনের মতোই হ্রদের তীর ঘেঁসে এগোতে থাকল। এপথে সকাল থেকেই নানা প্রাণী চোখে পড়তে লাগল সুদীপ্তদের। কখনো জেব্রার দল চরে বেড়াচ্ছে মাঠে, কখনো জিরাফ লম্বা গলা তুলে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে গাছের মাথা থেকে, আবার কখনো বা ইম্পালা নামের ছোট হরিণের ঝাঁক দৌড়ে পালাচ্ছে মানুষ দেখে। এছাড়া তাঙ্গানিকার জলে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে জলহস্তির দাপাদাপি। চলতে চলতে সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'এখানে হাতি নেই?'

টোগো জানাল, 'না, এদিকে হাতি তেমন একটা দেখা যায় না। বুরুন্ডিতে হাতি খুব বেশি নেই। হাতির স্বর্গরাজ্য হল কিনিয়া আর তাঞ্জেনিয়া। সেখানে হাতি এত বেশি যে মাঝে মাঝে সরকার থেকে হাতি মারা হয়। শিকারিদের পারমিটও দেওয়া হয়।'

টোগোর কথা শোনার পর হেরম্যান হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ওই আফ্রিকান্ডার তো শুনলাম গ্রেট রিফ্‌টে সিংহ শিকারে যাচ্ছে। ওই অঞ্চলে সিংহদের কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে নাকি?'

টোগো বলল, 'না, তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। লোকটা যে এত কষ্ট করে ওখানে সিংহ শিকারে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না। উপত্যকায় সিংহ শিকার বেশ অসুবিধাজনক। সিংহ শিকারের আদর্শ জায়গা হল, উগান্ডা আর কিনিয়া। সরকার তো এ বছর সেখানে সিংহ শিকারের জন্য পাশও দিচ্ছে। বুরুন্ডিরও কিছু লোক সাফারিতে গেছে সে দু-দেশে। উনি তো ওসব জায়গাতেই যেতে পারতেন!'

টোগোর উত্তর শুনে, কী যেন ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগলেন হেরম্যান।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদও ক্রমশ চড়ছে আগের দিনের মতোই। তবে এদিকে বড় গাছ কিছুটা আছে। যতদূর সম্ভব তার ছায়াতেই সকলে চলতে লাগল।

বেলা এগারোটা নাগাদ দূর থেকে কিসের যেন গুরুগম্ভীর ধ্বনি শুনতে পেল তারা।

টোগো জানাল, 'আমরা রুজিজি নদীর মোহনার কাছে পৌঁছে গেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্তরা পৌঁছে গেল সেই জায়গাটাতে। গ্রেট রিফট উপত্যকা থেকে নেমে এসে রুজিজি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঙ্গানিকার জলে। যেখানে রুজিজি এসে মিশেছে প্রচণ্ড শব্দ সেখানে। ওই শব্দই কানে আসছিল দূর থেকে। রুজিজির জল হ্রদে পড়ে প্রথমে রেণু রেণু হয়ে ছিটকে উঠছে আকাশের দিকে, তারপর আবার নীচে নেমে পাক খেতে খেতে মিশে যাচ্ছে তাঙ্গানিকার সাথে। অপূর্ব দৃশ্য! একটু দূরে দাঁড়িয়ে জায়গাটা দেখল সুদীপ্তরা। মোহানার কাছেই এক জায়গাতে বেশ বড় একটা জলহস্তির দল দেখা গেল। অন্তত জনপঞ্চাশেক প্রাণী হবে। তাদের শাবক টাবকও আছে! সুদীপ্তদের দেখে তারা কিন্তু মোটেও পাত্তা দিল না, যেন এই দুপেয়ে জীবগুলো নেহাতই মশামাছি! টোগো বলল, 'জলহস্তির মাংস খেয়েছেন কোনো দিন? আমি খেয়েছি। ভারী তৈলাক্ত!'

অন্য কেউ কথাটা বললে ব্যাপারটা হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিত সুদীপ্তরা। কিন্তু টোগো এখানকার মানুষ। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোই তার পেশা। তার পক্ষে ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়।' সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ও মাংস কোথায় খেয়েছ তুমি?'

সে জবাব দিল, 'এই তাঙ্গানিকার তীরেই, তবে বুরুন্ডিতে নয়, তাঞ্জানিয়াতে এক আদিবাসী গ্রামে। বছর পাঁচেক আগে একটা দলের সাথে সেখানে সাফারিতে গেছিলাম আমি। একটা জলহস্তী মেরে গ্রামসুদ্ধ লোক ভোজ খেল।'

সুদীপ্ত এবার কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'তুমি সিংহর মাংস কোনো দিন খেয়েছ?'

সে জবাব দিল, ''না, আমি খাইনি। তবে 'মাসাই ল্যান্ডে' কোনো কোনো আদিবাসী খায় বলে শুনেছি। সিংহর যকৃত, হৃৎপিণ্ড দিয়ে অবশ্য ওঝারা ঔষুধ তৈরি করে। ও খেলে নাকি সিংহর মতো শক্তি হয়!'

হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন এ মহাদেশে বহু জনগোষ্ঠীর বাস। প্রায় এক হাজার কথ্য ভাষায় কথা বলে তারা। তাদের আচার আচরণ, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনও ভিন্ন ভিন্ন। পিগমি, বুশমেন, হটেনটট—এই তিন আদিবাসী সম্প্রদায় হল প্রস্তর যুগের মানুষ। এদেশের খাদ্যাভাস যে বিচিত্র হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! গভীর বনে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাসের কথা না হয় বাদই দাও। আমি একবার জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকার এক ঝাঁ-চকচকে ফাইভস্টার হোটেলে খেতে গেছি। সেখানে 'রয়াল স্যুপ' বলে আমার টেবিলে কী হাজির করা হল জানো? একটা স্যুপ, আর তার মধ্যে ভাসছে এক বিঘত লম্বা একটা সিদ্ধ গিরগিটি!!! আমার পাশের টেবিলের এক দম্পতিকে দেখি সে জিনিসই তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে!'

'আপনি সে জিনিস খেলেন নাকি?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল সুদীপ্ত।

হেরম্যান তার কথা শুনে চলতে চলতে মাটির ওপর বেশ কয়েকবার থুথু ফেলে তার অভিব্যক্তি বুঝিয়ে দিলেন।

রুজিজি নদীর মোহানা থেকে নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলল তারা। তাঙ্গানিকা পড়ে রইল পিছনে। এদিকে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ের সংখ্যাই বেশি। ঘাসে ছাওয়া প্রান্তর আর চোখে পড়ছে না। পথের নীচের মাটি বেশ শক্ত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

রুজিজি কোথাও প্রশস্ত, আবার কোথাও সংকীর্ণ। এঁকেবেঁকে সে চলেছে সুদীপ্তদের ফেলে আসা পথের দিকে। রুজিজির পাড় বরাবর বেশ কিছুটা পথ এগোবার পর হঠাৎ নদীখাতে দূর থেকে বেশ কয়েকজন মানুষ দেখতে পেল তারা। টোগোই দেখতে পেল প্রথমে। হেরম্যানের কাছে একটা বাইনোকুলার ছিল, সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ তাদের পর্যবেক্ষণ করার পর টোগো এগোল তাদের দিকে। মূল জলস্রোতের পাশেই তিরতির করে বয়ে চলা একটা উপখাতে গোড়ালি সমান জলে দাঁড়িয়ে কী যেন করছিল, জনাসাতেক অর্ধউলঙ্গ লোক। সুদীপ্তরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই লোকগুলো জল ছেড়ে উঠে এল তাদের কাছে। লোকগুলোর উচ্চতা মাঝারি, প্রায় নেড়া মাথা, সামান্য বস্ত্রখণ্ড পরা আছে দেহের নিম্নাংশে। রোদের তাতে পুড়ে যাওয়া কালো মুখে একটা সরলতার ভাব আছে। তবে দেখেই মনে হচ্ছে বেশ পরিশ্রমী।

টোগোই প্রথম তাদের সাথে কথাবার্তা শুরু করল। তাদের পরিচয় জানার পর সে সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে বলল, "ওরা নদীর ওপারের 'জাইরে'র অর্থাৎ 'গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর' বাসিন্দা। 'বান্টু' জনগোষ্ঠীর লোক। ওরা এদিকে এসেছে নদীখাতে হীরে খুঁজতে। গ্রেট রিফট্ উপত্যকার কাছেও ছিল ক'দিন। তারপর সিংহর ভয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছে। ওদিকে সিংহর নাকি খুব উৎপাত। এদের একজন সঙ্গীকে নাকি সিংহ টেনেও নিয়ে গেছে।'

হীরের কথা শুনে সুদীপ্ত অবাক হয়ে বলল, 'হীরে! হীরেও পাওয়া যায় নাকি এখানে?'

টোগো বলল, 'রুজিজির এই যে জলপ্রবাহ তার সাথে মিশেছে বহু ছোট ছোট নদীর জলধারা। গ্রেট রিফটের বহু ভূ-গর্ভস্থ গুহার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ওইসব নাম-না-জানা নদী। তাদের জলধারা অনেক সময় সেই অজানা-গোপন পর্বতকন্দর থেকে বয়ে আনে হীরকখণ্ড। তবে খুব বড় হীরে অবশ্য পাওয়া যায় না। পর্বত কন্দরে লুকানো খনি থেকে এতটা পথ আসতে জল আর পাথরের ঘর্ষণে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। যা পাওয়া যায়, তা আসলে হল হীরের কুচি। আপনি দেখবেন? দাঁড়ান তাহলে বলি এদের! এই বলে সে সম্ভবত তাদের কথাটা বলতেই, তাদের একজন এগোল কিছুদূরে একটা গাছের দিকে। সেই গাছের আড়ালে লোকগুলোর বাসস্থান, কাপড়ের তৈরি একটা তাঁবু এবার চোখে পড়ল সুদীপ্তর।

লোকটার তাঁবুর দিকে এগোবার পর হেরম্যান টোগোকে বললেন, 'ওরা তো গ্রেট রিফটের ওদিকে গেছিল বলছে। দেখো ওদের কাছে ওদিকের অন্য কোনো খবর আছে নাকি?'

টোগো আবার কথা বলতে শুরু করল তাদের সাথে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁবুর দিক থেকে ফিরে এল সেই লোকটা। তারপর সুদীপ্তদের সামনে এসে একটা ছোট্ট চামড়ার থলি থেকে হাতের তেলোতে ঢালল এক মুঠো পাথর। কিন্তু সে পাথরে কোনো দ্যুতি নেই, গোলমরিচের দানার চেয়ে একটু বড় কালচে বর্ণের পাথর। একটা পাথর নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল হেরম্যান আর সুদীপ্ত। পাথরটা লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়ে হেরম্যান বললেন, 'এগুলো সব অনেকটা ডায়মন্ড। পালিশ করলেই ঝলমল

করে উঠবে। তারপর কেপটাউন হয়ে চলে যাবে আমস্টারডামের বাজারে। হাজার ডলারে বিকবে এক-একটা।'

সুদীপ্ত শুনে বলল, 'এ লোকগুলোর তো তাহলে ভালোই পয়সাকড়ি আছে। কিন্তু দেখে তো মনে হয় না!'

টোগো লোকগুলোর সাথে কথা বলতে বলতে সুদীপ্তর কথা কানে যেতেই, তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক তার উল্টো। এরা সত্যিই খুব গরিব। কাগজে কলমে ক্রীতদাস প্রথা আফ্রিকা থেকে উচ্ছেদ হলেও আসলে এরা মালিকের ক্রীতদাস। সে-ই তাদের পাঠিয়েছে এখানে। ফিরে গিয়ে তার হাতে হীরেগুলো জমা দিয়ে তার বিনিময়ে এরা হয়তো পাবে, সামান্য কয়েক বস্তা খাদ্যশস্য, কিছু পুরানো পোশাক, ঘর ছাওয়ার খড় এইসব। আর যাকে সিংহ নিল, তার তো সবই গেল। জঙ্গলে কাজ করতে এলে কিছু হলে ক্ষতিপূরণের ব্যাপার-ট্যাপার এখানে নেই।' টোগোর কথা শুনে আর লোকগুলোকে দেখে বেশ খারাপ লাগল সুদীপ্তর।

বান্টুদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর টোগো হেরম্যানকে জানাল, 'এরা গিয়েছিল গ্রেট রিফট্ উপত্যকার ঠিক মুখ পর্যন্ত যেখানে আমরা আজ তাঁবু ফেলব। এখান থেকে আনুমানিক জায়গাটা আট-দশ মাইল উত্তরে হবে। বেশ ঘন জঙ্গল যেখানে। রাতে খুব ঠান্ডা, আর সিংহের উপদ্রব ছাড়া, সে জায়গা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারছে না এরা। পাহাড় টপকে ও-পাশের উপত্যকাতে তারা যায়নি। তবে অন্য একটা খবর এরা বলছে। সেই আফ্রিকাভারের নেতৃত্বে যাওয়া দলটার সাথে নাকি কাল বিকালে এদের এখানে দেখা হয়েছিল। তারাও এদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছিল ও অঞ্চলের। আর সেই আফ্রিকাভার নাকি হুটুদের মতো, এদের কাছেও জিজ্ঞেস করেছে সবুজ বানরের কথা!' হেরম্যান শুনে শুধু মন্তব্য করলেন, 'আশ্চর্য!'

লোকগুলোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার চলতে শুরু করল সকলে। টোগো বলল, বিশ্রামের জন্য আজ আর থামা যাবে না, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে হবে। সন্ধ্যা নামার আগেই নির্দিষ্ট স্থানে তাঁবু ফেলতে হবে। নইলে বিপদ আছে!' তার কথা শোনার পর সকলে দ্রুত পা চালাতে শুরু করল। মাইল দেড়েক চলার পর নীল দিগন্তে একটা অস্পষ্ট কালো রেখা চোখে পড়ল সুদীপ্তদের। মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে টোগো বলল, "ওই হল, 'গ্রেট রিফট্।' ওখানেই আমরা যাব।"

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'ও দিকে এর আগে কোন পর্যন্ত তুমি গেছ?'

টোগো জবাব দিল, 'গ্রেট রিফটে, আমি আগে দু-বার গেছি। কিন্তু আপনি যেখানে যেতে চাইছেন সেই ওপাশের উপত্যকাকে যাইনি কোনোদিন। পাহাড়ের মাথা থেকে গভীর বনে ঘেরা জায়গাটা দেখেছি শুধু।'

সুদীপ্তদের যাত্রাপথে পায়ের নীচের মাটি ক্রমশ রুক্ষ হতে শুরু করল। আবার কমে আসতে লাগল বড় বড় গাছের সংখ্যা, তার পরিবর্তে তাদের বেষ্টন করতে লাগল বিরাট বিরাট কাঁটাঝোপের বন। তাদের ভিতর বিরাজ করছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দিগন্তের কালো রেখাটা ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। সুদীপ্তদের চলার সাথে তাল

মিলিয়ে সূর্যও ক্রমশ ধীরে ধীরে পশ্চিমে এগোতে লাগল। জঙ্গলের ভিতর থেকে আসা পাখির ডাকগুলোও মিলিয়ে গেল এক সময়। শুধু জেগে রইল রুজিজির গম্ভীর নিনাদ। শুধু চলা আর চলা। সে-চলার যেন আর বিরাম নেই।

চলতে চলতে সুদীপ্তরা তখন গ্রেট রিফটের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পাহাড়ি উপত্যকার গিরিশিরাগুলো তখন নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট দৃশ্যমান। সূর্যের আলো নরম কিন্তু সন্ধ্যা নামতে প্রায় ঘণ্টা দুই দেরি। নির্ধারিত সময় অনুপাতে বেশ একটু দ্রুতই পথ অতিক্রম করেছে তারা। ঠিক এই সময় চলতে চলতে টোগো পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আঙুল তুলে ইশারায় কাছে একটা ঝোপের দিকে দেখাল। আস্কারিরা সঙ্গে সঙ্গে কোনো অজানা বিপদের আশঙ্কাতে সুদীপ্তদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাগ করল সেই ঝোপের দিকে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর একজন কুলি সেই ঝোপটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতের বর্শাটা দিয়ে ঝোপটা একটু ফাঁক করতেই তার আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল বিরাট হরিণ জাতীয় একটা প্রাণীর দেহ। তার কালো অঙ্গ লাল হয়ে গেছে রক্তে। চারপাশেও ছড়িয়ে আছে চাপচাপ রক্ত। প্রাণীটার দেহের পিছনের অংশ থেকে বেশ কয়েক পাউন্ড মাংস কে যেন খুবলে নিয়েছে। টোগো প্রাণীটাকে দেখে সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে প্রথমে বলল, 'এটা হল কুডু জাতীয় হরিণ। এ দেশে এই হরিণ খুব সামান্যই পাওয়া যায়। এদের আসল দেশ হল অ্যাঙ্গোলা। সেখানকার 'গ্রেট কুডু' বিখ্যাত প্রাণী!'

এরপর একটু নীচু হয়ে মৃত প্রাণীটার ক্ষতস্থানটা ভালো করে দেখে টোগো বলল, 'সিংহর কাজ! বান্টু উপজাতীয় লোকগুলো মিথ্যা বলেনি। এ তল্লাটে সিংহ আছে। খুব সাবধানে পথ চলতে হবে আমাদের।'

প্রাণীটাকে দেখে আর টোগোর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল আস্কারি আর কুলির দল। সুদীপ্ত আর হেরম্যানকে ঘিরে একটা বৃত্ত রচনা করল তারা। তুতসি কুলিরা তাদের বর্শার ফলাগুলোকে বাগিয়ে ধরল ঝোপের দিকে। আফ্রিকানদের বর্শার ফলাগুলো বেশ অদ্ভুত ধরনের হয়। লাঠির মাথায় অনেকটা বেয়নেটের মতো দেখতে ফুট তিনেক লম্বা ইস্পাতের ফলা। তার দু-পাশে ধার। অনায়াসে তাদের তরোয়ালের ফলার মতো ব্যবহার করা যায়, রাইফেল আর বর্শা ফলকের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আবৃত হয়ে তারা এগিয়ে চলল সামনের দিকে। ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগল গ্রেট রিফট্।

সারা দিনের পথশ্রমের পর অবশেষে তারা সন্ধ্যা নামার কিছু আগে এসে উপস্থিত হল গ্রেট রিফটের পাদদেশে। ছোট বড় পর্বতশ্রেণি সেখানে ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে হারিয়ে গেছে উত্তর দিগন্তে। হেরম্যান বললেন, 'এই পর্বতশ্রেণি উত্তরে রোয়ান্ডা সীমান্ত অতিক্রম করে উগান্ডার ওপাশে এগিয়েছে। রুজিজি আর এই পর্বতমালার ওপাশটা হল জাইরে বা গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো। জাইরের অন্তর্গত, আফ্রিকা মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গ 'মাউন্ট স্টানলি'র উচ্চতা ৫১১০ মিটার। মাউন্ট স্ট্যানলি কিন্তু এই গ্রেট রিফটেরই অন্তর্গত।'

দিনান্তের সূর্যরশ্মির লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে পর্বতশৃঙ্গের মাথায়। তার পাদদেশে বয়ে চলা রুজিজি নদী, আফ্রিকার অরণ্য প্রদেশের গহীন জঙ্গল, সভ্য পৃথিবীর থেকে

বিচ্ছিন্ন এ এক অচেনা পৃথিবী! সুদীপ্ত আর হেরম্যান বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখতে লাগল অস্তাচলগামী সূর্যালোকে রাঙানো প্রকৃতিকে। টোগো তাড়া লাগাল, 'আমাদের কিন্তু এখন দাঁড়ালে হবে না। চটপট জায়গা বেছে তাঁবু ফেলতে হবে। অগ্নিকুণ্ডও জ্বালাতে হবে। এ জায়গা কিন্তু ভালো নয়।'

অতঃপর আর দাঁড়িয়ে না থেকে তাঁবু ফেলার জন্য স্থান নির্বাচন করা হল। জায়গাটা পাথুরে দেওয়াল আর জঙ্গলের মাঝে এক চিলতে ফাঁকা জমি। দুজন কুলি লেগে গেল তাঁবু খাটানোর কাজে। হেরম্যান, সুদীপ্ত আর টোগোও হাত লাগাল তাতে। আর অন্য দু-জন কুলি আস্কারিদের প্রহরাতে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে এক জায়গাতে জমা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো তাঁবু খাটিয়ে ফেলল তারা। ছোট তাঁবুতে থাকবে হেরম্যান, সুদীপ্ত আর টোগো। বড়টাতে থাকবে কুলিরা, আর দুজন আস্কারি। আস্কারিরা নিজেদের মধ্যে সময় ভাগ করে নিয়ে দুজন করে একসাথে তাঁবু পাহারা দেবে। তাঁবু দুটোর গা ঘেঁষে থাকবে দুটো ছোট আর একটা বড় অগ্নিকুণ্ড, তাঁবু খাটানো আর কাঠ সংগ্রহর পর কুলির দল রান্নার প্রস্তুতি শুরু করল। হেরম্যান, সুদীপ্তকে নিয়ে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে অন্ধকার নেমে এল। আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে আসতে লাগল ঝিঁঝিঁ পোকার নিরবচ্ছিন্ন ঐকতান। তাঁবুর ভিতর হাত-পা ছড়িয়ে বসে সেই কলতান শুনতে লাগল সুদীপ্তরা। অন্ধকার গাঢ় হতেই ধীরে ধীরে ঠান্ডা নামতে শুরু করল উপত্যকার বুকে।

এক ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নেবার পর তারা দুজন যখন আবার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল, তার অনেক আগেই অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়ে গেছে। কুলিদের তাঁবুর সামনে রান্নার কাজ চলছে। সেখানেই একটা ছোট অগ্নিকুণ্ড ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে টোগো সহ অন্যরা। বাইরে বেরিয়ে হেরম্যান সুদীপ্তকে নিয়ে বসলেন নিজেদের তাঁবুর সামনে অগ্নিকুণ্ডের পাশে। চাঁদ উঠেছে আকাশে, সেই আলোতে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া থাক থাক পাথুরে দেওয়াল—'গ্রেট রিফট্ ভ্যালি'। চারপাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গল। চাঁদের আলো কেন, দিনমানে আফ্রিকার প্রখর সূর্যরও প্রবেশের অনুমতি নেই সেখানে। চন্দ্রালোকিত গ্রেট রিফটের একটা অংশ দেখিয়ে হেরম্যান বললেন, ওর ওপাশে যেতে হবে আমাদের। জানি না সেখানে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে!'

সুদীপ্ত সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের কী ওই অত উঁচু পাহাড়ে উঠতে হবে?'

হেরম্যান বললেন, 'পাহাড়ের মাথায় উঠতে না হলেও, অন্তত হাজার তিনেক ফিট উঠতে হবে। বেশ কয়েকটা গিরিশিরা আছে এখানে, তারই একটা ধরে এগিয়ে, তারপর ওপাশের ঢাল বেয়ে নামতে হবে। বেশ কয়েকটা উপত্যকা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্রেট রিফটের ওপাশে। অনুচ্চ পাহাড়ঘেরা জঙ্গলময় সব ছোট ছোট উপত্যকা। তারই একটা উপত্যকা, ম্যাপ দেখে খুজে বার করতে হবে আমাদের। যেখানে আছে ওই পিগমি গ্রাম।

সুদীপ্ত শুনে বলল, 'ম্যাপ! ওখানকার ম্যাপ কোথায় পেলেন আপনি?'

হেরম্যান বললে, 'বছর পঞ্চাশ আগে ডারবানবাসী এক ইওরোপীয় ধর্মযাজক, রেভারেন্ড কলিন্স ওই অঞ্চলে গেছিলেন। অবশ্য তাঁর আগে-পরেও বেশ কয়েকজন গেছে ওই অঞ্চলে। তারাও অধিকাংশই ইওরোপীয় পর্যটক। যাই হোক কলিন্স ওই অঞ্চলের একটা কাঁচা ম্যাপ এঁকেছিলেন, একটা ডায়েরিতে কিছু নোটও নিয়েছিলেন। কলিন্স মারা যান কুড়ি বছর আগে। কিছু দিন আগে তারই এক উত্তরসূরীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের বিনিময়েই ম্যাপ আর ডায়েরি সংগ্রহ করি আমি। আর তারপরই এই বুরুন্ডি অভিযানের পরিকল্পনা করি। যার ফলশ্রুতি চাঁদের আলোতে গ্রেট রিফটের সামনে আমাদের এই বসে থাকা।

ডায়েরি আর ম্যাপের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে সুদীপ্ত জানতে চাইল, ডায়েরিতে তাহলে নিশ্চয়ই সবুজ বানরের কথা লেখা আছে। তিনি কী লিখছেন প্রাণীটার সম্বন্ধে?

হেরম্যান জানালেন, 'রোজ নামচা' বলতে যা লেখা হয় তাঁর ডায়েরিতে তেমনভাবে কিন্তু কিছু লেখা নেই। আছে খণ্ড খণ্ড কিছু ঘটনার বিবরণ। আর আছে ওষুধপত্তরের হিসেব। আফ্রিকার অত্যন্ত গ্রামগুলোতে ওষুধপত্র বিলি আর তার সাথে সাথে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই এদিকে তিনি এসেছিলেন। তবে অবশ্যই তাঁর ডায়েরিতেই ওই প্রাণীর উল্লেখ আছে। নইলে আর আমি সেটা সংগ্রহ করব কেন? পিগমিরা তাদের ডেরায় কলিন্সকে ঢুকতে দেয়নি। তিনি বেশ দূর থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে একবার দেখেছিলেন পিগমিদের দঙ্গলে। তাতে তিনি ওই প্রাণীটার যে চেহারা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হল, 'প্রাণীটার দেহ সবুজ বর্ণের লোমে ঢাকা, উচ্চতা অন্তত দশফুট, প্রাণীটা দু-পায়ে চলাফেরা করে, তবে একটু ঝুঁকে হাঁটে। আর প্রাণীটা দু-পায়ে হাঁটে বলেই তিনি সম্ভবত তার লেখার সময়, 'গ্রিন-মাঙ্কি'র পরিবর্তে 'গ্রিন ম্যান' কথাটা ব্যবহার করেছেন! হ্যাঁ, 'সবুজমানুষ!' ব্যাস এটুকুই লেখা আছে এই প্রাণীর সম্পর্কে?' সুদীপ্ত শুনে বলল, 'আচ্ছা, আপনার কী মনে হয় ; ওই প্রাণীটা কী মানুষ জাতীয় কোনো প্রাণী?'

হেরম্যান জবাবে বললেন, 'দ্যাখো এই আফ্রিকা মহাদেশ হল মনুষ্য প্রজাতির অন্যতম আদি বাসস্থান। গ্রেট রিফটের একটা অংশ কেনিয়াতেও আছে। সেখানে গ্রেট রিফটে অবস্থিত তারকানা হ্রদের তীরে পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু কঙ্গো-বুরুন্ডি এ অঞ্চলেই ২০০ জনগোষ্ঠী বাস করে। তার মধ্যে আবার কেউ কেউ প্রস্তর যুগের মানুষ। এখানে যেমন দেখা মেলে চার ফুট উচ্চতার ক্ষুদ্রাকৃতি পিগমিদের, তেমনই দেখা যায় ছয়-সাড়ে ছয় ফুট উচ্চতার যাযাবর সাসাইদের। তবে তাদের কেউই রোমশ নয়, উচ্চতাও দশফুট নয়। এ অঞ্চলে বেশ কিছু প্রজাতির গোরিলা, শিম্পাঞ্জির দেখা মেলে। বিশেষত কঙ্গো সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। আমার নিজস্ব ধারণা, ও প্রাণীটা গোরিলা জাতীয় প্রাণী। বিরাট বপুর এই প্রাণীরা মানুষের মতো দু-পায়ে হাঁটতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, এই নীল বানর বা নীলমানুষ হল, হিমালয়ের 'ইয়েতি' বা 'আমেরিকার 'বিগ ফুটে'র' আফ্রিকান সংস্করণ!'

কুলির দল ছেড়ে টোগো এর পর এসে বসল তাদের কাছে। হেরম্যান তাকে জিজ্ঞেস

করলেন, ওই পাথরের দেওয়াল অতিক্রম করতে আমাদের কত সময় লাগতে পারে মনে হয়?'

টোগো হিসেব করে বলল, 'ওপরে উঠতে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। ও পাশের ঢাল বেয়ে নামতে আরও তিন ঘণ্টা। আমার ধারণা, কাল বিকালের আগেই আমরা ও পাশের কোনো উপত্যকায় পৌঁছে যাব।' এরপর সে একটু থেমে বলল, 'আফ্রিকান্ডার দলটা আমাদের ঠিক একদিন আগে চলছে। হয়তো ওপাশে গেলে তাদের সাথে আমাদের দেখা হয়ে যাবে।'

তার কথা শোনার পর হেরম্যান বললেন, 'কাল সুদীপ্তর কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ওই দলটার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার মনেও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে! যে সিংহ শিকারের জন্য যাচ্ছে সে সিংহর ব্যাপারে খোঁজ না নিয়ে সবুজ বানরের সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছে কেন? তাদের সাথে যতক্ষণ না সাক্ষাৎ হচ্ছে, ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না!'

কথাগুলো বলার পর হেরম্যান আর টোগো পরদিনের যাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই কুলিরা রাতের খাবার নিয়ে এল। খাওয়া সেরে তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়ল সুদীপ্তরা।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তর। তাঁবুর ভিতর পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সুদীপ্ত দেখল টোগো আর হেরম্যান উঠে বসেছেন। সুদীপ্তও উঠে বসতেই হেরম্যান ইশারায় চুপ থাকতে বললেন তাকে। তার মনে হল, তাঁরা যেন কান খাড়া করে তাঁবুর বাইরে কী যেন একটা শোনার চেষ্টা করছেন। কয়েক মুহূর্ত পর সুদীপ্তও শুনতে পেল শব্দটা। 'খক্‌খক্' কাশির শব্দ। যে পাথরের দেওয়ালের নীচে তাদের তাঁবু, তারই মাথার ওপর কোনো জায়গা থেকে আসছে শব্দটা। আরও কিছুক্ষণ শোনার পর সুদীপ্তর মনে হল ওই শব্দটা যেন ক্রমশই গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের তাঁবুর দিকে নেমে আসছে। মিনিট খানেক পর ওই খক্ খক্ কাশির শব্দটা বদলে গেল একটা ঘড়্ঘড়্ শব্দে। শব্দটা যেন এবার কিছু দূর থেকে অগ্নিকুণ্ডে ঘেরা তাঁবু দুটোকে প্রদক্ষিণ শুরু করল। টোগো এবার অস্পষ্ট স্বরে সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে বলল, 'সিম্বা' অর্থাৎ সিংহ!

ঠিক এই সময় একজন রাইফেলধারী আস্করি সুদীপ্তদের তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তাকাল টোগোর দিকে। অর্থাৎ শব্দটা তার কানেও গেছে। টোগো হেরম্যানকে বলল, 'যদিও আগুন জ্বালানো আছে, তবুও এ প্রাণীকে বিশ্বাস নেই। খুব ধূর্ত প্রাণী! তাঁবুর ভিতর থেকেও মানুষ তুলে নিয়ে যায়! ওকে দূরে সরাতে হবে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইলেন হেরম্যান।

টোগো বলল, 'ফাঁকা আওয়াজ করে।'—এই বলে সে দুর্বোধ্য ভাষায় কাজটা করার নির্দেশ দিল আস্কারিকে।

লোকটা সরে গেল তাঁবুর দরজা থেকে, আর তারপরই রাইফেলের কানফাটানো গর্জনে খান খান হয়ে গেল রাতের অরণ্যের নিস্তব্ধতা। পরপর তিনবার ফায়ার করল লোকটা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাইফেলের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গ্রেট রিফটে।

সে শব্দ থেমে যাবার পর, সেই ঘড়্ঘড়্ শব্দটা আর শোনা গেল না। নিজের রাইফেলটা মাথার কাছে রেখে টোগো বলল, 'আপনারা এবার ঘুমিয়ে পড়ুন। আবার তো কাল সকালে উঠতে হবে।'

শুয়ে পড়ল সুদীপ্ত, কিন্তু ঘুমের মধ্যে সে যেন খালি শুনতে লাগল সেই ঘড়্ ঘড়্ শব্দ।
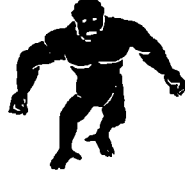
গ্রেট রিফট্। ছোট ছোট পাহাড় ধীরে ধীরে উঁচু উঁচু হতে হতে ক্রমশ হারিয়ে গেছে উত্তর দিগন্তে। ওদিকে এর বিস্তার উগান্ডা পর্যন্ত। পশ্চিমে গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো আর পূর্বে বুরুন্ডি। গ্রেট রিফট্-ই হল এ দু-দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা বিভাজক। চারপাশে ছড়িয়ে আছে পাহাড় ঘেরা অসংখ্য নাম-না-জানা উপত্যকা। বাঁশ ও অন্যান্য গাছের গহীন জঙ্গল সেখানে। দিনেরবেলাও সেখানে সূর্যের আলো প্রবেশের অনুমতি নেই। আদিম মহাবৃক্ষদের সেই রাজত্বে দিন-রাতের ফারাক বিশেষ বোঝা যায় না। সূর্যালোক আদিম মহাদ্রুমদের উদ্ধত শীর্ষদেশ শুধু স্পর্শ করে। কখনো চোখে পড়ে গ্রেট রিফটের ওপর থেকে নেমে আসা কোনো নদী। ওপর থেকে নাচতে নাচতে নীচে নেমে তারা হারিয়ে যায় উপত্যকার মহারণ্যের বাঁকে। উপত্যকার এসব অরণ্য বহু প্রাণীর আবাসস্থল। বিশেষত গোরিলা, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি নানা বানর জাতীয় প্রাণীর দেখা মেলে এখানে। আর দেখা মেলে সিংহর, এবং অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে। নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলে তমসাবৃত উপত্যকার অরণ্যে। সুদীপ্তরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যত ওপরে উঠতে লাগল, ওপর থেকে নীচে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অরণ্য উপত্যকাগুলো তত ভালো ভাবে দৃষ্টিগোচর হতে লাগল তাদের।

পাহাড়ের ঢালেও জঙ্গল আছে। তবে সে জঙ্গল খুব গভীর নয়। কিছুটা কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন সব মহাবৃক্ষ। তাদের গুঁড়িগুলো কত বিশাল তা না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না! পাঁচ জন লোকও হাতে হাত মিলিয়ে বেড় দিয়ে ধরতে পারবে না সেসব গাছের গুঁড়ি। পুরু শ্যাওলা জমে আছে তার গায়ে। আর নীচে জমে আছে শতাব্দী প্রাচীন পচা পাতার রাশি। সেগুলো নাড়িয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল সুদীপ্তরা। ওপরে উঠতে উঠতে মাঝে মাঝে অবশ্য হাঁফ ধরে যাবার জন্য তাদের থামতে হচ্ছিল। মিনিট দশেকের জন্য বিশ্রাম, তার পর আবার চলা। ঢালগুলো খুব খাড়া নয়, এই রক্ষা! তাছাড়া গাছের থেকে নেমে আসা মোটা মোটা লতাগুল্মগুলো ওপরে উঠতে দড়ির মতন ব্যবহার করতে পারছিল তারা। ওপরে উঠতে উঠতে এরকমই এক লতা-গুল্ম বেষ্টিত পাহাড়ের ঢালে তাদের সাথে দেখা হয়ে গেল একদল শিম্পাঞ্জির।

এতগুলো মানুষ দেখে মোটেও ভয় পেল না তারা। বরং সুদীপ্তদের মাথার ওপর লতা ধরে দোল খেতে খেতে বেশ কিছুটা পথ কিচির-মিচির করে এগোল তাদের সাথে। যেন তাদের দেখে নয়, বরং সুদীপ্তদের দেখেই ভারী মজা পেয়েছে প্রাণীগুলো! হেরম্যান বললেন, 'এ তল্লাটে কদাচিৎ মানুষ আসে, তাই সম্ভবত মানুষের বিপদ থেকে সচেতন নয় এরা।'

টোগো বলল, 'ঠিক তাই। নইলে মানুষকে সব প্রাণী এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।'

ঘণ্টা ছয় ওপরে ওঠার পর বেলা বারোটা নাগাদ সুদীপ্তরা গিরিশিরার বেশ উপরে একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গাতে পৌঁছে গেল। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। চারপাশে সেখানে শুধু পাহাড়ের সারি। ছোট ছোট পাহাড়গুলো উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করে আকাশের দিকে উঠে গেছে। তার মাঝে মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দুর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকা। দক্ষিণে অনেক নীচে চোখে পড়ছে রুপালি ফিতার মতো একটা রেখাচিহ্ন। টোগো বলল, 'ওই হল রুজিজি।'

হেরম্যান তার বাইনোকুলারটা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পশ্চিম দিকে দেখলেন। তারপর সেটা টোগোর হাত ঘুরে এল সুদীপ্তর হাতে। সুদীপ্তর চোখ রাখল তাতে। পাহাড়ের একটা শাখা চলে গেছে সেদিকেও। অনুচ্চ সব পাহাড়শ্রেণি সেদিকে। পাহাড়ের ঢালে উপত্যকার ঘন জঙ্গলগুলো ধরা দিতে লাগল সুদীপ্তর বাইনোকুলারে। সে বলল, 'ওপাশের জঙ্গলগুলো অন্য দিকের তুলনায় অনেক বেশি যেন ঘন মনে হচ্ছে।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হচ্ছে। ওদিকটাই হল কঙ্গো সীমান্ত। আমরা যে জায়গাতে যাব, সেটা সীমান্তবর্তী এলাকা। ঘন-জঙ্গল সেখানে বুরুন্ডি আর কঙ্গোর সীমারেখা মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমের ঢাল বেয়ে নীচে নামার পর কলিন্সের ম্যাপ দেখে নির্দিষ্ট উপত্যকা খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। ছোট ছোট পাহাড়ের আড়ালে অসংখ্য উপত্যকা আছে ওদিকে। তারই একটায় ওই পিগমি গ্রাম।'

জায়গাটাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর, পশ্চিমের ঢাল বেয়ে সুদীপ্তদের নীচে নামা শুরু হল। তারা যত নামতে লাগল, এপাশে জঙ্গল যেন আরও গভীর বলে মনে হতে লাগল। আশেপাশের অরণ্য উপত্যকাগুলোও ঘন জঙ্গলে ঢাকা। গত দু-দিনও জঙ্গলের মধ্যে কাটিয়েছে তারা, কিন্তু এদিককার জঙ্গল আরও অনেক বেশি থমথমে। কেমন যেন রহস্যময়! সুদীপ্তর মনে হল, তারা অন্য কোনো পৃথিবীতে পদার্পণ করতে চলেছে। এ পথে দুটো ছোট নদী পার হল তারা। অগভীর নদীখাত, গোড়ালি সমান জল তিরতির করে বয়ে চলে হারিয়ে গেছে নীচের উপত্যকার জঙ্গলে।

হেরম্যান বললেন, 'ওপাশের জলধারাগুলো মিলে যেমন রুজিজির সৃষ্টি হয়েছে, তেমন এপাশের জলধারাগুলো কঙ্গো নদী বা গ্রেট জাইরের কোনো শাখার সাথে মিশেছে। অথবা কঙ্গোর ভূখণ্ড দিয়ে এগিয়ে মিশেছে সেই তাঙ্গানিকাতে।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, রুজিজির মতো কঙ্গো নদীরও উৎপত্তিস্থল 'গ্রেট রিফট' নাকি? এসব অঞ্চলে সভ্য মানুষের কবে প্রথম পদার্পণ ঘটে?' হেরম্যান বললেন, 'না। কঙ্গো বা গ্রেট জাইরে নদীর উৎপত্তিস্থল কঙ্গোর পশ্চিমে। দেশটার মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে

প্রবাহিত ওই নদী। তবে দেশটার সর্বত্রই প্রায় ওর শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত। কঙ্গো বা আমরা এখন যে অঞ্চলে প্রবেশ করছি, এসব জায়গা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত সভ্য পৃথিবীর অজানা ছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত পর্যটক 'হেনরি মর্টন স্ট্যানলি' সর্বপ্রথম এ তল্লাটে আসেন। আর তারই মাধ্যমে কঙ্গো এবং কঙ্গো সংশ্লিষ্ট এসব অঞ্চলে কথা সর্ব প্রথম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরই নাম অনুসারে বাঙ্গোর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 'মার্গারিটা'র নাম রাখা হয় 'মাউন্টস্ট্যানলি।' নীচে নামার পথে এদিকেও একদল শিম্পাঞ্জির সাথে সাক্ষাৎ হল তাদের। তবে এ প্রাণীগুলো তাদের অনুসরণ করল না। বরং তাদের দেখে কেমন যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে সরে গেল।

তিন ঘণ্টা ধরে চলার পর সুদীপ্তরা এক সময় তখন প্রায় নীচে নেমে এসেছে। আর হাজার খানেক ফুট নীচেই অনুচ্চ পাহাড় ঘেরা গভীর জঙ্গল ঘেরা এক ছোট্ট উপত্যকা। সেখানে নামতে আর বড়জোর আধ ঘণ্টা লাগবে। ঠিক এমন সময় এক দল কালো হরিণ চোখে পড়ল তাদের। সুদীপ্তদের যাত্রাপথের পাশেই পাহাড়ের ঢালে তারা চরে বেড়াচ্ছে। তাদের দেখার পর কুলির দল কী যেন বলল। তাদের কথা শুনে টোগো দাঁড়িয়ে পড়ে, কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে নিয়ে হেরম্যানকে বলল, 'কুলিরা হরিণের মাংস খেতে চাচ্ছে। তাছাড়া এদিকে এভাবেই খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। একটা প্রাণীকে মারতে হবে।' এই বলে যে রাইফেল তাগ করল হরিণের পালটার দিকে। রাইফেলের গর্জনে কেঁপে উঠল বনভূমি। হরিণের পালের থেকে একটা প্রাণী পড়ে গেল মাটিতে। অন্যরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সুদীপ্তদের দিকে। ব্যাপারটা অনুধাবন করতে কয়েকমুহূর্ত সময় লাগল প্রাণীগুলোর। আর তার পরই তারা নিহত সঙ্গীর দেহ ফেলে রেখে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল গভীর অরণ্যে।

টোগো একজন কুলিকে নির্দেশ দিল, প্রাণীটার দেহটা তুলে আনার জন্য। তার কথা শুনে সে নিজের মালপত্র অন্যদের পিঠে চাপিয়ে এগোল নির্দেশ পালন করতে। ঠিক সেই সময় নীচের উপত্যকা থেকে ভেসে এল, পরপর দু-বার দুমদুম শব্দ। রাইফেলের গর্জন! টোগো বলল, 'মানুষ! সম্ভবত ওই আফ্রিকাভারের দল হবে! আমাদের রাইফেলের শব্দ শুনে আমাদের সংকেত পাঠাচ্ছে।'

টোগোর কথা শুনে হেরম্যান তার বাইনোকুলার দিয়ে নীচের দিকে দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর টোগোও তার হাত থেকে সেটা নিয়ে নীচে বেশ কিছুক্ষণ দেখল, কিন্তু বড়বড় গাছের আড়ালে ঢাকা দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছাড়া আর অন্য কিছু চোখে পড়ল না তাদের।

হেরম্যান টোগোকে বললেন, 'তুমি একবার ছোড়ো। দেখো তো আর জবাব আসে নাকি?'

রাইফেল চালাল টোগো। আবার কেঁপে উঠল বনভূমি। এরপর কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপরই রাইফেলের শব্দ শোনা গেল নিচ থেকে। অর্থাৎ অনুমান সত্যি। টোগোর রাইফেলের শব্দ শুনে অন্য পক্ষও নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে।

টোগো বলল, 'লোকগুলো আমাদের সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী তা বোঝা যাচ্ছে।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক। এখানে তো সচরাচর মানুষ আসে না। ঠিক আমরাও যেমন কৌতূহলী ওদের ব্যাপারে, তবে লোকগুলো কেমন কে জানে!'

টোগো জবাব দিল, 'সেটা ওদের সাথে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাবে না। আমাদের সতর্কভাবে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওদের মতলবটাও জানতে হবে। আর তেমন কিছু হলে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই, আমরাও প্রত্যেকেই সশস্ত্র।'

সুদীপ্ত শুনে বলল, 'কিন্তু আমার কাছে তো কোনো অস্ত্র নেই!'

টোগো কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর নিজের জামার তলা থেকে একটা রিভলভার বার করে সুদীপ্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন, এটা রাখুন। জঙ্গলে চলতে হলে, এমনিতেই একটা হাতিয়ার অন্তত সঙ্গে রাখতে হয়। আমি ভেবেছিলাম, আপনার কাছে কিছু অন্তত আছে।' একটা মৃদু তিরস্কারের স্বর শোনা গেল টোগোর গলায়। অবশ্য সেটা যে সুদীপ্তর মঙ্গল কামনাতেই তা বুঝতে তার অসুবিধা হল না।

জিনিসটা হাতে নিয়ে সুদীপ্ত, হেরম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর আপনার?'

তার কথা শুনে হেরম্যান তার জামাটা তুলতেই তার কোমরে একটা রিভলভারের বাঁট চোখে পড়ল সুদীপ্তর। জামাটা ঠিক করে নিয়ে হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'তোমার জন্যও একটা এনেছি। সেটা তোমাকে আগেই দেওয়া উচিত ছিল। আপাতত তুমি টোগোরটাই রাখো। তাঁবুতে তোমাকে আমি ওটা দেব।'

হরিণটা কাঁধে তুলে সুদীপ্তদের কাছে ফিরে এল কুলিটা। তারপর সকলে মিলে নীচে নামতে শুরু করল।

মিনিট পনেরো ঢাল বেয়ে নামার পর, নীচ থেকে ওটা একটা ক্ষীণ ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখতে পেল তারা। তারপর তারা যত নীচে নামতে লাগল, ধীরে ধীরে নীচে জঙ্গল ঘেরা একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গা তাদের দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। বেশ কয়েকটা তাঁবু আর তার সামনে কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে সেখানে। হেরম্যান তার বাইনোকুলার দিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই আফ্রিকান্ডারের দলটাই হবে। একজন দীর্ঘদেহী লোক দেখতে পাচ্ছি ওদের মধ্যে। ওরাও আমাদের দেখতে পেয়েছে। একজন আমাদের লক্ষ্য করে কাপড় নাড়াচ্ছে!'

টোগো বলল, 'নীচে নেমে আমরা সোজা ওদের ওখানেই যাব। আর একটা কথা, নিজেদের মধ্যে কোনো-আলোচনা থাকলে একটু আড়াল-আবডালে সারবেন। জঙ্গলে অচেনা লোককে চট করে বিশ্বাস করতে নেই।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই উপত্যকার মাটিতে পা রাখল সুদীপ্তরা। গভীর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। চারপাশে অনুচ্চ সব পাহাড়। তাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে এরকমই আরো নানা উপত্যকা। তার কোনো-কোনোটাতে আজও হয়তো কোনো সভ্য মানুষের পদার্পণ ঘটেনি। ওইসব অজানা-অচেনা উপত্যকারই কোথাও লুকিয়ে আছে সুদীপ্তদের গন্তব্যস্থল, পিগমিদের সেই গ্রাম।

পশ্চিমের যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সুদীপ্তরা নীচে নামল, সূর্য তার মাথার আড়ালে চলে গেছে। যদিও সন্ধ্যা নামতে অন্তত ঘন্টা তিনেক সময় বাকি, তবুও পাহাড়ের ছায়া উপত্যকার আলোকে সময়ের তুলনায় বেশ কিছুটা ম্লান করে রেখেছে। একটা ছায়াময় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে চারপাশে। শব্দ বলতে শুধু ঝিঁ ঝিঁ জাতীয় কোনো পোকার একটানা ডাক, আর বড়বড় গাছগুলোর ডালপালার খসখস শব্দ। নীচে নামার পর কিছুক্ষণ ধরে চারপাশটা দেখে নিল সকলে, তারপর বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ির ফাঁক গলে, ঝোপজঙ্গল ভেঙে তারা এগোল সেই ফাঁকা জায়গার দিকে, যেখানে তাঁবু ফেলেছে লোকগুলো।

জঙ্গলের মধ্যে একটা বৃত্তাকার জায়গা সাফ করে নেওয়া হয়েছে তাঁবু ফেলার জন্য। বেশ অনেকটা তাঁবু খাটানো হয়েছে সেখানে। তাঁবুগুলোর সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী মাসাই রক্ষীর দল। আবলুশ কাঠের মতো তাদের গায়ের রং, হাতে ধরা আছে বর্শা। কাঁধে চামড়ার স্ট্রিপে ঝুলছে রাইফেল। ভাবলেশহীন মুখ, ঠিক যেন পাথর-খোদাই মূর্তি। সুদীপ্তরা জায়গাটাতে গিয়ে উপস্থিত হতেই তারা সতর্ক ভঙ্গীতে ফিরে তাকাল তাদের দিকে। আর তারপরই একটা তাঁবুর আড়াল থেকে যে লোকটা বেরিয়ে সুদীপ্তদের সামনে এসে দাঁড়াল তাকে দেখে চমকে গেল তারা। ছ-ফুট উচ্চতার লোক হামেশাই দেখা যায় আফ্রিকাতে, সুদীপ্ত নিজে পাঁচ-দশ, হেরম্যান পাক্কা 'ছ-ফুট', টোগোর উচ্চতাও ওরকমই হবে। মাসাইরাও বেশ লম্বা। কিন্তু এ লোকটার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে! সাতফুটের বেশিও হতে পারে! এত লম্বা লোক এর আগে কোনোদিন দেখেনি সুদীপ্ত। তার প্রস্থও আনুপাতিক। ঠিক যেন একটা দানব! লোকটার গায়ের রং মনে হয় সাদা, তবে তা আফ্রিকার প্রখর সূর্যের তাপে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। মাথার চুলের রং লালচে বাদামি। পরিষ্কার করে কামানো মুখমণ্ডলে এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ,

টিকালো নাসা। একটা খাঁকি রঙের পোশাক তার পরনে। পায়ে হাইহিল চামড়ার বুট। কোমরে রিভলভার। বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে একটা কার্তুজের বেল্ট ঝুলছে। সুদীপ্তর মনে হল লোকটার বয়স বছর চল্লিশ হবে।

এই লোকটাই যে সেই আফ্রিকান্ডার, সুদীপ্তদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না। লোকটা কয়েক মুহূর্ত সুদীপ্তদের সতর্ক দৃষ্টিতে জরিপ করে নেবার পর তাদের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে বলল, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'বুজুমবুরা। অর্থাৎ বুরুন্ডির রাজধানী থেকে।'

'ও বুজুমবুরা। কিন্তু আপনাদের দুজনকে দেখে তো আফ্রিকান বা আফ্রিকান্ডার বলে মনে হচ্ছে না!' ভ্রু কুঁচকে বলল লোকটা।

হেরম্যান বললেন, 'আপনার ধারণা সঠিক। আমরা দুজন ও-দুটোর কোনোটাই নই। আমরা বুজুমবুরা থেকে এখানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। আমি, 'ফ্রেডরিখ হেরম্যান,' জার্মানির বাসিন্দা। আর আমার এই সঙ্গী হল ইন্ডিয়ান। নাম, 'সুদীপ্ত'। সঙ্গের অন্যরা অবশ্য বুরুন্ডিরই লোক। এই টোগো হল, আমাদের গাইড অ্যান্ড ম্যানেজার।' এই বলে তিনি আঙুল তুলে টোগোকে দেখালেন।

তা আপনারা কী বায়োলজিস্ট? নাকি, কোনো জিওগ্রাফিক সোসাইটির লোক? সাধারণ ট্যুরিস্ট এখানে এতদূর আসে না। আপনাদের দেখে ঠিক শিকারি বলেও মনে হচ্ছে না!' লোকটা একটু সন্দিগ্ধভাবে বলল হেরম্যানের উদ্দেশ্যে।

হেরম্যান জবাব দেবার সময় একটু কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বললেন, 'আমাকে ওই বায়োলজিস্টই বলতে পারেন আপনি। এই অঞ্চলের পশুপাখি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এখনও সভ্য দুনিয়ার কাছে তেমন নেই। ওদের সম্বন্ধেই তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। কাছেপিঠের উপত্যকাগুলোতে কী কী প্রাণী আছে সে সম্পর্কে একটু অনুসন্ধান করব।'

আফ্রিকান্ডার তার কথা শুনে ঘাড় নেড়ে মনে হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হেরম্যান তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, 'আর আপনার পরিচয়?'

লোকটা হেরম্যানের প্রশ্ন শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, 'আমার নাম, ম্যাকুইনা ডায়ার। তাঞ্জানিয়ার জাঞ্জিবারের বাসিন্দা। ওখানে আমার একটা ডায়মন্ড মাইন' আছে। আমি ওখানেই থাকি।'

'ডায়মন্ড মাইন! অর্থাৎ, হীরের খনির মালিক!' সুদীপ্ত অবাক হয়ে তাকাল লোকটার দিকে।

নিজের পরিচয় দেবার পর ম্যাকুইনা দু-পা এগিয়ে এসে প্রথমে করমর্দন করলেন হেরম্যানের সঙ্গে, তারপর সুদীপ্তর দিকে তার ডান হাতের বিরাট থাবাটা করমর্দনের জন্য বাড়িয়ে দিয়ে একটু হাসলেন। বিকালের স্বল্প আলোতেই লোকটার দাঁতের ফাঁকে ছোট্ট একটা বিন্দু ঝিলিক দিয়ে উঠল। হীরে। হীরে বসানো আছে ম্যাকুইনার দাঁতে!

সুদীপ্তর সাথে করমর্দনের পর ম্যাকুইনা আবার হেরম্যানের দিকে ফিরে তাকাতেই, হেরম্যান এরপর তাকে মৃদু হেসে বললেন, 'তা আপনি এখানে কিসের সন্ধানে এসেছেন?'

ম্যাকুইনা প্রশ্ন শুনে একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি এখানে এসেছি সিংহ শিকারে। তাঞ্জানিয়াও সিংহের দেশ। আমার রক্তেও শিকারের নেশা আছে। কিন্তু তাঞ্জানিয়াতে এখন সিংহ শিকার প্রায় নিষিদ্ধ বললেই চলে। আগের দিন আর নেই। এখন বছরে মাত্র দু-একটা পাশ, লটারির মাধ্যমে দেওয়া হয় সিংহ শিকারের জন্য। তা-ও অনেক বিধি নিষেধ আছে শিকারের ব্যাপারে। কারণ ওই প্রাণীগুলোকে দেখার জন্যই তো পকেট ভর্তি ডলার নিয়ে ট্যুরিস্টরা ছুটে আসে ওখানে। গভর্নমেন্টের দু-পয়সা লাভ হয়। কিন্তু এখানে ওসব হাঙ্গাম নেই। এ জায়গাটা বুরুন্ডি আর কঙ্গোর সীমান্ত, অনেকটা 'নো ম্যানস ল্যান্ডের' মতো। কাগজ কলমে দু-দেশের একটা সীমারেখা নির্ধারিত থাকলেও, দু-দেশের সরকারই এ জায়গা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। আর সিংহও এখানে প্রচুর আছে। তাই খোঁজ নিয়ে আমি এখানে চলে এসেছি।' একটানা অনেকগুলো কথা বলে থামলেন তিনি।

হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'এখানে এসে কোনোটাকে এখনও মেরেছেন?'

ম্যাকুইনা বললেন, 'এখনও পর্যন্ত নয়। উল্টে গতকাল রাতে, ওদেরই একটা বড় দল হামলা চালিয়েছে আমাদের তাঁবুতে। একজন মাসাই জখম হয়েছে। ওই যে সামনের পাহাড়টা দেখছেন। ওদিক থেকে হানা দিচ্ছে ওরা। কাল বিকালে আমরা এখানে তাঁবু ফেলেছি। আজ সকালে ক'জনকে পাঠিয়ে ছিলাম ওদিকে। ওরা এসে খবর দিল যে, ওই পাহাড়ের নীচে ঘাসবনে গোটা তিনেক বড় বড় দল আছে। সিংহ-সিংহী এক-একটা দলে সাত-আটটা করে প্রাণী আছে!'

হেরম্যান এরপর কী যেন চিন্তা করে ম্যাকুইনাকে বললেন, 'আমরা যদি আজ আপনাদের এখানে তাঁবু ফেলি, তাহলে আপনাদের আপত্তি আছে? কাল আমরা আবার অন্য দিকে এগোব।'

ম্যাকুইনা জবাব দিলেন, 'না, আপত্তি নেই। বেশ কিছুটা জায়গা তো খালি আছে। তাছাড়া অচেনা জায়গাতে একসঙ্গে থাকাটা উভয়ের ক্ষেত্রেই অনেক বেশি নিরাপদ।'

হেরম্যান বললেন, 'ধন্যবাদ'। ম্যাকুইনা বললেন, 'ঠিক আছে, আপনারা তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা করুন। পরে আবার কথা হবে আপনাদের সাথে।' এই বলে ম্যাকুইনা 'আকালা' বলে হাঁক দিলেন। মাসাইদের ভিড়ের ভিতর থেকে সবচেয়ে লম্বা লোকটা কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে চমকে উঠল সুদীপ্তরা। একটা লম্বা কাটা দাগ তার ডান পাশের চোখের নীচ থেকে চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেদিকে তার ঠোঁটের একটা অংশ নেই। শূন্য ঠোঁটের ভিতর মাড়ি সমেত দুটো দাঁত দেখা যাচ্ছে। সুদীপ্ত যে লোকটাকে দেখে চমকে গেছে তা সম্ভবত বুঝতে পেরে ম্যাকুইনা বললেন, 'ওর মুখে সিংহ থাবা মেরেছিল, ও তারই দাগ। ও মাসাইদের সর্দার। ও রইল, সাহায্যের প্রয়োজন হলে ওকে বলবেন'—এই বলে হেরম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তাঁর তাঁবুর দিকে এগোলেন।

ম্যাকুইনার তাঁবুর পাশেই একটা ফাঁকা জায়গাতে দুটো তাঁবু ফেলা হল। একটা তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল হেরম্যান, সুদীপ্ত আর টোগো। হেরম্যান আর সুদীপ্ত মাটিতে বসে পড়ার পর হেরম্যান টোগোর উদ্দেশ্যে বললেন, 'ম্যাকুইনা লোকটাকে কেমন বুঝলে?'

টোগো বলল, 'এ অভিযানের জন্য প্রচুর টাকা ঢেলেছে লোকটা। মাসাইদের হাতের রাইফেলগুলো একদম আনকোরা নতুন! তবে একটা জিনিস লক্ষ করলাম, এ রাইফেলগুলো স্বয়ংক্রিয় হলেও আসলে এসবই দ্রুতগতিসম্পন্ন হালকা রাইফেল। বিশেষত মানুষ বা হরিণ জাতীয় প্রাণী মারা হয় এই রাইফেল দিয়ে, সিংহ শিকারের জন্য উপযুক্ত নয়।'

.তার কথার মাঝখানেই সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'সিংহ শিকারের জন্য কী ধরনের রাইফেল লাগে?'

টোগো জবাব দিল, 'ভারী রাইফেল। আফ্রিকার এইসব নিবিড় জঙ্গলে এমন কার্টিজ ব্যবহার করতে হয়, যা ধীরগতিসম্পন্ন অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী। যা গাছের গায়ে লেগে পিছলে যাবে না। 'ম্যাগনাম' বা '৩৫ হোয়েলাস' এ জাতীয় রাইফেল। চারণভূমি হলে, কেউ কেউ হয়তো 'ইংলিশ রিপিটার'ও ব্যবহার করে। কিন্তু এ ধরনের কোনো রাইফেল দেখলাম না ওদের কাছে। এটা একটা খটকার ব্যাপার!

হেরম্যান বললেন, মাসাইগুলো তো সাধারণ গার্ড। এমন হতে পারে যে শিকারের রাইফেল ম্যাকুইনার তাঁবুতে আছে?'

টোগো বলল, 'হতে পারে। আপনারা এখন বিশ্রাম করুন। আমি দেখি মাসাইগুলোর সাথে ভাব জমিয়ে কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারি কিনা। তাছাড়া রান্নার তদারকিও করতে হবে। কথাগুলো বলে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল টোগো।

সুদীপ্ত হেরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, ম্যাকুইনার অরিজিন কী মনে হয়? ইওরোপীয় নাকি আমেরিকান?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'ডায়ার' পদবিটা ব্রিটিশ অথবা আইরিশ ম্যানদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। আমার ধারণা ওর গ্র্যান্ডফাদার ব্রিটিশ ছিলেন। ১৮৮৬ সালে আমাদের দেশ, অর্থাৎ জার্মানি ও ব্রিটেন যৌথভাবে 'তাঙ্গানিকা-জাঞ্জিবার' অঞ্চল দখল করে। তারপর জার্মানি নেয় 'তাঙ্গানিকা' আর ব্রিটেন নেয় 'জাঞ্জিবার'। হাতির দাঁত, হীরে আর সোনার লোভে বেশ কিছু ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ সেসময় জাঞ্জিবারে বসতি স্থাপন করে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জাঞ্জিবার ছিল ব্রিটেনের অধীনে। ঠিক যেমন ছিল তোমাদের দেশ। তবে ওদেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আসে ১৯৬৩ সালে। কিন্তু তার সাথে সাথেই সেখানে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মাথাতেই ১৯৬৪ তে 'তাঙ্গানিকা' ও 'জাঞ্জিবার' মিলিত হয়ে এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। তার নাম হয় 'তাঞ্জানিয়া'। এখনও বহু বিটিশ বংশভূতরা ওখানে বসবাস করেন।'

হেরম্যান এরপর বললেন, 'আজ অন্য দিনের চেয়ে বেশ কিছুটা সময় আগে তাঁবু ফেলা গেছে। বাড়তি সময় পাওয়া গেল বিশ্রামের জন্য। কাল থেকে শুরু হবে আমাদের আসল অভিযান।'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'ওই পিগমি অঞ্চলে পৌঁছতে আমাদের কত সময় লাগবে?'

তিনি জবাব দিলেন 'কলিন্সের ডায়েরি অনুসারে সম্ভবত ও-জায়গাটা মাইল তিরিশ হবে। আশেপাশের কোনো পাহাড়ের আড়ালে রয়েছে ওই উপত্যকা। টোগো ফিরলে

ওর সঙ্গে কলিন্সের ম্যাপটা নিয়ে আলোচনা করে আমাদের অন্তিম যাত্রাপথ ঠিক করতে হবে।' এই বলে বিশ্রাম নেবার জন্য হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

সুদীপ্ত শুয়ে পড়ে নানা কথা চিন্তা করতে লাগল। ওদিকে বাইরে দ্রুত ফুরিয়ে আসতে লাগল বিকেল।

শুয়ে থাকতে থাকতে একটু তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল সুদীপ্তর। হঠাৎ বাইরে চিৎকার চেঁচামেচির শব্দে উঠে বসল সে। কারা যেন চেঁচাচ্ছে, 'সিম্বা! সিম্বা!!' শব্দটার অর্থ বুঝতে পেরেই সুদীপ্ত লাফিয়ে উঠে তাঁবুর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল তার কিছু তফাত দিয়ে একটা হলুদ রঙের বিদ্যুৎ, একটা মানুষকে কাঁধে ফেলে ছুটে যাচ্ছে! কয়েক মুহূর্ত মাত্র, আর তারই মধ্যে প্রাণীটা সারিবদ্ধ মাসাইদের চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে দিয়ে তাঁবুর সামনের ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। শেষ মুহূর্তে প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে কে যেন একটা বর্শা ছুড়ে ছিল। কিন্তু সেটা প্রাণীটাকে স্পর্শ করল না। হতভাগ্য মাসাইটার আর্ত চিৎকার জঙ্গলের ভিতর ক্রমশ দূর থেকে দূরে হারিয়ে গেল।

সুদীপ্ত দেখল ম্যাকুইনা একটা রাইফেল নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশেই তাঁর তাঁবু। হেরম্যানও উঠে পড়ে তাঁবুর দরজায় সুদীপ্তর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা দুজন বাইরে বেরিয়ে ম্যাকুইনার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মাসাইরা এসে ম্যাকুইনাকে যা বলল, তার অর্থ হল, 'যাকে সিংহ টেনে নিয়ে গেল সে লোকটা মিনিট তিনেক আগে, বড় যে তাঁবুটা আছে তার পিছনে একটা গাছের আড়ালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছিল। প্রাণীটা ওখানেই ঘাপটি মেরে বসেছিল। আর তারপর...।'

অন্ধকার নেমে আসছে। এই সময়ে ওই মাসাইকে জঙ্গলে খুঁজতে যাওয়া মানে, নিজেদেরও মৃত্যু ডেকে আনা। কাজেই সে কাজ করতে গেল না কেউ। সুদীপ্তর ম্যাকুইনার কথা শুনে মনে হল, তিনি মাসাইটার থেকেও একটা বন্দুক চলে যাওয়াতে বেশি দুঃখ পেলেন। কারণ তিনি সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কী ভয়ংকর জায়গা দেখছেন! এতগুলো লোকের মধ্যেও লোকটাকে টেনে নিয়ে গেল। আমার গুলি চালানো উচিত ছিল। সিংহটা তো ওকে মারলই। ওর কাঁধের বন্দুকটা অন্তত বেঁচে যেত! এক একটা বন্দুকের অনেক দাম। কাল বনের ভিতর লোক পাঠাব, যদি বন্দুকটা অন্তত উদ্ধার করা যায়!'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি ভয়ংকর জায়গা। এতগুলো লোক দেখেও প্রাণীটা ভয় পেল না!'

তবে এই উপত্যকা যে সত্যি কতটা ভয়ংকর তা বুঝতে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল হেরম্যান বা ম্যাকুইনার দলের সবাইকে। চারপাশ প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। ম্যাকুইনা তাদের লোকদের তাঁবুগুলোর চারপাশে ফাঁকা জমিটা ঘিরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাতে বললেন।

সুদীপ্তদের সঙ্গের তুতসি কুলিরাও হাত লাগাল তাদের কাজে। হেরম্যানও হুটু গার্ডদের সতর্ক থাকতে বললেন। ম্যাকুইনা হেরম্যানকে বললেন, 'যান, আপনারা তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমি রাতে আপনাদের তাঁবুতে যাব।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আসবেন। অভিজ্ঞতা বিনিময় করা যাবে।'

ম্যাকুইনা এরপর ঢুকে গেলেন নিজের তাঁবুতে। টোগো কাছেই ছিল, হেরম্যান তাকে বললেন, 'তুমি কখন আসছ? আমাদের একটু আলোচনায় বসতে হবে।'

সে বলল, 'আর এক ঘণ্টার মধ্যেই রান্না হয়ে যাবে। একেবারে খাবার নিয়ে যাচ্ছি।'

তার উত্তর শুনে সুদীপ্তরা তাঁবুর দিকে এগোল।

তাঁবুর ভিতরটা অন্ধকার। হেরম্যান একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে বললেন, 'অন্য সময় জঙ্গলের মধ্যে যখন তাঁবু ফেলা হবে, তখন দিনের বেলা হলেও তাঁবু ছেড়ে কোথাও একটু দূরে গেলে, ফিরে এসে ভিতরে ঢোকার আগে বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নেবে। ফাঁকা তাঁবুতে কোনো প্রাণী ঢুকে বসে থাকতে পারে।'

সুদীপ্ত তাঁর কথা শুনে একটু হালকা ছলে বলল, 'প্রাণী মানে, সিংহ নাকি?'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। আমি ঠাট্টা করছি না। তোমাকে একটা ছোট্ট গল্প বলি, 'আমার পরিচিত এক শিকারি, শিল্ডম্যান একবার উগান্ডা গিয়েছিলেন অ্যান্টিলোপ শিকারের জন্য। ঘাসবনের এক প্রান্তে একটা বাওয়াব গাছের নীচের তাঁবু ফেলেছিলেন তিনি। সঙ্গী বলতে শুধু একজন মাসাই। তাকে নিয়ে সারাদিন শিকারের সন্ধানে ঘুরে সন্ধ্যায় রোজ তাঁবুতে ফিরে আসেন। ওরকমই একদিন শিকার শেষে ফিরে সটান তাঁবুতে ঢুকে তাঁর ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়লেন। তার সঙ্গী ছিল বাইরে। হঠাৎ তাঁবুর ভিতর একটা বোটকা গন্ধ পেয়ে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখে তার ক্যাম্পখাটের ঠিক নীচেই থাবার ওপর মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছেন এক সিংহ মহারাজ। তাঁবুতে ঢোকার সময় ব্যাপারটা তাঁবুর আধো অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেননি শিল্ডম্যান। তার সঙ্গী যেন কীভাবে বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা, সে তাঁবুতে আর ঢুকল না। এদিকে সিংহর ঘুম ভেঙে যাওয়ার ভয়ে খাট ছেড়ে আর নীচে নামতে শিল্ডম্যান সাহস পেলেন না। অন্ধকার নেমে এল তাঁবুর ভিতর-বাইরে। পরিস্থিতিটা বোঝো একবার! একটা মানুষ আর সিংহ, আর তাদের দুজনের মধ্যে সামান্য একটা ক্যাম্বিস কাপড়ের ব্যবধান! ওই অবস্থাতেই সারারাত কাটালেন তিনি। তবে বরাত ভালো বলতে হবে তার। শেষ রাতের দিকে ঘুম ভাঙল পশুরাজের। তারপর সে শিল্ডম্যানকে কিছু না বলেই তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সারারাত একটা মানুষ তার সঙ্গে কাটাল এ ধারণা সম্ভবত সিংহমশাইও করতে পারেননি। মাসাইটা ভোরবেলা তাঁবুতে ঢুকে দেখল, এক রাতেই যেন শিল্ডম্যান অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন!

হেরম্যানের গল্প শুনে সুদীপ্ত বলল, 'তাহলে সত্যিই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে।'

সুদীপ্ত আর হেরম্যান এরপর শুয়ে তাদের যাত্রাপথের নানা কথা আলোচনা করতে লাগল।

এক ঘণ্টাও কাটেনি, হঠাৎ তাঁবুর বাইরে আবার একটা গোলযোগ শুনে উঠে বসল সুদীপ্তরা। ঠিক সেই মুহূর্তে টোগো তাঁবুর দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। বেশ কিছুক্ষণ হল অন্ধকার নেমে গেছে। তাঁবুগুলোকে ঘিরে ফাঁকা জমিটার চারপাশে গোটা সাতেক ছোট বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। তাঁবুর সামনের ফাঁকা জমির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে

আছে মাসাই রক্ষী ও সুদীপ্তদের সঙ্গে আসা তুতসি কুলিরা। ম্যাকুইনাদের কাছে দাঁড়াতেই টোগো আঙুল তুলে পশ্চিম দিকে দেখাল। সেদিকে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। সুদীপ্ত প্রথমে সেদিকে তাকিয়ে কিছু ঠাহর করতে পারল না, তারপর যেন মনে হল অগ্নিকুণ্ডের ঠিক ওপাশে অন্ধকার বনানীর নীচে যেন জ্বলছে সার সার কয়েক জোড়া চোখ! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের অবয়বগুলো স্পষ্ট হয়ে গেল সুদীপ্তর চোখে। হ্যাঁ, সিংহ! গোটা সাতেক সিংহের একটা বেশ বড় দল! দুটো সিংহ, বাদ বাকি সিংহী। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আগুনের এ-পাশে থাকা মানুষেদের লক্ষ করছে প্রাণীগুলো।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর হেরম্যান বললেন, 'ওরা আমাদের আক্রমণ করবে নাকি?'

ম্যাকুইনা বললেন, 'একটাকে নিয়ে যাবার পর খাবারের খোঁজে...সে উদ্দেশ্যেই দল বেঁধে এসেছে ওরা।'

আরও মিনিট পাঁচেক সময় কেটে যাবার পর প্রাণীগুলো অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে একদম অগ্নিকুণ্ডের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। অগ্নিকুণ্ডের আলোতে দাঁড়িয়ে জিভ চাটছে প্রাণীগুলো।

আর অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না মনে করে ম্যাকুইনা প্রাণীগুলোকে হটাবার জন্য আকালার বন্দুকধারী মাসাইদের ফাঁকা আওয়াজ করার নির্দেশ দিলেন। বেশ কয়েকটা বন্দুক শূন্যে গর্জে উঠল। তাদের প্রচণ্ড শব্দে খানখান হয়ে গেল রাত্রির নিস্তব্ধতা। কিন্তু তারা বন্দুকের শব্দে ঘাবড়াল না। অগ্নিকুণ্ডের থেকে কয়েক পা পিছু হটে দাঁড়াল মাত্র।

মিনিট তিনেক পর আবার রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করা হল। কিন্তু এবারও প্রাণীগুলো ভয় পেল বলে মনে হল না। তারা একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

সুদীপ্তর পিছনে দাঁড়িয়ে টোগো বলল, 'ওরা দলে ভারী। এত তাড়াতাড়ি রণে ভঙ্গ দেবে মনে হয় না। ওরা ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে!'

'কিসের ধৈর্য?' পিছন ফিরে জানতে চাইল সুদীপ্ত।

টোগো জবাব দিল, 'কখন আমরা অসতর্ক হই। আর সেই সুযোগে আগুন টপকে তুলে নিয়ে যাবে কাউকে!'

টোগোর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে পিছনের দিকে আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল সুদীপ্তর, সেদিকেও সবার অলক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে আরও একদল সিংহ! দুটো অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে সে দিকে। একটা বিরাট কলেবরের সিংহ দুটো অগ্নিকুণ্ডের মাঝখান দিয়ে সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে ফাঁকা জমিতে প্রবেশ করতে চলেছে। অগ্নিকুণ্ড যদি ও পার হয়ে যায় তবে সে-জায়গা থেকে সুদীপ্তদের যে দূরত্ব, তাতে মাত্র কয়েকটা লাফেই সে পৌঁছে যাবে তাদের কাছে!

সুদীপ্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করার সাথে সাথেই চিৎকার করে উঠল, 'ওই যে! ওই যে! ওদিকেও একটা দল! সকলে ফিরে তাকাল পিছনে। সেই সিংহটা তখন অগ্নিকুণ্ড পার হবার জন্য এগিয়ে এল। প্রমাদ গুনল সবাই। দু-পাশ থেকে তাদের আক্রমণে উদ্যত

হিংস্র প্রাণীগুলো। সিংহগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করল রক্ষীরা। রাইফেলের শব্দ আর ক্রুদ্ধ প্রাণীদের গর্জনে কেঁপে উঠতে লাগল চারদিক। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল এ লড়াই। গোটা চারেক প্রাণী মাটিতে পড়ে যাবার পর অবশেষে রণে ভঙ্গ দিল সিংহের দল। জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল তারা। সেখান থেকে ভেসে আসতে লাগল তাদের ক্রুদ্ধ গর্জন। তাদের আরও দূরে হটাবার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারপাশের অন্ধকার জঙ্গল লক্ষ্য করে গুলি চালাল মাসাইরা। তারপর এক সময় সব শব্দ থেমে গেল। যেন, কোথাও কিছু হয়নি! শুধু বাতাসে ভেসে বেড়ানো বারুদের কটু গন্ধ, আর অগ্নিকুণ্ডগুলোর আশেপাশে পড়ে থাকা মৃত প্রাণীগুলোর লাশ শুধু স্মরণ করাতে লাগল সদ্য ঘটে যাওয়া ভয়ংকর ঘটনার কথা।

এ অভিজ্ঞতা হেরম্যান বা সুদীপ্তর আগে কোনোদিন হয়নি।

টোগো বলল, 'প্রাণীগুলো কী ধূর্ত দেখেছেন! কৌশল করে দুটো দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল ওরা। প্রথম দলটা তাদের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করাচ্ছিল। আর সেই সুযোগে দ্বিতীয় দল আমাদের পিছন থেকে আক্রমণের তালে ছিল। তাদের ঠিক সময় দেখতে না পেলে আমাদের কাউকে মরতেই হত!'

ম্যাকুইনা বললেন, 'সম্ভবত প্রাণীগুলো জঙ্গলের ওপাশে ঘাসবনের দিকে চলে গেল ওদের আড্ডায়।

টোগো বলল, 'তবে কিছুই বলা যায় না। ওরা আবার ফিরে আসতে পারে। রাতটাই তো এখনও বাকি! আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

আলোচনা করে এরপর ঠিক হল, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁবুগুলোর সামনে আরও বেশ কয়েকটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হবে। আর তাঁবুগুলোকে গোল হয়ে ঘিরে রক্ষীরা সারারাত পাহারা দেবে। আর নামমাত্র যে ক'জন লোক তাঁবুর ভিতর থাকবে, তারা যেন অস্ত্র নিয়ে শোয়।

আলোচনা শেষ হবার পর, সুদীপ্ত আর হেরম্যান আবার নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গেল।

তাঁবুতে ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার নিয়ে এল টোগো। হরিণের ঝলসানো মাংস আর রুটি জাতীয় একটা খাবার। খিদে পেয়ে গেছিল সবার। একসাথে বসে বেশ পরিতৃপ্তি করে খেল তারা। খেতে খেতে হেরম্যান টোগোকে বললেন, ওদের মতলব কিছু জানতে পারলে?' টোগো বলল, 'না, কেউ মুখ খুলল না। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল যে, কাল সকালেই ওরা তাঁবু গুটিয়ে অন্য দিকে এগোবে। আফ্রিকাভার নাকি সেরকমই নির্দেশ দিয়েছে। তবে একটা ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট যে ওরা সিংহ শিকারের জন্য এখানে আসেনি। যেখানে এত সিংহ, যে জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গাতে ওদের যাবার দরকার কী? তাছাড়া আমি যে বিরাট সিংহটাকে প্রথমে মারলাম, অন্য কেউ হলে ওর মাথা আর চামড়াটা ট্রফি হিসাবে নিয়ে যেত। কিন্তু আপনারা তাঁবুতে চলে আসার পর ম্যাকুইনার সামনেই দেখলাম কয়েকজন মাসাই প্রাণীটার চামড়া ছিঁড়েখুড়ে ওর হৃৎপিণ্ডটা বার করে নিল। ওর অত সুন্দর চামড়াটা নষ্ট হতে দেখেও কিছু বলল না ম্যাকুইনা।

এ ব্যাপারটাও ঠিক শিকারিসুলভ নয়।'

সুদীপ্ত শুনে বলল, 'মাসাইরা ওই হৃৎপিণ্ড নিয়ে কী করবে?'

টোগো বলল, 'পুড়িয়ে খাবে। এ রকম একটা ধারণা আছে যে, সিংহর হৃৎপিণ্ড খেলে দেহের শক্তি বাড়ে।'

টোগো এরপর বলল, 'এসব কথা থাক। কাল আমরা কোন দিকে এগোব তা নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া যাক। জায়গা ভালো নয়, পরিকল্পনা না করে এগোলে বিপদ হবে।'

হেরম্যান বললেন, 'ওই আলোচনা সেরে নেবার জন্যই তো বসেছি। এক মিনিট দাঁড়াও— এই বলে তিনি উঠে গিয়ে তাঁবুর কোনায় রাখা তার ব্যাগ থেকে একটা রোল করা কাগজ বার করে এনে সেটা মেলে ধরলেন টোগো আর সুদীপ্তর সামনে। মেট্রোম্যাক্সের আলোতে কাগজটা তিনি মাটিতে বিছাতেই সুদীপ্ত বুঝতে পারল সেটা একটা ম্যাপ। পার্চমেন্ট কাগজের ওপর পেন্সিলে অস্পষ্ট আঁকযোক করা আছে তাতে। খুদে খুদে অক্ষরে কী সব যেন লেখা দেখা যাচ্ছে। কাগজটা বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে গেছে।

ম্যাপটা বিছিয়ে হেরম্যান টোগোকে বললেন, 'এই হল কলিন্সের ম্যাপ। যদিও স্কেলের কোনো বালাই নেই, কাঁচা হাতে আঁকা ম্যাপ। তবু এর ওপরই নির্ভর করতে হবে আমাদের।'

সবাই ঝুঁকে পড়ল ম্যাপের ওপর। হেরম্যান ম্যাপের ওপর আঙুল চালিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'এই হল আমাদের অবস্থান। আর এই হল সেই পাহাড়, যা ডিঙিয়ে আমরা উপত্যকাতে নেমেছি। এই জায়গা থেকেই শুরু হচ্ছে আমাদের ম্যাপ। সামনের পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে উত্তর দিকে মাইল সাতেক এগোতে হবে আমাদের। তারপর আমরা পৌঁছাব, এই যে এই ক্রম চিহ্ন দেওয়া জায়গাতে। রুভ্ভু নদীর খাত পেরিয়ে ওপারে পৌঁছলে এখানে একটা পাহাড় আছে। তার এক পাশটা দেখতে সিংহর মুখের আদলে বলে, কলিন্স তার নামকরণ করেছিলেন 'সিংহর মুখ।' সেখানে ছোট পাহাড় বেয়ে উপত্যকার ভিতর প্রবেশ করতে হবে। তাহলেই আমাদের চোখে পড়বে পিগমিদের সেই গ্রাম। এই অঞ্চলই হল সেই সবুজ বানরের দেশ। চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঘন বাঁশের জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের ঢালের ঠিক মাঝখানে অনেকটা বাটির আকৃতির নীচু জায়গাতে অবস্থান করছে পিগমি গ্রামটা। তারা অর্ধসভ্য জাতি। বাইরের পৃথিবীর সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তারা চাষাবাদ জানে না। উপত্যকার জঙ্গলে শিকার করে খায়। কলিন্সের বিবরণ অনুযায়ী পঞ্চাশ বছর আগে ও জায়গা ঠিক এমনই ছিল। ঠিক এই জায়গাটা—এই বলে ম্যাপের ওপর একটা বিন্দুতে তর্জনি স্থির করলেন হেরম্যান।

টোগো, হেরম্যান-নির্দেশিত বিন্দুটা ভালো করে দেখার পর বলল, 'মোটামুটি অনুমান করতে পারলাম জায়গাটা। তবে যেটাকে রুভভুনদী বলা হচ্ছে, তা সম্ভবত রুভভুর কোনো শাখানদী। কারণ মূল রুভভু প্রবাহিত হয়েছে বুরুন্ডির ঠিক মাঝখানে। যাইহোক, যাত্রাপথের কোনো বিবরণ কলিন্স সাহেব বলেছেন কি?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'তেমন ডিটেল কিছু নেই, ডায়েরিতে আছে নদী পর্যন্ত উত্তরে ঘাসবন। বর্ষা ছাড়া অন্য ঋতুতে নদীখাত শুকনো থাকে। আর, পিগমি গ্রামের উপত্যকার জঙ্গলে নাকি গোরিলার দেখা মেলে।

টোগো আর হেরম্যান এরপর পরদিন যাত্রা শুরুর ব্যাপারে পরিকল্পনা ছকতে লাগল, আর সুদীপ্ত শুনতে লাগল তাদের কথা।

হঠাৎ তাঁবুর ভিতরে বসেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করল সুদীপ্ত। ম্যাকুইনা আর তাদের তাঁবুর মাঝে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। আগুনের লাল আভা এসে পড়েছে সুদীপ্তদের তাঁবুর সে পাশে। তাঁবুর সেই ক্যানভাসের পর্দায় ফুটে উঠেছে একটা মানুষের দীর্ঘ অবয়ব। যেন তাঁবুর গা ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে কেউ! মুহূর্তের জন্যই যেন দৃশ্যমান হল সেই অবয়ব। সুদীপ্ত আঙুল তুলে বলল, 'কে ওখানে?' কিন্তু টোগো আর হেরম্যান সেদিকে তাকাবার আগেই ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল!

সেদিকে তাকিয়ে কিছু না দেখতে পেয়ে হেরম্যান বললেন, 'কী?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'মনে হয়, কে যেন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল!'

টোগো সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে রিভলভার টেনে বার করে তাঁবুর বাইরে ছুটে গেল। কিন্তু হুটু আস্কারি ছাড়া অন্য কাউকে চোখে পড়ল না তার। তারা বলল, ওদিকে আগুন জ্বালানো আছে বলে ওরা সেদিকে যায়নি। টোগো একবার তাকাল অগ্নিকুণ্ডের ওপাশে ম্যাকুইনার তাঁবুর দিকে। তার ভিতরটা অন্ধকার। সেখানে কেউ আছে কিনা সে বুঝতে পারল না। বাইরে আশেপাশেও কোথাও ম্যাকুইনাকে দেখতে পেল না সে। টোগো আবার তাঁবুতে ফিরে এল। হেরম্যান আর টোগোর আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে গেছিল। কলিন্সের ম্যাপটা গুটিয়ে যথাস্থানে রাখার পর হেরম্যান তাঁর কাছে রাখা একটা রিভলভার এনে সুদীপ্তর হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা আমার দেশের বিখ্যাত "জার্মান মাউজার।" ছোট হলেও শক্তিশালী অস্ত্র। এটা এখন থেকে তোমার সম্পত্তি।' সুদীপ্ত জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখার পর নিজের কাছে রেখে দিয়ে টোগোর রিভলভারটা তাকে ফেরত দিয়ে দিল।

হেরম্যান এরপর টোগোকে বললেন, ম্যাকুইনা আসবেন বললেন, কিন্তু কই, তিনি তো এলেন না?'

টোগো জবাব দিল, 'বাইরে তাকে দেখলাম না। তার তাঁবুও অন্ধকার। হয়তো তিনি শুয়ে পড়েছেন।'

হেরম্যান বললেন, 'তাহলে আমরাও শুয়ে পড়ি। কাল আবার নতুন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

তাঁবুর বাতি নিভিয়ে দেওয়া হল। হেরম্যান আর সুদীপ্ত শুয়ে পড়ল। শুধু টোগো তাদের মাঝে বসে রইল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হেরম্যান নাক ডাকতে শুরু করলেন। প্রথমে সুদীপ্তর ঘুম এল না। অন্ধকার তাঁবুতে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, 'তাঁবুর গায়ে যে ছায়াটা সে দেখে ছিল, সেটা কী সত্যি? নাকি সেটা আসলে তার মনের ভুল?'

কিছুসময় পর বাইরে থেকে ভেসে আসতে লাগল মাসাইদের সমবেত সঙ্গীত। কেমন

যেন একটা করুণ সুর তাতে। সুদীপ্ত টোগাকে জিজ্ঞেস করল, 'এত রাতে কী গান গাইছে ওরা?'

টোগো চাপাস্বরে বলল, 'সন্ধ্যায় ওদের যে সঙ্গীকে সিংহ টেনে নিয়ে গেল, তার উদ্দেশে গানের মাধ্যমে শোক প্রকাশ করছে ওরা। আর বনদেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তিনি যেন ওই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে শান্তি দেন।'

এরপর টোগো তাকে বলল, 'আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি জেগে আছি। তেমন কিছু হলে ডাকব।'

মাসাইদের সঙ্গীতধ্বনি শুনতে শুনতে এরপর এক সময় সুদীপ্ত ঘুমিয়ে পড়ল।
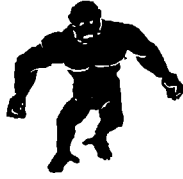
রাতটা নিরুপদ্রবেই কাটল। তাঁবুতে প্রাতরাশ সেরে সুদীপ্তরা যখন তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন প্রভাতরবির কিরণে উদ্ভাসিত সবুজ উপত্যকা। যেদিকেই তাকানো যায়, সেদিকেই বনানীর অপরূপ শোভা। জঙ্গলের ভিতর থেকে দু-একটা পাখির ডাকও যেন ভেসে আসছে। শুধু পাহাড়ের মাথায় কোথাও কোথাও এখনও কুয়াশা জড়িয়ে আছে। ওটুকুই শুধু একটু রহস্যময় বলে মনে হয়। সূর্যের আলোতে তা-ও ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। মাথার ওপর ঘন নীল আকাশ, আর তার নীচে এই পাহাড় ঘেরা সবুজ উপত্যকা। কী সুন্দর চারদিক! গত রাতেই সেই জমাট বাঁধা অন্ধকার, সিংহর আক্রমণ! এ সবই যেন নিছক দুঃস্বপ্ন বলে মনে হল সুদীপ্তর।

তুতসি কুলিদের তাঁবু তোলার নির্দেশ দিল টোগো। ম্যাকুইনার লোকেরা তার আগেই নিজেদের তাঁবু গোটাতে শুরু করেছে। তবে ম্যাকুইনার তাঁবু তখনও খোলা হয়নি। সম্ভবত তিনি তাঁবুর ভিতরই আছেন।

কুলিরা তাঁবু খুলতে লাগল। তার সামনে দাঁড়িয়ে হেরম্যান, সুদীপ্তরা যে দিক থেকে নেমেছে, তার উল্টোদিকে জঙ্গলের পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পাহাড় দেখিয়ে বললেন, 'ওই পাহাড়ের দিকেই আপাতত এখন এগোব আমরা। কিন্তু ম্যাকুইনা কোথায়? যাত্রা শুরুর আগে সৌজন্যের খাতিরে তাঁর সাথে একবার সাক্ষাতের প্রয়োজন।'

হেরম্যানের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল ম্যাকুইনার কণ্ঠস্বর, 'গুড মর্নিং মিস্টার হেরম্যান।'

সুদীপ্ত দেখল তাঁবু ছেড়ে বেড়িয়ে ম্যাকুইনা এগিয়ে আসছেন তাদের দিকে।

তিনি কাছে এসে দাঁড়াবার পর হেরম্যান তার সাথে করমর্দন করে বললেন, 'গুড মর্নিং মিস্টার ম্যাকুইনা, যাবার আগে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই কাল আপনাদের সাহচর্যে তাঁবু ফেলতে দিয়েছেন বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হচ্ছি আমরা।'

ম্যাকুইনা মৃদু হেসে বললেন, 'ধন্যবাদ। তা কোন দিকে যাচ্ছেন আপনারা?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'ওই পাহাড়ের দিকে।'

ম্যাকুইনা মৃদু হেসে বললেন, 'ওই পাহাড়কে বেড় দিয়ে ঘাসবন পার হয়ে কী রুভ্ভু নদীর উপত্যকাতে?'

তার কথা শুনে চমকে উঠল সুদীপ্ত। হেরম্যান একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'না মানে, ওরকমই একটা ইচ্ছা...।'

হেরম্যানের কথা শেষ হবার আগেই ম্যাকুইনা ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'ইচ্ছা নয়। নির্দিষ্টভাবেই রুভ্ভু উপত্যকাতেই যাচ্ছেন আপনারা।'

'মানে?' বিস্মিত হেরম্যান তাকালেন ম্যাকুইনার দিকে।

হাসলেন ম্যাকুইনা। সকালের আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর হীরে বসানো দাঁত। কয়েকমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে হেরম্যানের দিকে তাকিয়ে থেকে ম্যাকুইনা বললেন, 'নিজেদের মধ্যে আর লুকোচুরি খেলে লাভ নেই মিস্টার হেরম্যান। কেনিয়া-তাঞ্জেনিয়া-উগান্ডা ছেড়ে যেমন কেউ আমার মতো এত দূরে সিংহ শিকারে আসে না, তেমনই নিছক কোনো প্রাণীর সন্ধানে কোনো বায়োলজিস্ট এত দূরে এই মৃত্যুর উপত্যকাতে আসে না। কী, ঠিক বললাম কিনা? তুমি তো আবার তাঁবুতে বসে আমার সিংহ শিকারের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছিলে। বেশ বুদ্ধিমান তুমি!' শেষের কথাগুলো ম্যাকুইনা অবশ্য বললেন টোগোকে লক্ষ্য করে।

ম্যাকুইনা যে তাঁবুর ভিতরে সুদীপ্তদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে তা আর বুঝতে অসুবিধা হল না কারো। কাল রাতে সুদীপ্তর দেখা তাঁবুর গায়ের ছায়াটা তাহলে ম্যাকুইনা বা তার কোনো অনুচরেরই হবে!

টোগো ম্যাকুইনার কথা শুনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যাকুইনা এরপর হেরম্যানকে বললেন, 'আসলে আমরা দুজনেই এসেছি সেই সবুজ বানরের খোঁজে। আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমাদের উভয়েরই গন্তব্য, লক্ষ্য যখন এক তখন এই এক্সপিডিশনটা এক সাথে করা যায় না? যদি সত্যিই তার খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে কৃতিত্বটা নয় আধাআধি ভাগ করে নেওয়া যাবে। এতে দুপক্ষেরই লাভ। যে ঘাসবনের ভিতর দিয়ে আপনারা এগোবেন, সেটা সিংহর ডেরা। কাল রাতের অভিজ্ঞতা ভোলেননি নিশ্চয়ই। সেই বন পার হয়ে আপনারা সকলে রুভ্ভু নদী পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। তারপর যদি সেখানে পৌঁছনও, সেখানে পৌঁছে আপনাদের মোকাবিলা করতে হতে পারে অসভ্য পিগমিদের। আপনাদের কয়েকটা রাইফেল তাদের ঝাঁকে ঝাঁকে আসা বিষ মাখানো তিরের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। যদি আমরা এক সাথে যাই, তাহলে লোকসান কমবে, উভয়ের পক্ষেই তাতে সুবিধা। আপনি আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাবেন। প্রাণীটা যদি সত্যি সেখানে থেকে থাকে তাহলে আমরা তাকে ধরার চেষ্টা করব।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে হেরম্যান তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার আসল পরিচয় কী? আপনি প্রাণীটাকে ধরতে চাইছেন কেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার পরিচয় আমি মিথ্যা বলিনি আপনাকে। তবে আমার একটা নিজস্ব চিড়িয়াখানা আছে। তার জন্য আমার ওই প্রাণী প্রয়োজন। সারা পৃথিবী থেকে লোকে আমার চিড়িয়াখানাতে প্রাণীটাকে দেখতে আসবে, নাম হবে। এই আর কি। তবে আপনিও এতে উপকৃত হবেন। সত্যি যদি আপনিও জ্যুলজিস্ট হয়ে থাকেন, তাহলে আপনিও কাজ করতে পারবেন প্রাণীটাকে নিয়ে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, যদি আপনি এখানে প্রাণীটার দর্শন পানও , কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি প্রাণীটাকে সভ্য জগতের সামনে হাজির করতে পারছেন, ততক্ষণ কেউ বিশ্বাস করবে না আপনার কথা। আর সে কাজ আমার সাহায্য ছাড়া আপনারা করতে পারবেন না। সেই প্রস্তুতি আপনাদের নেই।'

হেরম্যান তার কথার জবাবে কী বলবেন বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যাকুইনা হেরম্যানের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি বরং একটু ভেবে নিন, আর প্রয়োজন হলে আপনার গাইডেরও পরামর্শ নিন, কি, তাই তো?'

টোগোর দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু ব্যাঙ্গোক্তি করে ম্যাকুইনা এরপর এগোলেন নিজের তাঁবুর দিকে।

তিনি চলে যাবার পর হেরম্যান টোগাকে বললেন, 'কী করা যায় বল তো?'

টোগো বলল, 'লোকটাকে কিন্তু আমার ঠিক সুবিধার মনে হচ্ছে না। যে লোক আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনে সে লোক ভালো লোক হতে পারে না।'

হেরম্যান বললেন, তবে লোকটার সব কথা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষত শেষের কথাগুলো। এ কথা ঠিকই যে, প্রাণীটাকে যদি সভ্য দুনিয়ার সামনে হাজির করা যায় তবে পৃথিবী চমকে যাবে, 'ক্রিপটোজ্যুলজিস্ট' দের আর ধাপ্পাবাজ কেউ বলতে পারবে না তবে ভয়ের ব্যাপার হল, ওঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা কোনো বিপদে না পড়ি।'

সুদীপ্ত এবার বলল, 'দেখুন যদি ও আমাদের আলোচনা সব শুনে থাকে, তাহলে আমরা চাই বা না চাই, ও আমাদের পিছু ধাওয়া করবেই। সে ক্ষেত্রে ওখানে গিয়ে আমাদের সাথে গোলমাল ধরতে পারে। সংখ্যায় ওরা আমাদের চেয়ে ভারী। বরং আপাতত ওকে আমাদের সঙ্গে নিই। ওখানে গিয়ে তেমন কিছু বুঝলে কৌশলে আমাদের সড়ে পড়তে হবে। এইসব বনে জঙ্গলে ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি কেউ হারিয়ে যায় তবে তার চট করে খোঁজ পাওয়া মুশকিল।'

হেরম্যান বললেন, 'তোমার কথার যুক্তি আছে।'

মিনিট পাঁচেক আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হল এক সঙ্গে যাওয়া হবে। টোগো হুটু আস্কারি আর কুলিদের একপাশে ডেকে নিয়ে ব্যাপারটা ওদের জানিয়ে দিল। তবে তার সাথে সাথে এই বলে দিল যে, একসাথে যাওয়া হচ্ছে বলেই ওই আফ্রিকান্ডার বা তার লোকদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। সবাই যেন তারা সব সময় এক সাথে থাকে, আর ম্যাকুইনার দলের লোকদের সামনে কোনো পরিকল্পনার কথা আলোচনা না করে। বিশেষ হুটু আস্কারিদের সব সময় সজাগ থাকার নির্দেশ দিন টোগো।

তাদের সাথে টোগোর কথা বলা শেষ হলে, হেরম্যান সুদীপ্তকে নিয়ে রওনা হলেন ম্যাকুইনার তাঁবুর দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁবু গুটিয়ে ম্যাকুইনার সাথে এক সাথে বেরিয়ে পড়ল সুদীপ্তরা। দলের প্রথমে হেরম্যানের হুটু রক্ষী ছাড়াও ম্যাকুইনার দলের চারজন মাসাই আস্কারি। তারপর টোগো, হেরম্যান, সুদীপ্ত ও উভয় দলের কুলিরা, শেষে মাসাই আস্কারি-পরিবৃত হয়ে ম্যাকুইনা। ফাঁকা জমি ছেড়ে, কিছুটা জঙ্গল অতিক্রম করে কিছু সময়ের মধ্যেই ঘাসবনের সামনে উপস্থিত হল সকলে। পাহাড়ের কোলে উত্তর থেকে দক্ষিণে অন্তহীন ঘাসবন। কোমর সমান উঁচু ঘাসের ঝাড়। ধূসর রঙের দেখতে। এই ঘাসবনই হল সিংহর ডেরা। গায়ের রঙের সাথে ঘাসের রং মিলে যায় বলে সিংহর লুকিয়ে থাকতে সুবিধা হয় এখানে। ঘাসবনে প্রবেশের আগে আস্কারিদের নির্দেশ দেওয়া হল, যাত্রাপথের আশেপাশে কোথাও কোনো জায়গা আন্দলিত হলে, সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গা লক্ষ্য করে যেন গুলি ছোড়া হয়। তাদের নির্দেশ দেবার পর সকলে প্রবেশ করল সেই বনে।

পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে এগোতে লাগল সবাই। সূর্য উঠতে থাকল মাথার ওপরে। ক্রমশই বনের ভিতরে হারিয়ে যেতে লাগল তারা। কোথাও কোথাও ঘাসবন এক মানুষ সমান উঁচু। পিছনের লোকজনেরা শুধু অগ্রবর্তী আস্কারিদের মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরা বর্শার ফলাটাই শুধু দেখতে পাচ্ছে। যাত্রাপথের দু-পাশে এক হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ছে না। মাঝে মাঝে মাসাইরা এক যোগে চিৎকার করে উঠছে, প্রথমবার সেই চিৎকার শুনে, কিছু হল মনে করে ঘাবড়ে গেছিল সুদীপ্ত। টোগো বলল, 'কোনো জানোয়ার যদি কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাকে দূরে তাড়ানোর জন্যই এই চিৎকার।'

সুদীপ্ত টোগোকে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা তোমরা যারা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও, গাইড বা রক্ষীর কাজ করো তাদের কিছু হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে?'

টোগো করুণ হেসে বলল, 'না, আমাদের অবস্থাও সেই বান্টুদের মতো। যারা নদীতে জল ছেঁচছিল। জঙ্গলে এলে সিংহ বা অন্য প্রাণীর পেটে কেউ যেতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। ব্যাপারটা আমাদের পরিবারও জানে, সরকারও জানে। তবে দু-পক্ষের কেউই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। আজ যদি আমার কিছু হয়, তাহলে কালই হয়তো আমার ভাই কিংবা ছেলে, আপনাদের মতো কাউকে নিয়ে জঙ্গলে আসবে কোনো কিছুর পরোয়া না করে। সিংহর চেয়েও ভয়ংকর হল মানুষের পেট। জঙ্গলে আমরা, এই হুটু বা তুতসিরা, কিংবা ওই মাসাইরা কেউ শখ করে আসি না। আসি এই পেটের তাগিদে।'

সুদীপ্তর তার কথার শুনে মনে হল, টোগোকে কথাটা না জিজ্ঞেস করলেই ভালো হতো।

তবে যে আশঙ্কাটা সবার মনে ছিল সেই সিংহর দলের সাথে, যে-কোনো কারণেই হোক আর সাক্ষাৎ হল না। শুধু এক চিত্রক মহারাজ নিতান্তই দৈব-দুর্বিপাকে এসে পড়েছিল সুদীপ্তদের যাত্রাপথের একদম সামনে। তাকে দেখা মাত্রই একজন মাসাই এক গুলিতে তাকে সাবাড় করে দিল।

ঘণ্টা চারেক চলার পর ঘাসবন এক সময় ফাঁকা হয়ে এল। সুদীপ্তদের চোখে পড়ল

এক পাহাড়। সেই পাহাড়ের একটা পাশ দেখতে ঠিক মুখের মতো। প্রকৃতির আপন খেয়ালে সেই ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। কলিন্স বর্ণিত রুভভুর সেই শাখা পাহাড়ের গা ঘেঁষে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। আর তার পশ্চিমেই দাঁড়িয়ে আছে সেই উপত্যকা। যার সন্ধানে মধ্য আফ্রিকার গহীন অরণ্যে পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি উপেক্ষা করে হেরম্যানের সঙ্গী হয়ে সুদীপ্ত ছুটে এসেছে।

ঘাসজমি পার হয়ে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল সকলে। শুকনো নদীখাত, কোথাও কোথাও হাঁটু সমান জল। অনেকক্ষণ পর সেখানে বন্য প্রাণী চোখে পড়ল। এক দল বেবুন কুকুরের মতো মুখ, দেহটা বানর জাতীয় প্রাণীর মতো। সম্ভবত তারা খাবার খুঁজছিল নদী খাতে। এত লোকজন দেখে নদী খাতের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

নদী পার হবার আগে হেরম্যান তাঁর বাইনোকুলার দিয়ে পশ্চিমের সেই উপত্যকার দিকে তাকালেন, অনুচ্চ পাহাড়ের সারি সেখানে হারিয়ে গেছে দিগন্তর দিকে। হেরম্যান সে দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন ও জায়গাতে সত্যিই গভীর জঙ্গল মনে হচ্ছে!

ম্যাকুইনা সমস্ত যাত্রাপথে একবারও সুদীপ্তদের সাথে কোনো কথা বলেননি। নিজেদের লোকের সাথেই তিনি পথ চলছিলেন। এবার তিনি এগিয়ে এসে হেরম্যানের হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে কিছুক্ষণ পশ্চিমের সেই উপত্যকার দিকে তাকিয়ে হেরম্যানের উদ্দেশ্যে বললেন, ওই উপত্যকাতেই সেই সবুজ বানরের বাসস্থান, 'কি তাই তো?'

হেরম্যান সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তেমনই লোকে বলে।'

ম্যাকুইনা আর কোনো কথা বললেন না। কেমন যেন একটা বাঁকা হাসি হেসে বাইনোকুলারটা ফিরিয়ে দিলেন।

নদীখাত পার হতে শুরু করল সুদীপ্তরা। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'রুভভু কিন্তু বুরুন্ডির প্রধান নদী, সারা দেশে তার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আছে। বর্ষাকাল হলে এ নদীখাত এ ভাবে পার হওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না।'

কিছুর সময়ের মধ্যেই নদীখাত পার হয়ে ওপারে পৌছে গেল সকলে। তারপর যাত্রাশুরু করল পশ্চিমের সেই উপত্যকার দিকে। এখনই তাদের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল সেই উপত্যকা।

এক সময় তারা সত্যি এসে উপস্থিত হল উপত্যকার পাদদেশে। ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে আদিম বৃক্ষের ঘন জঙ্গল। বিশাল বিশাল গাছগুলো যেন অনেক উঁচুতে উঠে আকাশকে স্পর্শ করতে চাচ্ছে। দল বেঁধে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠা শুরু হল। এখানে পাহাড়ের ঢালে সূর্যের আলো ঠিকভাবে পৌছয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমে থাকা পচা পাতার রাশি ঢিপি হয়ে আছে গাছের নীচে। কোথাও কোথাও আবার ঘন বাঁশঝাড়। সেখানে গাছ কেটে পথ করে নিতে হচ্ছে। এ ভাবেই তারা ক্রমশ প্রবেশ করতে লাগল উপত্যকার ভিতরে।

ঘণ্টাখানেক পর তারা বেশ অনেকটা ওপরে উঠে এল। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সে জায়গা থেকে। উত্তরে যতদূর চোখ যাচ্ছে খালি ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। টোগো বলল, 'ও পাহাড় চলে গেছে রোয়ান্ডার দিকে।'

কাছের পাহাড়ের ঢালগুলোও গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। কেমন যেন গা ছমছমে পরিবেশ চারপাশে।

টোগো হঠাৎ কাছেই একটা পাহাড়ের ঢালের দিকে আঙুল তুলে বলল, ওই দেখুন! ওই দেখুন!'

তার কথা শুনে সেদিকে তাকাতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। কিছু দূরে জঙ্গলের ধারে পাহাড়ের ঢালে এক ফালি ফাঁকা জায়গা। সেখানে বসে আছে বিরাটাকারের অনেকটা শিম্পাঞ্জির মতো দেখতে প্রাণী। আগে এ প্রাণীগুলোকে কোনোদিন চাক্ষুষ না করলেও তাদের চিনতে অসুবিধা হল না সুদীপ্তর—গোরিলা! আকার আর উঁচু কপালের পার্থক্য শিম্পাঞ্জির সাথে।

যাত্রা থামিয়ে সকলে দেখতে লাগল তাদের। টোগো বলল, 'এ প্রাণীগুলোকে আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। অসীম সাহসী আর শক্তিধর প্রাণী, এমনিতে ওরাও মানুষকে এড়িয়ে চলে। তবে রেগে গেলে সিংহকেও রেয়াত করে না। আমি একবার কঙ্গোতে এ রকম এক লড়াই দেখেছিলাম। ভয়ংকর লড়াই!' সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'কে জিতে ছিল তাতে?'

সে জবাব দিল, 'শেষ পর্যন্ত সে লড়াই আমি দেখিনি। তা দেখতে গেলে আপনাদের সাথে আমার দেখা হত না।'

হেরম্যান কাছেই দাঁড়ানো ম্যাকুইনার উদ্দেশ্যে বললেন, 'কি, ফেরার সময় এ প্রাণীও একটা নিয়ে যাবেন নাকি?'

ম্যাকুইনা জবাব দিল, সবুজ বানর না পেলে, তখন না হয়, এরই একটার গায়ে সবুজ রং মাখিয়ে নিয়ে যাব।

হেরম্যান আর সুদীপ্ত হাসল তার কথা শুনে।

গোরিলাগুলোও কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল সুদীপ্তদের। তারপর সেই ফাঁকা জায়গা ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ঢালের গভীর জঙ্গলে। তারপর সুদীপ্তরা আবার ওপরে উঠতে শুরু করল। অবশেষে এক সময় তারা শুকনো ঘাস আর জঙ্গল ছাড়িয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল। আর তারপরই ঢালের বিপরীত দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, মানুষের আস্তানা, একটা গ্রাম। গভীর জঙ্গল-আচ্ছাদিত পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামটা। গাছের গুঁড়ির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গ্রামটার ঘর বাড়ি লোকজন সব কিছুই ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথা থেকে নীচের মানুষগুলোকে ঠিক পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে। হেরম্যান তাঁর বাইনোকুলার দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর চাপা স্বরে তার পাশে দাঁড়ানো সুদীপ্ত আর টোগোর উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই সেই পিগমি গ্রাম। এখানেই পিগমিদের দঙ্গলে সেই সবুজ বানর বা মানুষকে দূর থেকে দেখেছিলেন কলিন্স।'

হেরম্যান এরপর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ম্যাকুইনা এগিয়ে এলেন তাদের কাছে। হেরম্যানের কাছ থেকে বাইনোকুলার নিয়ে নীচের দিকে আর চারপাশের পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলের দিকে দেখার পর তিনি বললেন, 'চলুন তাহলে ওই গ্রামের

দিকে এগোনো যাক। আচ্ছা, আপনি কী নিশ্চিত এ অঞ্চলেই ওই সবুজ বানরের সন্ধান মিলবে?' হেরম্যান পুরো ব্যাপারটা না ভেঙে জবাব দিলেন, 'আমি যতটুকু জানি এ অঞ্চলেই দেখা যায় ওই প্রাণীটাকে।' এরপর টোগোর দিকে তাকালেন হেরম্যান। টোগো একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'বেলা গড়াতে শুরু করেছে। আর মাত্র ঘণ্টা চারেক আলো থাকবে। আমার মনে হয় এখন আর গ্রামের দিকে না এগোনোই ভালো। হাজার হোক, ওরা পুরোপুরি এখনও সভ্য নয়। আমাদের আক্রমণ করে বসতে পারে। আমার মনে হয়, এই পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলের আড়ালে আজকের মতো আমরা তাঁবু ফেলি। দিনের আলো যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আড়াল থেকে ওদের ভাবগতিক লক্ষ করি। তারপর কাল ভোরে আমরা নীচে ওই গ্রামের দিকে নামব।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'তাহলে সেই ব্যবস্থাই করা যাক। কাল সকাল থেকে ওই গ্রাম আর ওই উপত্যকাতে অনুসন্ধান চালাব আমরা। যদি ও প্রাণী এখানে থাকে তাহলে তাকে ধরতেই হবে।'

হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'আপনি ওর সন্ধান পেলে কীভাবে ধরবেন ওকে?'

ম্যাকুইনা জবাব দিলেন, আমার কাছে 'ট্রাঙ্কুলিন গান' আছে। তাই দিয়ে অচৈতন্য করে ফেলব ওকে।

হেরম্যান শুনে বললেন, 'আপনি তো সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন দেখছি।'

ম্যাকুইনা শুধু হাসলেন, হেরম্যানের কথা শুনে। তারপর এগোলেন লোকজনকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দেবার জন্য।

শুকনো ঘাস ছাওয়া পাহাড়ের মাথায় গাছের আড়ালে তাঁবু ফেলা হল। ইচ্ছা করেই ম্যাকুইনার তাঁবু থেকে কিছুটা তফাতে সুদীপ্তদের তাঁবু বসাল টোগো। হুটু আস্কারিদের সে নির্দেশ দিল, তারা যেন কড়া নজর রাখে তাঁবুর ওপর। ম্যাকুইনা বা তার কোনো লোকজন তাঁবুর দিকে এলেই তার যেন সংকেতে ভিতরের লোককে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়।

পাহাড় ভাঙতে বেশ কষ্ট হয়েছে সকলের। তাঁবু ফেলার পর সুদীপ্ত আর হেরম্যান চলে গেলেন তাঁবুর ভিতর বিশ্রাম নেবার জন্য, আর টোগো, হেরম্যানের বাইনোকুলারটা নিয়ে পাহাড়ের ঢালে একটা গাছের আড়ালে বসল, গ্রামটাকে লক্ষ করার জন্য।

ঘণ্টা তিন পর যখন সুদীপ্ত আর হেরম্যান তাঁবু ছেড়ে টোগোর কাছে এসে বসল এখন বিকাল পার হয়ে সন্ধ্যা নামতে চলেছে। আশেপাশের পাহাড়ের মাথায় কুয়াশার আস্তরণ ক্রমশ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। দূরের পাহাড়গুলোর মাথায় বিদায়ী সূর্যের লাল আভা এখনও কিছুটা ছড়িয়ে আছে। মৃদু-মন্দ বাতাস ভেসে আসছে উত্তর দিক থেকে। শুকনো ঘাসের বন আর জঙ্গলের মাথাগুলো কাঁপছে তাতে। টোগোর পাশে বসে হেরম্যান নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তেমন কিছু চোখে পড়ল?'

টোগো জবাব দিল, 'না তেমন কিছু দেখিনি। যা মনে হচ্ছে, তাতে শ-দুয়েক লোক আছে ওই গ্রামে।'

সুদীপ্ত তাকে বলল, 'কাল তো আমরা ওই গ্রামে যাচ্ছি। তা তুমি ওদের ভাষা জানো?'

টোগো বলল, 'ওরা কী ভাষায় কথা বলে তা আমার জানা নেই, তবে আমি বান্টু ভাষা জানি। আফ্রিকার দুশোর বেশি জনগোষ্ঠী এ ভাষায় কথা বলে। আর তাতে কাজ না হলে 'কমন আফ্রিকান কোডে' কথা বলব।'

''কমন আফ্রিকান কোড' কী জানতে চাইলে সুদীপ্ত।

এ উত্তরটা হেরম্যানই দিলেন, বহু জনগোষ্ঠীর দেশ এই আফ্রিকা। গোটা সাতেক ইউরোপীয় ভাষা ছাড়াও ৭৫০টা ভাষা আছে এখানে। জঙ্গলের মধ্যে এখানে এমন অনেক গ্রাম আছে, সেখানে এক গ্রামের মানুষ, পাশের গ্রামের মানুষের ভাষা বোঝে না। জঙ্গলে যারা ঘুরে বেড়ায়, তারা এই অসুবিধা দূর করার জন্য কিছু 'কমন শব্দ' আর সংকেত ব্যবহার করে। অন্যের ভাষা না জানানও ওই শব্দ আর সংকেতের মাধ্যমে তাকে বক্তব্য মোটামুটি বুঝিয়ে দেওয়া যায়। একেই বলা হয় 'কমন আফ্রিকান কোড।'

হেরম্যান এরপর বললেন, পিগমিদের সঙ্গে কথা বলাটা একান্ত জরুরি। তাদের সাথে কথা বলে ওই সবুজ প্রাণীর ব্যাপারে জানার চেষ্টা করতে হবে। নইলে এই দুর্গম উপত্যকাতে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

টোগো এবার বলল, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এই আফ্রিকাভার যে আমাদের ঘাড়ে এসে চাপল, এ ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না। লোকটা সুবিধার নয়, ও আমাকে হীরের লোভ দেখিয়ে হাত করতে চাচ্ছিল!'

হেরম্যান আর সুদীপ্ত তার কথা শুনে, একসাথে অবাক হয়ে বলল, 'মানে!'

টোগো বলল, 'ওর সাথে যারা এসেছে তাদেরকে ও নগদ টাকার পরিবর্তে একটা করে ছোট হীরে দিয়েছে। অর্থমূল্যে যা নাকি আস্কারিদের মজুরির অনেক অনেকগুণ বেশি, ফেরার পরও নাকি আরও একটা করে দেবে! ওরকমই একটা হীরে লোকটা আপনারা তাঁবুতে ঢোকার পর আমাকে বকশিশ হিসাবে দিতে এসেছিল। ও বকশিশের মানে আমি বুঝি।'

এরপর একটু থেমে টোগো বলল, 'ওই সবুজ বানরের জন্য দেদার পয়সা খরচ করছে লোকটা। এতগুলো নতুন রাইফেল! এতগুলো হীরে! হোক না সেগুলো তার নিজের খনি থেকে তোলা, হাজার হোক লোকটা একজন ব্যবসায়ী, নিছক একটা অদ্ভুত প্রাণীকে চিড়িয়াখানায় রাখার জন্য সে পয়সা খরচ করছে বলে মনে হয় না, আমার ধারণা ওই দানব বানরকে ও বিশেষ কোনো কারণে ধরতে চাচ্ছে!'

টোগের কথা শুনে সুদীপ্ত বলল, 'তাহলে সে কারণ, কী হতে পারে?'

সুদীপ্তর এ প্রশ্নর উত্তর অবশ্য টোগো বা হেরম্যান কেউই দিতে পারল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নেমে এল উপত্যকাতে। পাহাড়ের নীচে পিগমি গ্রামে জ্বলে উঠতে শুরু করল বিন্দু বিন্দু মশালের আলো। সুদীপ্তরা তাদের তাঁবুতে ফেরার জন্য উঠে পড়ল। বাইরে বেশ জোরেই বাতাস আসছে উত্তর থেকে। ও দিকেই তো গ্রেটরিফটের বড় বড় শৃঙ্গগুলো। রাত বাড়ার সাথে বাতাস বাড়ছে।

রাতে ম্যাকুইনা এলেন সুদীপ্তদের তাঁবুতে। দু-চারটে মামুলি কথাবার্তা বলে চলে গেলেন তিনি। সুদীপ্তরা বেশ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে তাঁবুতে শুয়ে পড়ল।
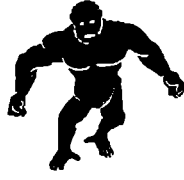
পরদিন সকালে উঠেই নীচে নামার প্রস্তুতি শুরু হল।

হেরম্যান, সুদীপ্ত, টোগো দাঁড়িয়ে ছিল এক জায়গাতে। ম্যাকুইনা এসে দাঁড়ালেন তাদের কাছে।

টোগো বাইনোকুলার দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সকাল থেকেই ওদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা লক্ষ করছি। সম্ভবত আমাদের উপস্থিতি তারা টের পেয়ে গেছে। আকালাও এ কথাই বলছিল।'

হেরম্যান বললেন, 'প্রথম সাক্ষাতে ওরা আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে মনে হয়?'

টোগো জবাব দিল, 'ওদের কাছে আমরা বিদেশি। এটা ওদের মর্জির ওপর নির্ভর করছে। তবে, আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে ওরা ক্রুদ্ধ হয়। তেমন হলে ওরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'ওরা আমাদের আক্রমণ করলে আমাদের ভয়ের কিছু নেই, চল্লিশটার মতো রাইফেল আছে সঙ্গে। তাছাড়া দুটো...।' কী যেন একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন তিনি।

হেরম্যান বললেন, 'তা আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু ওদের সাথে মিথ্যা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে আমাদের আ৫৫ সল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া এ জায়গা আমাদের অপরিচিত। অসুবিধায় পড়তে হতে পারে।'

তার কথা শুনে ম্যাকুইনা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'না, আমি ওদের সাথে আগ বাড়িয়ে ঝগড়া করতে যাওয়ার কথা বলছি না। তবে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলায় যে আমি তৈরি আছি, সেটা আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম।'

সুদীপ্ত এবার হঠাৎ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করল, 'আমরা ওদের কাছে গিয়ে নিজেদের কী পরিচয় দেব?'

হেরম্যান সম্ভবত সুদীপ্তর প্রশ্নর জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ম্যাকুইনা বললেন, 'আমাদের আসল উদ্দেশ্য যে ওদের প্রথমে বলা ঠিক হবে না,—এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চয়ই আমার সাথে, একমত হবেন। আমরা ধর্মপ্রচারক, বা এ জাতীয় কিছু বলতে হবে ওদের। হেরম্যান বললেন, 'সেটা মনে হয় ঠিক খাপ খাবে না। আমাদের কারও চেহারা বা পোশাক ধর্ম প্রচারকদের মতো নয়। বা তাঁরা কেউ আমাদের মতো আস্কারি পরিবৃত হয়েও ঘোরেন না। তার চেয়ে বরং শিকারি বলাই ভালো। বলব,

শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এ দিকে চলে এসেছি। ম্যাকুইনা বললেন, 'ঠিক আছে তাই বলা যাক। সবুজ দানব বানরের কথা কৌশলে জানার চেষ্টা করা হবে।'

সকাল আটটা নাগাদ জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে নীচে নামতে শুরু করল সুদীপ্তরা। কিছু লোক শুধু রয়ে গেল তাঁবু আগলাবার জন্য। ক্রমশই সুদীপ্তদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল নীচের গ্রামটা। বড় বড় বেশ কয়েকটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে সার সার গোলাকৃতি পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর। সংখ্যায় গোটা পঞ্চাশেক হবে। গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা বৃত্তাকার ফাঁকা জায়গা। যেখানে সমবেত হয়েছে বেশ কিছু লোক। তবে তাদের সংখ্যাটা ওপর থেকে সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত পিগমিরা একত্রিত হয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে পাহাড়ের ঢাল বয়ে নেমে আসা লোকদের দেখছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচে নেমে কিছুটা পথ এগিয়ে গ্রামের সামনে পৌঁছে গেল তারা।

গাছের গুঁড়ির উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা গ্রাম। সুদীপ্তরা তার প্রবেশ মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই, আগল ঠেলে ভিতর থেকে একদল মানুষ বেরিয়ে এসে চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। অদ্ভুত আকৃতির মানুষ সব। উচ্চতা চার-সাড়ে চার ফুট হবে। তিনফুট উচ্চতারও কয়েকজন আছে দলের মধ্যে। তবে হুটু গ্রামের লোকদের মতো এদের চেহারা অনাহার ক্লিষ্ট নয়, বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, উচ্চতাটাই যা চোখে পড়ার মতো কম। তবে এদেরও ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, দেহের নীচের দিকের অংশ একখণ্ড পশুচর্মে ঢাকা। তবে সাজগোজের কিছু বাহার আছে, অনেকেই রঙিন পুঁতির মালা, আর কর্ণকুণ্ডলে সজ্জিত। লোকগুলোর কারো হাতে বর্শা, কারো হাতে তির ধনুক। অস্ত্রগুলোও তাদের মতো ক্ষুদ্র, যেন খেলনার জিনিস। জনা তিরিশ লোকের একটা দল। সুদীপ্তদের ঘিরে ধরে মনোযোগ দিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগল তারা। তাদের আকৃতি আর বিশেষত তাদের অস্ত্রগুলোকে দেখে ম্যাকুইনা চাপা স্বরে হেরম্যানকে বললেন, 'এই লোকগুলোকে নিয়ে আপনারা এত চিন্তা করছিলেন! আমাদের কাছে এরা তো কিছুই না।'

হেরম্যান কিছু না বললেও টোগো চাপা স্বরে বলল, 'ওদের অস্ত্রগুলো নিরীহ বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। আপনার রাইফেলের গুলি খেয়ে কেউ বাঁচলেও বাঁচতে পারে, কিন্তু ওদের অস্ত্রর সামান্য খোঁচা খেলেও কারো বাঁচা সম্ভব নয়। এই তির খেলে মুহূর্তের মধ্যে সিংহ গোরিলারাও লুটিয়ে পড়ে। এমনই বিষমাখানো এই অস্ত্রগুলো।'

কিছুক্ষণ সুদীপ্তদের দেখার পর পিগমিদের দঙ্গল থেকে কে একজন যেন কর্কশ ভাষাতে কী একটা বলল। সুদীপ্ত পাশ ফিরে দেখতে গেল লোকটাকে, তার উচ্চতা বড়জোর চার ফুট, বিরাট বড় ভুঁড়ি, নানা রঙের পাথরের মালা তার গলায়। লোকটার মাথায় একটা অদ্ভুত সাজও আছে। কেউ যেন একটা কাঠের তৈরি ছোট টব উল্টো করে বসিয়ে দিয়েছে তার মাথায়। এরকম অদ্ভুত শিরোভূষণ সুদীপ্ত আগে কোনোদিন দেখেনি। সম্ভবত লোকটা মাঝবয়সি হবে। সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে সে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কারা? এ মুলুকে কেন?'

ভাষাটা ধরতে পারল টোগো। বান্টুরই কোনো স্থানীয় সংস্করণ হবে।

সে জবাব দিল, 'আমরা শিকারি। এ তল্লাটে শিকারের খোঁজে এসেছি।

টোগোর জবাব শুনে লোকটা সন্দিহান হয়ে তাকে বলল, 'কেন, অন্য মুলুকে বন নেই নাকি? সাদা চামড়া দুটো কোন দেশের লোক? ওরাই কী দলটাকে এনেছে? আর 'না-সাদা না-কালো' এ লোকটাই বা কোন জাতের?'—এক সঙ্গে এক ঝাঁক প্রশ্ন টোগোর উদ্দেশে ছুড়ে দিল। টোগো জবাবে যা বলল, তা হল, 'শিকারের জন্য ঘুরতে ঘুরতেই তারা এ তল্লাটে চলে এসেছে। এখানে আসার পিছনে তাদের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নেই। পিগমিদের সাথে তারা কোনো সংঘাতে যেতে চায় না। টোগো হল দাড়িঅলা সাদা চামড়ার গাইড। এ সাদা চামড়া আফ্রিকার বাসিন্দা নয়, আর, না-সাদা না-কালো লোকটা হল দাড়িঅলা সাদা চামড়ার সঙ্গী, ইন্ডিয়া বলে একটা দূর দেশে সে থাকে। আর লম্বা সাদা চামড়া হল একজন আফ্রিকান্ডার। এ দিকে আমার পথে তাদের সাথে দেখা হয়েছে। তারপর সকলে এক সাথে এদিকে এসেছে।'

টোগো আর সেই ভুঁড়িঅলা পিগমি বান্টু ভাষায় এরপর বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর, টোগো হেরম্যানকে বলল, 'এই ভুঁড়িঅলা লোকটার নাম ওটুম্বা। ও এখানকার রাজা, মানে সর্দার। এই গ্রাম আর চারপাশের পাহাড় হল ওর সাম্রাজ্য। এমনিতে ওরা বিদেশিদের পছন্দ করে না। তবে আমরা যেহেতু এখানে পৌঁছেই গেছি, তাই ও আমাদের এখানে তিন দিনের জন্য শিকারের অনুমতি দিতে রাজি। তবে ওদের তিনটে শর্ত মানতে হবে, আর দুটো আগুন ছোড়া লাঠি অর্থাৎ রাইফেল ও কিছু কার্তুজ উপহার দিতে হবে। নইলে পত্রপাঠ বিদায় নিতে হবে আমাদের।' টোগোর কথা শুনে ম্যাকুইনা বললেন, 'এতগুলো রাইফেলধারী লোককে শর্ত না মানলে ও বিদায় নিতে বলছে! বামনটার তেজ তো কম নয়! তাছাড়া রাইফেল নিয়ে ও কী করবে? এরা রাইফেল চালাতে জানে নাকি?'

হেরম্যান ম্যাকুইনাকে বললেন, 'ওদের সাথে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। বরং ওদের অন্য শর্তগুলো শোনা যাক।' টোগো এরপর ওটুম্বার কাছে শর্ত জানতে চাইলে সে বলল, 'প্রথম শর্ত, উত্তর দিকের পাহাড়ে একদল গোরিলা আছে, মাঝে মাঝেই তারা আক্রমণ করে আমাদের। তোমাদের বন্দুক দিয়ে মেরে তাড়াতে হবে ওদের। দ্বিতীয়ত, গ্রামের কাছে মাসাইদের থাকা চলবে না, কারণ এত লোক এখানে থাকলে তোমরা হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করতে পারো। আর তৃতীয়ত, গ্রামের ঠিক পিছনেই, পশ্চিমের যে পাহাড়, সেখানে কারো যাওয়া চলবে না। ওখানে আমাদের দেবতা টাইবুরুর থান আছে। বিদেশিরা পা রাখলে ও পাহাড় অপবিত্র হবে। এ সব মানলে মানো, নইলে বিদায় হও।'

ওটুম্বার শর্ত নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করা হল, তার শর্ত মানা হবে। তবে দুটো রাইফেলের একটা তাকে এখন দেওয়া হবে, অন্যটা দেওয়া হবে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবার সময়। আর ওটুম্বাকে অনুরোধ করা হোক, যাতে সে একবার সুদীপ্তদের গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখায়।

ওটুম্বা সুদীপ্তদের বক্তব্য জেনে গ্রাম দেখানোর ব্যাপারে একটু দোনামোনা করেও

শেষ পর্যন্ত তাতে রাজি হয়ে গেল। তবে এ ক্ষেত্রেও সে শর্ত দিল যে, মাত্র পাঁচজন গ্রামে ঢুকতে পারবে। এবং তাদের সাথে কোনো রাইফেল থাকবে না।

আত্মরক্ষার জন্য হেরম্যান, সুদীপ্ত, টোগো—তিন জনের পোশাকের নীচেই রিভলভার আছে। সম্ভবত ম্যাকুইনার কাছেও আছে। তাই হেরম্যান, ম্যাকুইনা, দুজনেই সম্মত হলেন ওটুম্বার প্রস্তাবে। ম্যাকুইনা এরপর একজন মাসাই রক্ষীকে তার রাইফেল ওটুম্বাকে দেবার নির্দেশ দিলেন। ওটুম্বা রাইফেলটা মাসাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে প্রথমে রাইফেলটা রক্ষীদের মতো কাঁধে ঝোলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু রাইফেলটা প্রায় তার দেহের সমান আকৃতির। কাজেই সে কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও ব্যাপারটা ঠিক জুত করতে পারল না। সুদীপ্ত প্রায় হেসেই ফেলছিল ওটুম্বার কাণ্ড দেখে! টোগো ইশারায় তাকে হাসতে বারণ করল। নিষ্ফল চেষ্টার পর ওটুম্বা তার রাইফেল একজন অনুচরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করার জন্য সুদীপ্তদের ওটুম্বার সঙ্গে আসতে বলল। হেরম্যান, সুদীপ্ত, টোগো, ম্যাকুইনা ও একজন হুটু আস্কারি, এই পাঁচজন ওটুম্বার পিছন পিছন গাছের গুঁড়ির প্রাচীর গলে প্রবেশ করল গ্রামের ভিতর। তির-ধনুকধারী পিগমি রক্ষীরাও চলল তাদের সাথে।

গ্রামের ভিতর ঢুকতেই তাদের দেখতে ঘরের ভিতর যারা ছিল তারাও বেরিয়ে এল। খুদে খুদে লোকজন সব। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের কুঁড়েগুলোর উচ্চতাও বেশি নয়, ফুট ছয়েক হবে। দেখতে অনেকটা ক্ষুদ্রাকৃতি ধানের গোলার মতো। তাতে কোনো জানলা নেই, ভিতরটা অন্ধকার। শুধু একটা ফোকর আছে তার ভিতরে যাবার জন্য। তবে কুঁড়েগুলোর প্রত্যেকটার গায়ে গোঁজা আছে অসংখ্য তীর। ওটুম্বার পিছন পিছন গ্রাম ঘুরে দেখতে লাগল সুদীপ্তরা। এক জাতীয় খর্বাকৃতি গোরুও চোখে পড়ল তাদের। তবে তাদের খাড়া সিং দুটো বেশ লম্বা। এছাড়া রয়েছে একপাল গিনিয়া ফাউল ও তিতির জাতীয় পাখি। গাছের নীচে পাতার রাশি সরিয়ে পোকা খুটে খাচ্ছে তারা। এক জায়গাতে রোদে শুকানো হচ্ছে নানা ধরনের প্রাণীর চামড়া, তার মধ্যে আছে সিংহ, চিতা, আর বানর জাতীয় নানা জীব। ওটুম্বা বলল, 'ও দিয়ে পোশাক তৈরি হবে। উৎসবের সময় যে পোশাক পরে নাচা হবে। শুধু পশ্চিমের নিষিদ্ধ পাহাড়ে নয়, পিগমিদের গ্রামের ভিতরেও এক লৌকিক দেবতার থান রয়েছে ঝাঁকড়া এক গাছের নীচে। বটের মতো গাছটার থেকে অসংখ্য ঝুড়ি নেমেছে মাটিতে। আর তার নীচে আধো অন্ধকার পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে এক বীভৎস মূর্তি! একটা ফুটা চারের লম্বা কাঠের গুঁড়ি কুঁদে তৈরি করা হয়েছে তাকে। মূর্তির হাত-পা নেই। মুখসর্বস্ব দেহ। কিন্তু তার ভয়াল রূপ দেখে চমকে উঠল সবাই। তীক্ষ্ণ দন্তশোভিত তাঁর করাল মুখগহ্বর যেন সবাইকে এখনই গ্রাস করতে চাইছে! ওটুম্বা, টোগোর প্রশ্নের উত্তরে জানাল, "ইনি, 'ওঙ্গো', আমাদের রক্ষাকর্তা।"

মূর্তিটার সামনে একটা বেশ বড় কালচে রঙের পাথরের চাঁই রাখা। সেই পাথরের চারপাশে অসংখ্য হাড়গোড় আর খুলি ছড়িয়ে আছে।

খুলিগুলো দেখতে অনেকটা মানুষের খুলির মতো। কিন্তু আকৃতিতে অনেক ছোট।

হেরম্যান বললেন, 'ওই পাথরের ওপর দেবতার সামনে বলি চড়ানো হয়।' এরপর তিনি জানতে চাইলেন, খুলিগুলো কীসের?

ওটুম্বা জবাব দিল, 'এখানে এক ধরনের বাঁদর আছে। ও সব তাদেরই খুলি। আমরা দেবতাকে নিবেদন করি।'

তার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাকুইনা হঠাৎ আঙুল নির্দেশ করে হাড়গোড়ের স্তূপের মধ্যে একটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'আর ওটাও কী বানরের?'

সুদীপ্তরও এবার চোখে পড়ল সেটা। বানরের খুলিগুলোর মধ্যে পড়ে থাকা বেশ বড় আকারের একটা খুলি!

ম্যাকুইনার ভাষা বুঝতে না পারলেও, তিনি কী বলতে চাচ্ছেন তা বুঝতে পারল ওটুম্বা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ম্যাকুইনার উদ্দেশ্যে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমরা কখনো সখনো মানুষও বলি দিই।'

তার কথা শুনে সুদীপ্তরা চমকে উঠল। ওটুম্বা আর সেখানে দাঁড়াল না। সুদীপ্তদের নিয়ে এগোল অন্য দিকে।

প্রায় আধ ঘণ্টা গ্রামের ভিতর ঘুরে বেড়াবার পর আবার গ্রামের বাইরে বেরিয়ে এল সুদীপ্তরা। ওটুম্বাও তাদের সাথে বাইরে বেড়িয়ে এল। বেলা প্রায় দশটা বাজে।

ম্যাকুইনা, হেরম্যানকে বললেন, এবার চারপাশের পাহাড়গুলোতে খোঁজ শুরু করা যাক। এদের শর্ত মতো আবার উত্তরের পাহাড়ে গোরিলা নিকেশ করার জন্য লোক পাঠাতে হবে। আমরা বরং মাসাইদের একটা অংশকে উত্তরের পাহাড়ে পাঠাই গোরিলা নিধনের জন্য। আর বাদবাকিদের নিয়ে নিজেরা যাই দক্ষিণে। তবে যারা গোরিলা মারতে যাবে, তাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে স্থানীয় কোনো লোক দিতে বলা হোক ওটুম্বাকে।' এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'আমরা যার খোঁজে এসেছি তার সম্বন্ধে ওটুম্বাকে একবার কৌশলে জিজ্ঞেস করবেন নাকি?'

হেরম্যান, ম্যাকুইনার কথা শুনে টোগো ওটুম্বার সাথে কথা বলতে ইশারা করলেন।

টোগো ওটুম্বাকে বলল, 'শিকারিরা এখন যাবে দক্ষিণের পাহাড়ে শিকারের খোঁজে। তবে আমাদের সঙ্গের মাসাই রক্ষীদের পাঠানো হবে গোরিলা মারার জন্য। কিন্তু উত্তরের পাহাড়ে যেখানে ওই গোরিলার দলের দেখা মিলবে, সে জায়গা চিনিয়ে দেবার জন্য স্থানীয় কাউকে ওদের সাথে দিতে হবে।' ওটুম্বা বলল, পাওয়া যাবে। আমি নিজে কয়েকজন নিয়ে সঙ্গে যাব।'

টোগো এরপর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা গোরিলা বা বানর জাতীয় আর কী কী প্রাণী আছে এ অঞ্চলে?'

সে জবাব দিল, 'শিম্পাঞ্জি আছে, লালরঙের বড় বানর আছে, কুকুরমুখো বানর আছে আর আছে ছোট হুপো বানর, যে বানর বলি দিই আমরা। টোগো তার উত্তর শুনে একটু কায়দা করে বলল, 'লাল রঙের বানর আছে, নীল বা সবুজ রঙের কোনো বানর এখানে নেই? অথবা গোরিলার চেয়ে বড় কোনো প্রাণী?'

প্রশ্ন শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ওটুম্বা উত্তর দিল, 'না, ওসব রঙের কোনো বানর বা গোরিলার চেয়ে বড় কোনো প্রাণী এখানে নেই। তবে জঙ্গলে কালো কেশরঅলা পাহাড়ি সিংহ আছে। চিতা আছে, তারাও কম ভয়ংকর নয়। এরপর সে সেই প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে সে বলল, উত্তরের পাহাড়ে যেতে হলে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার, গোরিলাদের আড্ডাটা বেশ কিছুটা দূরের পথ। এখন সেখানে রওনা না হলে, সন্ধ্যার আগে ফিরে আসা যাবে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিকল্পনা মতো দুটো দল রওনা হয়ে গেল দু-দিকে। আকালার নেতৃত্বে ম্যাকুইনার মাসাই রক্ষীদের সিংহভাগই গেল ওটুম্বার সাথে, আর অবশিষ্টরা চলল দক্ষিণ দিকের পাহাড়ে সুদীপ্তদের সাথে।

ম্যাকুইনা চলতে চলতে বললেন, দুটো দলে বিভক্ত হয়ে ভালোই হল। আমাদের যেসব লোক উত্তরের পাহাড়ে ওটুম্বার সাথে গেল, তাদের প্রত্যেককে সজাগ থাকতে বলেছি। গোরিলা নিধনের কাজ, আজ তারা সম্পূর্ণ করবে না। কালও তারা যাবে ওদিকে। গোরিলা নিধনের কাজে ওদের উত্তরে যাবার পিছনে আসল উদ্দেশ্য হবে ওই সবুজ দানব বানরের অনুসন্ধান করা। গ্রামের পুব দিকের পাহাড় থেকে আমরা নেমেছি। আসার পথে মোটামুটি তিন জায়গা দেখা হয়েছে। আমরা এখন যাচ্ছি দক্ষিণে। অর্থাৎ তিনটে দিক মোটামুটিভাবে খোঁজা হয়ে যাবে আমাদের। যতটা সম্ভব জঙ্গল তন্ন তন্ন করে ওই সবুজ বানরের সন্ধান করার চেষ্টা করতে হবে আমাদের।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, ওটুম্বাতো প্রাথমিক ভাবে ও জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব অস্বীকার করল। এ অঞ্চলের চারপাশ ভালো করে দেখতে হবে আমাদের।'
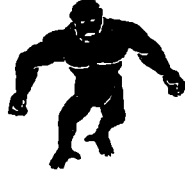
দক্ষিণের পাহাড়টা অপেক্ষাকৃত ছোট। সেটা গিয়ে মিশেছে পশ্চিমের পাহাড়ের সাথে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পাহাড়ের মাথায় উঠে এল তারা। অনেক নীচে পিগমিদের গ্রাম বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথাটা প্রায় সমতল, কিন্তু গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আদিম মহাবৃক্ষের দল ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও আবার নিশ্ছিদ্র বাঁশ গাছের প্রাচীর। যতটা সম্ভব চারপাশ অনুসন্ধান করতে করতে জঙ্গল কেটে এগোতে লাগল সুদীপ্তরা। বেশ কয়েকটা শিম্পাঞ্জির দল আর ছোট আকৃতির পাহাড়ি হরিণ তাদের যাত্রাপথে চোখে পড়ল। একটা চিতাও তাদের গুহামুখের সামনে দর্শন দিল। দুপুর নাগাদ উত্তরদিকে পাহাড় থেকে রাইফেলের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। তার আওয়াজ গুমগুম শব্দে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড় থেকে পাহাড়ে।

ম্যাকুইনা বললেন, 'সম্ভবত গোরিলার দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে মাসাইদের। লড়াই শুরু হয়েছে।'

হেরম্যান আর সুদীপ্ত বাইনোকুলার দিয়ে দেখার চেষ্টা করল উত্তরের দিকে। কিন্তু মহাবৃক্ষের প্রাচীরের আড়ালে সে পাহাড়ের সব কিছুই অদৃশ্য। শুধু রাইফেলের গর্জন ভেসে আসছে সেদিক থেকে। চলতে থাকল সুদীপ্তরা। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে কখনো থেমে থেমে কখনো বা নিরবিচ্ছিন্নভাবে শোনা যেতে লাগল সেই শব্দ। ম্যাকুইনা একবার অসন্তুষ্টভাবে বললেন, 'মূর্খ মাসাইগুলো গোরিলাগুলোর পিছনে কত গুলি নষ্ট করছে দেখুন!'

হেরম্যান বললেন, 'আমাদেরও কিন্তু এখানে কয়েকটা গুলি নষ্ট করতে হবে। শিকারের নাম করে এখানে এসেছি। সঙ্গে করে কিছু না নিয়ে ফিরলে পিগমিদের মনে সন্দেহ হতে পারে। তাছাড়া মাংসেরও তো দরকার আছে।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'তা বটে।'

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই নেহাতই অদৃষ্টের পরিহাসেই এক চিত্রক মহারাজ দর্শন দিলেন গাছের মাথায়। তাকে দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেরম্যান ইশারা করলেন টোগোকে। আবার রাইফেলের কান ফাটানো গর্জনে কেঁপে উঠল বনভূমি। এক গুলিতেই টোগো পেড়ে ফেলল প্রাণীটাকে। ম্যাকুইনার একজন মাসাইরক্ষী প্রাণীটার দেহ কাঁধে তুলে নিল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাসাইরা ইম্পালা হরিণ শিকার করল।

উত্তরের জঙ্গলে যথাসম্ভব অনুসন্ধান করে বেলা আড়াইটে নাগাদ তারা এসে উপস্থিত হল জঙ্গলের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের ঢালে একটা উন্মুক্ত স্থানে। ঢালের কিছু নীচে একটা

শুকনো নদীখাত, আর তারপরই পশ্চিম পাহাড়ের ঢাল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বিরাজ করছে সেখানে। কেমন যেন থমথমে পরিবেশ সেদিকে। জঙ্গলের মাথায় আকাশে একটাও পাখি চোখে পড়ছে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আদিম বৃক্ষরাজি বাইরের পৃথিবী থেকে ওই পাহাড়কে আড়াল করে রেখেছে। বেশ কিছুক্ষণ সে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ম্যাকুইনা হেরম্যানকে বললেন, 'হাতে কিছুটা সময় আছে। খাদটা পার হয়ে ওদিকটা একবার দেখে আসবেন নাকি?'

হেরম্যান বললেন, 'ওটা তো আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা। চুক্তি ভঙ্গ হলে পিগমিদের সাথে সংঘাতে যেতে হবে। সেটা কী ঠিক হবে?'

ম্যাকুইনা বাইনোকুলার দিয়ে খাদের ওপাশে পশ্চিম পাহাড়ের ঢাল মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন, 'এমনটাও হতে পারে যে ওই পাহাড়ে সবুজ বানরের বাস। পিগমিরা তাকে আমাদের থেকে আড়াল করার জন্যই দেবতার থানের গল্প ফেঁদেছে। ওদের সব শর্ত যে আমাদের বাস্তবে মানতে হবে এমন কোনো কথাই নেই। আপনারা ওদিকে গেলে চলুন, নইলে এখানে অপেক্ষা করুন। আমি একবার ওপাশে গিয়ে দেখে আসছি। ওদিকে যা জঙ্গল, তাতে পিগমিরা সচরাচর ওদিকে যায় বলে মনে হয় না।'

ম্যাকুইনার কথার জবাবে হেরম্যান বললেন, 'ওই পাহাড়ে প্রাণীটার লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা আমার মাথাতেও এসেছে। তবে হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া...'

ম্যাকুইনা তাঁর কথা শেষ না হতেই ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন, 'আমি তো বললামই, অত ভয় পেলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।'

আঁতে ঘা লাগল হেরম্যানের, তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'ঠিক আছে—দেখা যাক, তাহলে চলুন।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমে পড়ল সুদীপ্তরা। তারপর শুকনো নদীখাত পার হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ পশ্চিম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সূর্য পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। তার ম্লান আভা খেলা করছে জঙ্গলে। শুধু সেখানে কোথাও নেড়া গাছের মাথার ফাঁক দিয়ে সূর্যালোক এসে নীচে নেমেছে, সে জায়গাই শুধু আলোকিত। ঢাল বেয়ে কিছুটা ওপরে ওঠার পর এমনই এক নেড়া গাছের কাছে এসে হঠাৎই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রুদ্ধ হয়ে গেল তাদের গতি। সবাই চমকে উঠল! পাতাহীন মৃত গাছটার একটা মোটা ডাল থেকে ঝুলছে তিনটে কঙ্কাল। তারা যেন সাবধানবাণী উচ্চারণ করছে সুদীপ্তদের প্রতি। প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সুদীপ্তরা কৌতূহলবশত গিয়ে দাঁড়াল গাছটার নীচে। লোক তিনটেকে যে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। গাছের ডাল থেকে চামড়ার ফিতেয় তারা ঝুলছে। তবে কঙ্কালগুলো বেশ পুরনো। বেশ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের খসে পড়েছে। একটার শূন্য মুখগহ্বরে বোলতা জাতীয় পতঙ্গ বাসা বেঁধেছে। একটা বেশ দীর্ঘাকৃতি কঙ্কাল আছে তার মধ্যে। তাকে দেখে সুদীপ্তদের মনে হল সম্ভবত সে লোকটা ইওরোপীয় ছিল বা সভ্য সমাজের মানুষ। কোমরে রিভলভার ঝোলানোর চামড়ার খাপ আর রোদ-বৃষ্টিতে পচে যাওয়া চামড়ার হাইহিল বুট দুটো এখনও তার পায়ে ঝুলছে।

হেরম্যান সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোনো শিকারি বা ভাগ্যান্বেষী পর্যটক হবে হয়তো। এদিকে এসে পড়েছিল, পিগমিদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধায় ফাঁসিতে লটকে দিয়েছে।'

হেরম্যানের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসে হঠাৎ দুলে উঠল কঙ্কালটা, আর তাতে গাছের ফাঁক বেয়ে নেমে আসা সূর্যকিরণে কঙ্কালটার ডান হাতের আঙুলে কী যেন একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল! একটা আংটি! ব্যাপারটা ম্যাকুইনার নজর এড়াল না। আর সেটা দেখেই একজন মাসাইকে কঙ্কালটা নীচে নামাতে বললেন। দড়ি কেটে নীচে নামানো হল সেটা। ম্যাকুইনা কঙ্কালটার কাছে গিয়ে তার অনামিকা থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। হীরে বসানো একটা সোনার আংটি! আংটিটা দেখতে দেখতে ম্যাকুইনার চোয়াল ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠল, বিড় বিড় করে কী যেন বলে তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাটিতে শোয়ানো কঙ্কালটার দিকে। মিনিট দু-এক এভাবে কেটে যাবার পর হেরম্যান ম্যাকুইনাকে বললেন, 'কে ও? ওর পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানেন নাকি?'

ম্যাকুইনা শুধু ঘাড় নাড়লেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গের লোকদের বললেন, 'একটা কবর খোঁড়ো। একে কবর দিতে হবে।'

ম্যাকুইনার ব্যাপার দেখে হেরম্যান আর সুদীপ্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মাসাইরা একটা গর্ত খুঁড়ল, তার মধ্যে কঙ্কালটাকে মাটি চাপা দেওয়া হল। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল কাজটা করতে। নিশ্চুপভাবে কঠিন চোয়াল চেপে পুরো ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করলেন ম্যাকুইনা। সুদীপ্তর মনে হল ম্যাকুইনার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। কবরের ব্যাপারটা মিটলেও ম্যাকুইনা কিন্তু এগোলেন না। একবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'চলুন, আজকের মতো ফেরা যাক।'

ফেরার পথ ধরল সুদীপ্তরা। সারা পথ আর একটাও কথা বললেন না ম্যাকুইনা। থমথমে মুখে পথ চললেন তিনি। বনবাদাড় ভেঙে আবার চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে অবশেষে পিগমিদের গ্রামে যখন ফিরে এল সূর্য তখন প্রায় ঢলতে বসেছে।

গ্রামের সামনে সুদীপ্তদের তাঁবু ফেলার বন্দোবস্ত হল এবং মাসাইরা থাকবে পাহাড়ের ওপর তাদের আগের জায়গাতেই।

সুদীপ্তরা ফিরে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটুম্বার সাথে উত্তরে পাহাড়ে যে দলটা গেছিল তারা ফিরে এল। না, সবাই ফেরেনি। চারজন সঙ্গীকে তাদের রেখে আসতে হয়েছে সেখানে, গোরিলার আক্রমণে মারা গেছে তারা। বুলেট খেয়েও অসীম শক্তিধর মৃত্যুপথযাত্রী প্রাণীগুলো নাকি হাতের সামনে যাকে পেয়েছে তার হাত-পা টেনে টেনে ছিঁড়েছে। শুধু বর্শা হাতে আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ শিকার করে বলে মাসাইদের খ্যাতি আছে। কিন্তু এমন ভয়ংকর প্রাণীর সামনে তারা পড়েনি! এমনই জানাল মাসাইদের দলপতি আকালা।

মাসাইদের মৃত্যুতে ম্যাকুইনা দুঃখ পেলেন বলে মনে হল না। তিনি আকালার কাছে কার্তুজ আর রাইফেলের হিসেব নিলেন। একটা রাইফেলের ব্যারেল দুমড়ে-মুচড়ে

দিয়েছে গোরিলারা। সেটা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি।

ওটুম্বা আর তার কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল মাসাইদের সাথেই। সূর্য ডুবতে চলছে। গ্রামে ঢুকতে হবে তাদের। সুদীপ্ত লক্ষ করল তাদের সঙ্গে আনা মরা চিতাটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে ওটুম্বা।

মাসাইদের সাথে ম্যাকুইনার কথা শেষ হতেই ওটুম্বা বলল, 'আমরা এখন গ্রামে ঢুকব। তোমরা যদি ওই চিতাটা আমাদের দাও তবে ভালো হয়। ও প্রাণী আমাদের একরকম ওষুধ তৈরির কাজে লাগে।'

ম্যাকুইনা এতক্ষণ ওটুম্বার উদ্দেশ্যে কোনো কথা বলেনি। টোগোর মুখ থেকে ওটুম্বার কথা শুনে হঠাৎই কেন জানি ওটুম্বার ওপর খেপে গিয়ে হিংস্র কণ্ঠে হিস্‌হিস্ করে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, নিয়ে যাও। তোমারও এই চিতাটার মতো দশা হবে! সবুর করো।'

ওটুম্বা তাঁর কথা বুঝতে না পেরে টোগোকে বলল, 'এই সাদা চামড়া আমাকে কী বলছে?'

ম্যাকুইনার বক্তব্য তাকে বলা সমীচিন হবে না বুঝে ব্যাপারটা টোগোই সামাল দিল। সে ওটুম্বাকে বলল, 'সাদা চামড়া বলছে, ও ওটা তোমাকে উপহার দেবার জন্যই মেরে এনেছে। তুমি স্বচ্ছন্দে এটা নিতে পারো।' খুশি হল ওটুম্বা। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, পরদিন সকালে আবার দেখা হবে বলে, চিতাটা নিয়ে গ্রামে ঢুকে গেল সে।

সে চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁবু খাটানো হল। আকালারা এরপর চলে গেল নিজেদের ছাউনি ফেলার জন্য। তাঁবুর চারপাশে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তুতসি কুলিরা লেগে গেল রান্নার কাজে। সুদীপ্তদের সাথে কোনো কথা না বলেই ম্যাকুইনা তাঁর তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন। সুদীপ্তরাও ঢুকে পড়ল নিজেদের তাঁবুতে।

রাতটা নির্বিঘ্নে কাটল। পরদিন ভোরে উঠে তাঁবুতে বসে প্রাতরাশ সারতে সারতে হেরম্যান বললেন, 'কাল ম্যাকুইনা হঠাৎ ওটুম্বার উদ্দেশ্যে ওরকম মন্তব্য করল কেন বলো তো? মনে হয় ভেতরে ভেতরে লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে আছে।'

সুদীপ্ত মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। বিশেষত, কাল ওই কঙ্কালটাকে নামিয়ে কবর দেবার ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত তাই না?'

টোগো বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় ওই কঙ্কালটা নিশ্চিতভাবে আফ্রিকান্ডারদের ঘনিষ্ঠ কোনো ব্যক্তির। যে কারণে ওর সৎকার করল।'

সুদীপ্ত বলল, 'কাল সন্ধ্যায় ও সেই যে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল, তারপর আর তো বাইরেই এল না।'

তার কথা শুনে হেরম্যান বললেন, 'ভেতরে ঢুকলেও মনে হয় ও ঘুমোয়নি। মাঝরাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে বেরিয়েছিলাম, তখন দেখি তাঁর তাঁবুর পেছনে যে গাছটা আছে তার নীচে অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে দেখার পর তার আকৃতি দেখে আন্দাজ করলাম লোকটা ম্যাকুইনা। গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।'

'গুড মর্নিং মিস্টার হেরম্যান। ঘুম থেকে উঠেই আমাকে নিয়ে কী আলোচনা শুরু

করলেন?' হেরম্যানের কথা শেষ হতে-না-হতেই ম্যাকুইনার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সবাই। তাঁবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর মুখের থমথমে ভাবটা এখনও কাটেনি।

হেরম্যান একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাঁর প্রতি সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, 'মাঝরাতে আপনি তাঁবুর বাইরে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই বলছিলাম।'

ম্যাকুইনা শুনে গম্ভীরভাবে বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় তাঁবুতে ঢোকার পর আমি আর তাঁবুর বাইরে আসিনি সারারাত। আমাকে আপনি দেখলেন কীভাবে?'

হেরম্যান এবার হাসির ছলেই বললেন, 'এই সামান্য ব্যাপারটা আপনি অস্বীকার করছেন কেন? আমি তো আর বলিনি যে আপনি আমাদের তাঁবুতে আড়ি পাতছিলেন! আপনার তাঁবুর পিছনে গাছের নীচে আমি আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। সেই কথাই আমি সঙ্গীদের বলছি', মৃদু একটা শ্লেষের ছোঁয়া ফুটে উঠল হেরম্যানের কথায়।

ম্যাকুইনা কিন্তু সেটা গায়ে না মেখে বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন, 'আমি বলছিই তো বাইরে যাইনি।'

হেরম্যান বললেন, 'যদিও জায়গাটা অন্ধকার ছিল কিন্তু ওখানে বেশ দীর্ঘ একটা অবয়ব আমি স্পষ্ট দেখেছি। মাথার ওপর গাছের একটা ডাল এক হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। অত লম্বা লোক আপনি ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ নেই।'

ম্যাকুইনা প্রত্যুত্তরে আর কিছু বললেন না। কী যেন ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ছিটকে বেরিয়ে গেলেন তাঁবু থেকে। সেটা হেরম্যানের কথার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাকুইনার রাগের বহিঃপ্রকাশ কিনা, সেটা ঠিক সেই মুহূর্তে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল না। হেরম্যান হেসে বললেন, 'উনি ব্যাপারটা অস্বীকার করার পরও কথাগুলো আমি জোর দিয়ে বলাতে মনে হয় চটে গেলেন। সত্যিই উনি যেন কেমন উদ্ভট প্রকৃতির।'

প্রাতরাশ শেষ করে তাঁবুর বাইরে এসে সুদীপ্তরা দেখল, ম্যাকুইনা তাঁর তাঁবুর পিছন দিকে সেই গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। সুদীপ্তদের আর ম্যাকুইনার তাঁবু প্রায় বলতে গেলে কাছাকাছি। আর সেই গাছটা দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকুইনার তাঁবুর আনুমানিক একশো ফুট দূরে। ম্যাকুইনা হেরম্যানের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কাল রাতে আমি এ জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম তাই তো?' সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন হেরম্যান।

ম্যাকুইনা এরপর গাছের গুঁড়ির দিকে ফিরে তার মাথার ওপর সবচেয়ে নীচে যে ডালটা আছে সেটা দেখিয়ে আবার হেরম্যানের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি সম্ভবত এই ডালটা ধরে দাঁড়িয়েছিলাম তাই তো? একটু ঠিক করে ভেবে বলুন।'

সুদীপ্ত তাকাল ডালটার দিকে। ডালটা বেশ উঁচু। সুদীপ্ত বা হেরম্যানের নাগালের বাইরে তো বটেই। হয়তো ম্যাকুইনা ছুঁতে পারেন সেটা। হেরম্যান ম্যাকুইনার কথার জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, দূর থেকে তেমনই তো মনে হয়েছিল আমার।'

ম্যাকুইনা এবার কোনো কথা না বলে তার ডান হাতটা বাড়াল সেই ডালের দিকে। ডালটা সুদীপ্তর যত উঁচু মনে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক ওপরে। সুদীপ্তরা অবাক হয়ে দেখল ম্যাকুইনার দীর্ঘ হাতের আঙুলগুলো ডালটার ইঞ্চি ছয়-আটেক দূরে গিয়ে থেমে গেল। ম্যাকুইনা এরপর পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তাতে ইঞ্চি তিনেক

ব্যবধান কমল, কিন্তু ডালটা তিনি স্পর্শ করতে পারলেন না।

স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে হেরম্যানের দিকে তাকালেন। হেরম্যানকে দেখে সুদীপ্তর মনে হল ম্যাকুইনা ডালটা স্পর্শ করতে না পারায় তিনি স্পষ্টতই বিব্রত। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'তাহলে এতটা ভুল দেখলাম।'

ম্যাকুইনা ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'না, সম্ভবত আপনি ঠিকই দেখেছেন।'

হেরম্যান বললেন, 'মানে?'

ম্যাকুইনা মুখে কিছু না বলে আঙুল দিয়ে গাছের গুঁড়ির কাছে মাটিতে একটা জায়গা দেখালেন। সুদীপ্তরা সেখানে ভালো করে তাকাতেই দেখতে পেল শুকনো মাটির মৃদু ধুলোর আস্তরণের ওপর ফুটে আছে অস্পষ্ট কয়েকটা পায়ের ছাপ। সবাই জায়গাটা গোল হয়ে দাঁড়াবার পর টোগো উবু হয়ে বসল ছাপগুলো পরীক্ষা করতে। বেশ কিছুক্ষণ ছাপগুলো খুঁটিয়ে দেখার পর সে বলল, 'এ ছাপগুলো দেখতে অনেকটা মানুষের বা মানুষজাতীয় কোনো প্রাণীর মতো। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল পায়ের পাতার চারটে করে আঙুল, বুড়ো আঙুল বলে কিছু নেই! ছাপটা এক ফুটেরও বেশি লম্বা, অর্থাৎ সে আটফুট অন্তত লম্বা হবে।'

ছাপটা দেখে আর টোগোর কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেরম্যান আর সুদীপ্ত। কয়েক মুহূর্ত পর প্রথম মুখ খুললেন ম্যাকুইনা। বললেন, 'টোগোর কথা যদি ঠিক হয় তবে আমরা ঠিক জায়গাতে এসেছি। সে আছে! এই পাহাড়-জঙ্গলের কোথাও সে লুকিয়ে আছে। কাল সে আমাদের তাঁবুর কাছে এসেছিল। এই তার চিহ্ন। হয়তো রাতে ঘুরতে ঘুরতে এদিকে চলে এসেছিল। অথবা তাঁবু দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল। হেরম্যান যদি তাকে দেখে আমার নাম ধরে ডাকতেন তাহলেও হয়তো তখনই ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেত।'

টোগো বলল, 'শিম্পাঞ্জি অথবা গোরিলা জাতীয় প্রাণীর অনেক সময় এ ধরনের কৌতূহল থাকে। তারা আড়াল থেকে মানুষকে লক্ষ করে। তাঁবুতে হানা দিতে আসে।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে হেরম্যান বললেন, 'এই পায়ের ছাপ যদি সত্যিই সেই দানব বানরের হয়ে থাকে তাহলে সে সম্ভবত এই পাহাড়ি জঙ্গলেই কোথাও আছে। হয়তো বা ওই পশ্চিম পাহাড়েই। তবে সে তো আর বারবার আমাদের তাঁবুর কাছে আসবে না। এত বড় জায়গা। আমাদের হাতে মাত্র দু-দিন সময়, পরিকল্পনা মাফিক অনুসন্ধান না করলে প্রাণীটার খোঁজ পাওয়া মুশকিল।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'হ্যাঁ, সেই পরিকল্পনাই করা প্রয়োজন। ওই প্রাণীটা যখন গ্রামের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে তখন ওটুম্বা নিশ্চয়ই ওর সন্ধান জানে। শয়তান বামনটা সে খবর দেবে বলে মনে হয় না। আমাদের যা করার নিজেদের করতে হবে। আমারও ধারণা ওই পশ্চিম পাহাড়টা রহস্যজনক। একটা পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে। কোনো অজুহাত দেখিয়ে ওটুম্বার সাথে গোরিলা মারতে আজ আর কোনো লোক পাঠাব না। তেমন হলে তারা কাল ওর সঙ্গে যাবে। ওটুম্বাদের দেখিয়ে আমরা চিতা শিকারের নামে

যাব দক্ষিণের জঙ্গলে। গ্রামের দৃষ্টিপথের বাইরে দক্ষিণের পাহাড়ে ওঠার পর আকালার নেতৃত্বে একটা বড় দল থেকে যাবে সেই পাহাড়ে। তারা শিকার-টিকার করতে বা শূন্যে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগোবে দক্ষিণ থেকে পুবে। সেই শব্দ শুনে ওটুম্বারা গ্রামে বসে ভাববে আমরা সে দিকেই এগোচ্ছি। আর আমরা একটা ছোট দল নিয়ে এগোব পশ্চিম পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।'

ম্যাকুইনার প্রস্তাব শুনে তা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত তাতে রাজি হয়ে গেলেন হেরম্যান। হাতে মাত্র আর দু-দিন সময়। পিগমিদের চোখ এড়িয়ে পশ্চিমের পাহাড়ে যাবার একটা ঝুঁকি তাদের নিতেই হবে। বিশেষত, ওই প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রমাণ সম্ভবত যখন তারা দেখতেই পাচ্ছে। এরপর হেরম্যানের নির্দেশে ওই ছাপের ছবি নিল সুদীপ্ত। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দুকধারী মাসাইরা নেমে এল ওপরের পাহাড় থেকে। তাদের নামতে দেখেই সম্ভবত পিগমি গ্রামের আগল ঠেলে ওটুম্বাও তার জনা পাঁচেক সঙ্গী নিয়ে গ্রামের বাইরে বেরিয়ে সুদীপ্তদের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। সে আজ বেশ সেজে এসেছে। তার কোমরে জড়ানো চিতার উজ্জ্বল চামড়া, উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গে নানা ধরনের পাথরের মালা, মাথায় রঙিন পালক গোঁজা। তাঁবুর সামনে উপস্থিত হয়ে সে বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে টোগোকে বলল, 'তোমাদের সব লোকজন তৈরি তো? তাহলে তাদের নিয়ে উত্তর পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে পড়ি।'

টোগো পূর্ব-পরিকল্পনা মতো একটু বিমর্ষভাবে তার উদ্দেশ্যে বলল, 'ওরা আবার কাল ওখানে যাবে।'

ওটুম্বা বিস্মিতভাবে জানতে চাইল, 'কেন, আজ নয় কেন?'

টোগো বলল, 'কাল মাসাইদের যে সঙ্গীরা মারা গেছে, তাদের আত্মার শান্তির জন্য ওরা চিতা শিকারে যাবে দক্ষিণের পাহাড়ে। সাদা চামড়াসহ সবাই যাব সেখানে। চিতা না মারলে ওদের প্রেতাত্মা শান্তি পাবে না। তারা নানা প্রাণীর রূপ ধরে ঘুরে বেড়াবে গ্রামের চারপাশের পাহাড়ে। তাতে তোমাদেরও অনিষ্ট হবে। আমরা তো এখানে কালকের দিনটা পর্যন্ত আছি, তাই ও কাজটা আজই সেরে রাখা জরুরি।'

আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পারলৌকিক কার্যের প্রথা আছে, তাছাড়া ভূত-অপদেবতা, এসবে তাদের বিশ্বাসও প্রবল, কাজেই ওটুম্বা অবিশ্বাস করল না টোগোর কথা। ওটুম্বা শুনে গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ, আত্মারা নানারকম ক্ষতি করে। তাদের শান্তির দরকার। আমাদের গ্রামে কেউ মারা গেলে আমরা শিম্পাঞ্জির হৃদপিণ্ডের মধ্যে তার আত্মা ভরে তা পুড়িয়ে ফেলি। ঠিক আছে, আমরা কালই আবার তোমাদের লোকদের সাথে যাব। আর একটা কথা, চিতার দেহগুলো যদি কাজে না লাগে তাহলে ওগুলো গতকালের মতো আমাদের দিয়ো।'

টোগো বলল, 'ঠিক আছে, সেগুলো আমরা তোমাদের দেব।'

টোগোর কথা শুনে ওটুম্বা খুশি হয়ে তার পারিষদসমেত আবার গ্রামের ভিতর ঢুকে গেল।

সে চলে যাবার কিছু সময়ের মধ্যেই সুদীপ্তরা তাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ল।

পরিকল্পনামতো দক্ষিণ পাহাড়ে পৌঁছে তারা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেল। মাসাইরা অধিকাংশই এগোল উত্তরমুখে, আর ম্যাকুইনা-হেরম্যান-সুদীপ্ত-টোগো, হুটু আস্কারি ও দু-জন মাত্র মাসাইকে নিয়ে এগোল দক্ষিণ পাহাড় হয়ে পশ্চিম পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।
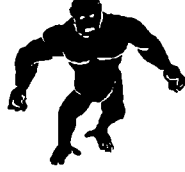
চলতে চলতে সুদীপ্ত হেরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তাঁবুর কাছে ওই পায়ের ছাপটা দেখে আপনার ওই প্রাণীটার সম্বন্ধে কী মনে হল?'

হেরম্যান বললেন, 'যদিও আমি এই ছাপের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই তবে চার আঙুল-বিশিষ্ট বানর জাতীয় প্রাণীর কথা শুনিনি। সাধারণত গোরিলা, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি মানুষের কাছাকাছি প্রাণীদের বুড়ো আঙুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পায়ের অন্য আঙুল থেকে ওই আঙুলটা একটু তফাতে ছড়ানো হয়, পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ঝোলার জন্য। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখছি। সম্ভবত এই সবুজ বানর বা কলিন্সের গ্রিন ম্যান গাছে চড়তে পারে না। পায়ের ছাপটাও মানুষের পায়ের ছাপের মতো লম্বাটে ধরনের। আরও একটা ব্যাপার হল—পাখি ও কিছু সরীসৃপ ছাড়া সবুজ রং কিন্তু অন্য প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না। ছাপ দেখে আর ওই রঙের কথা ভেবে মনে হচ্ছে প্রাণীটা কোনো নতুন শ্রেণির দো-পেয়ে প্রাণী। আবার তার যা আকৃতি তাতে সে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া দানব-বানর "জাইগান্টোপিথিকাস"-এর কোনো উত্তরসূরিও হতে পারে।'

এরপর জঙ্গল ভাঙতে ভাঙতে হেরম্যান বললেন, 'ক্রিপ্টো-জুলজির ব্যাপারে ছাপ-সংক্রান্ত কয়েকটা ঘটনার কথা বলি—ঘটনাগুলো তোমাদের হিমালয়ের ইয়েতি সংক্রান্ত। আমরা যেমন অজানা প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখলাম, তেমনই কোনো অজানা দো-পেয়ের ছাপ হিমালয়ের বুকে ১৮৮৯ সালে প্রথম দেখেন ইউরোপীয় অভিযাত্রী ওয়াডেল। তারপর ১৯২১ সালে রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির লেফ্‌টেন্যান্ট চার্লস হাওয়ার্ড "এভারেস্ট রিকনয়সান্স" অভিযানে গিয়ে ২১০০০ ফুট উচ্চতায় 'লাকপা লা' গিরিসঙ্কটে দেখতে পান কোনো অজানা দো-পেয়ের বিশাল পদচিহ্ন। হাওয়ার্ডের পর ১৯২৫ সালে রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির টোমবাজি। জেমু হিমবাহে তিনি দেখলেন সাত ইঞ্চি লম্বা পায়ের ছাপ। আর ১৯৫১ সালে এভারেস্ট এক্সপিডিশনে গিয়ে এরিক শিপটন তুলে আনলেন বরফের মধ্যে আঁকা এক বিশালাকৃতি দো-পেয়ে দানবের পদচিহ্ন। আকারে তা একটা আইস অ্যাক্স বা তুষার গাঁইতির ফলার মতো। পদচিহ্নের পাশে ওই আইস-অ্যাক্স রেখেই ছবি তুলেছিলেন তিনি। ইয়েতির পদচিহ্ন হিসেবে খ্যাত ওই ছবি আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল সারা বিশ্বে। হয়তো তুমিও সেই ছবি দেখে থাকবে। এমনটাও তো হতে পারে—তুমি যে ছবি তুললে সেটাও একদিন বিখ্যাত হবে।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'যাদের কথা আপনি বললেন তাঁরা কী শুধু ছবিই তুলেছিলেন? কেউই চাক্ষুষ দেখেননি প্রাণীটাকে?'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, দুজন এ দাবি করেছিলেন। ইয়েতির কথা মানুষের আলোচনায় প্রথম আসে ১৮৩২ সালে। ওই বছর তোমাদের কলকাতা থেকে প্রকাশিত এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে নেপাল হিমালয়ের অভিযাত্রী 'হজসন-এর' এক প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে তিনি দাবি করেছিলেন তাঁর সঙ্গীরা নাকি গাঢ় রঙের বিশালাকৃতি এক বানর জাতীয় প্রাণীকে তাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছিল। আর দ্বিতীয়বার এ দাবি করেন ওই টোমবাজি। আমি যেমন প্রাণীটাকে গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, তেমনই টোমবাজি দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মানুষের মতো দেখতে এক ঘন রঙের দো-পেয়ে প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খর্বাকৃতি এক রডোডেনড্রন গাছের মাথা ধরে ঝাঁকাচ্ছে। সামান্য দূর থেকে মিনিট তিনেক ধরে প্রাণীটাকে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। তারপরই প্রাণীটা বরফাচ্ছাদিত পর্বত কন্দরে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রাণীটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে পৌঁছে ওই পায়ের ছাপের ছবি তোলেন শিপম্যান।'

হেরম্যান সুদীপ্তর প্রশ্নের জবাব দেবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-ভাবে বললেন, 'হজসন, ওয়াডেল, টোমবাজি বা শিপটন যে-কাজটা ইয়েতির ক্ষেত্রে করতে পারেননি, বুরুন্ডির সবুজ মানুষের ক্ষেত্রে সে কাজটাই করে দেখাতে হবে আমাদের। শুধু পায়ের ছাপের ছবি তোলা বা দূর থেকে তাকে দেখা শুধু নয়, তাকে হাজির করাতে হবে সভ্য পৃথিবীর সামনে। নিছক ব্যক্তিগত খ্যাতি লাভের জন্য এ কথা বলছি না, ক্রিপটোজ্যুলজিস্টদের যুগ যুগ ধরে পণ্ডিত প্রবরদের কাছ থেকে যে তাচ্ছিল্য-অপমান হজম করতে হয়েছে, যার থেকে শিপটন বা হেরম্যান কেউই বাদ যাননি—তার বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদ হবে বুরুন্ডির সবুজ মানুষ।' কথাগুলো বলার সময় উত্তেজনায় চক্‌চক্ করে উঠল হেরম্যানের চোখ।

সুদীপ্ত তাঁর কথা শুনে মনে মনে বলল, 'তাই যেন হয়।'

ম্যাকুইনা অবশ্য হেরম্যান ও সুদীপ্তর সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন না। তিনি তাদের কিছুটা তফাতে মাসাই রক্ষী দুজনকে নিয়ে চলতে লাগলেন। এক সময় সেই শুকনো নদীখাতের কাছে পৌঁছে গেল তারা। তারপর খাত অতিক্রম করে পশ্চিম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপস্থিত হল সেই জায়গাতে—যেখানে বিরাট গাছটাতে ঝুলে রয়েছে দুটো কঙ্কাল। তাদের অপর সঙ্গীর সদ্‌গতি গতকাল করেছে ম্যাকুইনা। ম্যাকুইনা জায়গাটাতে পৌঁছে একবার তাকালেন, কিছু দূরে ঝোপের ওপাশে যেখানে গত বিকালে সেই কঙ্কালটাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তারপর সে জায়গা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগোল সবাই।

এ পথ সুদীপ্তদের অচেনা। তারা যত এগোতে লাগল, ততই অন্যান্য গাছ কমে গিয়ে বাড়তে লাগল বাঁশের জঙ্গল। এক সময় জঙ্গল এত ঘন হয়ে এল, ঠিক যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর। যেদিকে চোখ যায় সুদীপ্তদের গতি রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের দেওয়াল। সে অরণ্যে প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই। একটা পাখি পর্যন্ত কোথাও ডাকছে না। অজানা

কোনো আতঙ্কে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে এ অরণ্য। অনেক চেষ্টা করে বাঁশঝাড় কেটে পথ করে নিয়ে মাইল খানেক এগোতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। দক্ষিণের জঙ্গল থেকে আকালাদের বন্দুকের শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। হয়তো তারা পুবের দিকে পৌঁছে গেছে। হেরম্যান হিসাব করে দেখলেন এ পাহাড়ের অর্ধেকও তারা অতিক্রম করতে পারেননি। একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে ম্যাকুইনার উদ্দেশে বললেন, 'যা জঙ্গল দেখছি আর যেভাবে আমরা এগোচ্ছি তাতে সন্ধের সময়ও এ পাহাড়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারব কি না সন্দেহ। তাছাড়া এ জঙ্গলে যদি ওই দানব বানর লুকিয়েও থাকে দৈবাৎ তার সাক্ষাত না পেলে তাকে খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। অসভ্য পিগমিগুলো যদি প্রাণীটার সন্ধান না দেয় তাহলে তাকে খুঁজে বার করাও মুশকিল। ফিরে গিয়ে আমি সে চেষ্টাই করব।'

হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'কীভাবে কাজটা করবেন আপনি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'দেখি, প্রলোভনে কাজ হয় কি না! ওটুম্বাকে আলাদা তাঁবুতে ডেকে আনতে হবে, হীরে আর তামাকের লোভ দেখাতে হবে।'

'আর তাতে যদি কাজ না হয়?' আবার জানতে চাইলেন হেরম্যান।

এ কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে হেরম্যানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকালেন ম্যাকুইনা। হেরম্যানকে তিনি কী যেন জবাব দিতে গিয়েও চুপ করে গিয়ে শুধু বললেন, 'আর একটু পথ অন্তত এগোনো যাক।'

এগোতে থাকল সকলে। আরও আধ ঘণ্টা চলার পর সুদীপ্তদের সামনের বাঁশবন হঠাৎই যেন ফাঁকা হতে শুরু করল। তাই দেখে সকলে একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। তাহলে কী শেষ হতে চলছে এই অন্তহীন বাঁশবন! আর কিছুক্ষণের মধ্যে তারা উপস্থিত হল একটা উন্মুক্ত স্থানে। না, বাঁশবন শেষ হয়ে যায়নি। বনের ভিতর বাঁশের জঙ্গল কেটে একটা বৃত্তাকার জায়গা কারা যেন সাফ করে রেখেছে। আর সেই বৃত্তের ঠিক মাঝখানে বিরাট লম্বা একটা বাঁশের মাথায় বেশ উঁচুতে ঝুলছে আরও একটা কঙ্কাল! তাহলে কী এটা আরও একটা বধ্যভূমি!

সুদীপ্তরা গিয়ে দাঁড়াল কঙ্কালটা যেখানে ঝুলছে তার ঠিক নীচে। বাঁশটা যেন স্বাভাবিক নিয়মে এখানে জন্মায়নি, এখানে সদ্য পোঁতা হয়েছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বাঁশের গোড়াতে বেশ কিছুটা জায়গাতে ছড়িয়ে আছে কাঁচা মাটি, তাতে অসংখ্য খুদে-খুদে পায়ের ছাপ। আর সেই ছাপের মধ্যে হঠাৎই একটা বিরাট পায়ের ছাপ দেখে চমকে উঠল সকলে। সেই ছাপ! এরপর ভালো করে মাটির দিকে তাকাতেই বুড়ো আঙুলহীন আরও বেশ কয়েকটা ছাপ দৃষ্টিগোচর হল তাদের।

ম্যাকুইনা বললেন, 'তাহলে ওই সবুজ মানুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে পিগমিদের। তাদের সঙ্গে প্রাণীটাও এখানে এসেছিল।'

সুদীপ্তদের আশ্চর্য হতে আরও কিছুটা বাকি ছিল। এরপর হঠাৎ বাঁশের আগায় ঝুলতে থাকা কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে টোগো বিস্ময়ে বলে উঠল, 'আরে, এ তো সেই কঙ্কাল,

যাকে কাল কবর দেওয়া হল। ওই তো তার সেই জুতো, ভালো করে দেখুন ওর গায়ে এখনও মাটি লেগে আছে! ফাঁস দেওয়া লতাটাও টাটকা!' তার কথা কানে যেতেই তড়িতাহতের মতো ঝুলন্ত কঙ্কালের দিকে তাকিয়েই দুর্বোধ্য ভাষায় প্রচণ্ড একটা চিৎকার করে স্থির হয়ে গেলেন ম্যাকুইনা। হেরম্যান আর সুদীপ্ত কঙ্কালটার দিকে ভালো করে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন—টোগোর কথাই ঠিক, কালকের সেই কঙ্কালটাকেই কবর থেকে তুলে এনে ঝোলানো হয়েছে বাঁশের মাথায়! কী আশ্চর্য ব্যাপার! তবে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হল টোগো, কারণ ম্যাকুইনা উত্তেজনার বশে আফ্রিকান ভাষায় চিৎকার করে যে-কথা বলে উঠলেন তার মর্ম উদ্ধার করতে অসুবিধা হল না তার। সে অবাক হয়ে তাকাল ম্যাকুইনার দিকে। আর তিনি পাথরের মূর্তির মতো চেয়ে রইলেন ওপর দিকে। শক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর চোয়াল, কোনো অজানা শত্রুর প্রতি আক্রোশে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে তাঁর চোখ দিয়ে!

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধভাবে কেটে যাবার পর হেরম্যান মন্তব্য করলেন, 'এ কঙ্কালটার প্রতি মনে হয় জাতক্রোধ আছে পিগমিদের, মৃত্যুর পরও তাই ওরা ওঁকে শান্তি দিতে চায় না। কবর থেকে তুলে আবার ফাঁসিতে চড়াল।'

একথা বলার পর সম্ভবত আর কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে ম্যাকুইনার উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, লোকটার পরিচয় কী বলুন তো? যে কারণে আপনি কাল ওঁর কবরের ব্যবস্থা করলেন?'

ম্যাকুইনা কঙ্কালের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ফিরে তাকালেন হেরম্যানের দিকে। তারপর হেরম্যান আর সুদীপ্তকে হতচকিতে করে ঠান্ডা গলায় জবাব দিলেন, 'ম্যাকলাস ডায়ার—আমার বাবা।'

'আপনার বাবা? তিনিও কী সবুজ বানরের সন্ধানে এখানে এসেছিলেন?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন হেরম্যান।

ম্যাকুইনা এ প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে শুধু বললেন, 'আমরা এবার তাঁবুর দিকে ফিরব।' এই বলে ঝুলন্ত কঙ্কালটার দিকে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে ফেরার পথ ধরলেন তিনি। তবে ফেরার সময় কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে লাগল সুদীপ্তদের। মনে হতে লাগল কেউ যেন আড়াল থেকে অনুসরণ করছে তাদের।

ফিরতি পথে সুদীপ্তরা এক সময় উপস্থিত হল সেই গাছের কাছে, যেখানে দুটো কঙ্কাল ঝুলছে। সুদীপ্তরা একবার গিয়ে দাঁড়াল ঝোপের আড়ালে সেই কবরের জায়গাতে। শূন্য কবর, তার চারপাশে ঝুরো মাটিতে জেগে আছে পিগমিদের পদচিহ্ন আর বুড়োআঙুলহীন সেই অদ্ভুত ছাপ! অনেকক্ষণের নীরবতা কাটিয়ে ম্যাকুইনা বলে উঠলেন, 'প্রাণীটাকে সম্ভবত পিগমিরা পোষ মানিয়েছে, ও ওদের সঙ্গেই ঘোরে দেখছি।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে হেরম্যান বললেন, 'কিন্তু আমাদের এ পাহাড়ে পদার্পণের খবর হয়তো এতক্ষণে ওটুম্বার কানে পৌঁছে দিয়েছে পিগমিরা। তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে কঙ্কালটাকে কারা গাছ থেকে নামিয়ে কবর দিয়েছিল। তবে আমার ধারণা ওরা এ ব্যাপারটা আজই বুঝতে পেরেছে, নইলে ওটুম্বা আমাদের সঙ্গে সকালবেলা ভালো

ব্যবহার করত না। আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি—এ ব্যাপারটা ও নিশ্চয়ই স্বাভাবিকভাবে নেবে না।'

ম্যাকুইনা আবার ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে বললেন, 'আমাদের আর পাহাড়ের নীচে গ্রামের পাশের তাঁবুতে ফেরা ঠিক হবে না। ওরা অসভ্য জাতি, ওটুম্বারা সন্দেহবশত আমাদের তাঁবু আক্রমণও করে বসতে পারে। আমরা ফিরব পাহাড়ের মাথায় মাসাইদের তাঁবুর কাছে পুরোনো জায়গায়। আকালারাও সরাসরি ওখানেই ফিরবে। তাকে তাই নির্দেশ দেওয়া আছে। তারপর টোগো আর আকালা গ্রামে যাক ওটুম্বার কাছে। ওরা তাকে জানাক—আমরা ভালো শিকার পাচ্ছি না, তাই কালই এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাব। ওটুম্বা যেন পাহাড়ের মাথায় তাঁবুতে এসে তার প্রাপ্য রাইফেল আর আজকের শিকার করা পশুর চামড়া নিয়ে যায়।'

হেরম্যান চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন, 'ওকে ওপরের তাঁবুতে ডেকে কী করবেন?'

ম্যাকুইনা বললেন, 'হীরের লোভ দেখিয়ে সবুজ বানরের খবর জানার চেষ্টা করব। ওরা যে তার খবর জানে এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।'

'যদি ও খবর না দেয়, অথবা যদি এমন হয় যে, আমরা এ পাহাড়ে এসেছি জেনে ওটুম্বা আমাদের কাছে না এসে টোগো আর আকালাকে আক্রমণ করে বসে—তখন?'

'ওটুম্বা যদি মুখ না খোলে তাহলে আর কী করব? ওকে ছাড়া ওই প্রাণীকে এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বিশেষত, ওরাই যদি প্রাণীটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখে!'

এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'আপনার গাইড আর আকালাকে চট করে ওরা আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না। আমরা যেমন ওদের ব্যাপারে সতর্ক ওরাও তেমনি। ঠিক যে-কারণে ওরা মাসাইদের তাঁবু গ্রামের পাশে ফেলতে দিল না। তাছাড়া "আগুন-ছোঁড়া লাঠি"-র ক্ষমতা সম্বন্ধে ওরা ওয়াকিবহাল। দেখলেন-না তাই, ওটার ওপর ওটুম্বার কেমন লোভ!' এরপর আর কেউ কোনো কথা না বলে চলতে লাগল।

সুদীপ্তরা যখন পুবের পাহাড়ে মাসাইদের ছাউনিতে ফিরে এল তখনও সূর্য ডুবতে ঘণ্টাখানেক বাকি। বেশ দ্রুত ফিরছে তারা। সুদীপ্তদের কিছুক্ষণ আগে সেখানে আকালাও তার দলবল নিয়ে ফিরেছে। সঙ্গে বেশ কিছু শিকার, দুটো হাটারি চিতাও আছে তার মধ্যে। ম্যাকুইনা আকালাদের ডেকে সুদীপ্তদের একটু দূরে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক কী সব আলোচনা করে নিলেন। তারপর হেরম্যানকে বললেন, 'আপনার গাইড টোগো আকালা এবার ওটুম্বার কাছে পাঠানো যাক! সঙ্গে আরও দু-জন লোকও যাক। আমাদের তাঁবু দুটোও তো খুলে আনতে হবে।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে হেরম্যান তাকালেন টোগোর দিকে। টোগো এবার হঠাৎ বলে উঠল, 'না, আমি নীচে যাব না।' টোগোর অনিচ্ছা প্রকাশের কারণ বুঝতে না পেরে হেরম্যান আর সুদীপ্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে।

ম্যাকুইনা টোগোর কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কী যেন চিন্তা করার পর হেরম্যানকে বললেন, 'আপনার গাইড যদি না যেতে চায় তাহলে আমার কিছু বলার

নেই। আকালা তাহলে একলাই যাবে। ও ভাঙা-ভাঙা বান্টু ভাষাতেও বলতে পারে।' কথাগুলো বলার পর একটু থেমে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'আমার মনে হয় ওর সঙ্গে আপনার যে পয়সার চুক্তি হয়েছে তাতে আর ওর মনঃপূত হচ্ছে না। অথবা ও সত্যিই ভয় পাচ্ছে ওই আধা-জন্তু, আধা-মানুষগুলোর কাছে যেতে! ও তো আর মাসাই নয়। আসলে এদের মতো গাইডরা আপনাকে মাসাইমারার ওয়াচটাওয়ার থেকে নীচে জেব্রার পাল দেখাতে পারে, কিন্তু এসব অভিযানের পক্ষে এরা অনুপযোগী। একটু খোঁজখবর করলেই মাসাই গাইড পেয়ে যেতেন আপনি।'

হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকুইনার কথার প্রতিবাদ করে বললেন, 'না, সম্ভবত আপনি ঠিক বলছেন না। আপনার মাসাই রক্ষীদের তুলনায় ও কম সাহসী নয়। আর জঙ্গল সম্পর্কে ওর অভিজ্ঞতা প্রচুর। আমরা আপনাদের মতো দলে ভারী নয়, টোগোই কিন্তু আমাদের নিরাপদে গ্রেট রিফটে এনেছে। ওর যেতে না চাওয়ার পিছনে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে।' এই বলে টোগোর দিকে তাকালেন হেরম্যান।

ম্যাকুইনা আবার বিদ্রুপের স্বরে বললেন, 'নিয়ে এসেছে তো ঠিকই, কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যায় কি না দেখুন। মাঝপথে ছেড়ে না পালায়।'

টোগো এবার ম্যাকুইনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদিও আপনি আমার মালিক নন, আপনাকে জবাবদিহি করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, তবুও বলি আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা যে মিথ্যে তা সময় এলেই বুঝতে পারবেন। বরং নিজের লোকেদের কথা ভাবুন! ওরা না আপনাকে ছেড়ে পালায়! আমার মালিকের সাথে আপনার যখন কথা হয়েছে, আমি নীচে যাচ্ছি, তবে আমার কথাটা খেয়াল রাখবেন।'

টোগোর কথা বলার ধরন দেখে হঠাৎ দপ্ করে যেন জ্বলে উঠল ম্যাকুইনার চোখ, কিন্তু পরমুহূর্তে তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে দুর্বোধ্য হেসে বললেন, 'বাঃ, এই তো সাহসীর মতো কথা! দাঁড়াও, তোমাদের সাথে যাবার জন্য অন্য দু-জন সঙ্গীর ব্যবস্থা করি।' এই বলে তিনি পা বাড়ালেন, কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আকালার মাসাই দঙ্গলের দিকে।

টোগো সেই সুযোগে চাপা স্বরে হেরম্যানকে বললেন, 'আফ্রিকাভারের মতিগতি আমার ভালো ঠেকছে না। আমি নীচে যাচ্ছি, কিন্তু আপনারা সাবধানে থাকবেন। ওর কয়েকজন লোকও বেপাত্তা দেখছি।'

টোগোর কথা শুনে হেরম্যান তাকে কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ম্যাকুইনা আবার মুখ ফেরালেন তাদের দিকে। মিনিটখানেকের মধ্যেই টোগো, আকালা আর তার দু-জন সঙ্গীর সঙ্গে রওনা হল পাহাড়ের নীচে ওটুম্বার সন্ধানে।

তারা চলে যাবার পর ম্যাকুইনা গিয়ে ঢুকলেন কাছের একটা তাঁবুতে। হেরম্যান আর সুদীপ্ত বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁদের তাঁবু নীচ থেকে ফেরার সময় টোগোরা সঙ্গে আনবে।

ম্যাকুইনা তাঁবুতে ঢোকার পর হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'টোগো মনে হয় কিছু আঁচ করেছে তাই সাবধানে থাকতে বলল। আমারও যেন মনে হচ্ছে কিছু ঘটবে!'

সুদীপ্ত বলল, 'আমরা সংখ্যায় অল্প। কাজেই সকলের একসাথে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যদি বিপদটা পিগমিদের দিক থেকে আসে তবে সেটা ম্যাকুইনার ওপরও আসবে। সেক্ষেত্রে নয় একসাথে লড়া যাবে। কিন্তু ম্যাকুইনা যদি বিপদের কারণ হন তবে?'

হেরম্যান বললেন, 'আমিও সেই আশঙ্কাই করছি। তবে ঘাবড়ালে চলবে না। আমাদের যে-কোনো ঘটনার জন্য তৈরি থাকতে হবে।' কথাগুলো বলার পর হেরম্যান আস্কারি আর তুতসি কুলিদের কাছে ডেকে নিলেন। সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে তাদের নিয়ে ঢালের ধারে বসলেন টোগোদের ফেরার প্রতীক্ষায়।

মিনিট চল্লিশ পর টোগোরা ফিরে এল। সঙ্গে ওটুম্বা আর তার চারজন দেহরক্ষী। টোগোরা সুদীপ্তদের তাঁবু দুটো আর ম্যাকুইনার তাঁবুও তুলে এনেছে।

তারা আসবার পর ম্যাকুইনা তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

হেরম্যান টোগোকে বললেন, 'ওরা কী আমাদের পশ্চিমের পাহাড়ে যাবার ব্যাপারটা জেনে গেছে?'

টোগো বলল, 'না, খবরটা সম্ভবত নীচের গ্রামে এখনও এসে পৌছয়নি। ওরা কিছু বলেনি এ ব্যাপারে। তবে ওপরে আসতে কিছুটা ইতস্তত করছিল। ওদের এখানে ডাকার পিছনে আমার কোনো দুরভিসন্ধি নেই, এ ব্যাপারে আমাকে শপথ করতে হয়েছে ওদের কাছে।'

ম্যাকুইনা সুদীপ্তদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে টোগোর কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, 'তাই নাকি!' তারপর তাকালেন ওটুম্বা আর তার সঙ্গীদের দিকে।
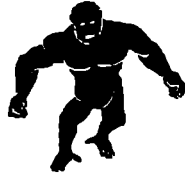
ওটুম্বাও ভালো করে সকলকে একবার দেখে নিয়ে টোগোকে বলল, 'কই, আমাদের শিকার আর আগুন-ছোঁড়া লাঠি কই? একটু পরেই অন্ধকার নামবে, আমাদের গ্রামে ফিরতে হবে।'

টোগোর মুখ থেকে তার কথা শুনে ম্যাকুইনা বললেন, 'ওকে বলো সেগুলো আমরা দিচ্ছি, তার সঙ্গে আরও দামি জিনিস ওকে দেব। তবে ওর সঙ্গে কিছু কথা আছে, একটু বসতে হবে।'

টোগো ম্যাকুইনার কথা ওটুম্বাকে বলতেই ওটুম্বা একটু সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'সাদা চামড়া আমার সঙ্গে কী আলোচনা করবে? তাহলে তাড়াতাড়ি কথা বলতে বলো।'

খাদের ঢাল থেকে একটু দূরে সরে এসে এরপর গোল হয়ে বসল সবাই। সুদীপ্তদের পিছনে হুটু আস্কারিরা দাঁড়িয়ে রইল আর ম্যাকুইনার পিছন ঘিরে দাঁড়াল আকালা সমেত

মাসাইরা। যারা মাটিতে বসে আছে তাদের ঘিরে একটা বৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করল হুটু আস্কারি আর মাসাইরা। আস্কারিদের পিছনে তুতসি কুলির দল।

টোগোর মাধ্যমে কথা শুরু হল।

ম্যাকুইনা ওটুম্বাকে বললেন, 'আমরা কাল তোমাদের এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তবে তোমার কাছ থেকে তার আগে একটা খবর জানতে চাই। যে খবর বললে তোমাকে অনেক দামি জিনিস দেব।'

'কী খবর?' সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল ওটুম্বা।

'আচ্ছা, তোমাদের এ তল্লাটে কী কী প্রাণী আছে বলো তো?' প্রশ্ন করলেন ম্যাকুইনা।

'সে তো তোমাদের বলেইছি। আবার জানতে চাইছ কেন? 'ভ্রূ কুঁচকে বলল ওটুম্বা।

ম্যাকুইনা বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তা বলেছ বটে, কিন্তু তাছাড়া অন্য কোনো প্রাণী? এই ধরো, গরিলার মতো অন্য কোনো দু-পেয়ে প্রাণী?'

ওটুম্বা এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল ম্যাকুইনার মুখের দিকে।

ম্যাকুইনা মৃদু হাসলেন। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট চামড়ার থলি বার করে সেটা খুলে হাতে ঢালতেই তাঁর হাতের তালুতে একরাশ সাদা ছোট ছোট পাথরকুচি শেষ বিকেলের আলোয় ঝলমল করে উঠল। হীরের কুচি। ওরকম একটা পাথর বসানো আছে তাঁর নিজের দাঁতেও। আঁজলা ভরা হীরের কুচি ম্যাকুইনা এক মুহূর্তের জন্য মেলে ধরলেন ওটুম্বার সামনে। সেগুলো দেখে ওটুম্বার চোখ দুটোও চকচক করে উঠল।

এরপর ম্যাকুইনা আবার হীরেগুলো থলির ভিতর রেখে সেটা ওটুম্বার মুখের সামনে নাচিয়ে বললেন, 'এটা আমি তোমাকে দেব, যদি তুমি আমাকে প্রশ্নের উত্তর দাও। দোপেয়ে দানব বানর, সবুজ রং?'

ওটুম্বা, ম্যাকুইনার সরাসরি প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্য চমকে উঠল। তারপর বেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'না, ওরকম কোনো প্রাণী এ তল্লাটে নেই।'

ম্যাকুইনা তার কথা শুনে তাকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পাহাড়ের নীচের গ্রাম থেকে হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করল ওটুম্বা আর তার সঙ্গীরা। মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল তারা। ওটুম্বা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা এখনই ফিরে যাব, আর কথা বলব না।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো এখনও দিলে না?'

ওটুম্বা টোগোকে একটু রুষ্টভাবে বলল, 'সাদা চামড়ার আর কোনো কথার জবাব আমি দেব না। কালই যেন ওরা এ তল্লাট ছেড়ে চলে যায়। আমি এখন যাচ্ছি।'

ওটুম্বার কথা শুনে ম্যাকুইনা এবার একটা বাঁকা হাসি হেসে টোগোকে বলল, 'বামনটাকে বলো, আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে ও নীচে যেতে পারবে না। ও নীল বানরের সন্ধান জানে। সে কোথায় আছে তা না বললে ওকে আমি ছাড়ব না।'

টোগো এবার উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকুইনার উদ্দেশে বলল, 'এ-কাজ কিন্তু ঠিক হবে না। ও যখন বলবে না বলছে তখন ওকে যেতে দিন। ওরা নিরাপদে নীচের গ্রামে ফিরবে,

এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি ওদের এখানে এনেছি। জঙ্গলের একটা নিয়ম আছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ফল খারাপ হবে।'

ম্যাকুইনা উঠে দাঁড়ালেন। হেরম্যান আর সুদীপ্তও উঠে দাঁড়াল।

টোগোর কথায় ম্যাকুইনা কর্কশস্বরে বললেন, 'তোমাকে যা বলতে বলেছি বলো। বললাম তো, আমার কথার জবাব না দিলে ওকে আমি ছাড়ব না।'

হেরম্যান ব্যাপারটা সামাল দেবার জন্য ম্যাকুইনার উদ্দেশে বললেন, 'টোগো ব্যাপারটা ঠিকই বলেছে। আপনার মতো আমিও ওই প্রাণীটার সন্ধানে এতটা দূরে ছুটে এসেছি। তবুও বলছি, ওটুম্বাকে যেতে দেওয়াই ভালো। ভুলে যাবেন না—আমরা কিন্তু ওদের রাজত্বেই আছি।'

হেরম্যানের কথা শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠে ম্যাকুইনা বললেন, 'আছি তো কী হয়েছে! ওদের তাই বলে ভয় পেতে হবে নাকি? আপনি চুপ করে থাকুন।'

ঢাকের শব্দ একটানা বেজেই চলেছে। টোগো-ম্যাকুইনা আর হেরম্যানের কথাবার্তা ওটুম্বারা কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু ঢাকের শব্দে ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠছে ওরা।

ম্যাকুইনার কথা শুনে হেরম্যানও উত্তেজিত হয়ে তাঁর উদ্দেশে বললেন, 'আপনি কী আমাকে ধমকাচ্ছেন নাকি? আমি আপনার মাসাই গার্ড নই। আমারও এ ব্যাপারে কথা বলার অধিকার আছে। বিশেষত, টোগোর প্রতিশ্রুতিতে যখন ওদের এখানে আনা হয়েছে তখন কথা বলবই। আমি আবারও বলছি ওদের যেতে দিন।' কথাটা জোরের সঙ্গে বললেন হেরম্যান।

হেরম্যানের কথার জবাবে ম্যাকুইনা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটল। ওটুম্বা ও তার সঙ্গীরা সম্ভবত কোনো একটা বিপদ যে ঘটতে চলেছে তা আঁচ করে ছিল। মুহূর্তের জন্য ওটুম্বা ও তার সঙ্গীদের মধ্যে কী একটা কথা হল, আর তার পরমুহূর্তেই মাসাইদের ব্যূহ ভেদ করে তাদের লম্বা পায়ের ফাঁক গলে ওটুম্বা তাদের সঙ্গীদের নিয়ে তিরের মতো ছুটল পাহাড়ের ঢালের দিকে। মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হয়ে গিয়েছিল সবাই। আর তার পরেই ম্যাকুইনা তাঁর কোমর থেকে রিভলভার টেনে বার করে চিৎকার করে উঠলেন, 'ধরো ধরো! শয়তান বামন সর্দার যেন পালাতে না পারে। ওকে কিন্তু জ্যান্ত ধরতে হবে!'

সুদীপ্তরা দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাকুইনা আর তাঁর সঙ্গীরা ছুটল ওটুম্বাদের পিছনে। খাদের ধার ঘেঁষে নীচে নামার পথের দিকে ছুটছে ওটুম্বারা। প্রথমে দুজন পিগমি তারপর ওটুম্বা, তার পিছনে আরও দুজন পিগমি। তাদের কিছুটা তফাতে একটা লম্বা দড়ি হাতে আকালা ও অন্য মাসাইদের নিয়ে ম্যাকুইনা। ক্রমশই দূরত্ব কমে আসছে দু-দলের মধ্যে। ওটুম্বারা তখন প্রায় নীচে নামার পথের মুখে পৌঁছে গেছে, আকালার সাথে তাদের মাত্র হাত কুড়ির ব্যবধান, সে প্রায় তাদের ধরে ফেলেছে। ঠিক এমন সময় তাদের সর্দারকে বাঁচাবার জন্য একটা চেষ্টা করতে গেল ওটুম্বার পিছু নেওয়া পিগমি দুজন। আকালাদের থামাবার জন্য তারা থেমে গিয়ে তির-ধনুক খুলে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু তির চালাতে পারল না

তারা। ম্যাকুইনার রিভলভার গর্জে উঠল। ধনুক হাতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তারা। আর তার পর মুহূর্তেই আকালা তার হাতের দড়ির ফাঁসটা মাথার ওপর একবার ঘুরিয়ে ছুড়ে দিল ওটুম্বাকে লক্ষ করে। যেমন করে ফাঁস দিয়ে জীবজন্তু ধরা হয়, ঠিক তেমনই দড়ির ফাঁসে ওটুম্বাকে ধরে ফেলল আকালা। মাসাইরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটুম্বার ওপর। ওটুম্বার অন্য দুজন সঙ্গী তখন ঢাল বেয়ে নীচের দিকে হরিণের মতো ছুটতে শুরু করেছে। এই পুরো ব্যাপারটা ঘটতে খুব বেশি হলে আধ মিনিট সময় লাগল। হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে হেরম্যান, সুদীপ্ত, টোগোরাও এবার ছুটল জায়গাটার দিকে।

দড়ির ফাঁসে আটক ক্রুদ্ধ সিংহের মতো ছটফট আর চিৎকার করছে ওটুম্বা। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে তার। আকালার দড়ির ফাঁস এঁটে বসেছে তার গলায়। ইতিমধ্যে আরও একটা দড়ি বেঁধে ফেলা হয়েছে তার কোমরে। দড়ির দু-প্রান্ত ধরে আছে দুজন মাসাই। তাদের ঘিরে ম্যাকুইনা ও অন্য মাসাইরা। কয়েক হাত দূরে মাটিতে চিত হয়ে পড়ে আছে ওটুম্বার দেহরক্ষী দুজন। রক্ত আর ধুলোতে মাখামাখি তাদের দেহ। সুদীপ্তরা যখন জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল তখনও পিগমি দুজনের মধ্যে একজনের দেহে প্রাণ আছে। থর থর করে কাঁপছে তার রক্তমাখা দেহ। তার ডান হাতে তখনও ধরা আছে ক্ষুদ্রাকৃতি তির। সেটা ছোড়ার সময় পায়নি সে। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সকলের দিকে। বীভৎস দৃশ্য! সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে হেরম্যান তিরস্কারে ভঙ্গিতে ম্যাকুইনাকে বললেন, 'আপনি দুটো মানুষকে খুন করলেন?'

ম্যাকুইনা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'এরা আবার মানুষ নাকি? এরা জন্তু। মানুষের চেয়ে বাঁদরের সঙ্গেই এদের মিল বেশি।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে হেরম্যান উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বললেন, 'তাহলে কি আপনিও মানুষ? শুধু শুধু আপনি এদের খুন করলেন! আমি এসব সহ্য করব না। নীল বানর মানুষের প্রাণের চেয়ে দামী নয়। ওটুম্বাকে এখনই ছেড়ে দিন।'

ম্যাকুইনাও এবার চিৎকার করে বললেন, 'না, শয়তান বামনটাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। ওরাই নীল বানরকে লুকিয়ে রেখেছে। আমার হাতে তাকে তুলে দিতে হবে ওকে। নইলে ওর দশা ওর সঙ্গীদের মতো হবে। তাছাড়া ওর সঙ্গে আর একটা হিসাব বাকি আছে। ওরাই হত্যা করেছে আমার বাবাকে।'

হেরম্যান, ম্যাকুইনার কথার প্রত্যুত্তরে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আরও একটা কাণ্ড হল! মাটিতে পড়ে থাকা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর পিগমিটা দেহের সব শক্তি দিয়ে জীবনে শেষবারের মতো একবারের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে হাতের ক্ষুদ্রাকৃতি তিরটা বাগিয়ে ধরে টলমল পায়ে ছুটে এল দঙ্গলের মধ্যে তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা আকালাকে লক্ষ্য করে। আকালা সেটা খেয়াল করল ঠিকই কিন্তু তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মাসাই আকালার বিরাট দেহের আড়ালে ছুটে আসা পিগমিটাকে দেখতে পায়নি। আকালা সরে গেল, তবে মৃত্যুপথযাত্রী পিগমিটা তার হাতের ক্ষুদ্রাকৃতি তিরটা বসিয়ে দিল সেই মাসাইয়ের উন্মুক্ত উরুতে। পিগমিটার দেহে মনে

হয় ওইটুকুই জীবনীশক্তি অবশিষ্ট ছিল। আঘাত করেই সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একজন মাসাই তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে দিল পিগমিটার নিথর দেহ লক্ষ্য করে, যদিও তার আর প্রয়োজন ছিল না।

মাসাইয়ের পায়ের বাহ্যিক আঘাত সামান্যই। উরুর চামড়ায় সামান্য কয়েকটা রক্তবিন্দু ফুটে উঠেছে মাত্র। মৃতপ্রায় পিগমিটার দেহে তেমন জোর ছিল না। কিন্তু ওই ক্ষুদ্রাকৃতি অস্ত্রের সামান্য একটা আঁচড়ের পরিণতি কী ভয়ংকর তা কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রত্যক্ষ করল সবাই। নিশ্চল পিগমিটার দিকে সুদীপ্তরা তাকিয়ে ছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় ওটুম্বার চিৎকারও কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল। দড়ি বাঁধা অবস্থাতেই এবার সকলকে চমকে দিয়ে ওটুম্বা হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল। সকলে ওটুম্বার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সে তিরে খোঁচা-খাওয়া মাসাইটাকে লক্ষ্য করে হাসছে। আর পরমুহূর্তে মাসাইটার দিকে চোখ পড়তেই সকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। কাঁপতে শুরু করেছে মাসাইটা। তার মুখ বেঁকে যাচ্ছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। তীব্র বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে সে। তিরের খোঁচায় মৃত্যু প্রবেশ করেছে লোকটার দেহে। অতি দ্রুত বিষ ছড়িয়ে পড়ছে লোকটার শিরা-উপশিরায়। এরপর আধ মিনিটও দাঁড়াতে পারল না সে। কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎই কাটা কলাগাছের মতো দড়াম করে পড়ে গেল সে মৃত পিগমিটার দেহের ওপর। মাসাইটার মুখের কষ বেয়ে নেমে এল রক্তধারা। খুব জোরে একবার কেঁপে উঠে চিরদিনের মতো নিথর হয়ে গেল তার দেহ। কী ভয়ংকর মৃত্যু! শিউরে উঠল সকলে।

ওটুম্বা ম্যাকুইনার উদ্দেশে দুর্বোধ্য ভাষায় কয়েকটা শব্দ বলল। ম্যাকুইনা কথার মানে বুঝতে পারলেন না। কিন্তু টোগো সুদীপ্তর কানে চাপা স্বরে বলল, 'ও বলছে, সাদা চামড়া, তুমিও মরবে।'

ম্যাকুইনা কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলেন মৃত মাসাইটার দেহের দিকে। তারপর নীচু হয়ে তার দেহ থেকে রাইফেলটা খুলে নিয়ে হেরম্যানের উদ্দেশে বললেন, 'ঘটনাটা দেখার পরও কী বলবেন জন্তু দুটোকে মেরে আমি ঠিক করিনি?'

হেরম্যান বিস্ময়ভাব কাটিয়ে দৃঢ়ভাবে ম্যাকুইনাকে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এখনও বলছি আপনি ঠিক করেননি। আপনি ওটুম্বাকে আটকাবার চেষ্টা না করলে এসব ঘটনা ঘটতই না। এই মাসাইটাকেও এভাবে মরতে হত না। এ রকম ঘটনা আরও ঘটার আগে আপনি ওটুম্বাকে ছেড়ে দিন।'

হেরম্যানের কথা শুনে ম্যাকুইনা ক্রোধে চিৎকার করে উঠে বললেন, 'আপনি থামুন এবার। আমার কাজে বাধা দিতে আসবেন না। আমি শুধু দুটো বাঁদর মেরেছি। প্রয়োজন হলে এবার মানুষও মারব।'

ম্যাকুইনার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হল না হেরম্যান বা সুদীপ্তর। হেরম্যান প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে কোমর থেকে রিভলভার বার করে ম্যাকুইনাকে চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনি আমাদেরও মারার ভয় দেখাচ্ছেন? এত বড় সাহস! তাহলে এখনই ফয়সালা হয়ে যাক।'

মুহূর্তের মধ্যে হাত দশেকের তফাতে দুটো দলে যেন আপনা থেকেই বিভক্ত হয়ে গেল সকলে। এক পাশে রিভলভার হাতে ম্যাকুইনা আর রাইফেলধারী জনা কুড়ি মাসাই; অন্যদিকে হেরম্যান, সুদীপ্ত, টোগো, চারজন হুটু আস্কারি ও চারজন তুতসি কুলিসহ মোটা এগারো জন লোক। তবে শেষ চারজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। বর্শা উঁচিয়ে তারাও দাঁড়াল সুদীপ্তদের পিছনের সারিতে।

মাঝখানে মাটিতে পড়ে থাকা পিগমি আর মাসাইটার মৃতদেহ আর তার দুপাশে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সার বেঁধে দাঁড়ানো যুযুধান দু-পক্ষ। উভয়েরই রাইফেল-রিভলভারের নল তাগ করা অপর পক্ষের দিকে। হেরম্যান ও ম্যাকুইনা দুজনেই নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন রিভলভার হাতে। ম্যাকুইনার মুখে হিংস্রতার স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠেছে, হেরম্যানের ভাবলেশহীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুখ। এই মুহূর্তে যে-কোনো ঘটনার জন্য প্রস্তুত তিনি। ম্যাকুইনারা সংখ্যায় ও শক্তিতে সুদীপ্তদের দ্বিগুণ। সংঘর্ষ হলে ম্যাকুইনাদের ক্ষতি হবে ঠিকই কিন্তু সুদীপ্তদের ক্ষতির পরিমাণ বেশি হওয়া স্বাভাবিক। সুদীপ্ত ভয় পায়নি, সে-ও রিভলভার তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কী হতে পারে তা অনুমান করতে অসুবিধা হল না তার। যেভাবে হেরম্যান ও ম্যাকুইনা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন তাতে যে-কোনো মুহূর্তে কোনো পক্ষ গুলি চালানো শুরু করলে কোনো পক্ষ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এ লড়াই থামবে না। সুদীপ্ত বুঝতে পারল এ লড়াই থামাতে হবে। পরে কৌশলে চেষ্টা করতে হবে ম্যাকুইনাকে প্রতিহত করার। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধভাবে কেটে গেল। নীচ থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে। দম বন্ধ করে দু-দল তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। সুদীপ্ত হঠাৎ রিভলভার নামিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দু-পক্ষে মাঝখানে। তারপর হেরম্যান আর ম্যাকুইনা উভয়ের উদ্দেশে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে কাজটা আমরা ঠিক করছি না। আমরা কেউই দুর্বল নই, লড়াইটা এখনই হতে পারে। কিন্তু তাতে কোনো পক্ষেরই লাভ হবে না। বরং ক্ষতিই হবে। আমরা লড়াই করতে এখানে আসিনি, এসেছি সবুজ বানরের খোঁজে। আমার মনে হয় এ লড়াইয়ে যে-ই জিতুক না কেন, লড়াইয়ের ফলে তার আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। বরং মাথা ঠান্ডা করে বিবাদের নিষ্পত্তি করাই শ্রেয়। আমার প্রস্তাবটা মিস্টার হেরম্যান ও মিস্টার ম্যাকুইনা উভয়কেই ভেবে দেখতে বলছি।'

আবার কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। সুদীপ্তর কথার যে যুক্তি আছে তা সম্ভবত বুঝতে পারলেন ম্যাকুইনা। তাঁর রিভলভারের মুখটা আস্তে আস্তে নীচের দিকে নেমে এল। হেরম্যানও তাঁর অস্ত্র নীচে নামালেন।

ম্যাকুইনা সুদীপ্তর উদ্দেশ্যে বললেন, 'ঠিক আছে আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি। রাতে বসে আলোচনা করা যাবে।'

সুদীপ্ত বললে, 'আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার ম্যাকুইনা। এ পথটাই ঠিক।'

'আমি আপনার প্রস্তাব মানলাম ঠিকই, কিন্তু কেউ কোনো চালাকির চেষ্টা করলে

তার পরিণতি পিগমি দুজনের মতো হবে।' এ কথা বলে হেরম্যানের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন ম্যাকুইনা।

হেরম্যান ম্যাকুইনার কথার প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার ঝঞ্ঝাট এড়াতে সুদীপ্ত হেরম্যানকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে ভিড়ের বাইরে বার করে আনল।

জমায়েতটা ভেঙে গেল। ম্যাকুইনা দলবলসমেত দড়ি বাঁধা ওটুম্বাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল, কিছু দূরে তাঁবুগুলোর দিকে। সুদীপ্ত, হেরম্যান আর টোগো গিয়ে বসল একটু দূরে একটা ফাঁকা জমিতে। তুতসি কুলিরা হুট আস্কারিদের তত্ত্বাবধানে লেগে গেল সুদীপ্তদের তাঁবু ফেলার কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুব দিল পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে। সুদীপ্তদের চারপাশে পাহাড়ের মাথায় নেমে এল এক শান্ত সমাহিত ভাব। শুধু মাটিতে পড়ে থাকা পিগমি দুজন আর মাসাইরক্ষীর মৃতদেহ পাহাড়ের মাথায় ভয়ংকর ঘটনার চিহ্ন হয়ে রইল। সুদীপ্তরা দূর থেকে দেখতে পেল ওটুম্বাকে নিয়ে গিয়ে তাঁবুগুলোর পিছনে একটা গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধা হচ্ছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। ম্যাকুইনাদের তাঁবুগুলোর সামনে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকে বাতাস বইতে লাগল। এ বাতাসের ব্যাপারটা এ পাহাড়ের মাথায় প্রথম দিন সুদীপ্তরা যখন তাঁবু ফেলেছিল তখনও দেখেছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বাতাস বাড়ে। সারা দিন ধরে আফ্রিকার প্রখর রোদে জ্বলেপুড়ে যাওয়া পৃথিবীর বুকে শান্তি এনে দেয়।

সুদীপ্তদের তাঁবু খাটানো হয়ে গেলেও খোলা আকাশের নীচেই তারা বসে রইল চুপ করে। হেরম্যানের মাথা ঠান্ডা হবার পর তিনি সুদীপ্তকে বললেন, 'কাজটা তুমি ঠিকই করেছ। অতটা উত্তেজিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আসলে অনর্থক ম্যাকুইনার জন্য মানুষ মরতে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

সুদীপ্ত বলল, 'যা হয়ে গেছে তা আর ভেবে লাভ নেই। এখন আমাদের কী করা উচিত তা আলোচনার প্রয়োজন।'

টোগো বলল, 'আমাদের বিপদ কিন্তু দুদিকেই। একদিকে ওই আফ্রিকান্ডার আর অন্য দিকে পিগমিরা। যে পিগমি দুজন পালাল তারা নিশ্চয়ই গ্রামে গিয়ে খবর পৌঁছে দেবে। ওরা কাউকে ছাড়বে না। আমি ওটুম্বাকে ডেকে এনেছি, তাই আমার প্রতি পিগমিদের আক্রোশ বেশি হবে।'

সুদীপ্ত শুনে বলল, 'আমার ধারণা ওটুম্বা দানব-বানরের সন্ধান দিলেও ম্যাকুইনা তাকে ছাড়বে না। ম্যাকুইনা সম্ভবত তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবেন।'

টোগো মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ, আমারও ধারণা আফ্রিকান্ডার খুন করবে ওটুম্বাকে, তবে কাজটা সে চট করে করবে না। ওটুম্বার কাছ থেকে আগে সবুজ বানরের সন্ধান জানার চেষ্টা করবে। তবে সে কাজে আমার সাহায্য লাগবে আফ্রিকান্ডারের। ওই সুযোগটাই আমি কাজে লাগাবার চেষ্টা করব। ওটুম্বাকে জানিয়ে দেব আমরা ওর শত্রু নই, আমরা

ওকে ছাড়াবার চেষ্টা করছি। ওটুম্বা আমার কথায় ভরসা করে এখানে এসেছিল, ওর জন্য প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নেব।'

সুদীপ্ত তার কথার জবাবে বলল, 'তোমার মতলবটা মন্দ নয়। তবে ম্যাকুইনার সংস্পর্শ ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব চলে যাওয়া প্রয়োজন।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, এতক্ষণ ধরে আমিও এ-কথাই ভাবছিলাম। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে করে সবুজ বানরের সন্ধানে এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার সঙ্গে তোমরা যারা এসেছ, আস্কারি বা কুলিরা যারা এসেছে তাদের পেটের খিদে মেটাতে সামান্য পয়সার আশায় সকলের জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারটাও আমার লক্ষ রাখার প্রয়োজন। আমি ভাবছি কালই আমাদের ফেরার পথ ধরব।' শেষ কথাটা বলার সময় হেরম্যানের গলায় স্পষ্ট বিষণ্ণতা ফুটে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুদীপ্ত বলল, 'কী আর করা যাবে! তবে ম্যাকুইনার সঙ্গে মাথা ঠান্ডা রেখে শেষ একবার কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন। আমরা যে কাল চলে যাচ্ছি, সেটা তাঁকে জানানো যেতে পারে। আশা করি তার এ ব্যাপারে আপত্তি থাকবে না। আমরা চলে গেলে তিনি নিজের মতো কাজ করতে পারবেন। চলুন, এবার তাঁর তাঁবুর দিকে যাওয়া যাক।' এই বলে সুদীপ্ত উঠে দাঁড়াল। সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে হেরম্যান আর টোগোও উঠে পড়ল। তিন জনে হাঁটতে শুরু করল ম্যাকুইনার তাঁবুর দিকে।
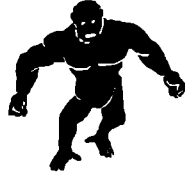
ম্যাকুইনার তাঁবুতে প্রবেশ করার আগে মুহূর্তের জন্য সুদীপ্তরা দাঁড়িয়ে পড়ল, ম্যাকুইনার তাঁবুর ঠিক পেছনে একটা ঝাঁকড়া গাছের সাথে বাঁধা আছে ওটুম্বা। জায়গাটা আধো-অন্ধকার। শুধু তাঁবুর সামনের অগ্নিকুণ্ডের মৃদু আভা গিয়ে পড়েছে সেখানে। স্পষ্ট বোঝা না গেলেও ওটুম্বা সম্ভবত তাকিয়ে দেখছে সুদীপ্তদের।

তার দিকে একবার তাকিয়ে সুদীপ্তরা প্রবেশ করল তাঁবুতে। ম্যাকুইনা তাঁবুর দরজার দিকে পিছন ফিরে কী যেন করছিলেন। পায়ের শব্দে চমকে উঠে পিছন ফিরলেন তিনি। সুদীপ্ত খেয়াল করল ম্যাকুইনার হাতটা তার কোমরের রিভলভারের কাছে চলে গেল। অর্থাৎ তিনি এখন বেশি সতর্ক হয়ে গেছেন। ম্যাকুইনার তাঁবুতে বেশ কয়েকটা কাঠের প্যাকিং বাক্স রয়েছে। ম্যাকুইনা ইশারায় সুদীপ্তদের তার ওপর বসতে বললেন। বসল সুদীপ্তরা। ম্যাকুইনা বসলেন তাদের মুখোমুখি আর একটা বাক্সর ওপর। সুদীপ্তদের একবার জরিপ করে নিয়ে ম্যাকুইনা গম্ভীরভাবে বললেন, 'বলুন, আপনারা কী আলোচনা করতে এসেছেন?'

সুদীপ্তই আলোচনা শুরু করল। বলল, 'আপনি ওটুম্বার ব্যাপারে নতুন কিছু ভাবলেন?'

ম্যাকুইনা জবাব দিলেন, 'না, নতুন কিছু ওর সম্বন্ধে আমার ভাবার নেই। আমার ভাবনা তো আগেই আপনাদের বলেছি। সবুজ বানরের সন্ধান যতক্ষণ না ও দিচ্ছে, ততক্ষণ ওর মুক্তি নেই।'

হেরম্যান এবার শান্তভাবে বললেন, 'ওর সঙ্গী দুজন তো গ্রামে ফিরে গেছে। ওরা ওদের সর্দারকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য যদি আক্রমণ করে তাহলে রাইফেল দিয়ে ওদের কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবেন? তাছাড়া মাসাইটার ওপর ওদের তিরের প্রভাব তো সকলে নিজের চোখেই দেখলাম। ওরা নিশ্চয়ই এত সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে না।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'ওরা আমার কিছু করতে পারবে না। শুধু রাইফেলের ওপর নির্ভর করে আমি বসে নেই। আপনারা যে প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে আছেন ওর ভেতরে কী আছে জানেন? মেশিনগান। পুবের পাহাড় আর এ পাহাড়ের মাথায় দুটো মেশিনগান বসিয়েছি আমি। বামনগুলো ও পাহাড়ে উঠে আসার আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমি তৈরি হয়েই এখানে এসেছি।'

সুদীপ্তরা এবার বুঝতে পারল, ম্যাকুইনার লোকসংখ্যা হঠাৎ কমে গেল কেন? সে লোকগুলো নিশ্চয়ই মেশিনগান নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে।

সুদীপ্ত ম্যাকুইনার কথা শুনে বলল, 'এ ব্যাপারটা নয় বুঝলাম, কিন্তু যদি ওটুম্বা কোনো কথা বলতে না চায় তখন?'

এবার একটা হিংস্র হাসি ফুটে উঠল ম্যাকুইনার মুখে। উঠে দাঁড়ালেন ম্যাকুইনা। তারপর বললেন, 'বলতে ওকে হবেই। আজ নয়তো কাল। সে পথ আমার জানা আছে। দরকার হলে আমি ওকে...'

'কী? খুন করবেন?' ম্যাকুইনার কথা শেষ হবার আগেই প্রশ্ন করলেন হেরম্যান।

নিঃশব্দে আবার হিংস্রভাবে হেসে তিনি বললেন, 'খুন করব না। কথা বার করার জন্য আমার অন্য রাস্তা জানা আছে। আপনারা জাঞ্জিবার নাইফ কাকে বলে জানেন?'

ঘাড় নাড়ল সুদীপ্তরা।

ম্যাকুইনা এবার তার পোশাকের পকেট থেকে অনেকটা সুপুরি-কাটা জাঁতির মতো ছোট্ট যন্ত্র বার করলেন। তার সামনে ছোট্ট একটা ছিদ্র আছে। ম্যাকুইনা মাটি থেকে একটা মোটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে সেই ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে কাঠিটা দু-টুকরো করে যন্ত্রটা সুদীপ্তর সামনে নাচিয়ে বললেন, 'এ হল এক প্রাচীন যন্ত্র। একসময় জাঞ্জিবারের হীরের খনিতে বুনো আফ্রিকান শ্রমিকদের বশ মানানোর জন্য শ্বেতকায় মালিকরা এ যন্ত্র ব্যবহার করত। এ যন্ত্র দিয়ে কী করা হত জানেন? কাঠিটা যেভাবে আমি কাটলাম, সেভাবে শ্রমিকদের হাত-পায়ের আঙুল কেটে নেওয়া হত। অসহ্য যন্ত্রণা! সিংহের মতো সাহসী আফ্রিকানরাও বশ মানত তাতে। আমি ওটুম্বার ওপর এ যন্ত্র ব্যবহার করব। একটা-দুটো আঙুল যাবার পর আশা করি ওটুম্বা মুখ খুলবে।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে শিউরে উঠল সবাই। নিঃশব্দে শয়তানের হাসি হাসতে লাগলেন

ম্যাকুইনা। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে আসা আগুনের লাল আভাতে ম্যাকুইনার মুখটা যেন শয়তানের প্রতিচ্ছবি। সুদীপ্তর ইচ্ছা হচ্ছিল এই মুহূর্তে রিভলভার দিয়ে লোকটার খুলি উড়িয়ে দিতে। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল নয়, নিজেকে সংযত রাখল সুদীপ্ত।

বেশ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইল সকলে। সুদীপ্তরা ভেবে পাচ্ছিল না ম্যাকুইনাকে তারা কী বলবে! সুদীপ্তদের কথার প্রত্যাশায় থাকার পর ম্যাকুইনা মুখ খুললেন, 'অবশ্য এ-সবের কিছুই প্রয়োজন হবে না যদি ওটুম্বা মুখ খোলে। এ ব্যাপারে টোগো যদি ওকে বুঝিয়ে বলে তাহলে কাজ হতে পারে। টোগো কি এখন ওর সঙ্গে কথা বলবে?' এই বলে তিনি তাকালেন টোগোর দিকে।

ওটুম্বার সাথে টোগোর কথা বলার সুযোগটা ছাড়া উচিত হবে না বুঝতে পেরে সুদীপ্ত তার পাশে বসা টোগোর হাতে আলতো করে চাপ দিল। টোগো ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকুইনাকে বলল, 'ঠিক আছে চলুন, আমি কথা বলতে রাজি।'

ম্যাকুইনা বলল, 'বাঃ, এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে। তবে ওর সঙ্গে কথা বলার সময় জাঞ্জিবার নাইফের ব্যাপারটা কিন্তু বোলো।'

ম্যাকুইনার তাঁবু থেকে বেরিয়ে তাঁবুর পিছন দিকে এগোল সুদীপ্তরা। সঙ্গে ম্যাকুইনা। কিছু দূরে একটা রোজউড গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা আঠে ওটুম্বা।

সুদীপ্তরা গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওটুম্বা তাদের দিকে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠে দড়ি ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ঠিক যেন সে একটা দড়ি বাঁধা সিংহ।

ম্যাকুইনা তাকে দেখে বললেন, 'কী তেজ দেখছেন বামনটার?'

তার কথা শুনে হেরম্যান বা সুদীপ্ত কোনো মন্তব্য করল না।

টোগো এবার কী যেন বলল ওটুম্বার উদ্দেশে। ওটুম্বা শুনে আরও চিৎকার করে উঠল।

টোগো আবারও কী একটা বলল। ওটুম্বা এবার চুপ করে তাকাল টোগোর দিকে। তার উদ্দেশে এরপর একটানা কথা বলতে শুরু করল টোগো। কিছুক্ষণ টোগোর কথা শোনার পর আস্তে আস্তে মুখ খুলল ওটুম্বা। শুরু হল টোগো আর ওটুম্বার কথোপকথন। দুর্বোধ্য সেই কথাবার্তা সুদীপ্তদের কারোরই বোধগম্য হল না।

তাদের কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ম্যাকুইনা এক-সময় অধৈর্য হয়ে টোগোকে বললেন, 'এবার আমাকে বলো ও কী বলছে।'

টোগো অবশ্য আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর থামল। ওটুম্বা যেন বেশ কিছুটা শান্ত হয়েছে বলে মনে হল সুদীপ্তর। ওটুম্বার সাথে কথা শেষ হলে টোগো ম্যাকুইনাকে বলল, 'আমাদের কথা ওকে বললাম। বললাম ও সবুজ মানুষের কথা বললেই ওকে আপনি ছেড়ে দেবেন। আপনার যন্ত্রের কথাটাও ওকে বলেছি, তাতে মনে হয় কিছুটা ভয় পেয়েছে। ও বলছে ওকে ভাববার জন্য একদিন সময় দিতে হবে।'

শুনে ম্যাকুইনা একটু খুশির স্বরে বললেন, 'ও ভয় পেয়েছে বলছ? ভালো, আমার

তাড়া নেই, তবে এক দিনের বেশি ভাবতে চাইলে প্রত্যেক দিনের জন্য একটা করে আঙুল গুনাগার দিতে হবে। এ-কথাটা বলে দাও ওকে।'

টোগো কী যেন বলল ওটুম্বাকে। শুনে সে ঘাড় নাড়ল। সুদীপ্তরা এবার পা বাড়াল সে জায়গা ছেড়ে ফেরার জন্য।

ম্যাকুইনা ঢুকে গেলেন নিজের তাঁবুতে। সুদীপ্তদের দুটো তাঁবু ম্যাকুইনাদের তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে খাদের কিনারায় পাতা হয়েছে। তাঁবুর সামনে বসে জটলা করছিল হুটু আস্কারি আর তুতসি কুলিরা। তাদের চোখমুখ দেখে সুদীপ্ত বুঝতে পারল সাম্প্রতিক ঘটনায় তাদের মধ্যেও চাপা উত্তেজনার ভাব। তাঁবুতে ঢোকার মুখে হেরম্যান তাদের উদ্দেশে বললেন, 'সবসময় সতর্ক থাকবে। যে-কোনো মুহূর্তেই কোনো ঘটনা ঘটতে পারে।'

তাঁবুতে ঢুকে বসার পর হেরম্যান টোগোকে বলল, 'ওটুম্বার সাথে তোমার কী কথা হল?'

টোগো বলল, 'আমি ওকে সংক্ষেপে সব কথা খুলে বলেছি। বলেছি আমরা ক'জন ম্যাকুইনার দলের লোক নই। ওর সঙ্গে আমাদের রাস্তায় দেখা হয়েছে। আপনি ও আপনার বন্ধু আফ্রিকার লোক নন। অনেক দূরদেশে থাকেন আপনারা। সবুজ বানরের খোঁজে আপনারা এখানে এলেও ওটুম্বার কোনো ক্ষতি করবেন না। এ-ও বলেছি আমরাও এখন প্রায় ম্যাকুইনার হাতে বন্দি। তার কথা শুনে আমাদের চলতে হচ্ছে। তাই ইচ্ছা থাকলেও আমরা কিছু করতে পারছি না। তবে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি ওকে মুক্ত করার। এ জন্য আমি কৌশলে ওটুম্বার নাম করে আফ্রিকান্ডারের কাছ থেকে এক দিনের সময় চেয়ে নিলাম।'

হেরম্যান টোগোর বুদ্ধির তারিফ করে বললেন, 'বাঃ। একটা দিন বাড়তি সময় পাওয়া গেল। আমাদের চলে যাবার কথাটা তাই ওকে বললাম না।'

'আচ্ছা, তোমার কথা শুনে ওটুম্বা কী বলল?'

টোগো জবাব দিল, 'আমার কথা সম্ভবত কিছুটা বিশ্বাস করেছে। কারণ ওর সামনেই আমরা দু-দল বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি ওকে আরও বলেছি আফ্রিকান্ডার ওকে বেঁধে রাখবে জানলে ওকে ডেকে আনতাম না। আফ্রিকান্ডাররা আমাদেরও ঠকিয়েছে, তাই যুদ্ধ হতে যাচ্ছিল। আমরা দলে কম বলে পিছিয়ে এসেছি। সুযোগের অপেক্ষায় আছি।'

এরপর থেকে টোগো বলল, 'তবে সবুজ বানর যে এ-তল্লাটে আছে, ওর কথা শুনে নিশ্চিত হয়েছি।'

'তাই নাকি!' বিস্মিত কণ্ঠে একসাথে বলে উঠল সুদীপ্ত আর হেরম্যান।

টোগো বলল, 'হ্যাঁ, ওটুম্বা বলল—সে যদি মুক্তি না পায় তাহলে দেবতা টাইবুরু আফ্রিকান্ডার সমেত সকলকে হত্যা করবে। আফ্রিকান্ডার যতই তার ওপর অত্যাচার করুক না কেন সে বা পিগমিরা প্রাণ থাকতে কিছুতেই তাদের সবুজ দেবতা টাইবুরুকে

তাদের হাতে তুলে দেবে না।'

বিস্মিত সুদীপ্ত বলল, 'তার মানে ওরা ওই দানববানরকেই দেবতা বলে পুজো করে।'

হেরম্যান বললেন, 'ওটুম্বা যা বলছে তাতে তো তাই মনে হচ্ছে। তাই তাঁকে আগলে রাখার এত প্রচেষ্টা ওটুম্বাদের।'

টোগো বলল, 'তবে পশ্চিম পাহাড়ে আমাদের যাবার ব্যাপারটা কিন্তু ও জেনে গেছে। ঢাকের বাদ্যির মাধ্যমে নীচ থেকে এ খবরই তাকে পৌঁছে দিয়েছিল পিগমিরা। যে কারণে ওটুম্বা গ্রামে ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত গ্রাম থেকে ওটুম্বাকে নিয়ে এখানে আসার পথেই পশ্চিমের পাহাড়ে আমাদের যাবার খবরটা গ্রামে এসে পৌঁছয়। সামান্য সময়ের পার্থক্যের জন্য ওটুম্বা ধরা পড়ে গেল।'

হেরম্যান বললেন, 'এখন আমাদের কর্মপন্থা নিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। কিন্তু তার আগে খাবার আর বিশ্রামের প্রয়োজন। কালকের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।'

সুদীপ্ত সম্মতি জানাল তার কথায়।

সারাদিন অনেক পরিশ্রম আর উত্তেজনা গেছে। রাত আটটা নাগাদ খাওয়া সেরে আস্কারিদের পাহারায় রেখে তাঁবুর ভিতর শুয়ে পড়ল সুদীপ্তরা। ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম এল তার চোখে।

মাঝরাতে চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তদের। বাইরে বেরিয়ে এসে তারা দেখতে পেল মাসাইরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটছে খাদের ধারে গ্রামে নামার পথের দিকে। সেখানে নীচের দিকে তাকিয়ে তারা কী যেন দেখছে। সেই দঙ্গলে ম্যাকুইনাও আছেন। সেদিকে যাবার আগে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কান খাড়া করে বলল, 'শুনতে পাচ্ছেন?'

মাসাইদের চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে এবার শব্দটা কানে এসে লাগল সুদীপ্তর। ঢাকের শব্দ! সে শব্দ নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছে।

হেরম্যান বললেন, 'সম্ভবত পিগমিরা তাদের রাজাকে মুক্ত করে নিতে আসছে। আমাদেরও বিপদের আশঙ্কা আছে। ওরা তো আমাদের আর ম্যাকুইনার তফাত করতে পারবে না। তারপর আবার টোগোই ওটুম্বাকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা বিপদের সম্ভাবনা দেখব ততক্ষণ আমরা লড়াই করব না।'

টোগো বলল, 'হ্যাঁ, আমিও আপনার সাথে একমত।'

হেরম্যান তুতসি কুলিদের তাঁবুর কাছেই থাকতে বলে তাদের নিরাপত্তার জন্য সেখানে একজন আস্কারি নিযুক্ত করলেন। তারপর বাকি তিনজন আস্কারিকে নিয়ে সুদীপ্তরা এগোল যেখানে ম্যাকুইনা দাঁড়িয়ে আছেন সেদিকে।

তাদের কাছে পৌঁছে পাহাড়ের নীচের দিকে তাকাতেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেক মশালের আলো সার বেঁধে ওপরের দিকে উঠে আসছে।

তারা সংখ্যায় অন্তত জনা পঞ্চাশেক হবে। ঢাক বাজছে। মশালের আলোতে চিকচিক করছে বর্শার ফলা, কাঁধে তির তূণীর। হাতে ধরা ঢাল। তার আড়ালে প্রায় অদৃশ্য পিগমিদের ক্ষুদ্র অবয়বগুলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওটুম্বাকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ উপরোধ জানাতে আসছে না। পুরোদস্তুর যুদ্ধের মেজাজে তারা পাহাড়ের উপরে উঠছে ওটুম্বাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকে যেন বুকের মধ্যে অনুভব করতে পারছে তাদের টিপ টিপ পদশব্দ। পিগমিরা যত ওপরে উঠে আসছে ততই যেন ম্যাকুইনার দুর্ধর্ষ মাসাইদের চোখেমুখে ফুটে উঠছে আতঙ্কের চিহ্ন। তিরের খোঁচায় তাদের সঙ্গীর মৃত্যুর টাটকা স্মৃতি কাঁপন ধরাচ্ছে বুকে। তারা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ম্যাকুইনার দিকে, কখন তিনি রাইফেল ছোড়ার নির্দেশ দেন তার অপেক্ষায়। ম্যাকুইনার মুখ কিন্তু ভাবলেশহীন। স্থির দৃষ্টিতে তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে আছেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যেতে লাগল। ক্রমশই উপরের দিকে উঠে আসছে মশালের সারি। সুদীপ্ত চাপা স্বরে হেরম্যানকে বলল, 'ম্যাকুইনা ওদের ওপরে ওঠার সুযোগ দিচ্ছেন কেন?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'সম্ভবত ও ওদের বুলেটের পাল্লার মধ্যে আনতে চাচ্ছে।'

হেরম্যানের অনুমান যে সত্যি তা কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমাণিত হল। মিনিট তিনেক পর অন্যান্যদের মতো সুদীপ্তরাও সঙ্গে সঙ্গে খাদের কিনারে ম্যাকুইনাদের একটু তফাতে বসে পড়ল। পিগমিরা তখন বেশ কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে। ম্যাকুইনা কিন্তু খাদের ধারে বসে থাকা সারবদ্ধ মাসাইদের রাইফেল চালাবার নির্দেশ দিল না। সকলে বসার পর তিনি হঠাৎ বসে পড়ে রিভলভার বার করে তিনবার শূন্যে গুলি ছুড়লেন। আর তার পরক্ষণেই সুদীপ্তদের পিছন দিকের পাহাড়ের একটা খাঁজ থেকে শুরু হল মেশিন-গানের র‍্যাট-র‍্যাট আওয়াজ। সুদীপ্তদের মাথার ওপর দিয়ে শোঁ-শোঁ বাতাস কেটে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি নামতে শুরু করল নীচের দিকে। পুবের পাহাড় থেকেও ভেসে আসতে লাগল একই আওয়াজ।

সুদীপ্তরা দেখতে পেল ওপরে উঠে আসা পিগমি দলটা যেন ভেঙে যেতে শুরু করেছে। কয়েকটা মশালের আলো গড়িয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বুলেট গিয়ে লাগছে তাদের গায়ে। ওপরে না-উঠে সম্ভবত তারা পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এরপরই তারা মশালের আলোগুলোকে সবাই এক সাথে নিভিয়ে ফেলল। পুরো দলটা হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। সেই অন্ধকার লক্ষ্য করেই ছুটতে লাগল মেশিনগানের গুলি। ম্যাকুইনা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'ওরা মশাল নিভিয়ে গ্রামে পালাচ্ছে। কিন্তু কাল সকালেই সারা গ্রাম শেষ করে দেব আমি।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে মাসাইদের মধ্যেও যেন একটা উল্লাসের ভাব ফুটে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই একজন মাসাই ঢাল বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। আর তারপরই একজন মাসাই হাঁউমাউ করে চিৎকার করে উঠল। সকলে তার দিকে তাকিয়ে দেখল তার হাতে ধরা আছে ক্ষুদ্রাকৃতি একটা তির। মাসাইটা তার বাহু থেকে সেই মুহূর্তে

টেনে বার করেছে সেটা। দু-একবার চিৎকার করে সে-ও নীচের দিকে গড়িয়ে গেল। তার হাতে ধরা তির দেখে সকলে তখনই বুঝে গেল ব্যাপারটা। পিগমিদের একটা দল তার কাছে উঠে এসেছে। অগ্রবর্তী সেই দল মশাল জ্বালায়নি, পিছনের দলটা মশাল জ্বালিয়ে ছিল তাদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য, যাতে প্রথম দলটা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বিনা বাধায় ওপরে উঠে আসতে পারে।

আরও একটা তির এসে বিঁধল। আতঙ্কে এবার চিৎকার করে উঠল অন্য মাসাইরা। তারপর আর ম্যাকুইনার নির্দেশের অপেক্ষা না করে অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করল। ম্যাকুইনাও রিভলভার চালাতে লাগলেন। নীচের অন্ধকারে আবার ঢাক বাজতে শুরু করল। মেশিনগানের আওয়াজ, রাইফেলের শব্দ, মাসাইদের আর্তনাদ, ঢাকের বাজনা, এসব মিলিয়ে নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হল। সুদীপ্তরা ম্যাকুইনাদের বেশ কিছুটা তফাতে রয়েছে। সামনে বেশ বড় একটা ঘাসের ঝোপ থাকায় সম্ভবত অন্ধকারে মিশে থাকা পিগমিদের চোখের আড়ালে রয়েছে সুদীপ্তরা। কারণ তাদের দিকে তির আসছে না। কিন্তু যে-কোনো সময় তারাও বিপদে পড়ে যেতে পারে।

হেরম্যান হঠাৎ চাপা স্বরে বললেন, 'এই সুযোগ! ম্যাকুইনা আর মাসাইরা পিগমিদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের এবার পালাতে হবে। পিগমি আর ম্যাকুইনা উভয়ের হাত থেকেই বাঁচতে হবে আমাদের।'

টোগো বলল, 'হ্যাঁ, এ সুযোগ আর আসবে না। তবে তাঁবু এখানে ফেলে যেতে হবে। যে ঢাল বেয়ে আমরা উঠে এসেছি সে পথেই পালাব আমরা। আফ্রিকাভার এই মুহূর্তে আমাদের পিছু ধাওয়া করতে পারবে না। তবে তার আগে ওটুম্বাকে মুক্ত করতে হবে।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর পিছনের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'পিছনে কেউ নেই ঠিকই, কিন্তু যে মেশিনগান চালাচ্ছে সে ওপর থেকে দেখে নিতে পারে আমাদের। একবার সে নলের মুখ আমাদের দিকে ঘোরালেই তো আমরা মুহূর্তের মধ্যে সাবাড় হয়ে যাব।'

টোগো একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তাহলে একটা কাজ করা যাক। মেশিনগানের গুলি থেকে মাথা বাঁচিয়ে আমরা আগে তাঁবুর কাছে যাই। তারপর আপনি সেখানে পৌঁছে আস্কারি আর কুলিদের নিয়ে এগোবেন উলটো দিকের ঢাল বেয়ে নীচে নামার জন্য। আমি দাঁড়িয়ে পাহারা দেব। যে মেশিনগান চালাচ্ছে বা অন্য কেউ আপনাদের দিকে গুলি চালালে তাকে রোখার জন্য। আর এই সাহেব যাবেন আফ্রিকাভারের তাঁবুর পিছনে ওটুম্বার দড়ি কাটার জন্য। ওদিকের কথা এখন আর খেয়াল নেই। সাহেব দড়ি কেটে ফিরে এলে আমরা দুজনও নীচে নামার পথ ধরব। কি, আপনি পারবেন তো?' এই বলে তাকাল সুদীপ্তর দিকে।

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, পারব।'

এরপর আর সময় নষ্ট করল না কেউ। মেশিনগানের গুলি থেকে মাথা বাঁচিয়ে

হামা দিয়ে আস্কারিদের সঙ্গে নিয়ে তারা এগোতে লাগলেন তাঁবুর দিকে। কেউ তাদের খেয়াল করল না। পিছনে চলতে লাগল লড়াই আর বীভৎস চিৎকার চেঁচামেচি।

সবার অলক্ষ্যে সুদীপ্তরা পৌঁছে গেল তাঁবুর কাছে। তাঁবু থেকে গুলি-বারুদ-অস্ত্র আর সামান্য কিছু খাবার তুলে নিয়ে কুলি আর আস্কারিদের সঙ্গে হেরম্যান দ্রুত এগোলেন পাহাড়ের উলটোদিকের ঢালের উদ্দেশে। যাবার আগে সুদীপ্তকে তিনি বললেন, 'তুমি পারবে তো? নইলে আমি ওটুম্বার কাছে যাচ্ছি, তুমি ওদের নিয়ে যাও।'

সুদীপ্ত বলল, 'না, আপনি এগোন। আমি এখনই কাজ সেরে টোগোকে নিয়ে আপনার পিছনে যাচ্ছি।'

টোগো সুদীপ্তর হাতে একটা লম্বা ছুরি তুলে দিল। হেরম্যান এগোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্তও পা বাড়াল ম্যাকুইনার তাঁবুর দিকে। রাইফেল হাতে চারপাশে নজর রাখতে লাগল টোগো।

ইতিমধ্যে আর ক'জন মাসাই পড়ে গেছে পিগমিদের বিষাক্ত তিরে। বাদবাকিদের নিয়ে ম্যাকুইনা লড়ছেন অদৃশ্য শত্রুর সাথে। কোনোদিকে তাঁর খেয়াল নেই। সুদীপ্ত দ্রুত পৌঁছে গেল ম্যাকুইনার তাঁবুর কাছে। তারপর তাঁবুটাকে বেড় দিয়ে পৌঁছে গেল সেই গাছটার কাছে। ওটুম্বা তাকাল সুদীপ্তর দিকে। এরপর সুদীপ্তর হাতে ছুরি দেখে আতঙ্কে সে চিৎকার করে উঠল। সুদীপ্ত তার ভাষা জানে না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে ইশারা করল। ওটুম্বা থামল ঠিকই, কিন্তু সুদীপ্ত তার দিকে পা বাড়াতেই সে আবার চিৎকার করে উঠল। ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল তার দড়ির বাঁধন। সুদীপ্তকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। না করাটাই স্বাভাবিক। সুদীপ্ত আরও একবার থমকে দাঁড়াল। কিন্তু আর অপেক্ষা করা যাবে না। ওটুম্বার চিৎকার কানে যেতে পারে ম্যাকুইনাদের। কাজেই সুদীপ্ত আর দেরি না করে ওটুম্বার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা আর্ত চিৎকার করে প্রচণ্ড আতঙ্কে চোখ বন্ধ করল ওটুম্বা। রজ্জুবদ্ধ শরীরটা কাঁপতে লাগল। সুদীপ্ত কাটতে লাগল দড়ি। খুব বেশি হলে আধ মিনিট সময় লাগল সুদীপ্তর কাজ সারতে। দড়ির বাঁধন খসে পড়তেই আবার চোখ খুলল ওটুম্বা। বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে তাকে সে কী যেন বলতে শুরু করল। সে কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার ভাব স্পষ্ট। সুদীপ্ত কিছুই বুঝতে পারছে না তার কথা। কিন্তু কথা বলতে বলতেই হঠাৎ তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। চিৎকার করে সুদীপ্তর উদ্দেশে কী একটা বলে একটা লাফ দিয়ে তিরের বেগে সে ছুটল পিছনের জঙ্গলের দিকে। আর ঠিক সেইসময় পিছনে মৃদু শব্দ। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আকালা। চোখে তার হিংস্র দৃষ্টি। আগুনের লাল আভা তার কাটা দাগওয়ালা মুখটাকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। যেন মূর্তিমান এক শয়তান দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

তাকে দেখেই সুদীপ্ত কোমরের রিভলভারের দিকে হাত বাড়াতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আকালা তার রাইফেলের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল সুদীপ্তর মাথায়। সুদীপ্তর চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন মুহূর্তের মধ্যে পাক খেয়ে উঠল।

কেউ যেন একটা কালো পর্দা ঢেকে দিল তার চোখে। যেন মূর্তিমান কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেল সুদীপ্ত।

সুদীপ্তর যখন প্রথমবার জ্ঞান ফিরল তখন সে বুঝতে পারল না সে কোথায় আছে। চোখের সামনে যেন আবছা পর্দা একটা তখনও আছে। পাশ ফিরতে গিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সে। অসহ্য যন্ত্রণা তার মাথায়। আস্তে আস্তে একটা হাত সে মাথায় দিল। সারা মাথা চটচট করছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকার পর তার দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল। সুদীপ্ত দেখল সে একটা তাঁবুর মধ্যে পড়ে আছে। বাইরে মনে হয় দিন। তাঁবুর ক্যাম্বিসের ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে কীসের যেন শব্দ হচ্ছে বাইরে। সুদীপ্ত মাথা থেকে হাতটা চোখের সামনে আনল চটচটে জিনিসটা কী তা দেখবার জন্য। হাতটা দেখার পরই চমকে উঠল সে—রক্ত!

কিন্তু রক্ত কেন? আর এর পরমুহূর্তে সব কথা মনে পড়ে গেল। অতি কষ্টে পাশ ফিরতেই চোখে পড়ল তাঁবুর মধ্যে রাখা কাঠের প্যাকিং বাক্সগুলো। তাঁবুটা চিনতে পারল সুদীপ্ত—এ তাঁবু ম্যাকুইনার! কিন্তু টোগো, হেরম্যান—এরা সব কোথায় গেলেন? তারা কি তাকে ফেলে পালাল? সে কি ম্যাকুইনার হাতে বন্দি? না-কি পিগমিরা দখল করেছে ম্যাকুইনার তাঁবু? কিন্তু লড়াই তো এখনও চলছে। বাইরে মাঝে মাঝে যে শব্দটা হচ্ছে ওটা তো মেশিনগানের শব্দ! এসব চিন্তা করে সুদীপ্ত বসতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় তাঁবুর পর্দা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল ম্যাকুইনা, আর তার পিছনে একটা মোটা দড়ি হাতে আকালা।

শুয়েই রইল সুদীপ্ত। ম্যাকুইনা একদম তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পোশাক ঘামে ভিজে আছে। চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট। মুখ গম্ভীর। সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'জ্ঞান ফিরেছে দেখছি। এবার কী করবেন আপনি? আপনার সঙ্গীরা তো সব আপনাকে ফেলে পালাল!'

সুদীপ্ত তাঁর কথায় কোনো জবাব দিল না।

ম্যাকুইনা আকালাকে বললেন, 'বেঁধে ফেল ওকে।'

আকালা এগিয়ে এল। সুদীপ্ত বুঝল তাকে বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। সে এখন সম্পূর্ণ ম্যাকুইনার কবজায়। ম্যাকুইনার ইচ্ছার ওপর তার জীবন নির্ভর করছে। সুদীপ্তর পাশে বসে মোটা দড়ি দিয়ে ঝটপট তার হাত-পা বেঁধে আকালা উঠে দাঁড়াল।

ম্যাকুইনা এবার সুদীপ্তর উদ্দেশে বললেন, 'আপনি ওটুম্বাকে ছেড়ে দিয়ে আমার যে ক্ষতি করেছেন তার খেসারত আপনাকে দিতে হবে। ওটুম্বার লোকজন আমার বারো জন লোককে শেষ করেছে। পিগমিরা সব পালিয়েছে। কিন্তু ওরা কেউ বাঁচবে না। সবাইকে শেষ করব আমি।'

সুদীপ্ত এবার মুখ খুলল, 'সবাইকে শেষ করে আপনারাও কি বাঁচবেন?'

ম্যাকুইনা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নিঃশব্দে হাসলেন। এরপর ট্রাউজারের ডানপাশের পায়ের কাপড়টা একটু টেনে তুলতেই সুদীপ্তর চোখে পড়ল তাঁর হাঁটুর নীচে ইঞ্চিখানেক একটা ক্ষতচিহ্ন! সেটা দেখিয়ে ম্যাকুইনা বললেন, 'পিগমিদের তিরের চিহ্ন! ওদের তির আমার কিছু করতে পারবে না।'

এরপর তিনি পকেট থেকে একটা তরলপূর্ণ ছোট্ট শিশি আর সিরিঞ্জ বার করে সুদীপ্তকে দেখিয়ে বললেন, 'এই অ্যান্টিভোট আমার নেওয়া আছে। পিগমিদের বিষ কাজ করবে না আমার শরীরে। তবে মেশিনগান-রাইফেলের কোনো অ্যান্টিডোট নেই পিগমিদের কাছে।'

এই বলে জিনিস দুটো পকেটে ভরে রেখে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'তবে আপনারও চিন্তা নেই। আপনি বাঁচবেন, আপনাকে আমি প্রাণে মারব না। ওটুম্বার ওপর ব্যবহার করা না গেলেও জাঞ্জিবার নাইফটা আপনার ওপর ব্যবহার করব আমি। শুধু আপনার আঙুলগুলো কেটে দেব আমি। আজ সন্ধ্যায় কাজটা সেরে ফেলব, তারপর আপনাকে বনে ছেড়ে দেব। এখানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবেন।'

সুদীপ্ত এবার চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান।' তার চিৎকার ঢাকা পড়ে গেল ম্যাকুইনার অট্টহাস্যে। হাসতে হাসতে ম্যাকুইনা আকালাকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারা চলে যাবার পর একইভাবে শুয়ে রইল সুদীপ্ত। হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা, উঠে বসার ক্ষমতা নেই। কান খাড়া করে সে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল বাইরে কী ঘটছে। মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট কথাবার্তা ভেসে আসছে বাইরে থেকে। কোনো কোনো সময় আবার কেউ হেঁটে চলে যাচ্ছে তাঁবুর পাশ দিয়ে। ছায়া পড়ছে তাঁবুতে। অর্থাৎ তাঁবুর কাছাকাছি বা পাহাড়ের ওপর কোনো লড়াই নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে মেশিনগানের র‍্যাট্-র‍্যাট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে কেন? ঠিক বুঝতে পারল না সুদীপ্ত। সময় এগিয়ে চলল। তাঁবুর মধ্যে অসহায়ভাবে পড়ে রইল সে। একসময় অবসাদ আর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। তাঁবুর বাইরে আফ্রিকার সূর্য তখন মধ্যগগনে।
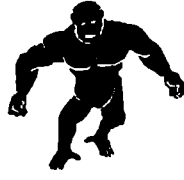
সুদীপ্ত ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে লাগল—অরণ্যের মধ্যে দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। অন্তহীন সে পথ। কত জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত সবকিছু অতিক্রম করে সে এগিয়ে চলেছে। তার পথের চারপাশে কত রকমের জীবজন্তু, গাছপালা, তার মধ্যে দিয়ে চলেছে। কিন্তু কোথায় চলেছে তা তার জানা নেই! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে স্বপ্নের মধ্যে সে অজানা পথ অতিক্রম করতে লাগল।

দীর্ঘ স্বপ্নের শেষ পর্যায়ে জঙ্গলের মধ্যে একসময় সে শুনতে পেল অসংখ্য শব্দ। শব্দগুলো যেন চারপাশ থেকে ব্যূহ রচনা করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর তাকে ঘিরে ধরল অসংখ্য পিগমি। হাতে তাদের বিষ মাখানো তির। পিগমি দলের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পারল—ওটুম্বা। ওটুম্বা তাকে বলল, 'তুমি অরণ্যের দেবতাকে ধরতে এসেছ, আমাকে তুমি মারতে চেয়েছিলে, তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম।'

সুদীপ্ত বলল, 'না না, সে আমি নই, ম্যাকুইনা।' কিন্তু তার কথা চাপা পড়ে গেল ঢাকের শব্দে। প্রচণ্ড জোরে ঢাক বাজছে। ওটুম্বা তির-ধনুক তাগ করল সুদীপ্তকে লক্ষ্য করে। একটা চিৎকার বেরিয়ে এল সুদীপ্তর গলা থেকে।

ঠিক এই মুহূর্তে ঘুমটা ভেঙে গেল সুদীপ্তর। সে একইভাবে পড়ে আছে তাঁবুর ভিতর। তাঁবুটা অন্ধকার হলেও পর্দার বাইরে যেন আলো আলো ভাব। পিগমিদের ঢাকের শব্দ আর বিচিত্র ধরনের আওয়াজ হচ্ছে বাইরে। মাঝে মাঝে যেন কাদের পদভারে মাটি কাঁপছে। কারা যেন ছুটে যাচ্ছে তাঁবুর পাশ দিয়ে। বাইরে কী হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছে না সুদীপ্ত।

মিনিট পাঁচেক একইভাবে পড়ে রইল সুদীপ্ত। বাইরে নানারকম শব্দ ক্রমশ বেড়েই চলেছে! হঠাৎ তাঁবুর খুব কাছেই যেন মানুষের গলার শব্দ কানে এল তার। সে শব্দ এগিয়ে আসছে তাঁবুর দিকে। তাহলে কী ম্যাকুইনা আসছে সুদীপ্তর ওপর প্রতিশোধ নিতে? বিস্ফারিত চোখে সে তাকাল তাঁবুর দরজার দিকে। আর তার পরমুহূর্তেই তাঁবুর পর্দা ঠেলে মশাল হাতে ভিতরে প্রবেশ করলেন হেরম্যান আর টোগো। তাদের দেখে মুহূর্তের মধ্যেই সুদীপ্তর সব যন্ত্রণা যেন মিলিয়ে গেল। আনন্দে সে উঠে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু দড়ি বাঁধা বলে পারল না।

তাঁবুতে ঢুকেই কোনো কথা না বলে টোগো দ্রুত সুদীপ্তর কাছে এসে বাঁধন খুলতে বসল।

সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'আপনারা কোথায় ছিলেন? ম্যাকুইনা কোথায়?'

হেরম্যান বললেন, 'আমরা পাহাড়ের ঢালে কাল রাত থেকে লুকিয়ে ছিলাম। ম্যাকুইনা নেই, পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে মানে?' অবাক হয়ে বলল সুদীপ্ত।

হেরম্যান বাইরের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'পিগমিদের ভয়ে পালিয়েছে। সব কথা বলার সময় নেই, এক্ষুনি পালাতে হবে। ওরা এসে পড়ল বলে।'

টোগো দ্রুত সুদীপ্তর বাঁধন খুলে দিল। তারপর তাকে হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এল। বাইরে বেরিয়ে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেল সুদীপ্ত। উত্তরের সারা পাহাড় আগুনে লাল হয়ে আছে। আগুনের লেলিহান শিখা লাফিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। আর সেই আগুন বাতাসবাহিত হয়ে দ্রুত ছুটে আসছে ঘাসের বন বেয়ে তাদের পাহাড়ের দিকে।

ইতিমধ্যে এ-পাহাড়েও বেশ কিছুটা আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। আগুন গ্রাস করে ফেলেছে বনভূমি। মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ছে গাছের ডাল। ভীত সন্ত্রস্ত প্রাণীরা আগুনের থেকে বাঁচতে প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে। হরিণ, শিম্পাজি, বেবুন আরও কত প্রাণী। একজোড়া হাটারি চিতা সুদীপ্তর প্রায় গা ঘেঁষে দৌড়ে পালাল। আর বাজছে অজস্র ঢাক। পাহাড়ের দু-দিকের ঢাল বেয়ে ওপর দিকে উঠে আসছে সে শব্দ।

সুদীপ্ত অবাক হয়ে বলল, 'এ কী দাবানল নাকি?'

হেরম্যান বললেন, 'না, পিগমিরা ম্যাকুইনার মেশিনগানের কাছে পরাস্ত হয়ে উত্তরের পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ওরা জানে বাতাস সে আগুন এ পাহাড়ে পৌঁছে দিয়ে সকলকে পুড়িয়ে মারবে। এর ভয়েই ম্যাকুইনা পালিয়েছে।'

সুদীপ্ত বলল, 'আমরা এখন কোন দিকে পালাব? যে দিক থেকে আমরা এসেছিলাম সে দিকেই?'

হেরম্যান বললেন, 'না, সে পথ বন্ধ। পিগমিরা কাল রাত থেকে তাদের বিপদের কথা ঢাকের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। আশেপাশের উপত্যকার জঙ্গলে সম্ভবত আরও কিছু পিগমি গ্রাম আছে। জাতভাইদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে তারাও এসে পৌঁছেছে। ওই ঢাকের শব্দ তাদেরই। এ পাহাড়ের চারপাশের ঢাল তারা ঘিরে ফেলেছে। আমাদের পালাতে হবে দক্ষিণে। যদি কোনোভাবে রক্ষা পাওয়া যায়।'

আগুন যেন ঘাসের বনে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যাকুইনার তাঁবু থেকে কিছু দূরে সুদীপ্তদের তাঁবুটা যেখানে পাতা হয়েছিল সে জায়গাটা এবার গ্রাস করে নিল আগুন। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল তাঁবু। ঢাকের বাজনাও প্রায় ঢালের ওপরে উঠে এসেছে। আর না দাঁড়িয়ে হেরম্যান সুদীপ্ত আর টোগোকে নিয়ে ছুটতে শুরু করলেন দক্ষিণ দিকে।

পাগলের মতো বনজঙ্গল ভেঙে ছুটতে লাগল তারা। কখনও তারা পড়ে যাচ্ছে, অন্ধকারে গাছের গুঁড়িতে বা পাথরে ধাক্কা লেগে থেঁতলে যাচ্ছে দেহ। তবু তারা ছুটছে।

তাদের পিছনে তাড়া করে আসছে আগুনের লেলিহান শিখা। তার সঙ্গে পিগমিদের ঢাকের শব্দ আর বীভৎস চিৎকার! ছুটতে ছুটতে একসময় তারা আগুনকে বেশ কিছুটা পেছনে ফেলে দিলেও হঠাৎ তারা জঙ্গলের মধ্যে শুনতে পেল তিন দিকে খুব কাছেই যেন ঢাক বেজে উঠল। হেরম্যান বললেন, 'সম্ভবত জঙ্গলের তিন দিক থেকে ওরা ঘিরে ফেলেছে আমাদের।'

জঙ্গলের একদিকে ফাঁকা জমি। প্রাণ বাঁচাতে গতিপথ পরিবর্তন করে সুদীপ্তরা সে দিকে ছুটল। হেরম্যান আর টোগো ছুটছে একসঙ্গে, হাত তিনেক তফাতে সুদীপ্ত। ফাঁকা জমি দিয়ে কিছুটা এগোবার পরই সুদীপ্তর সামনে হঠাৎই ভোজবাজির মতো যেন মিলিয়ে গেলেন হেরম্যান আর টোগো। সেটা দেখার সাথে সাথেই সুদীপ্ত দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু গতি নিয়ন্ত্রণ করার আগেই তার পায়ের তলার মাটি হঠাৎ সরে গেল, অন্ধকার গহবরের মধ্যে আছড়ে পড়ল সুদীপ্ত।

সুদীপ্তর কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। অন্ধকারের মধ্যে প্রথম টোগোর গলা শোনা গেল, 'আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি। যেমনভাবে পশু ধরা হয় তেমনি পিগমিরা তিন দিক থেকে তাড়িয়ে এনে আমাদের ফাঁদে ফেলল। আমরা বুঝতে পারিনি।'

হেরম্যান বললেন, 'আর পালাতে পারলাম না। ওই যে, ওরা গর্তের কাছে ছুটে আসছে! পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে!'

সুদীপ্ত বলল, 'ওরা আমাদের মেরে ফেলবে! আমাদের কাছে তো রাইফেল, রিভলভার আছে। একটা শেষ চেষ্টা করতে হবে। কোনোভাবে যদি ওপরে ওঠা যায়।' এই বলে সে অন্ধকারের মধ্যেই ওপরে ওঠার কোনো পথ আছে কি না, তা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

হেরম্যান সুদীপ্তর কথা শুনে বললেন, 'ওপরে ওঠার আর কোনো সুযোগ নেই। ওরা এসে পড়ল বলে। তাছাড়া এভাবে লড়াই করে কোনো লাভ হবে না। আমরা তিনজন, ওরা সংখ্যায় অনেক। খুব বেশি হলে আমাদের তিনজনের প্রাণের বিনিময়ে ওদের কিছু লোকের প্রাণ নিতে পারি, ব্যস, এই পর্যন্তই। আমার মনে হয় যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করাই ভালো। তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।'

টোগো বলল, 'হ্যাঁ, সেটাই ঠিক। যদি কোনো কারণে ওরা আমাদের মুক্তি দেয়।'

সুদীপ্ত বলল, 'তাহলে তাই হোক, আমরা লড়াই করব না।'

তাদের কথা শেষ হবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গর্তের ওপরে অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল। মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল গর্তের মুখ। সুদীপ্তরা তাকিয়ে দেখল ওপরে গর্তের চার পাশ দিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পিগমিরা। তাদের তিরের ফলা তাগ করা হাত নীচে গর্তের মধ্যে পড়ে থাকা সুদীপ্তদের দিকে। পিগমিদের সার সার তিরের ফলা এই মুহূর্তে সুদীপ্তদের পিন-কুশন বানিয়ে দিতে পারে। যদিও ওই বিষ-মাখানো তির সুদীপ্তদের এক-এক জনের পক্ষে একটাই যথেষ্ট।

সুদীপ্তদের দিকে তির তাগ করে পিগমিরা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সুদীপ্তরাও নড়াচড়া করছে না। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি মুহূর্তের মধ্যে ওদের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সুদীপ্তদের পর্যবেক্ষণ করার পর পিগমিদের একজন কী যেন একটা বলল তার সঙ্গীদের। তার কথা শুনে কয়েকজন পিগমি ঘাসের দড়ি ঝুলিয়ে তা বেয়ে গর্তের মধ্যে নামতে শুরু করল। যারা নীচে নামল তারা প্রথমে সুদীপ্তদের রাইফেলগুলো কেড়ে নিয়ে দড়ি দিয়ে তাদের হাত-পা বেঁধে ফেলল। ওরাও বাধা দিল না। দড়ি বেঁধে কিছুক্ষণের মধ্যে গর্তের ওপরে তুলে ফেলা হল তাদের তিন জনকে। ওপরে প্রায় জনা পঞ্চাশেক পিগমি দাঁড়িয়ে আছে। তবে সুদীপ্তর তাদের ওটুম্বার গ্রামের লোক বলে মনে হল না। সম্ভবত অন্য কোনো গ্রাম থেকে ওটুম্বাদের সাহায্য করার জন্য এরা এসেছে। এদের চেহারা নগ্ন ও মুখে আর বুকে উল্কি আঁকা। আগুনের আভায় হিংস্র তাদের মুখ।

ওপরে ওঠানোর পর সুদীপ্তদের তিনজনকে, বাঁধা হল তিনটে লম্বা বাঁশের সঙ্গে। তারপর ঠিক যেমন শিকার করা প্রাণী বাঁশে বেঁধে কাঁধে করে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তেমনি কয়েকজন পিগমি বাঁশ তিনটের দু-প্রান্ত কাঁধে তুলে চলতে শুরু করল। আর অন্যরা ঢাক বাজাতে বাজাতে তাদের পিছনে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্তদের নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামতে লাগল পিগমিরা। বাঁশে ঝুলন্ত অবস্থাতেই সুদীপ্তরা বুঝতে পারল তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নীচে ওটুম্বাদের গ্রামের দিকে। পাহাড় থেকে সুদীপ্তদের বয়ে নিয়ে নীচে নেমে পিগমিরা সত্যিই প্রবেশ করল গ্রামের ভিতর। সারা গ্রাম মশালের আলোতে আলোকিত। কয়েকশো পিগমি সমবেত হয়েছে সেখানে। বিচিত্র তাদের সাজ-পোশাক, বিচিত্র তাদের অস্ত্র শস্ত্র। এত মানুষ গ্রামে, এর আগে ওরা দেখেনি। গ্রেট রিফ্‌ট্ ভ্যালির বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর যোদ্ধারা আজ এ গ্রামে উপস্থিত হয়েছে ভিনদেশি শত্রুদের শাস্তি দেবার জন্য। বাহকরা সুদীপ্তদের নিয়ে গ্রামে ঢুকতেই অপেক্ষারত পিগমিরা বীভৎস স্বরে বিজয়-উল্লাস শুরু করল। বাজতে লাগল ঢাক জাতীয় নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। তাদের শত্রুরা পরাস্ত হয়েছে, বন্দি শত্রুদের হত্যা করে এবার সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ নেবে পিগমিরা। চোখের বদলে চোখ, নখের বদলে নখ, প্রাণের বদলে প্রাণ—এই হল জঙ্গলের চিরাচরিত নিয়ম। দোষের কিছু নয়, পিগমিরা জঙ্গলের এ নিয়মই এবার পালন করবে। শত্রু নিধন করে রাত শেষে দেবতা ওঙ্গো আর বড় দেবতা টাইবুরুর আশীর্বাদ নিয়ে বাইরে থেকে আসা পিগমিরা যে যার গ্রামে ফিরে যাবে। শত্রু নিধনের প্রাক্কালে শত্রুদের ঘিরে তাদের এ উল্লাস স্বাভাবিক।

গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করে এক জায়গাতে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াল মুখে উল্কি আঁকা পিগমির দলটা। তারপর একজন এসে কী যেন বলল উল্কি আঁকা দলের সর্দারকে। সুদীপ্তদের নিয়ে তারা আবার চলতে শুরু করল গ্রামের ভিতর। আর তাদের ঘিরে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে এগোল সমবেত অন্য পিগমিরা।

সুদীপ্তদের নিয়ে গিয়ে নামানো হল সেই বটগাছের মতো বিশাল গাছটার নীচে। গাছেরা চারপাশে মাটিতে পোঁতা বাঁশের খুঁটিতে মশাল গোঁজা। সেই আলোতে গাছের

গুঁড়ির নীচে রাখা ওঙ্গোর মূর্তিটা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তার করাল মুখগহ্বর যেন গিলে খেতে আসছে সবাইকে। বীভৎস তার রূপ, ঠিক যেন মৃত্যুর প্রতিমূর্তি। গাছের নীচে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে পিগমিরা। সেই অর্ধবৃত্তের মাঝখানে সুদীপ্তদের নামিয়ে বাঁশের বাঁধন আর হাত পা-র বাঁধন খুলে তিনজনকে হাঁটু মুড়ে পাশাপাশি বসানো হল। তাদের চারপাশে বিষাক্ত তিরধনুক হাতে পিগমিদের পাহারা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে দেখছে বন্দিদের। চারপাশে তাকিয়ে দেখার পর সুদীপ্তর হঠাৎ চোখ পড়ল গাছের ওপর দিকে। একটা মোটা ডালে ঝুলছে দুটো দেহ। ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাদের। লোক দুজনকে চিনতে পারল সুদীপ্ত। একজন ম্যাকুইনার মাসাই সর্দার আকালা, অন্যজন তার সঙ্গী মেশিনগান চালক। দুজনেই পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে পিগমিদের হাতে। সুদীপ্তর পাশে বসা হেরম্যান হঠাৎ কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা দিলেন সুদীপ্তকে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে এক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেল সুদীপ্ত। কিছুদূরে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে ম্যাকুইনা। তার পিঠে একটা তির বেঁধা, মুখটা অন্যদিকে ফেরানো, নিস্পন্দ দেহ। এক হাতে এখনও রাইফেল ধরা। তাহলে ম্যাকুইনা শেষ পর্যন্ত পালাতে পারেননি, ধরা পড়েছিলেন পিগমিদের হাতে।

হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, 'সম্ভবত ম্যাকুইনাও আমাদের মতো এ পর্যন্ত জীবিত অবস্থাতেই এসেছিলেন।'

সুদীপ্ত একটু অবাক হল ম্যাকুইনার তিরবিদ্ধ মৃতদেহ দেখে। তার মানে ম্যাকুইনার নেওয়া ইঞ্জেকশন পিগমিদের বিষাক্ত তিরের প্রভাব কাটাতে পারেনি। সেই তিরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কারণ অন্য কোনো আঘাত তাঁর দেহে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঢাক বাজছে। হাঁটুমুড়ে সুদীপ্তরা বসে আছে। কয়েকজন পিগমি গাছে উঠে একটা ডালে দড়ি ঝোলাতে লাগল। সুদীপ্ত তাই দেখে হেরম্যানকে নীচু স্বরে বলল, 'এরা কী আমাদেরও ফাঁসিতে ঝোলাবে?'

হেরম্যান হতাশভাবে জবাব দিলেন, 'হয়তো তাই।'

এরপরই সুদীপ্ত হাত নাড়তে গিয়ে অনুভব করল, 'পোশাকের নীচে তার কোমরে রিভলভারটা এখনও আছে। সুদীপ্তর মনে একটু সাহস ফিরে এল। সে হেরম্যানকে বলল, 'আমার রিভলভারটা আছে। ম্যাকুইনার রাইফেলটাও কাছেই পড়ে আছে।'

সুদীপ্তর কথার অর্থ বুঝতে পেরে হেরম্যান বললেন, 'রিভলভার আমার আর টোগোর কাছেও আছে। সত্যিই যদি ওরা আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাতে চায় তবে একটা শেষ চেষ্টা করব। একমাত্র গাছের দিকটাই অরক্ষিত, ওদিকেই আমরা ছুটব।'

সুদীপ্ত মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, যেভাবেই হোক বাঁচার একটা চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।'

এরপর সে হেরম্যানের উদ্দেশে বলল, 'পিগমিরা আমাদের বাঁধনগুলো খুলে দিল কেন? এতে কী ওদের ফাঁসিতে ঝোলাতে সুবিধে হবে? নাকি ওরা আমাদের পালানোর সুযোগ করে দিয়ে পিছন থেকে তির ছুড়ে শিকারের আনন্দ উপভোগ করতে চায়?'

হেরম্যান তার কোনো জবাব দিলেন না।

সুদীপ্তর কথার মাঝেই পিগমিদের ঢাকের বাদ্যি হঠাৎই যেন থেমে গেল, আর তার সঙ্গে থেমে গেল চারপাশের পিগমিদের কোলাহল। চারপাশ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না সুদীপ্ত। মাথা নীচু করেই সে হেরম্যানের উদ্দেশে আর একটা প্রশ্ন করল, 'পিগমিরা আমাদের গর্তের মধ্যে না মেরে এখানে আনল কেন?'

হেরম্যানের কাছ থেকে এবারও কোনো সাড়া মিলল না।

দ্বিতীয়বার হেরম্যানের উত্তর না পাওয়ায় সুদীপ্ত পাশ ফিরে তাঁর দিকে তাকাতেই দেখতে পেল তিনি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে।

সুদীপ্ত তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের মোটা গাছের গুঁড়ির দিকে তাকাতেই যেন পাথর বনে গেল। গাছের গুঁড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে সুদীপ্তদের সামনের ফাঁকা জমিতে এসে দাঁড়িয়েছে ওটুম্বা, আর তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুতদর্শন দ্বি-পদ মূর্তি! তার উচ্চতা প্রায় আট ফুট হবে! সবুজ রঙের ঘন লোমে প্রাণীটার সারা দেহ ঢাকা। একটু কুঁজো হয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তদের দেখছে প্রাণীটা।

বুরুন্ডির সবুজ বানর!

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সুদীপ্ত। এরই সন্ধানে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আফ্রিকার এই দুর্গম প্রদেশে সুদীপ্তরা ছুটে এসেছে। বিপদকে বার বার ফাঁকি দিয়ে, অসহ্য কৃচ্ছ্রসাধন করে বুরুন্ডির গহীন অরণ্যে একেই খুঁজতে বেরিয়েছে তারা। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে এসে দর্শন দিল তাদের। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সুদীপ্ত প্রাণীটার দিকে।

পাশ থেকে বিড়বিড় করে হেরম্যান সুদীপ্তকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যাক, মৃত্যুর আগে অন্তত একটা সান্ত্বনা পেলাম। ক্রিপ্টোজুলজি, ক্রিপটিড যে মিথ্যা নয় তা তোমাকে দেখাতে পারলাম।'

সুদীপ্ত কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে।

আরও কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। ওটুম্বা কী যেন বলল সমবেত পিগমিদের উদ্দেশে। সঙ্গে সঙ্গে পিগমিরা উচ্চস্বরে কী যেন বলে, হাত নামিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াল।

টোগো বলল, 'ওটুম্বা দেবতা টাইবুরুর প্রতি সম্মান জানানোর নির্দেশ দিল পিগমিদের।'

ওটুম্বা এরপর নিজেও পিগমিদের দঙ্গলের একপাশে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াল। দেবতা টাইবুরুর শুধু একলা দাঁড়িয়ে রইল গাছের সামনের ফাঁকা জমিতে।

প্রাণীটার মুখটা অনেকটা গোরিলার মতো, সুদীপ্তদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু দুলছে প্রাণীটা।

হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, 'মনে হচ্ছে এটা গোরিলা ও মানুষের মধ্যবর্তী স্তরের কোনো জীব। গোরিলার মতো হাত অতটা লম্বা নয়, দাঁড়ানোর ভঙ্গি অনেকটা মানুষের মতো।'

প্রাণীটাকে দেখার পরই বিস্ময়ে সুদীপ্তরা পালানোর চিন্তাটা যেন ভুলেই গেল। তারা প্রাণীটার দিকে তাকিয়েই রইল।

দানববানর সুদীপ্তদের কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর ধীরপায়ে সোজা এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। সামান্য ঝুঁকে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে যেন। উত্তেজনায় নিজেদের অজান্তেই সুদীপ্তরা উঠে দাঁড়াল।

সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'ও কি আমাদের আক্রমণ করতে আসছে নাকি?'

তিনি মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, 'জানি না।'

হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে সুদীপ্তরা প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে আছে, দানববানর এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। তিনদিক ঘিরে নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকশো পিগমি। অথচ একটা পাতা পড়লেও যেন শব্দ পাওয়া যাবে, এমনই নিস্তব্ধতা। তারাও তাকিয়ে আছে সবুজ প্রাণীটার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর প্রাণীটা তখন প্রায় সুদীপ্তদের সামনে চলে এসেছে, হাত দশেকের মতো ব্যবধান, আর ঠিক সেই সময় একটা বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটল। সুদীপ্তর যেন মনে হল, একটু দূরে পড়ে থাকা ম্যাকুইনার মৃতদেহটা হঠাৎই নড়ে উঠল, আর তারপরই ম্যাকুইনা বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে উঠে সবুজ বানরের দিকে রাইফেল তাগ করে চিৎকার করে উঠলেন, 'সবাই অস্ত্র না ফেললে এখনই গুলি চালাব।' এই বলে এক হাত দিয়ে অবলীলায় নিজের পিঠ থেকে তিরটা খুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবুজ বানর। হতবাক পিগমিরা, হেরম্যানরাও। পিগমিদের বিষাক্ত তির খেয়েও যে কেউ এভাবে বেঁচে উঠতে পারে তা অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

যদিও পিগমিদের কয়েকজন ম্যাকুইনাকে লক্ষ্য করে তির তাগ করল, কিন্তু সে তির কেউই ছুড়তে পারল না। কারণ তাইবুরু আর আগুনলাঠি হাতে শত্রু এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে যে তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই দেবতার গায়ে লাগতে পারে।

সুদীপ্তও যেন ব্যাপারটা দেখে প্রথমে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারল—ম্যাকুইনা তাকে ঠিকই বলেছিলেন, অ্যান্টিডোটের প্রভাবে পিগমিদের বিষাক্ত তির ওঁর দেহে কাজ করেনি। তিনি এতক্ষণ মরার ভান করে সুযোগের অপেক্ষায় পড়েছিলেন।

সবুজ বানর আর ম্যাকুইনা হাত খানেকের ব্যবধানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুজনেই পাথরের মূর্তির মতো স্থির! ম্যাকুইনা আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'শেষ বারের মতো বলছি, সবাই হাতিয়ার না ফেললে এখনই গুলি চালাব।'

পিগমিরা তার চিৎকারের মর্মার্থ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। কিন্তু সবুজ বানরের মুখ থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল। সে শব্দ শুনে মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল পিগমিদের দঙ্গলে। তারপর তারা নিজেদের অস্ত্র নামিয়ে রাখল পায়ের কাছে।

সুদীপ্ত স্পষ্ট দেখতে পেল সবুজ বানরের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি ফুটে উঠল

ম্যাকুইনার মুখে। মশালের আলোতে ঝিলিক দিল তার হীরে বসানো দাঁত। হিস্‌হিস্‌ করে চাপাস্বরে কী যেন বললেন ম্যাকুইনা। সেকথা সুদীপ্তর কানে এল না ঠিকই কিন্তু ম্যাকুইনার রাইফেলের নল যে সবুজ বানরের দেহ স্পর্শ করে আছে তা ওর নজর এড়াল না। ম্যাকুইনা সত্যি কী প্রাণীটাকে গুলি করতে যাচ্ছেন নাকি?

পরমুহূর্তেই হঠাৎ হেরম্যান সুদীপ্তকে চমকে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে ম্যাকুইনার রাইফেলের নল এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আগলে দাঁড়ালেন সবুজ বানরকে। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'না, ওকে আমি মরতে দেব না। ওর প্রাণ আমার আপনার চেয়ে অনেক দামি। এ প্রাণী একবার পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্লিজ, মিস্টার ম্যাকুইনা!'

ম্যাকুইনা সে কথায় কর্ণপাত না করে হিংস্রভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সামনে থেকে সরে না গেলে এখনই গুলি করে মারব। আমি তিন গুনব, 'এক... দুই...' ম্যাকুইনা তিন গোনার আগেই হেরম্যান ম্যাকুইনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর হাতের রাইফেল ছিনিয়ে নেবার জন্য। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝাপটা-ঝাপটি হল, তারপরই শোনা গেল রাইফেলের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে হেরম্যান পড়ে গেলেন সবুজ বানরের ওপর। সে ধাক্কায় প্রাণীটাও টাল সামলাতে পারল না। কয়েক হাত তফাতে দুজনে ম্যাকুইনার দুদিকে ছিটকে পড়ল।
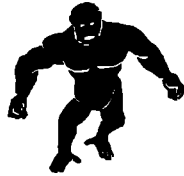
একটা রক্ত জল-করা হাসির গররা উঠল ম্যাকুইনার গলা থেকে। সুদীপ্ত দেখল মুহূর্তের মধ্যে হেরম্যানের জামা লাল হতে শুরু করেছে! তার ওপর একটা গুলি চালিয়ে দিয়েছেন ম্যাকুইনা!

ম্যাকুইনা এরপর তার রাইফেল তাঁর ঘাড়ের ওপর তুললেন মাটিতে পড়ে থাকা হেরম্যানকে লক্ষ্য করে। অবচেতনে সুদীপ্ত কখন যে তার রিভলভার টেনে বার করেছে তা নিজেই বুঝতে পারেনি। ম্যাকুইনাকে দ্বিতীয়বার রাইফেল তাগ করতে দেখে আর সময় নষ্ট না করে ম্যাকুইনাকে লক্ষ্য করে কাঁপা কাঁপা হাতে চালিয়ে দিল গুলি। সেটা পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। সম্ভবত ম্যাকুইনার কোমরের কাছে কোথাও লাগল গুলিটা। বিজাতীয় ভাষায় একটা চিৎকার করে টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতেও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন ম্যাকুইনা, রাইফেল হাতে ঘুরে দাঁড়ালেন সুদীপ্তর দিকে। কিন্তু গুলি আর তার চালানো হল না। তার আগেই গর্জে উঠল সুদীপ্তর পাশে দাঁড়ানো টোগোর রিভলভার! অব্যর্থ লক্ষ, রিভলভারের গুলি ম্যাকুইনার পাঁজর ফুড়ে বেড়িয়ে গেল।

তাঁর হাতে ধরা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল আকাশের দিকে ছিটকে উঠে সশব্দে শূন্যে ক'টা গুলি নিক্ষেপ করে ঠিকরে পড়ল মাটিতে। ম্যাকুইনার হাত দুটো হিংস্র আক্রোশে কাকে ধরার জন্য একবার শুধু মাথায় উঠল, আর তার পরই তাঁর দানবের মতো দেহটা প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল মাটিতে! একদম স্থির সেই দেহ।

ম্যাকুইনা পড়ে যেতেই সুদীপ্ত আর টোগো ছুটে এল হেরম্যানের কাছে। প্রচণ্ড কোলাহল করে অস্ত্র তুলে নিয়ে পিগমিরাও ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে। এক হাতে ভর দিয়ে মাটির ওপর উঠে বসলেন হেরম্যান। রক্ত ঝরলেও আঘাত তত গুরুতর নয়। রাইফেলের বুলেট তাঁর বাঁ কাঁধের সামান্য মাংস চিরে বেরিয়ে গেছে। হেরম্যান উঠে বসে তার ডান হাতটা সুদীপ্তর দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে আর টোগো তাঁকে ধরে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিল। আর তার পরমুহূর্তেই তাদের তিনজনের চোখ পড়ল সবুজ বানরের দিকে। দানবাকৃতির প্রাণীটা তখন নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মুহূর্ত সুদীপ্তদের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রাণীটা ধীরে ধীরে তার একটা হাত তুলে আনল নিজের ঘাড়ের কাছে, তারপর সুদীপ্তদের হতবাক করে দিয়ে একটানে ঘাড়-মাথা থেকে তার রোমশ চামড়াটা টেনে সরিয়ে ফেলল। সেই চামড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধ মানুষের মুখ! লোল চর্ম, শনের মতো সাদা চুল, নীল চোখ। গায়ের রং দেখে মনে হয় তিনি শ্বেতাঙ্গই হবেন। নীল চোখে তিনি চেয়ে রইলেন সুদীপ্তদের দিকে।

প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর হেরম্যান তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনি মানুষ?'

মৃদু ঘাড় নেড়ে বৃদ্ধ একটু জড়ানো গলায় ইংরাজিতে জবাব দিলেন, 'একদিন হয়তো তাই ছিলাম।'

হেরম্যান তার উত্তর ঠিক বুঝতে না পেরে বললেন, 'এত লম্বা মানুষ আমি কোথাও দেখিনি! আপনি কে?'

মৃদু হাসলেন বৃদ্ধ। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কারা? আপনারা আর এই যুবককে দেখে তো ঠিক আফ্রিকান বলে মনে হচ্ছে না? এখানে এসেছিলেন কেন?

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আমি হেরম্যান, জার্মানির লোক। আমার সঙ্গী একজন ইন্ডিয়ান। আমি একজন ক্রিপটোজুলজিস্ট। অর্থাৎ বলতে পারেন, বিচিত্র প্রাণী খুঁজে বেড়াই। তবে নিজের স্বার্থে নয়, বিজ্ঞানের স্বার্থে। সবুজ মানুষের কথা শুনে তার সন্ধানে আমি এখানে এসেছিলাম।' সত্যি কথাই বললেন তিনি। সবুজ মানুষ বললেন, 'ও বিজ্ঞানী!' এরপর তিনি মাটিতে পড়ে থাকা ম্যাকুইনার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'এই হিংস্র মানুষটার পরিচয় আমি অনুমান করতে পারছি। কিন্তু কী নাম ওর? অনেক মানুষকে খুন করল ও। আপনার সাথে ওর সম্পর্ক কী?'

অস্ত্র হাতে পিগমির দল সতর্কভাবে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাইকে। বৃদ্ধর কথা শুনে হেরম্যান তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, 'আমরা কিন্তু কোনো মানুষকে মারিনি। ও আমাদের কেউ নয়। ও একজন আফ্রিকান্ডার। তাঞ্জানিয়ার বাসিন্দা, নাম ম্যাকুইনা ডায়ার।'

'ম্যাকুইনা ডায়ার!' বিড়বিড় করে নামটা দুবার বললেন বৃদ্ধ। তারপর স্বগোতক্তির স্বরে বললেন, 'তাহলে ও জাঞ্জিবারের নয়?'

ম্যাকুইনার বাসস্থানের কথা বৃদ্ধ নির্ভুলভাবে জানেন দেখে বেশ আশ্চর্য হয়ে হেরম্যান বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ জাঞ্জিবারই! পঞ্চাশ বছর হতে চলল, ও দেশ আরও দু-দেশের সাথে মিশে তাঞ্জানিয়া বলে এক দেশ হয়েছে।' এ কথা বলার পর তিনি আবার বললেন, 'তবে আমরা সবুজ বানরের খোঁজে এলেও আপনার কোনো লোককে মারিনি। আশা করি আপনি আমাদের মুক্তি দেবেন। ম্যাকুইনার সাথে পথে আমাদের যোগাযোগ। বলতে গেলে তাঁর হাতে আমরা প্রায় বন্দি ছিলাম!'

সবুজ মানুষ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা আমি জানি। আপনার সঙ্গী ওটুম্বাকে মুক্তি দিয়েছেন শুনেছি। আর এখন আপনার-আমার প্রাণ বাঁচালেন। কিন্তু আপনারা সবুজ বানরের কথা শুনলেন কোথায়? এত দূরদেশে এলেনই বা কীভাবে?'

এবার হেরম্যান বলে যেতে লাগলেন সব কথা। পর্যটক কলিঙ্গের ডায়রি ও সেই সূত্রে তাদের অভিযানের কথা, ম্যাকুইনার সাথে তাদের পরিচয়ের কথা। তাঁবুর কাছে অন্ধকারে গাছের নীচে সবুজ মানুষকে দেখার ঘটনা, পশ্চিমের পাহাড়ে অভিযান থেকে শুরু করে ম্যাকুইনার হাতে সুদীপ্তর বন্দি হওয়া থেকে মুক্তি হওয়ার ব্যাপার।

মিনিট দশেক পর কথা শেষ হল হেরম্যানের।

বৃদ্ধ সব শোনার পর বললেন, 'বুঝলাম, কিন্তু এক কষ্ট করে এত দূর এসে শেষ পর্যন্ত তো খালি হাতেই ফিরতে হবে আপনাদের।'

তাঁর মুখে এ কথা শুনে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল বিপদের মেঘ কেটে গেছে। হেরম্যান এবার একটু উৎফুল্ল স্বরে বললেন, 'না, ঠিক খালি হাতে আমরা ফিরছি না। এই যে এই অভিযানে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম, কতকিছু শিখলাম, জানলাম, এ পাওনাও তো অমূল্য। তাছাড়া যারা বিজ্ঞান চর্চা করে, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চায়, কৃচ্ছ্রসাধন তো তাদের করতেই হয়।'

বৃদ্ধ মনে হয় খুশি হলেন হেরম্যানের কথা শুনে। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন তিনি।

সুদীপ্ত এতক্ষণ হেরম্যান আর সবুজ মানুষের কথোপকথন শুনছিল। সে এবার সাহস সঞ্চয় করে বৃদ্ধকে বলল, 'আপনার পরিচয় কিন্তু আমাদের জানা হয়নি। সভ্য সমাজ থেকে এত দূরে এই অরণ্য উপত্যকায় পিগমদের মাঝে আপনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন কেন?'

সুদীপ্তর প্রশ্ন শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন বৃদ্ধ। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনারা সত্যি জানতে চান সে কথা?'

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ চাই। যদি অবশ্য তা জানাতে আপনার আপত্তি না থাকে।'

বৃদ্ধ আবার কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'সে কথা বলতে আজ আর আমার কোনো আপত্তি নেই। অনেক বয়স হল, আর ক-দিনই বা বাঁচব! বরং সভ্য জগতের মানুষের কাছে মৃত্যুর আগে সে কথা জানিয়ে গেলে হয়তো তৃপ্তি পাব।'

সবুজ মানুষ এরপর সমবেত পিগমিদের উদ্দেশ্যে সুদীপ্তদের দেখিয়ে কী যেন বললেন। তার কথা শেষ হবার পর পিগমিদের দলটা একটা উল্লাস করে উঠে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। চারপাশে আবার ঢাক বাজতে শুরু করল। তবে এ ঢাকের ছন্দ অন্যরকম।

সবুজ মানুষ বললেন, 'ওরা যখন যুদ্ধ জয়ের আনন্দে উৎসব করবে। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।' সুদীপ্তদের এ কথা বলে ওটুম্বাকে কী একটা নির্দেশ দিয়ে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে সুদীপ্তদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। একজন পিগমি যোদ্ধা মশাল হাতে তাঁদের আগে আগে চলতে লাগল।

সুদীপ্তরা এসে দাঁড়াল গ্রামের শেষ প্রান্তে এক বেশ বড় কুঁড়েঘরের সামনে। রক্ষীর হাতের মশাল নিয়ে সুদীপ্তদের সাথে করে ফোকর গলে কুঁড়ের ভিতর প্রবেশ করলেন সবুজ মানুষ। ভিতরে আছে একটা খড়ের বিছানা। চিতার চামড়া বিছানো আছে তার ওপর। বসার জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটা কাঠের গুঁড়ি। দেওয়ালে টাঙানো আছে বিভিন্ন ধরনের হরিণের মাথা আর একটা আদ্যিকালের ম্যাচলক বন্দুক। মশালটা মাটিতে গুঁজে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসলেন বৃদ্ধ। সুদীপ্তরা তাঁকে ঘিরে বসল। তার ভিতরে ঢুকে বসার প্রায় সাথে সাথেই দুজন পিগমি ঘরে ঢুকে দুটো পাত্র নামিয়ে রেখে গেল। বড়পাত্রে ঝলসানো মাংস আর ফলমূল, আর ছোটপাত্রে একটা সবুজ রঙের ক্বাথ। সেই পাত্রটা দেখিয়ে বৃদ্ধ হেরম্যানকে বললেন, 'এটা ওষধি লতাগুল্মর মণ্ড। ক্ষতস্থানে লাগিয়ে নিন। দ্রুত সেরে যাবে। আর, খাওয়া সেরে নিন। তারপর বলব আমার কাহিনি।' টোগো কাজে লেগে পড়ল। হেরম্যানের ক্ষতস্থানে ক্বাথর প্রলেপ লাগিয়ে, জামার একটা হাতা ছিঁড়ে তা দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। ইতিমধ্যে আরও একজন পিগমি জলের পাত্র দিয়ে গেল। হেরম্যানের ক্ষতস্থান বেঁধে দেবার পর দ্রুত খেতে শুরু করল তারা। উত্তেজনায় দুদিন খিদে-তৃষ্ণার কথা ভুলেই গেছিল তারা। বৃদ্ধ তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তাদের। সুদীপ্ত লক্ষ করল, বৃদ্ধর চোখ মুখ কেমন যেন বিষণ্ণতা মাখা! তার নীল চোখের দৃষ্টি যেন স্মৃতির অতলে ডুব দিচ্ছে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়া শেষ করে সবুজ মানুষের মুখোমুখি বসল সকলে।

হেরম্যান সবুজ মানুষের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি আপনার কাহিনি আমাদের বলুন।

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, 'কত যুগ পরে আমি সভ্য পৃথিবীর মানুষের সাথে কথা বলছি! জানি না সব কিছু আপনাদের গুছিয়ে বলতে পারব কিনা! এতদিন পরে হয়তো সব কিছু মনেও নেই। তবে নামটা কিন্তু আমার এখনও মনে আছে,—'ম্যাকলিন ডায়ার।'

তার নাম আর পদবি শুনে চমকে উঠল সুদীপ্ত।

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সবুজ মানুষ শুরু করলেন তাঁর কাহিনি—

'আমার জন্ম উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অধীনস্থ জাঞ্জিবারে। জাতিতে আমি ইওরোপীয়, ব্রিটিশ বংশভূত। আমার বাবা ম্যাক ডায়ার আমার জন্মের কিছুকাল আগে

অন্যান্য বহু ইউরোপীয়র মতো ভাগ্যান্বেষণে আফ্রিকা আসেন ও জাঞ্জিবারে এক হীরের খনির মালিক হন। আজকের জাঞ্জিবার কেমন তা আমার জানা নেই, কিন্তু সে সময় জাঞ্জিবার ছিল পাথরের তৈরি ছোট্ট শহর। আর তার চারপাশে ছিল ছোট-বড় বেশ কিছু হীরের খনি। সেখানকার বাসিন্দা ছিল কিছু ইংরেজ, জার্মান, আরব আর স্থানীয় বান্টু জনগোষ্ঠীর লোক। ব্যবসা বাণিজ্য বলতে হীরা আর হাতির দাঁতের কারবার। আর তার সাথে সাথে ছিল দাস ব্যবসার রমরমা। আমাদের ঠিক বাড়ির কাছেই ছিল একটা দাসবাজার। আরও একটা জিনিস সেখানে সেসময় ছিল, কলেরার প্রকোপ! আমার যখন মাত্র তিন বছর বয়স তখন সে রোগেই আমার মা মারা যান। আমার বাবা আর চাকর বাকরদের কাছেই মানুষ হতে থাকি আমি। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার উচ্চতা অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি বাবার মুখে শুনেছিলাম, আমার পিতৃপুরুষরা নাকি প্রত্যেকেই দীর্ঘকায় ছিলেন, তাঁর নিজের উচ্চতাও ছিল ছ ফুট। তবে তাঁরা কেউই অতি অস্বাভাবিক ছিলেন না, যে প্রবণতা লক্ষ করা গেল আমার মধ্যে। মাত্র দশ বছর বয়সে আমার উচ্চতা হয়ে দাঁড়াল সাড়ে পাঁচ ফুট। প্রকৃতি দেবতার আমাকে নিয়ে এই অদ্ভুত খেলাই আমার জীবনে অভিশাপ নামিয়ে আনল। আমরা এক ইওরোপীয় মহল্লায় বাস করতাম। সেই মহল্লাতেই ইওরোপীয় ছাত্রদের জন্য ছোট এক মিশনারি স্কুলে পড়াশোনার জন্য বাবা আমাকে ভর্তি করিয়ে ছিলেন আট বছর বয়সে। মাত্র দুটো ক্লাস সেখানে পড়তে পেরেছিলাম আমি। কারণ, আমার এই অস্বাভাবিক উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য স্কুলের ছেলেরা আমার পিছনে লাগতে শুরু করল। সেখানে আমি আর টিকতে পারলাম না। স্কুল ছাড়তে হল। আমি খুব কম বয়সে মাতৃহীন হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আসল দুর্ভাগ্যের শিকার হতে শুরু করলাম ওই স্কুল ছাড়ার সময় থেকেই।

আমার বয়স যখন বারো, তখন আমার উচ্চতা হল পাকা ছ ফুট! এবার আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে যাওয়াও বন্ধ করতে হল আমাকে। রাস্তায় ছেলেরা আমাকে দেখলেই 'ডেমন! ডেমন!' বলে চিৎকার করত, পাথর ছুড়ত। আমার বাবা ছিলেন নরম মনের মানুষ। ছেলের এই অবস্থা দেখে মনে মনে কষ্ট পেতেন। আমার অন্য কোনো ভাইবোন ছিল না। বাবা সন্ধ্যায় খনি থেকে ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমি ঘরের ভিতরই কাটাতাম। বাবার এক খুড়তুতো ভাই, 'মন্টিলা' এ সময় ইংল্যান্ড থেকে জাঞ্জিবারে এসে উপস্থিত হলেন তার পরিবার নিয়ে। ইংল্যান্ডে কী একটা ঘটনা ঘটায় তাদের সে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। সে এসে বাবার সাথে দেখা করে বলল, সে কপর্দকহীন, বাবা যদি তার খনিতে ভাইয়ের একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে সে পরিবার নিয়ে বাঁচতে পারে। বাবা ঠিক করলেন কাকা ও তার পরিবারকে আমাদের বাড়ি এনে রাখবেন। কাকাকে তত্ত্বাবধায়কের কাজ দেবেন খনিতে। তাতে খনির কাজ ভালো করে দেখাশোনাও হবে, আর আমিও বাড়িতে আপনজনের সঙ্গ পাব। তাছাড়া, সেসময় খনি মালিকদের বাড়িতে মাঝে মাঝে ডাকাতি হতো। বাড়িতে অনেক দুর্মূল্য জিনিস আছে। অনেক লোক থাকলে, বিপদের সম্ভাবনাও কম। এসব ভেবেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কাকা

এ প্রস্তাব লুফে নিল। সে তার স্ত্রী আর তিন পুত্রকে নিয়ে ঘাঁটি গাড়ল আমাদের বাড়িতে।

প্রথম প্রথম সব কিছু ভালোই চলছিল। কিন্তু, যত দিন এগোতে লাগল তাদের সবার স্বরূপ আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম আমি। কাকার তিন ছেলে, 'ম্যাকুই, মিক, আর ম্যাকুলা। আমার প্রায় সমবয়সি তারা, অসম্ভব দুর্দমনীয় আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির। আমাকে তারা তিনজন নানাভাবে কষ্ট দিয়ে নিজেরা আনন্দ পেত। বাবাকে তাদের ব্যাপারে নালিশ জানালে বাবাকে কাকা কাকিমা বোঝাল, আমি একলা একলা থাকার কারণে ভাইদের সাথে মিশতে শিখিনি। এসব কোনো ব্যাপার নয়, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা বিশ্বাস করলেন তাদের কথা। সময় এগোতে থাকল। ঠিক কিন্তু কিছুই হল না। ক্রমশ আরও হিংস্র হয়ে উঠতে লাগল তারা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াত তারা। একদিন সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বান্টু উপজাতির একটা বাচ্চা ছেলেকে স্রেফ পিটিয়ে মেরে ফেলল তিন ভাই। বাবা অনেক কষ্টে ধামাচাপা দিলেন ঘটনাটা। ইতিমধ্যে কাকার স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত হল। বাবা খবর পেলেন, কাকা খনি থেকে হীরে সরাচ্ছে! তাছাড়া আরব দাস ব্যবসায়ীদের সাথে ক্রীতদাস কেনাবেচার ব্যবসাতেও টাকা ঢালছে! এবার সতর্ক হয়ে গেলেন বাবা। ভালো করে খনির যাবতীয় হিসাবপত্র দেখতে লাগলেন। হীরে যা উঠত, তার মধ্যে যা দুর্মূল্য তা বাড়িতে এনে সবার অগোচরে পাথরের দেওয়ালে গর্ত করে লুকিয়ে রাখতেন। শুধু আমাকে জানিয়ে রাখতেন ব্যাপারটা। কাকাকে তিনি সতর্ক করে দিলেন, তার বা তার ছেলেদের কোনোরকম বেয়াদপি দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়ি থেকে বার করে দেবেন। মুশকিলে পড়ে গেল কাকা ও তার ছেলেরা। মুখে তারা কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারতাম। আমার ও বাবার প্রতি তাদের আক্রোশ ক্রমশ বাড়ছে। এভাবেই বছর ঘুরতে থাকল, আর আমার উচ্চতাও বাড়তে থাকল। আঠারো বছর বয়সে আমার উচ্চতা হল আট ফুট!

বাবা আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আর কাকাদের ব্যবহারের কারণে এমনিতে খুব বিমর্ষ হয়ে থাকতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি খনি থেকে ফিরে বেশ উৎফুল্ল হয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন। তারপর পকেট থেকে বার করলেন প্রায় হাঁসের ডিমের আকৃতির একটা পাথর। যাকে বলে 'আনকাট ডায়মন্ড।' তিনি বললেন, পাথরটা নাকি সেদিনই খনি থেকে উঠেছে। এত বড় হীরা নাকি কোনো দিন কোথাও পাওয়া যায়নি। আমার ভবিষ্যতের আর কোনো চিন্তা নেই। তিনি আমাকে নিয়ে এবার ইওরোপে ফিরে যাবেন। হীরাটা ইওরোপে বেঁচে যে পয়সা পাওয়া যাবে তাতে আমরা সেখানে রাজার হালে জীবন কাটাতে পারব। আর সভ্য সমাজে আমার উচ্চতা নিয়েও তেমন বিব্রত হতে হবে না। তিনি হীরেটার একটা নামকরণও করলেন, 'কিং অব জাঞ্জিবার'—'জাঞ্জিবারের রাজা!' তিনি আমাকে এ-ও বললেন, যে সুড়ঙ্গের মধ্যে তিনি পাথরটা পেয়েছেন সেখানে পরদিন একবার যাবেন তিনি। এমনও হতে পারে এ জাতীয় হীরা আরও সেখানে আছে! এরপর বাবা ফিরে গেলেন নিজের ঘরে। সারা রাত জেগে পাথরটাকে ঘষামাজা করে পরদিন তিনি রওনা হলেন খনিতে।

কিন্তু সেদিনই যে আমার জীবনে চরম দুর্যোগ নেমে আসবে তা আমি জানতাম না। কাকা ও তার ছেলেরা ভিতরে ভিতরে অন্য মতলবে ছিল। খনির কিছু লোককে তারা টাকাপয়সা দিয়ে হাত করে নিয়েছিল। বাবা সেদিন খনিতে নামতেই অন্ধকার নির্জন সুড়ঙ্গে একদল লোক গাঁইতি হাতে তাকে ঘিরে ধরল। বাবা আর ফিরলেন না খনি থেকে। কাকা কয়েকজন নিরীহ খনি-শ্রমিককে গুলি করে মেরে রটিয়ে দিলেন, তারাই নাকি হীরের লোভে খুন করেছিল বাবাকে। কাকা তাদের শাস্তি দিয়েছেন।

বাবার মৃত্যুর পরই শুরু হল আমার জীবনের ভয়ঙ্করতম দিন। বাবার লুকিয়ে রাখা হীরার সন্ধানে আমার ওপর শুরু হল অমানুষিক অত্যাচার। তাদের ধারণা হয়েছিল আমি সেসবের সন্ধান জানি। চাবুকের মার সহ্য করতে না পেরে দেওয়ালে লুকিয়ে রাখা হীরের সন্ধান আমি তাদের দিয়ে মুক্তি পেতে চাইলাম। কিন্তু তাতে ফল আরও মারাত্মক হল। তাদের ধারণা হল আমি আরও গুপ্তধনের সন্ধান জানি। অত্যাচারের পরিমাণ উল্টে আরও বেড়ে গেল! চামড়ার চাবুক প্রতিদিনই কেটে বসতে লাগল আমার পিঠে। এ কাজটা করত বিশেষত ম্যাকুলা। অত্যাচার আমার আর সহ্য হল না। আমি একদিন পালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ম্যাকুই আমাকে ধরে ফেলল। আমাকে তালা বন্ধ করা হল ঘরে। সে দিন রাতে ম্যাকুলা তার দুই ভাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকল আমাকে শাস্তি দেবার জন্য। আর তারপর...!"

এত বছর পরও বৃদ্ধ যেন শিউরে উঠলেন সে দিনের কথা বলতে গিয়ে। মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা মুছে ফেললেন তিনি!

'তারপর কী? প্রশ্ন করলেন হেরম্যান।

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, "ম্যাকুলার হাতে ছিল একটা জাঞ্জিবার নাইফ। আরব দাস ব্যবসায়ীরা ও-ছুরি ব্যবহার করত। তারপর এই যে—" বৃদ্ধ ম্যাকলিন তার পায়ের পাতা-দুটো দেখালেন। সুদীপ্ত দেখতে পেল বৃদ্ধর পায়ের পাতায় বুড়ো আঙুল দুটো নেই!

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে রইল আঙুলহীন পায়ের পাতা দুটোর দিকে চেয়ে। বৃদ্ধ তারপর আবার বলতে শুরু করলেন—

"সে কী অসহ্য যন্ত্রণা তা ভাবতে পারবেন না আপনারা। মৃত্যু মনে হয় তার চেয়ে শ্রেয়। কিন্তু মানুষ তো বাঁচতে চায়, বাঁচার ইচ্ছা তাই আমার মধ্যেও জেগে রইল। এ ঘটনার মাস দুয়েক বাদে সুস্থ হয়ে ওঠার পর আবার পালাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম আমি। একদিন সে সুযোগ এসেও গেল। সেদিন বাড়িতে ম্যাকুইকে একলা আমার পাহারায় রেখে বাড়ির অন্য সবাই গেছে পাশের শহরে একটা আমোদ উৎসবে। রাতে আর সেদিন কেউ বাড়ি ফিরবে না। সন্ধ্যাবেলা একলা সময় কাটছে না দেখে, আমাকে নিয়ে তামাশা করার জন্য চাবুক হাতে ম্যাকুই আমার ঘরের তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। আমিও তাকে আমার ঘরের দিকে আসতে দেখেই মনে মনে তৈরি হয়ে গেছিলাম। ঘর অন্ধকার। সে ঘরে পা রাখতেই কাঠের টেবিলের একটা ভাঙা পায়া দিয়ে আমি আচমকা আঘাত করলাম তার মাথায়। তাকে খুন করার সাহস বা ইচ্ছা না থাকলেও

আঘাতটা মনে হয় জোরেই হয়ে গেছিল। কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল ম্যাকুই। আমি বুঝতে পারলাম সেখানে থাকলে মৃত্যু আমার অনিবার্য। পালাতে হবে আমাকে। সামান্য কিছু টাকাপয়সা আর দেওয়ালে ঝোলানো ওই ম্যাচলক বন্দুকটা সম্বল করে সেই সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়লাম আমি। কিন্তু কোথায় যাব? আমার তো অন্য কোনো ঠিকানা নেই! সারা রাত পায়ে হেঁটে পৌঁছলাম নিয়ামো বলে এক ছোট শহরে, নিয়ামোজি আর আরবদের বাস সেখানে। একজনের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমি শুনতে পেলাম ম্যাকুইকে খুনের অপরাধে আমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। দিন তিনেক সেখানে থাকার পর আমি একদিন সেখানের রাস্তায় ম্যাকুলা আর ম্যাককে দেখতে পেলাম। বুঝলাম আমার সে তল্লাটে থাকার খবর পেয়েছে তারা। ধরা পড়লেই নির্ঘাত তারা খুন করবে আমাকে। আবার সেদিনই পালালাম আমি। তারপর এ শহর থেকে সে শহর পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম আমি। আট ফুট তিন ইঞ্চির কোনো মানুষকে কোনো ছদ্মবেশেই লুকিয়ে রাখা যায় না। আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারতাম না। খবর ঠিক পৌঁছে যেত। ম্যাকুলা আর ম্যাক আমাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল এখান থেকে সেখানে। বেশ কয়েকবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম আমি। অবশেষে জাঞ্জিবারের সীমানা ত্যাগ করে আমি হাজির হলাম তাঙ্গানিকা রাজ্যে। ডেরা বাঁধলাম এক মাসাই গ্রামে। মাসাইরা কেউ আট ফুট উচ্চতার না হলেও সাড়ে ছয়, এমনকী সাত ফুট উচ্চতার লোক সেখানে হামেশাই দেখা যায়। আমি খুব একটা বেমানান হলাম না তাদের মধ্যে। সামান্য লম্বা এই যা। আমি থেকে গেলাম সেখানে।

ভালোই কাটছিল সেখানে আমার। ভাবলাম বুঝি বিপদ কাটল। কিন্তু বছর দুই কাটতে না কাটতে দুই ভাই এসে হানা দিল সেখানে। মাসাই সর্দার আমাকে তাদের হাতে তুলে দিতে না চাওয়ায় যুদ্ধ বাধল। বেশ কয়েকজন মাসাই আর ম্যাক মারা গেল লড়াইতে। ম্যাকুলা পালাল ঠিকই কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম প্রতিহিংসা নেবার জন্য ফিরে আসবে সে। মাসাইদের একটা দল সেসময় নৌকা নিয়ে তাঙ্গানিকার উত্তরে রওনা হচ্ছিল শিকারের উদ্দেশ্যে। মাসাইরা আমাকে বলল, 'তোমার তো বন্দুক আছে, তুমি আমাদের সাথে শিকারে চলো।' গ্রাম ত্যাগ করলে বেশি নিরাপদে থাকতে পারব ভেবে আমি তাদের নৌকাতে গিয়ে উঠলাম। নৌকা ভাসল তাঙ্গানিকাতে। কিন্তু সে যাত্রাও আমার পক্ষে শুভ হল না। সব মিলিয়ে জনা পনেরো লোক ছিলাম নৌকাতে। সে সংখ্যা কিছু দিনের মধ্যেই কমতে শুরু করল। জঙ্গলে শিকার করতে নেমে পাঁচ জন গেল সিংহর পেটে, একজন গেল সাপের কামড়ে। তিনজন কালা জ্বরে। দুর্ভাগ্য যেন আমার পিছু ছাড়ছিল না। মাসাইদের হঠাৎ কেন জানি ধারণা হল, তাদের সঙ্গীদের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। প্রত্যেকবার শিকারে এসে দু-একজন লোক আর গ্রামে ফেরে না ঠিকই, কিন্তু এত লোক তো কখনো মরে না? নিশ্চয়ই আমি কোনো অপদেবতা! নইলে সাদা মানুষ এত লম্বা হবে কেন? আর সভ্য জগৎ ছেড়ে আমি বা জংলি মাসাইদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন?

যে মাসাইরা কদিন আগে আমাকে রক্ষা করার জন্য রক্ত ঝরাল, আমি বুঝতে পারলাম তারাই এবার ভিতরে ভিতরে আমাকে খুন করার মতলব আটছে!'

—এ পর্যন্ত বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন বৃদ্ধ। তারপর আবার বলতে লাগলেন তাঁর কথা।

সুদীপ্তরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগল তার রোমাঞ্চকর জীবনকাহিনি—

"আমার কাছে বন্দুক ছিল বলে আমাকে সরাসরি আক্রমণ করতে মাসাইরা সাহস পেল না ঠিকই। কিন্তু একদিন শিকারের সন্ধানে যখন আমি জঙ্গলে নেমেছি, তখন তারা আমাকে জঙ্গলে ফেলে রেখে নৌকা নিয়ে পালাল! আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল গহীন অরণ্যে একলা মানুষ আমি! সম্বল বলতে একটা বন্দুক, সামান্য কিছু গুলি বারুদ। বুঝতে পারলাম সাহস হারালে মৃত্যু আমার অনিবার্য। তাই মন শক্ত করে তাঙ্গানিকার তির বরাবর জঙ্গল ধরে উত্তরে হাঁটতে লাগলাম আমি, যদি কোনো লোকালয় পাওয়া যায় সেই আশাতে। দিনের পর দিন কাটতে লাগল। এ সময় কত কষ্ট যে আমি সহ্য করেছি, কতবার যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছি তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন! একবার তো একটা সিংহ আমার পিঠ থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিল, তবু বেঁচে গেলাম আমি! কোনোদিন না খেয়ে, কোনোদিন সামান্য ফলমূল বা কাঁচা মাংস খেয়ে দিন কেটেছে আমার। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এ সময় একদিন খিদের তাড়নায় একটা আহত সিংহকে মেরে তার কাঁচা মাংসও খেয়েছি আমি! পরে অবশ্য আমি অভিজ্ঞতায় দেখেছি, জঙ্গলে যখন প্রাণ বাঁচানোই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে তখন খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক প্রায়শই বিপরীত হয়ে ওঠে।

যাই হোক, এ রকমই চলতে চলতে আমি একদিন জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে আকাশের বুকে পাহাড়ের সারি দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম আমি চলতে চলতে গ্রেট রিফট্ উপত্যকার কাছে পৌঁছে গেছি! মাসাইদের মুখে এ জায়গার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম এদিকে কোথায় যেন একটা লোকালয় আছে, যদিও পরে বুঝেছিলাম তা সঠিক নয়। লোকালয়ের কথা ভেবে এ দিকেই এগোতে লাগলাম আমি। আর তার পর দিনই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল! সকালবেলা নদীর পাড় ধরে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলছিলাম। হঠাৎ হ্রদের পাড় থেকে মানুষের গলার শব্দ কানে এল। জঙ্গলের ভিতর থেকে তাকিয়ে দেখি, হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন লোক। কিছু দূরে জলের মধ্যে রয়েছে একটা ছোট নৌকা। তাদের দেখে মনে হল, তারা সোয়াহিলি এবং তাদের পোশাক বলছে সভ্য জগতের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। লোকগুলোর সাথে একটা কাঠের বাক্স ছিল, আর তারা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই বাক্সটাকে নৌকায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল। নৌকা ও লোক দেখে বাঁচার আশায় আমি জঙ্গল ছেড়ে ছুটলাম তাদের দিকে। কিন্তু তাদের কাছে যেতেই লোকগুলো বর্শা নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে বসল। আমি ততদিনে জঙ্গলের নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রাণ বাঁচাতে আমি তখনই একজনকে গুলি করে খতম করে দিলাম। বাকি দুজন ঝাঁপ দিল জলে। তারপর সাঁতরে নৌকায়

উঠে নৌকা নিয়ে পালল। তাদের সম্ভবত ধারণা হয়েছিল আমি কোনো প্রেতাত্মা হব! একে তো জঙ্গলের ত্রিসীমানায় কোনো মানুষ নেই। তার পরে আমার এ রকম অদ্ভুত চেহারা, সে চেহারা আবার অনাহারে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে! তাই তাদের ধারণাকে দোষ দেওয়া যায় না। যাই হোক নৌকা, চলে যাওয়ায় আমার সভ্য জগতে ফেরার শেষ আশাও মুছে গেল। হতাশ হয়ে আমি হ্রদের পাড়ে বসে পড়লাম। এরপর হঠাৎ যেন তাদের ফেলে যাওয়া বাক্স থেকে কীসের নড়াচড়ার শব্দ কানে এল আমার! বাক্সটা কাপড়ে মোড়া ছিল। কৌতূহলী হয়ে বাক্সটার কাছে গিয়ে তার কাপড় সরাতেই দেখি, সেটা আসলে হল কাঠের তৈরি একটা খাঁচা। আর তার মধ্যে গুটিশুটি মেরে বসে ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে! তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। তারপর আরও ভালো করে তার দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম, আসলে সে বাচ্চা নয়, সে একজন বামন মানুষ,—'পিগমি!' ব্যাপারটা তখনই আমি মোটামুটি অনুমান করে নিলাম। ইওরোপীয়দের অনেকেই আফ্রিকার জঙ্গলচারী মানুষদের মানুষ বলেই মানত না। পিগমিদের ভাবত বানর জাতীয় জন্তু বিশেষ। জঙ্গলে লোক পাঠিয়ে পিগমিদের ধরে এনে কোনো কোনো ইওরোপীয় তাদের বাড়ির প্রাচীরঘেরা বাগানে পোষা হরিণের মতো ছেড়ে রাখত বা খাঁচায় বন্দি করে রাখত। বুঝতে পারলাম লোকগুলো সম্ভবত ওই কারণেই ধরে নিয়ে যাচ্ছিল লোকটাকে! বামন লোকটার থেকে আবার মরার কোনো সম্ভাবনা নেই আমি খাঁচা খুলে তাকে মুক্ত করে দিলাম। সে কিন্তু পালল না। আমার পায়ের কাছে পড়ে পায়ে চুমু খেতে লাগল। বান্টু, ভাষাটা আমি বলতে না পারলেও কিছু কিছু বুঝতে পারতাম। কিছুক্ষণ পর তার কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম সে আমার দানবীয় উচ্চতা দেখে আমাকে তাদের অরণ্যের লৌকিক দেবতা টাইবুরু ভেবেছে। সে ধরে নিয়েছে তার ডাক শুনে আমি তাকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছি! লোকটা জানাল তার নাম, 'ওলাওলা'। দূরের ওই যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তার ওপাশে এক পিগমি গ্রাম আছে. ওলাওলা হল সেই গ্রামের রাজা। সে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের এ পাশে এসেছিল শিকারের খোঁজে। আর তারপর সোয়াহিলিদের হাতে ধরা পড়ে।

ওলাওলা এরপর তার সাথে তার গ্রামে যাবার জন্য অনুরোধ জানাল। পিগমিদের গ্রাম হোক আর যাই হোক, মানুষের গ্রাম তো, জঙ্গল অপেক্ষা অনেক নিরাপদ। তাছাড়া ওলাওলা বলল, তার ওই পিগমি গ্রাম ছাড়া আশেপাশে কোনো গ্রাম নেই। কাজেই তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে তার সাথে এ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম আমি। তারপর পাহাড় ডিঙিয়ে তার সাথে একদিন এ গ্রামে পৌঁছে গেলাম। গ্রামের লোকেরা আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। রাজাকে তারা ফিরে পাবে ভাবেনি। তাছাড়া তার সাথে দানবাকৃতি একজন লোক। ওলাওলা পিগমিদের বলল সব ঘটনা। আমার আকৃতি দেখে তারাও নিঃসন্দেহ হল আমি দেবতা টাইবুরু। এরপর গ্রামে থাকতে শুরু করলাম আমি। তারাও আমাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে লাগল। আর আমিও তাদের আমার সাধ্যমতো

শিক্ষিত করে তুলতে লাগলাম। প্রথম প্রথম আমি ভেবেছিলাম যদি কোনো সভ্য লোক এ তল্লাটে আসে তাহলে তার সাথে সভ্য পৃথিবীতে ফিরে যাব। কিন্তু এখানে থাকতে থাকতে কখন কীভাবে আমি এদের একজন হয়ে গেলাম তা আমি নিজেই জানি না! আস্তে আস্তে ফেরার ইচ্ছাটা আমার মন থেকে মুছে গেল। দিন, মাস, বছর কাটতে লাগল। প্রথম কয়েক বছর সন-তারিখের হিসাব আমি রাখতাম, তারপর একদিন সেসব কিছুও হারিয়ে গেল। আমি কত বছর এখানে আছি, আমার বয়স কত, এ সব কোনো কিছুই আজ আমি বলতে পারব না।”

একটানা তাঁর জীবনকাহিনি বর্ণনা করে দম নেবার জন্য থামলেন বৃদ্ধ। সুদীপ্ত-হেরম্যান বিস্মিত হয়ে শুনছে তাঁর কথা! তাদের চোখের পলক পড়ছে না। ঘরের ভিতর মশালের আলোও নিবু নিবু হয়ে এসেছে। বৃদ্ধ আবার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন;—

“এই এত বছরের মধ্যে সভ্য দুনিয়ার মানুষ যে আমি দেখিনি তা নয়। বিভিন্ন সময় বেশ কয়েকজন ইওরোপীয় এ গ্রামের আশেপাশে এসেছিল। এদের কেউ বা পাদ্রী, কেউ বা শিকারি। দূর থেকে তাদের দেখেছি আমি। তাদের দেখে এক এক সময় তাদের কাছে গিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা হতো। কিন্তু পরক্ষণেই আমি নিজেকে সামলে নিতাম। আসলে এখানে আসার পরও ম্যাকুলাদের আতঙ্ক মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। ভাবতাম যদি তাঁর কাছে কোনো ভাবে খবর পৌঁছে যায় সে তাহলে আমার সন্ধানে এখানেও পিছু ধাওয়া করবে। তবে আমার ধারণা অমূলক ছিল না। খবর নিশ্চয়ই তার কাছে পৌঁছে ছিল। হয়তো এখানে যারা এসেছিল তারা কেউ আমাকে দেখে ফেলে আমার কথা গল্প করেছিল সভ্য সমাজে। ঠিক যেভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছেছিল সবুজ মানুষের খবর। বছর কুড়ি আগে এত বছর বাদেও একজন এখানে এসেছিল আমার সন্ধানে। আমাদের বহু লোককে সে গুলি চালিয়ে মারে। শেষপর্যন্ত পিগমিরা তাকে মেরে পশ্চিমের পাহাড়ে দেহটাকে ঝুলিয়ে দেয়। যে কঙ্কালটাকে নামিয়ে আপনারা কবর দেন। তার হাতে একটা আংটি ছিল, সেটা দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে ডায়ার বংশেরই কেউ হবে। আর আজ ম্যাকুইনার মুখটাও ভালোভাবে কাছ থেকে দেখলাম। সেটা ঠিক যেন ম্যাকুইনার মুখ! একইরকম হিংস্রতা সেই মুখে। ম্যাকুলার মুখ আমি আজও ভুলিনি। আজও তারা খুজে বেড়াচ্ছে আমাকে। ম্যাকুইনা তার প্রমাণ।” কথা শেষ করলেন বৃদ্ধ।

তন্ময়ভাবে তাঁর কথা শোনার পর হেরম্যান প্রথমে বৃদ্ধকে বললেন, ‘হ্যাঁ, আপনার ধারণাই ঠিক। ম্যাকুইনা বলেছিল, ওই কঙ্কালটা তার বাবার। এখন বুঝতে পারছি ম্যাকুইনা আপনার আসল পরিচয় জানত। বংশপরম্পরায় তারা আপনাকে খুঁজছে! এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘আপনার পরনের এই সবুজ চামড়ার আচ্ছাদনের রহস্য কী?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, ‘পিগমিদের আরাধ্য দেবতা টাইবুরুর সাথে আমার চেহারার শুধু একটাই পার্থক্য ছিল। অরণ্যের রক্ষাকর্তা, পিগমিদের দানবীয় দেবতার গায়ের রং নাকি সবুজ। যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাদের লৌকিক উপকথায় তাই তারা শুনছে। যে কারণে

বছরে একদিন তারা আমাকে পশ্চিম পাহাড়ে দেবতা রূপে পুজো দেবার আগে আমার গায়ে সবুজ রং মাখিয়ে দিত। আমি একদিন ভাবলাম ব্যাপারটা মন্দ নয়। সবুজ পোশাকে সহজেই জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায়। তাছাড়া এভাবে কেউ যদি আমাকে দেখে সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে আমার কথা গল্প করে তবে কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। এ ভাবনা মাথায় আসতেই একটা গোরিলার চামড়া সংগ্রহ করলাম। তারপর তাতে সবুজ রং মাখিয়ে পোশাক বানিয়ে নিলাম। তবে আমার জানা ছিল না, আপনাদের মতো কিছু মানুষ আছেন যারা এ জাতীয় প্রাণীর সন্ধানে এত দূরে ছুটে আসতে পারেন!'

এরপর একটু থেমে বৃদ্ধ বললেন, 'তবে আজ আবার বুঝলাম, আট ফুট তিন ইঞ্চির কোনো মানুষ কোনো ছদ্মবেশেই কোথাও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না! হয়তো আবার আমার সন্ধানে কয়েক বছর পর এখানে কেউ আসবে। ম্যাকুইনার ছেলে বা ভাই অথবা আপনাদের মতো কোনো অভিযাত্রী। তবে তারা আর কেউ আমাকে পাবে না। আমি বুঝতে পারছি আমার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে এসেছে, চোখে ঝাপসা দেখি আমি। এমনিতেই বুড়ো আঙুল দুটো চলে যাবার পর থেকে হাঁটা চলার সময় ভারসাম্য রাখতে আমার অসুবিধা হত। সে সমস্যা আরও বাড়ছে। পশ্চিমের পাহাড়ে টাইবুরুর থানে আমার আস্তানা ছেড়ে আমি আর এখন নীচে গ্রামে নামি না। নেমেছিলাম আপনাদের জন্য। ওই পাহাড়ে আমার সমাধির ব্যবস্থা করবে ওটুম্বা। সভ্য জগৎ থেকে অনেক অনেক দূরে গহীন অরণ্যের পার্বত্য উপত্যকায় শান্তিতে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকব আমি। শেষ হতে চলেছে আমার দীর্ঘ অভিশপ্ত জীবনকাহিনি। আজ বহু বছর পর মৃত্যুর আগে যা সভ্য জগতের মানুষের কাছে জানিয়ে যেতে পেরে কিছুটা শান্তি পেলাম আমি।'

মশালের আলো প্রায় নিভে গেছে। শুধু তার একটা মৃদু আভা এসে পড়েছে বৃদ্ধর মুখে। বিষাদ মাখানো নীল চোখে বৃদ্ধ ম্যাকলিন নিশ্চুপভাবে তাকিয়ে আছেন সুদীপ্তদের দিকে। নিস্তব্ধ, প্রায় অন্ধকার ঘরে বৃদ্ধ মানুষটার হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা বেদনা যেন স্পর্শ করেছে সুদীপ্তদের। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সুদীপ্ত বলল, 'বংশ পরম্পরায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য মানুষ কত দূর ছুটে আসতে পারে তাই না? ভাবতেও অবাক লাগে! কী বিচিত্র প্রাণী মানুষ!'

মশালের আলো সুদীপ্তর কথা প্রায় শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিভে যাবার আগে একবার দপ্ করে জ্বলে উঠল। মুহূর্তের জন্য সুদীপ্তর যেন মনে হল, বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে একটা আবছা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে! আর এরপরই ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আবার, কিছু সময়ের নিস্তব্ধতা। তারপর বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন এবার বাইরে যাই, ভোর মনে হয় হয়ে এল!'

বৃদ্ধর সাথে কুঁড়ের বাইরে এসে দাঁড়াল সুদীপ্তরা। পিগমিদের ঢাকের বাজনা অনেকক্ষণ থেমে গেছে। কুঁড়ের ভিতর তন্ময় হয়ে গল্প শুনতে শুনতে সুদীপ্তরা সেটা খেয়াল করেনি। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে খোলা আকাশের নীচে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে তারা। নিস্তব্ধ চারপাশ। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। শুকতারা ফুটে উঠেছে আকাশের

কোণে। অল্প অল্প ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে বাইরে। পাহাড়ের মাথার ঘাসের জঙ্গলের আগুনও নিভে এসেছে, শুধু একটা সাদা ধোঁয়ার রেখা ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের মাথায়। অনেকটা ঠিক ভোরের কুয়াশার মতো। অচেতন পিগমির দল। নিদ্রিত কুঁড়েঘরের পাশ দিয়ে বৃদ্ধ ধীর পায়ে সুদীপ্তদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন ওঙ্গোর থানের দিকে।

কিছু দূর থেকেই সুদীপ্তর চোখে পড়ল ওঙ্গোর পাশে ঝাঁকড়া গাছটার ডাল থেকে কী যেন একটা ঝুলছে! ভালো করে সেদিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল ওটা আসলে ম্যাকুইনার মৃতদেহ। পিগমিরা তাকে ঝুলিয়ে রেখেছে গাছের ডালে।

সুদীপ্তরা এসে দাঁড়াল গাছটার নীচে ওঙ্গোর মূর্তির সামনে। এখন এখানে আর কেউ নেই। রাত শেষের বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে ম্যাকুইনার মৃতদেহ। সুদীপ্তদের আর ম্যাকুইনার রাইফেলগুলো কাছেই মাটিতে শীতঘুমে পড়ে আছে। ম্যাকুইনার দেহর দিকে তাকিয়ে হেরম্যান বৃদ্ধকে বললেন, 'ওকে ঝোলানো হল কেন?' ম্যাকলিন বললেন, 'এটা এখানকার প্রথা। যারা কোনো চরম অপরাধ করে, তাদের মৃত্যুর পর এভাবে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হয়। যাতে তারও ওই একই পরিণতি হতে পারে ভেবে ভবিষ্যতে অন্যরা অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকে।'

ম্যাকুইনার ঝুলন্ত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত বলল, বংশপরম্পরায় লালিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এসে শেষপর্যন্ত বাবা-ছেলে দুজনকেই নিজেদের জীবন খোয়াতে হল! তাছাড়া আরও কত মানুষ মরল ওদের জন্য! কী ভয়ঙ্কর এই প্রতিহিংস বাসনা!

তার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'প্রতিহিংসা ঠিক নয়, লোভ। লোভই ওদের শেষ করল!'

তাঁর কথা শুনে হেরম্যান আর সুদীপ্ত একসাথে বলে উঠল, 'মানে?'

স্পষ্টতই এবার একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল বৃদ্ধর বলিরেখা আঁকা মুখমণ্ডলে। সুদীপ্তদের কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনি ওঙ্গোর মূর্তির দিকে ফিরে তার ডান হাতটা সটান ঢুকিয়ে দিলেন দেবতা ওঙ্গোর করাল মুখগহ্বরে। সেখানে হাতড়ে হাতড়ে কী যেন একটা জিনিস তিনি তুলে এনে সেটা হাতের তালুতে নিয়ে মেলে ধরলেন সুদীপ্তদের সমনে। সেটা একটা বেশ বড় নুড়ি আকৃতির পাথর। আধো অন্ধকারে যেন একবার সেটা ঝিলিক দিয়ে উঠল!

সুদীপ্তদের সেটা দেখিয়ে বৃদ্ধ ধীরকণ্ঠে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'নিছক প্রতিহিংসার জন্য নয়, আসলে এর সন্ধানেই যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় ম্যাকুলা-ম্যাকুইনারা খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে।'

সুদীপ্ত জিনিসটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী ওটা?'

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইলেন তার হাতে ধরা জিনিসটার দিকে। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, 'বাড়ি থেকে এটা সঙ্গে করে পালিয়েছিলাম আমি। এ হল আমার কাহিনির সেই 'কিং অব জাঞ্জিবার!'

বিস্মিত হয়ে সুদীপ্তরা বেশ কিছুক্ষণ পাথরটার দিকে তাকিয়ে থানার পর, সুদীপ্ত ম্যাকলিনের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমরা একবার ওটা হাতে নিয়ে দেখতে পারি?'

নিশ্চুপভাবে বৃদ্ধ পাথরটা এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

সুদীপ্ত হাতে নিয়ে দেখল পাথরটা। একটু লম্বাটে ধরনের। মুরগির ডিমের আকৃতির একটা হীরা! সে পাথরটা দেখার পর সেটা তুলে দিল হেরম্যানের হাতে।

হেরম্যান পাথরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে যখন আবার বৃদ্ধর হাতে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছেন তখন সুদীপ্তদের চমকে দিয়ে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'ওটা আপনারা আপনাদের কাছেই রাখুন। এত কষ্ট করে এত দূর এসে খালি হাতে ফিরে যাবেন?'

হেরম্যান বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বললেন, 'আমরা এটা নেব কেন? এর সন্ধানে তো আমরা এখানে আসিনি। আমাদের এর প্রতি কোনো লোভ নেই।

বৃদ্ধ মৃদু হেসে প্রথমে বললেন, 'লোভ নেই বলেই তো ওটা ম্যাকুইনার হাতে তুলে না দিয়ে আপনাদের দিলাম।' তারপর একটু থেমে বললেন, তাছাড়া ওটা আর এখানে থাকুক আমি তা চাই না। আমার জীবন তো শেষ হয়ে এল। পিগমিরা এখনও জিনিসটার সঠিক মূল্য জানে না। হয়তো একদিন তা জানবে। আমার মৃত্যুর পর ওর জন্য খুনোখুনি করবে নিজেদের মধ্যে। অথবা ম্যাকুইনার মতো কেউ আবার হানা দেবে এখানে, নিজেরা মরবে বা গুলি চালিয়ে মারবে অরণ্যচারী নিরীহ পিগমিদের, ধ্বংস করবে অরণ্য। তাছাড়া এসব রত্ন অসভ্য পিগমিদের জন্য নয়, সভ্য সমাজেই ওর স্থান হওয়া উচিত।

বৃদ্ধর শেষের কথাতে যে একটা চাপা শ্লেষ রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হল না সুদীপ্তর।

হেরম্যান বললেন, 'কিন্তু...

বৃদ্ধ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আলো ফুটতে শুরু করবে। এবার ফিরতে হবে। আপনাদের পুবের পাহাড়ে পৌঁছে দিয়ে পশ্চিমে নিজের ডেরায় ফিরব আমি।'—এই বলে মাটিতে পড়ে থাকা রাইফেলগুলো ইশারায় তুলে নিতে বলে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলেন।

সুদীপ্তরা রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে নিশ্চুপভাবে তাঁকে অনুসরণ করল।

গ্রাম ছেড়ে পুবের পাহাড়ে উঠতে উঠতে আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে এল। শুকতারা প্রায় মুছে গেছে তখন। সে পাহাড়ে উঠে বৃদ্ধর সাথে উল্টো দিকের ঢালের সামনে সুদীপ্তরা এসে উপস্থিত হল। ঢাল বেয়ে ফেরার পথ ধরতে হবে।

সারাটা পথ কেউ কোনো কথা বলেনি। এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সবাই।

ঢাল বেয়ে নামার আগে হেরম্যান বৃদ্ধর উদ্দেশ্যে বললেন, 'এখনও কিন্তু ভেবে দেখার সুযোগ আছে।'

'কী?' মৃদুস্বরে বললেন বৃদ্ধ।

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আমাদের সাথে ফেলে আসা পৃথিবীতে ফেরার।'

বিষণ্ণ চোখে বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন সুদীপ্তদের দিকে। তারপর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন, 'না।' সুদীপ্তরা ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

সুদীপ্তরা তখন বেশ অনেকটা পথ নেমে এসেছে। বেশ আলো ফুটেছে। আস্তে আস্তে প্রভাতকিরণে দৃশ্যমান হচ্ছে নীচের সবুজ বনানী আচ্ছাদিত উপত্যকা। দু-একটা পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে। একটা বাঁকের মুখে এসে শেষ বারের জন্য একবার পিছনে ফিরে তাকাল সুদীপ্ত। ফেলে আসা পাহাড়ের মাথার ওপর উদিত হচ্ছেন সূর্যদেব। তার আলো ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের মাথায়। সুদীপ্ত স্পষ্ট দেখল এক দীর্ঘকায় সবুজ মানুষ একলা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সে একবার যেন হাত নাড়ল সুদীপ্তর উদ্দেশ্যে, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সুদীপ্তর দৃষ্টিপথের বাইরে।

পুনশ্চ : আবার তাঙ্গানিকা! দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির সমারোহ। দু-দিন পর এক সকালে হ্রদের পাড়ে এক বিরাট বাওয়াব গাছের তলায় সুদীপ্তরা বসেছিল। গতকাল সন্ধ্যায় তারা এসে পৌঁছেছে এখানে। রাতটাও এখানেই কাটিয়েছে। পথে আস্কারি আর কুলিদের সন্ধান মিলে গেছে। তারাও সঙ্গে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঙ্গানিকার তীর ধরে দিনের যাত্রা শুরু করবে তারা। সেই পথ ধরে, যে পথে এসেছিল তারা।

হেরম্যান ফেরার পথে কেমন যেন চুপ মেরে গেছেন। প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা তিনি বলেননি এ দু-দিনে। রাতেও তাকে জেগে বসে থাকতে দেখেছে সুদীপ্ত। যেন সব সময় কী যেন তিনি চিন্তা করে চলেছেন। তবে এই নিশ্চুপতা তার এত বড় অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবার কারণে কিনা তা সুদীপ্তর জানা নেই। কিন্তু অভিযান পণ্ড হলেও হেরম্যান যে এখন বেশ ধনী তা বলতে দ্বিধা নেই। পাথরটার কত দাম হবে কে জানে!

হেরম্যান নিশ্চুপভাবে চেয়ে ছিলেন জলরাশির দিকে। পাশে বসা সুদীপ্ত তার উদ্দেশ্যে বলল, 'এর পরের অভিযান কোথায় করবেন? সেখানে আমায় সঙ্গে নেবেন তো?

হেরম্যান কোনো জবাব দিলেন না তার কথায়।

এরপর কিছু দূরে এক অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল সুদীপ্তর। একদল জলহস্তী হ্রদের পাড়ে একটা বড় ঝাঁকড়া গাছের নীচে কাদামাটিতে এতক্ষণ বসেছিল। এবার তারা উঠে দাঁড়িয়েছে মুখ হাঁ করে। কোত্থেকে একদল লাল মুখো বাঁদর এসে জড়ো হয়েছে সেই গাছে। বেলের মতো অনেক ফল ঝুলছে সেই গাছে। বাঁদরগুলো ওই ফল ছিঁড়ে ছুড়ে দিচ্ছে জলহস্তীদের বিরাট হাঁ করা মুখের ভিতর। প্রাণীগুলো ফলগুলো গিলে নিচ্ছে! অদ্ভুত দৃশ্য! সুদীপ্ত ব্যাপারটা দেখার পর প্রথমে হেরম্যানের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ওই দেখুন কী অদ্ভুত ব্যাপার!' তারপর টোগোকে বলল, 'বাঁদরগুলো ওদের ফল খাওয়াচ্ছে কেন?'

টোগো বলল, 'এ দৃশ্য আমি এর আগে দেখেছি। জঙ্গলের বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে

নানা অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জলহস্তীরা ওই ফল খায় কারণ, ওই ফলের শক্ত খোলা ওদের পরিপাকে সাহায্য করে। আর বাঁদররা ওই ফল ছুড়ে দিয়ে ওদের ডেকে আনে কারণ, তাহলে জলহস্তীর উপস্থিতিতে কুমিরদের দূরে সরিয়ে ওরা জল খেতে পারে। ওই দেখুন জলহস্তীর দঙ্গলের ফাঁক দিয়ে একদল বাঁদর হ্রদে জল খেতে নেমেছে।'

টোগোর কথা শুনে হঠাৎ হেরম্যান উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন সেই গাছের দিকে।

সুদীপ্ত বলল, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?'

হেরম্যান শুধু জবাব দিলেন, 'জলহস্তীকে ফল খাওয়াতে।'

তাঁর কথা বুঝতে না পেরে কাদামাটিতে নেমে সুদীপ্ত তাকে অনুসরণ করল।

হেরম্যান আর সুদীপ্ত গাছটার কাছাকাছি পৌঁছাতেই তাদের দেখে গাছের ডাল ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। সতর্ক হয়ে জলহস্তীগুলো একে একে জলে নেমে যেতে লাগল। তারা যখন জায়গাটাতে পৌঁছল তখন একটাই মাত্র জলহস্তী দাঁড়িয়ে আছে হ্রদের কিনারে। তার আকার দেখে মনে হল সম্ভবত এ প্রাণীটাই পালের গোদা। প্রাণীটা লাল চোখ দুটো দিয়ে সতর্কভাবে দেখতে লাগল সুদীপ্তদের। হেরম্যান কাদা ভেঙে সোজা তার দিকে এগোতে লাগলেন। তার পিছনে সুদীপ্ত।

হেরম্যান তখন প্রাণীটার প্রায় কাছাকাছির মধ্যে পৌঁছে গেছেন। জলে নামার আগে শেষবারের মতো একটা বিরাট হাঁ করল প্রাণীটা। আর হেরম্যান মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ট্রাউজারের পকেট থেকে কী যেন বার করে অব্যর্থ লক্ষে জিনিসটা ছুড়ে দিলেন জলহস্তির হাঁ করা মুখে। সুদীপ্তর মনে হল প্রাণীটার মুখগহ্বরে মুহূর্তের জন্য যেন সেটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। পরমুহূর্তে প্রাণীটা মুখবন্ধ করে বিশাল বপু নিয়ে ঝাঁপ দিল জলে। জল তোলপাড় করতে করতে জলহস্তীর ঝাঁক এগিয়ে চলল তাঙ্গানিকার গভীরে।

এবার সুদীপ্তর দিকে ফিরে তাকালেন হেরম্যান। তাঁর মুখে মেঘ কেটে গিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে হাসির রেখা। ঠিক সকালের ওই সূর্যের মতো। সুদীপ্তর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'জাঞ্জিবারের রাজাকে তাঙ্গানিকাকে দিয়েদিলাম। উফ্ঃ, এ দুটো দিন কী দুশ্চিন্তাতেই কেটেছে আমার! এ জিনিস আমাদের জন্য নয়। ওটা কাছে রাখলে আর কোনো ক্রিপটিডের সন্ধানে যাওয়া হত না আমার।'

সন্দ্বীপের সোনার ড্রাগন

টেবিলে ম্যাপটা ধরে হেরম্যান বললেন, 'এ দেশটায় প্রায় চোদ্দো হাজার দ্বীপ। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে তা চন্দ্রকলার মতো ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে ছ'হাজার দ্বীপে মানুষের বসতি আছে। এখনও বহু এমন দ্বীপ আছে, যেখানে আজও মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি!'

এর পর তিনি সুদীপ্তকে বোঝাবার জন্য ম্যাপে আঙুল চালাতে-চালাতে বললেন, 'এই হল সুমাত্রা, জাভা-জাকর্তা। এটা বালি। বালির পূর্ব দিকে এই ফ্লোরেস দ্বীপে রয়েছি আমরা। পূর্বে কোমোডো আইল্যান্ড। চারপাশে আছে রিনকা, গিলিমোটাং, গিলিড্যাসামি ইত্যাদি। এ সবক'টা দ্বীপেই পৃথিবীর বৃহত্তম গিরগিটি বা কোমোডো ড্রাগনের দেখা মেলে। স্থানীয় লোকরা ওদের ডাকে 'বুয়জি দারাত' অর্থাৎ 'স্থল কুমির' বলে।'

সুদীপ্ত বলল, 'কোন দ্বীপে যাব আমরা?'

ম্যাপে চোখ রেখে হেরম্যান বললেন, 'আমরা যাব কোমোডো দ্বীপের আশি মাইল দক্ষিণে একটা দ্বীপে। কোমোডোর মতো ওটাও সুন্দাদ্বীপমালার অংশ। একদম প্রান্তভাগ। ওই দ্বীপ খুব বড় নয়, ম্যাপেও নেই। সুন্দা ধীবররা বলে 'ওরা দ্বীপ'। 'ওরা' কথার মানে 'গোসাপ'। কোমোডো ড্রাগনকে 'ওরা' বলেও ডাকা হয়। 'ওরা' দ্বীপ জনমানবহীন, তাই মাছ ধরার নৌকো ওর কাছে যায় না। ওখানে নাকি প্রাচীন ভূতেদের বাস! দ্বীপের ভিতর থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে!'

হেরম্যানের কথায় সুদীপ্ত বলল, 'ভূতের দ্বীপ যখন, আমরা সেখানে পা রাখলে আপনার সোনার ড্রাগনও ভূতের মতো মিলিয়ে যাবে না তো?'

সুদীপ্তর কথায় গম্ভীর হয়ে গেলেন হেরম্যান, বললেন, 'তুমি ঠাট্টা করছ? এই যে কোমোডো ড্রাগনের কথা গোটা পৃথিবী জানে, সে-ও কিন্তু একদিন গল্প-গাথার পৌরাণিক প্রাণী বা ক্রিপ্‌টিড হিসেবেই পরিচিত ছিল। ধীবররা তার কথা বললেও পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেননি। অথচ জাভার অনেক লোককথায় ওদের উল্লেখ ছিল। কীভাবে ওদের খোঁজ মিলল? ফান স্টেন ফান হ্যাভব্রেক নামে এক ওলন্দাজ বৈমানিক উড়ে যাচ্ছিলেন ওই দ্বীপের কাছ দিয়ে। হঠাৎ তাঁর বিমান সমুদ্রে ভেঙে পড়ে। বেঁচে যান তিনি। কাঠের গুঁড়ি ধরে সাঁতরে রাতের অন্ধকারে পৌঁছে যান ওই দ্বীপে। রাত কাটাবার জন্য গাছের মাথায় উঠে কিছুক্ষণ পর দেখতে পান, নীচে অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল কুমিরের মতো প্রাণী। অন্ধকারে চোখ জ্বলছে। শরীরের আঘাতে গাছের গুঁড়ি কাঁপছে। অনেক দূর থেকে তাদের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে! অন্ধকারে শিকার ধরে বেড়াচ্ছে

মাংসাশী প্রাণীগুলো। তাদের বিশাল আকৃতি ও নিশ্বাসের শব্দে ফান ধারণা করেন, ওগুলো ড্রাগন। ফিরে এসে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা শোনালে প্রাণীবিজ্ঞানীরা অভিযান চালান ওই দ্বীপে। খোঁজ মেলে কোমোডো ড্রাগনের। অথচ তার আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা উড়িয়ে দিতেন তার কথা। তুমি এখন আমার কথায় হাসলেও আমার বিশ্বাস, সোনালি কোমোডো ড্রাগন নিশ্চয়ই আছে।'

একটানা কথাগুলো বলে সুদীপ্তর উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইলেন হেরম্যান। সুদীপ্ত বলল, 'না, আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না, তবে সোনালি ড্রাগনের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো প্রমাণ....।'

হেরম্যান বললেন, 'প্রমাণ বলতে এখানকার বেশ কিছু পৌরাণিক কাহিনিতে এবং সুন্দা ধীবরদের লোককথায় এর উল্লেখ আছে। এদের অনেকে দেখেছে বলেও দাবি করে। দুজন ভিনদেশি লোকের কথাও বলি। শেষ খবরটা 'লন্ডন টাইম্স'-এর, বছর খানেক আগের। ইংরেজ প্রত্নবিদ রিচার্ড বালি দ্বীপের পাশের নানা দ্বীপে ঘুরছিলেন প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখার জন্য। 'ওরা' দ্বীপে ওই প্রাচীন মন্দিরের কাছে এক ভগ্নস্তূপে শেষ বিকেলে একলা কাজ করছিলেন রিচার্ড। তাঁর ইচ্ছে ছিল পরদিন মন্দিরে যাবেন। হঠাৎ ফোঁস শব্দ শুনে তিনি দেখলেন, কিছু দূরে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে বিশাল এক সোনালি কোমোডো। সাধারণত এরা দৈর্ঘ্যে আট থেকে দশ ফুট হয়। ওজন সত্তর থেকে একশো কেজি। কিন্তু রিচার্ডের স্থির বিশ্বাস, সেই ড্রাগন ছিল কমসেকম পনেরো ফুট। হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। তার নিশ্বাসে উঠেছিল ধুলোঝড়। তার আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখে রিচার্ড চিৎকার করে উঠলেন। লোকজনও ছুটে এল। আর তাতেই ঘাবড়ে গিয়ে মন্দিরের দিকে অদৃশ্য হল প্রাণীটি। এর একটু পরেই সন্ধে নামল। রিচার্ডের সঙ্গীরা ভয় পেল ড্রাগনের কথা শুনে। স্থানীয় মানুষরা গল্প শুনেছে, আগে এই মন্দিরে নাকি অপরাধীদের বলি দিয়ে সেই মাংস খাওয়ানো হত ড্রাগনদের। সেসব নিহত মানুষ ভূত হয়ে বাস করে মন্দিরে। কাজেই অনুসন্ধান শেষ না করে পরদিন দ্বীপ ছাড়তে হল রিচার্ডকে।' থামলেন হেরম্যান। এরপর ঘড়ি দেখে তিনি বললেন, 'এখন আমি কালকের যাত্রার জন্য নৌকোর ব্যবস্থা করতে বন্দরে যাব। দেখি কী ব্যবস্থা হয়। তুমি হোটেলের ঘরে বিশ্রাম নাও।' একথা বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

হেরম্যান যাওয়ার পর সুদীপ্ত জানলার ধারে দাঁড়াল। দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সুদীপ্তর পূর্বপুরুষরা সমুদ্র-সন্ধানে বেরিয়ে দ্বীপময় এই দেশের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সংস্কৃতি। আজও তার চিহ্ন লুকিয়ে আছে ইন্দোনেশিয়ার পান্না সবুজ দ্বীপমালায়। সুদীপ্তরা আজই এসে হাজির হয়েছে ফ্লোরেসে। হেরম্যানকে প্রথমে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে পৌঁছতে হয়েছিল কলকাতায়। তারপর দুজনে মিলে কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কক হয়ে দেনপাশার বিমানবন্দরে। সেখান থেকে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে ফ্লোরেসের মাউমেরে বিমানবন্দরে।

হেরম্যান মিষ্টভাষী, পরিশ্রমী, পণ্ডিত মানুষ। তাঁর অদ্ভুত শখ। নিজেকে একজন ক্রিপ্টোজুলজিস্ট বলেই পরিচয় দেন। পৃথিবীর নানা প্রান্তে লোকগাথায় এমন অনেক প্রাণী বা উদ্ভিদের কথা শোনা যায়, বিজ্ঞান যাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এদের বলা হয় 'ক্রিপটিড'। ক্রিপটিড নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের ডাকা হয় ক্রিপ্টোজুলজিস্ট বলে। হেরম্যান এক সময় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। পারিবারিক ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যবসায় মন না দিয়ে তিনি ব্যবসার অংশ বেচে সে টাকায় ক্রিপটিড খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁর সব অনুসন্ধানই ব্যর্থ হয়েছে। এবার এখানে এসেছেন সোনালি কোমোডো ড্রাগনের খোঁজে। তাসমানিয়ার ডিমপাড়া স্তন্যপায়ী প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মিলিকান্থ মাছ, জায়েন্ট স্কুইড, মেগামাউথ শার্কের কথা বিজ্ঞানীরা মানতেই চাইতেন না। অথচ সেসব তো সত্যি! এর আগে সুদীপ্ত তার সাথে আফ্রিকার গহীন অরণ্য প্রদেশে গ্রেট রিফট্ উপত্যকায় এক অভিযানে গেছিল সবুজ মানুষের খোঁজে। অভিযান ব্যর্থ হলেও বহু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল। সেই রোমাঞ্চের খোঁজেই এই ইন্দোনেশিয়াতেও হেরম্যানের সঙ্গী হয়েছে সুদীপ্ত।

হেরম্যান ফিরলেন সন্ধেরও বেশ পরে। সুদীপ্ত শুয়ে পড়েছিল। দরজা খুলে দিতেই চেয়ারের উপর ধপ করে বসে হেরম্যান বললেন, 'উঃ, নৌকো খুঁজতে জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। কেউই যেতে রাজি নয় ওদিকে। শেষ পর্যন্ত কটা চিনা জাঙ্ক জোগাড় হল। এক মালয় ব্যবসায়ী ওদিকে যাচ্ছে জাঙ্ক নিয়ে। তার সঙ্গে শেয়ারে যেতে হবে। কাল ভোরে যাত্রা শুরু করব।'

পরদিন সুদীপ্তরা যখন বন্দরে গিয়ে পৌঁছল তখন সূর্যদেব সবে উদয় হচ্ছেন। হেরম্যান বলেছেন তাদের জাঙ্কের নাম 'ঘোস্ট'।

হেরম্যান বললেন, 'চলো, ঘোস্টকে খুঁজে বের করার আগে কফি খেয়ে নেওয়া যাক।'

সুদীপ্তরা দোকানে ঢুকল। দু'মগ কফি নিল। কফি শেষ করে হেরম্যান যখন দাম মেটাতে যাচ্ছেন তখন দোকানদার বলল, 'না, পয়সা লাগবে না।'

হেরম্যান বললেন, 'কেন, আমরা বিদেশি বলে?'

চুপ করে থেকে লোকটা জবাব দিল, 'আমাদের বিশ্বাস আছে, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে পানীয় দান পুণ্যের কাজ।'

সুদীপ্তরা বেশ অবাক হল তার কথা শুনে। হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

বৃদ্ধ বলল, 'কাল বিকেলে আপনিই তো 'ওরা' দ্বীপে যাওয়ার জন্য নৌকো খুঁজছিলেন! আপনারা যে ওখানে যাচ্ছেন সেটা চাউর হয়ে গিয়েছে। ওই দ্বীপে প্রাচীন পুরোহিতদের প্রেতাত্মারা থাকেন। কোমোডোও আছে অনেক। মার্চ-এপ্রিল হল ওদের ডিম ফোটার সময়। ওরা এখন হিংস্র হয়ে ওঠে। ওই দ্বীপের গা ঘেঁষেই একটা দ্বীপে অসভ্য মানুষের বাস। ওদের তিরে অনেক ধীবরের প্রাণ গিয়েছে। কাজেই এত বিপদকে ফাঁকি দিয়ে আপনাদের ফিরে আসাটা...!' কথাটা শেষ করল না লোকটা।

হেরম্যানও আর কথা বাড়ালেন না। সুদীপ্তকে বললেন, 'অসভ্যদের দ্বীপের কথাটা জানা ছিল না। তবে চিন্তার কিছু আছে বলে মনে হয় না। বিদেশি দেখলে স্থানীয় মানুষরা অনেক কথা বাড়িয়ে বলে!'

সমুদ্রের তীর ধরে জাঙ্কের খোঁজে হাঁটতে শুরু করল সুদীপ্তরা। হেরম্যান বললেন, 'আরে, এই তো আমাদের জাঙ্কের মালিক লু-সেন! আমাদেরই খুঁজতে এদিকে আসছে।'

সুদীপ্ত দেখল এগিয়ে আসছে লম্বা এক চিনা লোক। সে এসে দাঁড়াল সুদীপ্তদের সামনে। পরনে নেটের গেঞ্জি আর জিনস্। ডান হাতের উপর দিকে কোমোডো ড্রাগনের উল্কি আঁকা। সে তার কুতকুতে চোখে একবার ভালো করে জরিপ করে নিল দুজনকে।

লু-সেন বলল, 'চলুন, মিস্টার সালুইন জায়া চলে এসেছেন। আপনাদের জন্যই দেরি হচ্ছে।'

সুদীপ্তরা লাগেজ নিয়ে অনুসরণ করল তাকে। যেতে-যেতে লোকটা হেরম্যানের উদ্দেশে বলল, 'শুনুন মিস্টার, আমি ছাড়া অন্য কেউ যে আপনাকে 'ওরা' দ্বীপে নিয়ে যেতে সাহস করবে না তা নিশ্চয়ই বুঝেছেন! টাকা দিচ্ছেন বলে মাথা কিনে নিচ্ছেন ভাববেন না। জাঙ্ক আমার মর্জিমতো চলে। ইচ্ছে না হলে কালই ফিরে আসতে পারি আমি। সেক্ষেত্রে টাকা ফেরত পাবেন। আগেই কথাগুলো জানিয়ে দিলাম।'

অন্য নৌকোগুলো থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল ঘোস্ট। গায়ে তার নাম লেখা। বেশ পুরনোই। একটা পালও আছে। আরও দুজন মাল্লা আছে। কাঠের পাটাতন বেয়ে লু-সেনের সঙ্গে জাঙ্কে ওঠার পর সে সুদীপ্তদের জাঙ্কের একটা ঘর দেখিয়ে চলে গেল ইঞ্জিনঘরের দিকে। লু-সেনের দেখানো ঘরে ঢুকল সুদীপ্তরা। ভিতরটা মামুলি। কাঠের ঘর, নিচু ছাদ। আসবাব বলতে একটা খাট। সুদীপ্তরা সে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র রাখতে-না-রাখতেই জাঙ্ক কেঁপে উঠল। ইঞ্জিন চালু হয়ে গিয়েছে। সুদীপ্ত ছোট ডেকের চারপাশ ভালো করে দেখল। এক দিকে দুটো খুপরি ঘর, অন্য দিকে রেলিংয়ের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধা আছে কয়েকটা পিপে। তার পাশেই একটা খাঁচায় রয়েছে দুটো বাঁদর জাতীয় ছোট প্রাণী। জাঙ্কের খোলে নামার পথ পিছন দিকে। সিঁড়ির কিছু অংশ জেগে আছে ডেকের উপর। সামনে সারেঙের ঘর।

জল কেটে এগিয়ে চলল জাঙ্ক। আশপাশে আরও কিছু নৌকো এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের গভীরে।

তটরেখা অস্পষ্ট হতে-হতে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। কুয়াশার আবরণ মুছে গিয়ে

ফুটে উঠছে দু'-একটা অস্পষ্ট দ্বীপ। হঠাৎ সারেঙের ঘরের দিক থেকে একজন লোককে হেঁটে আসতে দেখল সুদীপ্তরা। মাঝবয়সি, চোখে কালো সানগ্লাস, পরনে নীল রঙের দামি সুট। ভদ্রলোক সুদীপ্তদের সামনে এসে বললেন, 'আমি, সালুইন। সালুইন জায়া। আপনারাই তো 'ওরা' দ্বীপে যাচ্ছেন? পরিচয় করতে এলাম।' করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

পরিচয়দান ও করমর্দন শেষ হলে হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তো ব্যবসার কাজে ওখানে যাচ্ছেন শুনেছি? ওই দ্বীপে আগে গিয়েছেন? কত সময় লাগবে যেতে?'

সালুইন বললেন, 'ওই দ্বীপের পাশ দিয়ে আমি একবার গিয়েছি, কিন্তু নামা হয়নি। বেশ বড়, জনমানবহীন দ্বীপ। সন্ধে নাগাদ ওর কাছে পৌঁছে যাব আশা করা যায়। তবে রাতে তো নামা যাবে না। ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' একটু থেমে ভদ্রলোক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা ওদিকে কেন যাচ্ছেন? কোনও গুপ্তধনের খোঁজে নাকি?'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'এদিকে কিছু প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আছে শুনেছি। আমি ইতিহাসে আগ্রহী। সেসব দেখতেই যাচ্ছি। আমাদের দেখে গুপ্তধন সন্ধানী মনে হল কেন?'

সালুইন বললেন, 'অনেকের ধারণা, প্রাচীন মন্দিরে গুপ্তধন থাকে। তার খোঁজে অনেকে নানা দ্বীপে ঘুরে বেড়ান। তাঁরা দু'-একটা ভাঙা মূর্তি ছাড়া কিছু পেয়েছেন বলে শুনিনি। তাই জেনে নিলাম আপনারা সে গোত্রের কি না?'

হেরম্যান বললেন, 'না, আমরা সে গোত্রের নই।'

সালুইন বললেন, 'আপনারা যখন ইতিহাসে আগ্রহী, নিশ্চয়ই ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন মন্দির প্লম্বানন আর বরবুদুর দেখেছেন? প্লম্বাননের ব্রহ্মমূর্তি, বরবুদুরের হাতি আর কোমোডোর লড়াইয়ের পাথর-খোদাই কী অসাধারণ, তাই না?'

হেরম্যান তাঁর প্রশ্নে সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সমুদ্রের দিকে তাকালেন। সালুইন এর পর আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কাছ থেকেই কোনো কিছুতে ঘা দেওয়ার শব্দ শোনা যেতেই সকলে কথা থামিয়ে তাকাল। ডেকের উপর একটা ছোট কাঠের ঘর। তার দরজা তালাবন্ধ, কিন্তু বন্ধ পাল্লা কাঁপছে। ভিতর থেকে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে।

সুদীপ্ত বলল, 'দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ, কিন্তু ভিতরে কেউ আছে নাকি?'

কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জোরে কয়েকবার শব্দ হল সেখান থেকে, তারপরই ঘরের ভিতর থেকে ভেসে এল দুর্বোধ্য এক কণ্ঠস্বর!

হেরম্যান বললেন, 'আরে, এ তো মানুষের গলা!'

ঠিক সেসময় সুদীপ্তরা দেখল, ইঞ্জিনঘরের দিক থেকে লু-সেন আসছে। তাকে দেখে সালুইন বললেন, 'ও ঘরে কাকে আটকে রেখেছ?'

লু-সেন জবাব দিল, 'একটা ছেলে। ওর বাপ আজই আমার জাঙ্কে ওকে তুলে দিয়ে গিয়েছে কাজ শেখানোর জন্য। ধীবর-নাবিকের ছেলেরা তো এভাবেই কাজ শেখে। কিন্তু ছেলেটা জাঙ্কে থাকতে চাইছে না। জাঙ্ক থেকে পালাবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। তাই আটকে রেখেছি।'

সালুইন বললেন, 'বুঝলাম। আমরা এখন অনেক দূরে। ও পালাতে পারবে না। তুমি দরজা খুলে দাও।'

সালুইনের কথায় লু-সেন গিয়ে দরজার তালাটা খুলে দিল। অমনি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত খর্বাকৃতি ছেলে। ফুট চারেকও লম্বা নয়। কালচে গায়ের রং। ঝাঁকড়া কালো চুলে মুখের প্রায় অর্ধেক ঢাকা। তবে কেমন যেন রুক্ষ চেহারা।

সুদীপ্ত বিস্মিতভাবে বলল, 'এইটুকু ছেলে পালাবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়েছিল?'

সালুইন মাথা নাড়লেন। ছেলেটাকে একবার স্থিরদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে লু-সেন সালুইনকে বলল, 'আমি যাচ্ছি। হুইল ধরতে হবে।'

সালুইন সদ্বীপ্তদের উদ্দেশে বললেন, 'আমিও এখন যাই। আমরা একসঙ্গে অন্তত দিন পাঁচেক থাকছি। পরে ভালো করে কথা হবে।'

তাঁরা চলে যেতে ছেলেটা সুদীপ্তদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে ডেকের এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

সুদীপ্ত আর হেরম্যান নিজেদের কথায় ফিরে এলেন।

হেরম্যান বললেন, 'মিস্টার সালুইনকে প্লম্বানন আর বরবুদুর দেখার ব্যাপারে বাধ্য হয়েই মিথ্যে বলতে হল। ইতিহাসে আগ্রহী, অথচ ও দুটো বিখ্যাত প্রাচীন স্মারক না দেখে আমরা 'ওরা' দ্বীপের ভগ্নস্তূপ খুঁজছি শুনলে লোকটা সন্দেহ করত।'

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু ওরাও তো এই দ্বীপে নামবে?'

হেরম্যান বললেন, 'দ্বীপে নেমে যে-যার কাজে দু'ভাগে ছড়িয়ে যাব। তখন বুদ্ধিমতো কাজ করা যাবে।'

কিছুক্ষণ গল্প করার পর এক সময় আর ডেকে দাঁড়াতে ভালো লাগল না সুদীপ্তদের। তাঁরা ঘরে ঢুকল। বারোটা নাগাদ দুপুরের খাওয়া হলে জাঙ্কের দুলুনি আর একঘেয়ে শব্দে ঘুমিয়ে পড়ল সুদীপ্ত।

বিকেলে ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে এসে সুদীপ্ত দেখল, জাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়েছে। লু-সেনের লোক দুজন নোঙর নামাচ্ছে জলে। আগেই ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন হেরম্যান। সুদীপ্তকে বললেন, 'লু-সেন বলে গেল, আজ এখানেই রাত্রিবাস করব আমরা। 'ওরা' দ্বীপ বেশি দূর নয়। দূরে কালো মতন একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে, ওটা একটা দ্বীপ। তার ওপাশেই 'ওরা' দ্বীপ। বিন্দুর মতো দ্বীপটায় ট্রাইবালদের বাস। এ সময় নাকি ও জায়গা অতিক্রম করা নিরাপদ নয়। তাই ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

সুদীপ্ত তাকাল দূরের দ্বীপটার দিকে। তার মাথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সুদীপ্তর চোখ গেল ডেকের কোনার দিকে। সেখানে একইভাবে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছেলেটা। তাকে দেখে বেশ কষ্ট হল সুদীপ্তর। এতটুকু ছেলে! কতই বা বয়স ওর? ভবিষ্যতের রুটি-রুজির জন্য এই বয়সে একলা অন্যের নৌকোয় তুলে দিয়ে গেল ওর বাবা।

আলাপ জমাবার জন্য সুদীপ্ত এগিয়ে গিয়ে পিঠে হাত রাখতেই চমকে উঠে মুখ

ফেরাল ছেলেটা। ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় ভাষা বাহাসা। সুদীপ্ত জানে না সে ভাষা।

বই দেখে কাজ চালানোর মতো কিছু বাহাসা বাক্য শিখেছেন হেরম্যান। তিনি বাহাসায় তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু জবাব মিলল না। কিছুক্ষণ হেরম্যানের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ছেলেটা দূরের দ্বীপের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। তারপর ডেক পেরিয়ে, তাকে যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামল সমুদ্রের বুকে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সুদীপ্তরা যখন ডেকে পা রাখল, বাতাসে বেশ ঠান্ডা ভাব। সালুইন, লু-সেনসহ জাঙ্কের নাবিকরা ডেকেই হাজির। নাবিকদের দুজন পাল খাটাতে শুরু করেছে।

হেরম্যান পালের দিকে তাকিয়ে বললেন 'জাঙ্ক কি এবার পালে চলবে?'

সালুইন বললেন, 'পুরোটা নয়, কিছুটা। ট্রাইবাল আইল্যান্ড পেরোতে হবে। কুয়াশার জন্য দ্বীপবাসীরা হয়তো আমাদের দেখতে পাবে না। ইঞ্জিনের শব্দ ওদের কানে যেতে পারে। দ্বীপের অধিবাসীরা আদিম। সভ্য মানুষদের পছন্দ করে না। আমরাও দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইঞ্জিন বন্ধ করে দেব।'

সুদীপ্ত বলল, 'ওই দ্বীপের নাম কী?'

সালুইন বললেন, 'নামটা অদ্ভুত! 'আস্কারি অফ গড' অর্থাৎ 'ভগবানের প্রহরী'। ওই দ্বীপ থেকে 'ওরা' দ্বীপের দূরত্ব মাত্র মাইল দুই। আমরা অবশ্য নামব 'ওরা' দ্বীপের উলটো পারে নিরাপদ জায়গায়।'

'দ্বীপটার ও নাম কেন?' জানতে চাইলেন হেরম্যান।

সালুইন বললেন, 'লোকে বলে, হাজার বছর আগে যখন 'ওরা' দ্বীপে মানুষ থাকত, তখন ওখানে নাকি রক্ষীদল থাকত। নামটা অবশ্য সাহেবরা দিয়েছে।'

পাল খাটানো হয়ে গেল। সালুইনের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলে লু-সেন চলে গেল ইঞ্জিনঘরে। তারপরই জাঙ্ক চলতে শুরু করল। ডেকে দাঁড়িয়ে রইল সালুইনসহ সুদীপ্তরা। দ্বীপটা কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। জাঙ্কের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিনঘর থেকে বেরিয়ে এল লু-সেন। হাতে একটা বাইনোকুলার। সেটা তুলে দিল সালুইনের হাতে। বাইনোকুলার দিয়ে সালুইন দ্বীপের দিকে চোখ রাখলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীপের প্রায় কাছাকাছি চলে এল জাঙ্ক। তারপর দ্বীপটাকে পাশে রেখে এগিয়ে চলল। সালুইন আর লু-সেনের দৃষ্টি দ্বীপের দিকে। ডেকের কোণ থেকে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার শোনা গেল। সুদীপ্ত তাকিয়ে দেখল, এক কোণে রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে রাখা কাঠের পিপের উপর

উঠে দাঁড়িয়েছে সেই ছেলেটা। আঙুল তুলে দ্বীপের দিকে দেখিয়ে উত্তেজিত স্বরে কী যেন বলছে! লু-সেন ছেলেটার দিকে এগোল। হঠাৎই সকলকে চমকে দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল ছেলেটা! প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সালুইন চিৎকার করে উঠলেন, 'ছেলেটার মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে! ওকে জাঙ্কে তোলো।'

লু-সেন বলল, 'কিন্তু জাঙ্ক আর দ্বীপের কাছে নেওয়া যাবে না। অসভ্যরা আক্রমণ করতে পারে। তবে ও পালাতে পারবে না।' লু-সেন আর সময় নষ্ট করল না। রেলিংয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে-ও লাফ দিল জলে। ছেলেটা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ওকে তাড়া করল লু-সেন।

সালুইন জাঙ্কের লোক দুজনকে বললেন, 'নোঙর ফেলে জাঙ্ক দাঁড় করাও। কাছি ধরে থাকবে। ওরা জাঙ্কে উঠলেই নোঙর তুলে নেবে।'

তাঁর কথামতো কাজ হল। ছেলেটা মনে হয় বুঝতে পারল লু-সেন তার পিছনে রয়েছে। সে গতি বাড়িয়ে দিল। ক্রমশ তারা দুজনেই সেই দ্বীপের দিকে এগোতে লাগল। হেরম্যান আর সুদীপ্ত দেখতে লাগলেন রুদ্ধশ্বাস সেই দৃশ্য। কিন্তু লু-সেনের সঙ্গে সাঁতারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না ছেলেটা। লু-সেন তাকে ধরে জাঙ্কের দিকে টেনে আনতে লাগল। তাকে নিয়ে কাছি ধরে জাঙ্কে উঠল। ছেলেটা কাঁপছে। লু-সেন ডেকে উঠে ছেলেটাকে তার ঘরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ছুটল ইঞ্জিনঘরের দিকে। ফের ইঞ্জিন চালু হল। দ্বীপটাকে পাশে রেখে দ্রুত এগিয়ে চলল জাঙ্ক।

যতক্ষণ না জাঙ্ক সে দ্বীপের সীমানা পেরোল, ততক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর মাইলখানেক দূরে চোখে পড়ল আর-একটা দ্বীপ।

সালুইন আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে 'ওরা' দ্বীপ। দ্বীপটাকে বেড় দিয়ে অন্য পাশে নামব আমরা।'

হেরম্যান বললেন, 'ও হঠাৎ ঝাঁপ দিল কেন?'

সালুইন বললেন, 'জল দেখে মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তবে দ্বীপে উঠলে জংলিরা ওকে মেরে পুড়িয়ে খেত!'

সুদীপ্ত বলল, 'এখানে কি ক্যানিবল আছে নাকি?'

তিনি বললেন, 'এ দেশের বোর্নিওতে আছে। শুনেছি, আস্কারি দ্বীপের বুনোদেরও নাকি এ ব্যাপারে অরুচি নেই!'

'ওরা' দ্বীপ এগিয়ে আসতে লাগল। সকালের সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে সোনালি বালুতট। তার কিছুটা তফাত থেকেই শুরু হয়েছে ঘন গাছের জঙ্গল। জঙ্গল এত ঘন যে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দিনমানেও সূর্যের আলো মাটি ছুঁতে পারছে না। দ্বীপের কাছে পৌঁছেও জাঙ্ক কিন্তু প্রথমে তটরেখা স্পর্শ করল না। দ্বীপটাকে বেড় দিয়ে এগিয়ে চলল।

সালুইন হেরম্যানকে বললেন, 'দ্বীপে পা রাখার আগে দু'দলের কর্মপন্থা ঠিক করে নেওয়া দরকার। তা হলে এক দলের জন্য অন্যদের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে না।'

হেরম্যান বললেন, 'আমিও কথাটা বলতাম। আপনার পরিকল্পনাটা জানাবেন?'

সালুইন বললেন, 'আমার কাজ শেষ হতে তিন থেকে সাতদিন লাগতে পারে। গোটা জঙ্গল ঘুরে ভালো গাছ বাছতে হবে তো। সমুদ্রতটের কাছাকাছিই তাঁবু ফেলব। আপনারা আপনাদের মতো কাজ করুন, আমরা আমাদের মতো। তিনদিন পর পরশু সন্ধের মধ্যে তাঁবুর কাছে ফিরে আসবেন। তারপর স্থির করব দ্বীপে থাকার দরকার আছে কি না।'

হেরম্যান বললেন, 'ঠিক আছে। এটাই ভালো বন্দোবস্ত।'

সালুইন বললেন, 'জঙ্গলে তো নামতে যাচ্ছেন! আপনাদের সঙ্গে কোনো হাতিয়ার আছে তো? এ সময়টায় আবার কোমোডো ড্রাগনের ডিম থেকে বাচ্চা বেরোয়। ডিমে তা দেওয়ার ফলে ক্ষুধার্ত থাকে ওরা। ওরা দূর থেকে মাংসের গন্ধ পায়। ওদের চোয়ালে কত দাঁত আছে জানেন? ষাটটা! আমার বা আপনার মতো একটা মানুষকে খেয়ে নিতে পারে!'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'ওদের সম্বন্ধে আমিও কিছুটা পড়েছি।'

এরপর জাঙ্কের একজন লোক এসে সালুইনকে বলল যে, লু-সেন তাঁকে ডাকছে। কাজেই সালুইন সেদিকে এগোলেন।

সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'দ্বীপটায় কীভাবে অনুসন্ধান চালাবেন?'

হেরম্যান বললেন, 'প্রত্নবিদ রিচার্ড প্রাচীন এক ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি প্রাণীটাকে দেখেছিলেন। ও জাতীয় ধ্বংসস্তূপ দ্বীপের কোথায়-কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে। আমরা একদিক থেকে শুরু করে গোল হয়ে অনুসন্ধান চালাব।'

সুদীপ্ত বলল, 'আর সালুইন যে হাতিয়ারের কথা বললেন?'

হেরম্যান বললেন, 'আমার কাছে রিভলভার আছে। ওর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

সুদীপ্ত চেয়ে রইল 'ওরা' দ্বীপের দিকে। এগোতে শুরু করল জাঙ্ক।

জাঙ্ক থেকে নেমে হাঁটুজল পেরিয়ে পারে উঠল সুদীপ্তরা। জাঙ্কের থেকে সকলেই নামল। সেই ছেলেটার কোমরে দড়ি বেঁধে লু-সেন তাকে নামাল। ছোট ছেলেটার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। হেরম্যান পারে উঠে সালুইনকে বললেন, 'ছেলেটাকে কি লু-সেন বেঁধেই রাখবে? আমার দেখতে খুব খারাপ লাগছে!'

সালুইন বললেন, 'ব্যাপারটা আমারও খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় নেই। এত বড় জঙ্গলে ও যদি পালিয়ে যায়, তা হলে খোঁজা মুশকিল হবে'

জাঙ্কের নাবিকরা জিনিসপত্র সব নামিয়ে ফেলল। সুদীপ্তদের জিনিসপত্র তেমন নেই।

দুটো রুকস্যাক, দিনকয়েকের মতো কিছু শুকনো খাবার, সামান্য পোশাক, ক্যামেরা, ছুরি, কাগজপত্র আর টুকিটাকি জিনিস। এ ছাড়া আছে একটা হালকা অথচ মজবুত তাঁবু।

তটরেখার কিছু দূর থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। সালুইন বাইনোকুলার দিয়ে চারপাশ দেখে নেওয়ার পর সকলে জঙ্গলে ঢুকল। দলের সব শেষে সেই ছেলেটা আর তার কোমরের দড়ি হাতে লু-সেন। জঙ্গলের ভিতর বেশ কিছুটা এগোবার পর বিশাল একটা গাছের সামনে সালুইনরা থামলেন। গাছটা দেখে অবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। পাঁচজন মানুষও বেড় দিয়ে ধরতে পারবে না গাছটার গুঁড়ি। সেই গুঁড়ি যেন উপরে উঠে স্তম্ভের মতো আকাশকে ধরে রেখেছে।

সালুইন বললেন, 'ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্টে এ ধরনের বড় গাছ দেখা যায়।' তারপর হেরম্যানের উদ্দেশে বললেন, 'আমি এখানে তাঁবু ফেলব। আপনারা এখানেই ফিরবেন।'

হেরম্যান বললেন, 'ঠিক আছে। তা হলে এই কথাই রইল। তিনদিনের মধ্যে ফিরে আসব আমরা।'

এর পর সালুইন আর লু-সেনের থেকে বিদায় নিয়ে এগোতে যাচ্ছিল সুদীপ্তরা। হেরম্যান সেই ছেলেটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভয় পেয়ো না। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।' তিনি কথাগুলো ইংরেজিতেই বললেন, যা ছেলেটার বোঝার কথা নয়। কিন্তু কথাগুলো বলে তিনি যেই পা বাড়াতে গেলেন, হঠাৎ ছেলেটা হেরম্যানের কোটের প্রান্তটা খামচে ধরে উদ্ভট ভাষায় কী বলতে যেন শুরু করল। হেরম্যান দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছেলেটার কথা হেরম্যান বা সুদীপ্তর বোধগম্য হচ্ছে না। সালুইন হেরম্যানের কোটটা ছাড়াবার জন্য ছেলেটার কাছে এগিয়ে এলেন। কিন্তু সে আরও জোরে চেপে ধরল কোটটা এবং চেঁচিয়ে হেরম্যানকে কী যেন বলার চেষ্টা করতে লাগল। লু-সেন এবার চিৎকার করে একটা হ্যাঁচকা টান দিল দড়িতে। সেই টানে হেরম্যানের কোট ছেড়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল ছেলেটা।

সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি মাটি থেকে তাকে তুলে দাঁড় করাল। হেরম্যান বললেন, 'না, ওর মাথা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে। ও আমাকে কী বলছিল?'

লু-সেন বলল, 'তেমন কিছু না। জল দেখে ও ভয় পেয়েছে। আপনারা যাত্রা শুরু করুন।'

হেরম্যান বললেন, 'ওকে বেশি বকাবকি করার দরকার নেই। ঘরবাড়ি ছেড়ে এত দূরে এসেছে তো!'

ছেলেটা উঠে দাঁড়াবার পর আর কোনো কথা না বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সুদীপ্তদের দিকে। হেরম্যান আর না দাঁড়িয়ে অরণ্যের ভিতরে ঢোকার জন্য সুদীপ্তকে নিয়ে এগোলেন।

হেরম্যান বললেন, 'আমার অভিযান এবার বিফলে যাবে না। মাঝেমধ্যে ভাবতে খুব খারাপ লাগে যে, প্রচলিত বিজ্ঞানের চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা আমাদের নিয়ে কত হাসাহাসি করেন! এ কাজে না আছে টাকাপয়সা, না আছে খ্যাতি।'

সুদীপ্ত বলল, 'তা হলে এ কাজ করেন কেন?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'বলতে পারো, এটা একটা নেশা।'

সুদীপ্ত বলল, 'আচ্ছা, এসব জঙ্গলে সত্যিই কি সোনা লুকনো থাকতে পারে?'

হেরম্যান বললেন, 'প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সম্পদ লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। আসলে এসব নিয়ে নানা মিথ গড়ে ওঠে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হিন্দু ও বৌদ্ধদের আগমন ঘটে এসব অঞ্চলে। সুমাত্রা ও জাভা অঞ্চলে গড়ে ওঠে শ্রীবিজয় রাজ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ব জাভার মাজাপাহিত হিন্দু রাজ্যের উত্থান হয়। শ্রীবিজয় রাজ্যের পতন ঘটে। বৌদ্ধদের প্রায় গোটা ইন্দোনেশিয়ায় কায়েম হয় মাজাপাহিতদের শাসন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুমাত্রায় আরবদের আগমন হয় এবং সেই সঙ্গে শুরু হয় মাজাপাহিতদের শাসন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আরবারই জয়ী হয়। প্রবাদ আছে, আরবদের আক্রমণে যখন মাজাপাহিতদের পতন ঘটতে চলেছে, তখন বরবুদুরের নির্মাতা শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের বংশধররা ও যবদ্বীপের হিন্দু রাজারা নাকি দীর্ঘদিনের শত্রুতা ভুলে হাতে হাত মিলিয়ে তাদের সব সম্পদ কোনো এক অজানা দ্বীপে মন্দিরের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেন। আশা ছিল, আরবরা চলে গেলে সেইসব সম্পদ ভাগ করে নেবেন। কিন্তু আরবদের পর একে-একে আসে পোর্তুগিজ-ওলন্দাজ-ইংরেজরা। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে নাকি হারিয়ে যায় সেই মন্দিরের ঠিকানা। তবে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, আজও নাকি অজানা মন্দিরে লুকোনো আছে সেই সম্পদ।'

সুদীপ্ত আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এত বড় খবর আপনি জানলেন কীভাবে?'

হেরম্যান বললেন, 'প্রত্নবিদ রিচার্ডের লেখা থেকে জেনেছি। কথা প্রসঙ্গে রিচার্ড মন্দিরের গুপ্তধনের মিথের ব্যাপারটা উল্লেখ করেছেন।'

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে জঙ্গল আরও গভীর হতে লাগল। টানা ঘণ্টাচারেক চলার পর দুপুরের খাবারের জন্য কিছুক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়ালেন তাঁরা। ঠিক সেই সময় প্রথম একটা প্রাণী দেখল সুদীপ্তরা। অনেকটা শূকরের মতো দেখতে বড় প্রাণী। নাকটা শুঁড়ের মতো।

হেরম্যান বললেন, 'ও হল টেপির।'

দুপুরের সামান্য কিছু আহারের পর আবার চলা শুরু হল। কিছু ম্যাকাও গোত্রের পাখিও এবার দেখা গেল যাত্রাপথে। বেলা চারটে নাগাদ হেরম্যান হিসেব করে দেখলেন, জঙ্গলের মধ্যে মাইল দশেক পথ পেরিয়ে এসেছেন। বললেন, 'আরও এক ঘণ্টা চলব আমরা, তারপর তাঁবু ফেলব।'

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যদি সোনালি কোমোডোর খোঁজ পান, কী করবেন?'

তিনি বললেন, 'তাকে ধরা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার ভিডিয়োগ্রাফি করে সভ্যসমাজে হাজির করব। ওর বাসস্থানও চিহ্নিত করব আমরা, যাতে ভবিষ্যতে লোকজন তাকে চাক্ষুষ করতে পারে। বিজ্ঞানীরা তো আবার চোখে না দেখলে কিছু বিশ্বাস করেন না!'

আরও কিছুটা চলার পর হঠাৎই যেন থমকে দাঁড়ালেন হেরম্যান। সুদীপ্ত তাঁকে বলতে যাচ্ছিল, 'কী হল?'

কিন্তু তার আগেই তিনি আঙুল তুলে কী যেন দেখালেন। সেদিকে তাকাতেই চমকে উঠল সুদীপ্ত। কিছু দূরে একটা গাছের ফোকর থেকে উঁকি দিচ্ছে বিরাট বড় মানুষের একটা মাথা! দাঁত বের করে বিরাট মাথাটা যেন সুদীপ্তদের গিলে খেতে চাইছে। তারা এর পর তার দিকে এগিয়ে গেল। পাথরের তৈরি প্রাচীন রক্ষীমূর্তি। গাছের উপর থেকে নেমে আসা মোটা ঝুরির আড়ালে দেহটা এমনভাবে অদৃশ্য যে, শুধু তার ভয়ংকর মুখটাই নজরে আসছে। কালো পাথরের তৈরি রক্ষীমূর্তি, উচ্চতায় প্রায় পনেরো ফুট হবে। জায়গাটা ভালো করে দেখে হেরম্যান উৎফুল্লভাবে বললেন, 'এটা দেখে মনে হচ্ছে প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি পৌঁছেছি আমরা। হয়তো কোনো তোরণ ছিল এখানে। সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই। এখানে তাঁবু ফেলা যাক। কাল ভোর থেকে আবার অনুসন্ধান শুরু হবে।'

মূর্তিটার কিছু দূরে একটা ফাঁকা জায়গা বেছে সুদীপ্তরা তাঁবু খাটিয়ে ফেলল। হেরম্যানের পরামর্শমতো শুকনো ডালপালা জোগাড় করে তাঁবু ঘিরে একটা প্রাচীরও দেওয়া হল। ধীরে-ধীরে বনে আলো কমে আসতে লাগল। রাতের খাওয়া সেরে সুদীপ্তরা তাঁবুতে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্তর চোখে ঘুম নেমে এল।

তখন সম্ভবত মাঝরাত। হেরম্যানের মৃদু ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তর। হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, 'বাইরে কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

সুদীপ্ত কান খাড়া করতেই শুনতে পেল সেই শব্দ। কেউ যেন বাইরে শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে! কখনও তাঁবুর কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে। কে ও? শব্দটা কিছুক্ষণ শোনার পর সুদীপ্তরা তাঁবুর দরজা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল। চাঁদ উঠেছে। তার আলোয় সুদীপ্তদের নজরে পড়ল সেই বীভৎস মুখটা। অরণ্যের প্রাচীন প্রহরী সুদীপ্তদের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে যেন এক রহস্যময় হাসি হাসছে। এরপর তারা দেখল, মূর্তির পায়ের কাছে গাছের গুঁড়ির নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু'জোড়া জ্বলন্ত চোখ! পাতা ভাঙার শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে একটা হিসহিস শব্দও কানে আসছে সেদিক থেকে।

হেরম্যান চাপাস্বরে বললেন, 'ওগুলো কী অনুমান করতে পারছ?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'হ্যাঁ, পারছি।'

হেরম্যান টর্চ বের করলেন। তারপর সেই জায়গায় আলো ফেললেন।

সুদীপ্তরা দেখল, হ্যাঁ, তাদের অনুমানই ঠিক। সেই আলোর মধ্যে ধরা পড়েছে দুটো জীবন্ত কোমোডো ড্রাগন! উজ্জ্বল আলোয় মনে হয়, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে। তারা তাকিয়ে আছে আলোর দিকে। মাঝেমধ্যে শুধু তাদের চেরা লম্বা জিভ মুখের বাইরে বের করছে। টর্চের আলোয় তাদের ভাঁটার মতো চোখ জ্বলছে। আকারে প্রাণী দুটো সম্ভবত ফুট ছ'য়েক হবে।

হেরম্যান বললেন, 'সম্ভবত খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে ওরা।'

টর্চের আলোয় বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে একটা প্রাণী হাঁ করল। মুহূর্তের জন্য তার মুখের ভিতরের সাজানো দাঁতগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। সুদীপ্ত বলল, 'প্রাণীগুলো আমাদের আক্রমণ করবে নাকি?'

কিন্তু তারা কিছুক্ষণ আলোর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে গাছের আড়ালে চলে গেল।

তারা চলে যাওয়ার পর হেরম্যান বললেন, 'ভোরের আলো ফুটলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা। তবে আলো ফুটতে এখনও ঘণ্টাপাঁচেক বাকি। এ সময়টা ঘুমিয়ে নিই।'

পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই তাঁবু গুটিয়ে ধ্বংসাবশেষ খোঁজা শুরু হল। সেই মূর্তির আশপাশে আরও কয়েকটা স্তম্ভের চিহ্ন খুঁজে পেলেও ঘণ্টাখানেক ধরে সে অঞ্চলে সন্ধান চালিয়ে মন্দির জাতীয় কোনো কিছুর চিহ্ন পেল না তাঁরা।

হেরম্যান বললেন, 'চলো, আমরা যেমন এগোচ্ছিলাম, তেমনি এগোব। সম্ভবত রক্ষীমূর্তিটা এখানকার মন্দিরের বাইরের কোনো অংশ ছিল। আগে অনেক ক্ষেত্রে মন্দির বা নগরীর পাঁচ-দশ মাইল বেড় দিয়ে পাঁচিল তৈরি করা হত। এটা তেমনই কিছু হবে।'

সুদীপ্তরা আবার চলতে শুরু করল। এবারের যাত্রাপথে অনেক পাখি চোখে পড়তে লাগল। এক জায়গায় মোষের মতো কয়েকটা প্রাণীকে দূর থেকে দেখতে পেল সুদীপ্তরা। প্রাণীগুলো মনে হয় বেশ লাজুক। সুদীপ্তদের দেখামাত্রই বনের আড়ালে চলে গেল। সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'ওগুলো কি বুনো মহিষ?'

হেরম্যান বললেন, 'না। আমি এই প্রথম দেখলেও ওদের ছবি আগে দেখেছি। গোরু ও মোষের মাঝামাঝি প্রাণী। শুধু ইন্দোনেশিয়াতেই দেখা মেলে। অদ্ভুত নাম ওদের, 'হোয়াট টু সি' অর্থাৎ 'কী দেখব'?'

এসব দেখতে পেলেও প্রাচীন মন্দিরের কোনো চিহ্ন ধরা দিল না তাঁদের চোখে। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর, তখন একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁরা বসলেন।

হেরম্যান বললেন, 'দেড়দিন তো কেটে গেল। কাল সন্ধের মধ্যে তো আবার তাঁবুর কাছে ফিরতে হবে। আমাদের আগে সেই মন্দিরটার কাছে পৌঁছনো দরকার। তেমন হলে আজ সারা রাত চলব আমরা।'

সুদীপ্ত বলল, 'রিচার্ড যখন লিখেছেন, তখন মন্দির নিশ্চয়ই কোথায় আছে।'

হেরম্যান এগোবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার ধারণা, সোনার ড্রাগনও নিশ্চয়ই সেখানে আছে।'

আবার চলা শুরু হল তাঁদের। কিছুক্ষণ পর তাঁরা হাজির হলেন জঙ্গলের মধ্যে একটা

ফাঁকা জমিতে। তার ওপাশে জঙ্গল আরও ঘন। বলা যেতে পারে, ফাঁকা জমিটা দুটো জঙ্গলের সীমারেখা। সেই জমিতে দিনের আলোয় প্রথম একটা কোমোডো দেখলেন তাঁরা। বেশ বড় ড্রাগন। সাত-আট ফুট লম্বা হবে। বলা বাহুল্য, হেরম্যানের ড্রাগন সেটা নয়। কালচে লাল তার দেহ। কিছুটা ছাই-ছাই রং। প্রাণীটা ঘাড় তুলে ওপাশের জঙ্গলের দিকে কী দেখছে আর মাঝেমধ্যে নাক তুলে বাতাস থেকে সম্ভবত গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করছে।

সুদীপ্ত ক্যামেরা বের করে বেশ কয়েকটা ফোটো তুলল প্রাণীটার। সে কিন্তু সুদীপ্তদের উপস্থিতি খেয়াল করল না। অতি ধীর পায়ে বাতাসে কিসের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে ফাঁকা জমি ছেড়ে ওপাশে গিয়ে ঢুকল। সুদীপ্তরাও এর পর ফাঁকা জমি পেরিয়ে সেখানে ঢুকল। তবে সেই কোমোডোটা আর চোখে পড়ল না।

কিছুটা এগিয়েই হঠাৎ একটা গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দুজনে। গাছের চারপাশ ঘিরে মাটির উপর জেগে আছে সার-সার নরকঙ্কাল! তারা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াতে চাইছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর হেরম্যান বললেন, 'সম্ভবত এটা আদিম অধিবাসীদের গোরস্থান। মানুষগুলোকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল।'

সুদীপ্ত বলল, 'কাদের গোরস্থান এটা? আপনি তো বলেছিলেন, এ দ্বীপে মানুষ থাকে না!'

তিনি বললেন, 'তাই তো জানি। এমন হয়তো হতে পারে, আশপাশের কোনো দ্বীপ থেকে মানুষ এখানে আসে।'

হেরম্যান বললেন, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি। ভালো করে লক্ষ করো, অধিকাংশ কঙ্কালগুলোর কিন্তু হাত নেই। আমার ধারণা, এদের কারও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।'

কিছুদূর এগোতেই কোথা থেকে যেন অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ কানে এসে লাগল তাঁদের, আর তারপরই গাছপালার ফাঁক দিয়ে কয়েকটা অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পেলেন তাঁরা। ওরা কারা? ভালো করে সেদিকে দেখার পর হেরম্যান বললেন, 'আরে, মনে হচ্ছে মিস্টার সালুইনরা! তা হলে ওঁরাও এদিকে এসেছেন?'

হেরম্যান তাঁদের দিকে এগোলেন। একসারি বিরাট গাছের ওপাশে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। সুদীপ্তরা সেই গাছের আড়ালে পৌঁছতেই কানে এল মিস্টার সালুইনের গলা, 'তুমি ফালতু বিদেশি দুটোকে জাঙ্কে তুলতে গেলে কেন? ওদের মতলব ঠিক বুঝতে পারছি না। জার্মানটাকে বললাম, বরবুদুর মন্দিরে হাতি আর কোমোডোর লড়াইয়ের পাথরমূর্তি কী সুন্দর! তা শুনে জার্মানটা সম্মতি জানাল। আসলে বরবুদুরে ওরকম কোনো মূর্তি নেই। লোকটা ওখানে যায়নি। যে ইতিহাসবিদ, সে ইন্দোনেশিয়ার বরবুদুর দেখবে না? ওরা নিজেদের উদ্দেশ্য গোপন করছে।'

কথাগুলো কানে যেতেই সুদীপ্তরা আর না এগিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সালুইন জায়ার কাছাকাছি লু-সেনকেও এবার দেখতে পেলেন তাঁরা। তাঁর হাতে

ধরা একটা রাইফেল! বুকে কার্তুজের বেল্ট ঝুলছে। জাঙ্ক থেকে নামার সময় তাঁকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখেনি সুদীপ্তরা। ওঁরা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন তাঁদের কথাবার্তা।

সালুইনের কথার উত্তরে লু-সেন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে লোক দুটো অন্য কোনো ধান্দায় এসেছে। আসলে জার্মানটা আমার সামনে এমনভাবে ডলারের তাড়া নাচাল যে, লোভ সামলাতে পারলাম না। গতবার ছেলেটাকে ধরার সময় আমার যে লোক দুটো জংলিদের হাতে মারা গেল, তাদের পরিবারকে ওই টাকা দিতে হবে। না হলে আমাদের এ দ্বীপে আসার ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তবে লোক দুটোকে নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই। তেমন হলে ওদের দ্বীপেই ছেড়ে রেখে যাব। আর খুব বেশি অসুবিধে হলে...।' বলে হাতের রাইফেল তুলে দাঁত বের করে হাসল লু-সেন। গাছের আড়াল থেকে লু-সেনের ইঙ্গিতটা বুঝতে সুদীপ্তদের অসুবিধে হল না।

সালুইন বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এত কষ্ট করে ছেলেটাকে ধরা হল, নিয়ে গিয়ে তিনমাস ধরে খাওয়ানো হল, আবার এখানে আনা হল, কিন্তু লাভ তো কিছু হল না। আমার মনে হয়, আস্কারি দ্বীপের অন্য জংলিদের মতো মন্দিরে কোথায় সোনা লুকোনো আছে, তা ওরও জানা। অত বড় মন্দিরের সব জায়গা তো আর খোঁড়া যাবে না! গতবার তিনদিন ধরে অনেক খুঁজেছি, কোথাও পাইনি। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, সোনা ওখানেই আছে। না হলে গতবার মন্দির চত্বরে বাচ্চাটাকে ধরার সময় যে জংলিটাকে আমরা মারলাম, তার কাছে সোনার গুঁড়ো এল কীভাবে? ওই মন্দির চত্বরের কোমোডোদের জংলিরা নিছক পুজো করতে আসে না, মন্দিরে নজর রাখতেও আসে।'

এরপর তিনি বললেন, 'দ্যাখো, কোনোভাবে ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে আকারে-ইঙ্গিতে কথা বের করতে পারো কি না?'

লু-সেন বলল, 'ভাষাটাই তো বড় সমস্যা। তিনমাস ধরে চেষ্টা করেও বিন্দুবিসর্গ কথা বুঝতে পারছি না। তবে কোমোডো ধরার টোপ হিসেবে ও কিন্তু দারুণ! সোনা না পাই, গোটা দশেক চামড়া পেলেই একটা জাঙ্ক কেনা যাবে।' কথাগুলো বলেই বেশ উত্তেজিতস্বরে একটু চাপা গলায় লু-সেন সামনের দিকে সালুইন জায়াকে কী যেন দেখিয়ে বলল, 'আরে, ওই দেখুন, বাঁদরের রক্তের গন্ধে ঠিক হাজির হয়েছে একটা।'

লু-সেন সালুইনকে কী দেখাচ্ছে তা দেখার জন্য গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে আর-একটু মাথা বের করতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। সালুইনরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে জঙ্গলঘেরা বেশ বড় একটা নেড়া মাঠ। পাথর আর মাটি ভরা জায়গা। ঘাসের চিহ্ন নেই। মাঠের প্রান্তে দুপুর রোদে উবু হয়ে পাথরের মূর্তির মতো হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে সেই ছেলেটা। তার কোমরের দড়ির এক দিক একটা খোঁটায় বাঁধা। ছেলেটার গায়ে কালচে ধরনের কী যেন মাখানো। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাকে ঘিরে মাছি জাতীয় পোকা ভনভন করছে। আর এর পরই অদ্ভুত

ব্যাপারটা চোখে পড়ল। জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে বেরিয়ে ছেলেটার দিকে এগোচ্ছে একটা কোমোডো ড্রাগন! খুব ধীর গতিতে সতর্ক ভঙ্গিতে সে এগোচ্ছে। মাঝে-মাঝে থেমে নাক উঁচু করে বাতাসে কিসের গন্ধ নিচ্ছে! ছেলেটাই যে তার শিকার তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। তবে সালুইন বা গাছের আড়ালে সুদীপ্তরা যেদিকে দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিকে নজর নেই প্রাণীটার।

সুদীপ্তরা লক্ষ করল লু-সেন ধীরে-ধীরে রাইফেল ওঠাচ্ছে। ড্রাগনটাও ক্রমশ এগোচ্ছে ছেলেটার দিকে। আর মাত্র ফুট দশেকের ব্যবধান।

হেরম্যান বললেন, 'আর দেরি করা ঠিক নয়। কোমোডো বা রাইফেলের গুলি যে-কারও হাতে ও মারা যেতে পারে!'

হেরম্যান গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে মাথার উপর রিভলভার তুলে ব্লাঙ্ক ফায়ার করলেন। তার পরই লু-সেন রাইফেল চালাল। পরপর দুটো আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দে খানখান হয়ে গেল বনভূমির নিস্তব্ধতা। রিভলভারের শব্দে মনে হয় হাত কেঁপে গিয়েছিল লু-সেনের। তার গুলি কোথায় লাগল বোঝা গেল না, শুধু ছেলেটার কাছাকাছি মাটিতে সামান্য ধুলো ছিটকে উঠল। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। ড্রাগনটাও যেন একটু লাফিয়ে মুহূর্তের মধ্যে শরীরটাকে মোচড় দিয়ে বাঁক নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে জমি পেরিয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পরেই লু-সেনের রাইফেলের নল ঘুরে গেল পিছন দিকে। সালুইনের হাতে উঠে এল রিভলভার। জাঙ্কের অন্য লোকগুলোও কোত্থেকে যেন ছুটে এল, তারাও প্রত্যেকেই সশস্ত্র। উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রের ঘেরা টোপে বন্দি হলেন তাঁরা দুজন।

সালুইনই এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। আপনাদের এ দ্বীপে আসার আসল উদ্দেশ্য কী বলুন তো? আপনি যে আমাদের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি।'

হেরম্যান বললেন, 'মিথ্যে পরিচয় আপনিও দিয়েছেন। আপনিও গাছের ব্যাপারে জঙ্গলে আসেননি। কেন এসেছি তা আপনাকে বলতে বাধ্য নই।'

লু-সেন বলল, 'আলবাত বাধ্য, নইলে আর ফেরা হবে না।'

হেরম্যান বললেন, 'ফেরা হবে না মানে? তোমাকে আমরা টাকা দিয়েছি।'

লু-সেন বলল, 'দিয়েছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আপনাকে জাঙ্কে তুলব কি না সেটা আমার মর্জির ব্যাপার!'

সে আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সালুইনদের একটা লোক চেঁচিয়ে বলল, 'আরে, ছেলেটা পালাচ্ছে! দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছে।'

ছেলেটার অস্তিত্ব যেন ভুলেই গিয়েছিলেন সকলেই। মাঠের দিকে তাকালেন সকলে, ছেলেটা উলটো দিকের জঙ্গলে দিকে ছুটতে শুরু করেছে।

সালুইন বললেন, 'ওকে পালাতে দেওয়া যাবে না। পায়ে গুলি করো।'

লু-সেন ঘুরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করল। হেরম্যান বাধা দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে

পড়লেন লু-সেনের উপর। তাঁরা দুজনেই মাটিতে পড়ে গেলেন। একটা লোক দৌড়ল ছেলেটাকে ধরার জন্য। সুদীপ্ত হেরম্যানকে সাহায্য করার জন্য এগোতে যাচ্ছিল। কিন্তু পিছন থেকে একজন বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে সুদীপ্ত দেখতে পেল সেই ছেলেটা মিলিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে।

সুদীপ্তর জ্ঞান ফিরতে দেখল, তাকে বেঁধে ফেলেছে লু-সেনের লোকজন। পাশেই আছেন হেরম্যান। তাঁর সাদা দাড়িতে লাল রক্তের ছোপ।

কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন সালুইন জায়া, লু-সেন। একজন লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়াল। হাতে একটা দড়ির টুকরো। সে বলল, 'না, পাওয়া গেল না।'

লু-সেন তার হাতের দড়িটা নিয়ে পরখ করে বলল, 'কোমোডোটাকে মারতে গিয়ে যে গুলি চালিয়ে ছিলাম, তাতেই ছিঁড়েছে।'

সালুইন বললেন, 'সময় নষ্ট করা যাবে না। ছেলেটাকে খুঁজতে হবে। ও সাঁতরে আস্কারি দ্বীপে পৌঁছলেই সর্বনাশ! একটা কাজ করা যাক লু-সেন, তোমার লোকেরা ছেলেটার পিছু ধাওয়া করুক, আমি আর তুমি যাব যেদিকে যাওয়ার কথা সেদিকে। তবে তার আগে এদের ব্যবস্থা করা যাক।'

তাঁদের কাছে এসে সালুইন কর্কশ গলায় বললেন, 'দুজনকেই শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী?'

সুদীপ্ত বলল, 'আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। আপনাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টিও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর যাই হোক সোনাটোনার সন্ধানে আমরা আসিনি, পুলিশের লোকও নই। আমাদের দড়ি খুলে দিন।'

সালুইন বললেন, 'আমার প্রশ্নের জবাব এটা নয়। কেন এসেছেন এখানে?'

হেরম্যান বললেন, 'আগেই তো বলেছি, তার উত্তর দেব না।'

সালুইন হেরম্যানকে বললেন, 'এর ফল ভুগতে হবে আপনাদের।'

হেরম্যান বললেন, 'আমরা যে তোমাদের জাঙ্কে চেপেছি তা অনেকেই দেখেছে, আমাদের কিছু হলে পুলিশ তোমাদের ছাড়বে না।'

সালুইন বললেন, 'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার রিভলভার তো আমার কাছে রইলই। এটা পুলিশকে জমা দিয়ে বলব, আপনি রিভলভার দেখিয়ে আস্কারি দ্বীপে জাঙ্ক ভেড়াতে বাধ্য করেছিলেন। দ্বীপে নেমে আপনারা জংলিদের হাতে ধরা পড়েছেন।'

সালুইনের কথা শুনে সকলে হেসে উঠল।

সুদীপ্তদের হাজির করা হল সেই গাছটার তলায়, যেখানে তাদের দেখা নরকঙ্কালগুলো আছে। সুদীপ্ত আর হেরম্যানের পা দুটো বাঁধা হল, তারপর মোটা দড়ি দিয়ে দুজনকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা হল, যাতে কেউ নড়তে না পারে।

একাজ শেষ হওয়ার পর সালুইন হেরম্যানকে বললেন, 'গোঁয়ার্তুমির ফল ভোগ করুন।

আস্কারি দ্বীপের শাস্তিদানের জায়গা এটা। জংলিরা তাদের শত্রুদের এখানে এনে হাত-পা বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় মাটিতে অর্ধেক পুঁতে রাখে। তারপর তাদের দুটো হাত কেটে দেয়। সামান্য রক্তের গন্ধও দূর থেকে টের পায় জীবন্ত ড্রাগন। গন্ধ অনুসরণ করে একে-একে হাজির হয় এখানে। প্রতীক্ষা করে কখন সেই মানুষটা ক্ষুধা-তৃষ্ণা- রক্তপাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে। আর তারপর...। তবে পচা মাংসও ওরা খুব তৃপ্তি করে খায়!'

হেরম্যান চিৎকার করে বললেন, 'শয়তান...!'

সালুইন দলবল নিয়ে এগোলেন জঙ্গলের দিকে।

গাছের গায়ে বাঁধা অবস্থায় বসে রইলেন হেরম্যান আর সুদীপ্ত।

'এখন কী করবেন? এভাবে মৃত্যুই কি আমাদের ভবিতব্য?' জিজ্ঞেস করল সুদীপ্ত।

হেরম্যান বললেন, 'দ্যাখো, মৃত্যু যেমন কঠিন ব্যাপার নয়, তেমন খুব সহজ ব্যাপারও নয়। তুমি ঘাবড়িও না, শেষ পর্যন্ত যদি অন্তিম পরিণতি নেমেও আসে, তবে তা আমাদের পক্ষে কম গৌরবজনক নয়। আমরা মরব বীরের মতো এই অজানা দ্বীপে।' কথাগুলো বলে হাসলেন হেরম্যান।

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু কোনো অভিযানে অর্ধেক পথে এভাবে মৃত্যু কি খুব ভালো? ওরা যেভাবে আমাদের রেখে গেল তাতে মুক্তির তো কোনো উপায় দেখছি না।'

হেরম্যান বললেন, 'আমার পকেটে একটা বড় ছুরি আছে, তবে ওরা আমাদের হাত এমনভাবে বেঁধেছে যে...!'

সুদীপ্ত বার কয়েক শরীরটাকে মুচড়ে চেষ্টা করল যদি কোনোভাবে বাঁধন খুলে বেরিয়ে আসা যায়। হেরম্যান চুপচাপ কী যেন ভাবছেন।

কিছু দূরে মৃদু একটা শব্দ হল। সুদীপ্তরা দেখল, একটা ঝোপ হঠাৎ দুলে উঠল। কী ওখানে? ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা কোমোডো! হেরম্যান চাপাস্বরে বললেন, 'মড়ার মতো চুপচাপ থাকো। ও আক্রমণ করতে এলে একসঙ্গে চিৎকার করে ঘাবড়ে দিতে হবে।'

ড্রাগনটা দেখছে সুদীপ্তদের। মাঝে-মাঝে লম্বা জিভ মুখের বাইরে বের করছে। মাঝারি আকারের কোমোডো। প্রাণীটা কিন্তু একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। তারপর সুদীপ্তদের কিছুটা দূর দিয়ে অন্য একটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রাণীটা দূরে চলে যাওয়ায় সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'ও চলে গেল কেন?'

হেরম্যান বললেন, 'এত সুন্দর খাবার মজুত আছে দেখে মনে হয় বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করতে গেল। একদম গ্র্যান্ড ফিস্ট!'

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধে নামল। বসে থাকতে-থাকতে মনে হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল সুদীপ্ত। হেরম্যানের ধাক্কায় তাকাল সে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে আসা চাঁদের আলোয় অন্ধকার কিছুটা ফিকে। হেরম্যান চাপাস্বরে বললেন, 'কেমন যেন একটা শব্দ হচ্ছে!'

সুদীপ্তও শুনতে পেল সেই শব্দ। শুকনো পাতার উপর হালকা পায়ের শব্দ। যে গাছে তাদের বাঁধা হয়েছে সম্ভবত তার গুঁড়ির আড়াল থেকে। কিন্তু ফিরে দেখার উপায় নেই।

সুদীপ্ত বলল, 'সেই কোমোডোটা ফিরে এল নাকি?'

হেরম্যান বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। চুপ করে থাকো, শব্দ কোরো না। ভাগ্যে যা আছে হবে।'

ক্রমশ সুদীপ্তদের পিছনে এগিয়ে আসতে লাগল শব্দ। তাকে দেখতে না পেলেও সে যে গাছের গুঁড়ি লক্ষ করে এগোচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শব্দটা থামল এসে তাদের ঠিক পিছনেই। হঠাৎই যেন ঘাড়ে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব হল সুদীপ্তর। সাপের স্পর্শ? নিজেকে বাঁচাবার জন্য চিৎকার করে উঠল সে। হেরম্যানও চেঁচালেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই গাছের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল সেই ছেলেটা। তার হাতে ধরা একটা পাথরখণ্ড। ছেলেটা প্রথমে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল। বিস্মিত সুদীপ্তরা। ছেলেটা তার হাতের পাথরখণ্ডটা ঘসতে শুরু করল। দড়ি কাটার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পর পাথরের ঘসায় দড়িটা ছিঁড়ে গেল। সুদীপ্তও হাতটাকে সামনে এনে ছেলেটার চেষ্টায় আলগা করে ফেলল হাতের বাঁধন। তারা উঠে দাঁড়াল।

ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। সুদীপ্ত-হেরম্যান দুজনেই বিস্মিত। ছেলেটা নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে দুবার বলল, 'টুসু-টুসু।'

সম্ভবত তার নাম টুসু। তারপর ছেলেটা সুদীপ্তদের ফ্যাসফ্যাসে গলায় আরও কিছু বলল, কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গ তারা বুঝতে পারল না।

হেরম্যান বললেন, 'সালুইনদের কথা শুনে যা বুঝেছি তাতে ও আস্কারি দ্বীপের বাসিন্দা। প্রকৃতির সন্তান। আসলে সাধারণ সভ্য সমাজের এইটুকু ছেলের পক্ষে যা অসম্ভব, ওর ক্ষেত্রে তা সম্ভব। তবে ওর গলার স্বর শুনে আমার মনে হচ্ছে ও ছোট হলেও আমরা ঠিক যত ছোট মনে করছি ও ঠিক তত ছোট নয়। ওর বুদ্ধি ও সাহস যথেষ্ট। হয়তো ও-ই আমাদের বাঁচার পথ দেখাতে পারে।'

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু ওর কথা তো বোঝা যাচ্ছে না!'

হেরম্যান কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ছেলেটা হঠাৎ উত্তেজিতভাবে একদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে শব্দ করল, 'হুই! হুই!'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদীপ্তরা দেখতে পেল দূরে জঙ্গলের মধ্যে দুটো উজ্জ্বল আলোর বিন্দু ঘোরাফেরা করছে। না, সেগুলো কোমোডোর চোখ নয়, টর্চের আলো!

সেগুলো এদিকেই আসছে। কেমন যেন পাংশু হয়ে গেল ছেলেটার মুখ। ভয় পেয়ে সে কী যেন বলল সুদীপ্তদের। তারপর ছুটতে শুরু করল জঙ্গলের অন্য দিকে। সম্ভবত সালুইন আর লু-সেন কোনো কারণে ফিরে আসছেন!

হেরম্যান বললেন, 'পালাও।'

ছেলেটা যেদিকে ছুটছে সেদিকেই ছুটতে শুরু করলেন তাঁরা। জঙ্গল ভেঙে ছোটার শব্দে তাঁদের গতিপথ টের পেয়ে গেলেন সালুইনরা। সঙ্গে-সঙ্গে পরপর গর্জে উঠল তাঁদের রাইফেল। ছুটন্ত সুদীপ্তদের মাথার হাতখানেক উপর দিয়ে রাইফেলের বুলেট গিয়ে লাগল একটা ডালে। ঝোপঝাড় ভেঙে সুদীপ্তদের তাড়া করলেন তাঁরা।

দুজনে ছুটেই চলছে বাঁচার জন্য। পড়ে যাচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে উঠে আবার ছুটছে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে হাত-পা, অন্ধকারে গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা লেগে থেঁতলে যাচ্ছে শরীর। ছেলেটা কোন দিকে গেল, তারা কোন দিকে যাচ্ছে, কিছুই খেয়াল নেই। শুধু ছোটা আর ছোটা! এক সময় তাদের পিছনে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, তবুও তারা থামল না।

ঘণ্টা তিনেক ছোটার পর তাদের শক্তি ফুরিয়ে এল। একসময় আর এগোতে পারল না। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল দুজনেই। উঠে বসার মতো শক্তি তখন আর নেই।

রাত তখন কত খেয়াল নেই। উঠে বসে সুদীপ্ত দেখল, হেরম্যানও উঠে বসেছেন। কেন তার ঘুম ভাঙল সুদীপ্ত পরক্ষণেই বুঝতে পারল। দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে স্পষ্ট একটা শব্দ। ঘণ্টাধ্বনি! বেশ গম্ভীর শব্দে বাজছে। আলো-আঁধারি মাখা জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ছে সেই শব্দ। রহস্যময় চাঁদের আলো আর ঘণ্টাধ্বনি মিলেমিশে কেমন যেন ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে!

হেরম্যান বললেন, 'শুনতে পাচ্ছ?'

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি। সুন্দা ধীবরদের কথা তা হলে মিথ্যে নয়?'

তিনি বললেন, 'না, মিথ্যে নয়। রিচার্ডের দেখা সেই মন্দিরও আছে। হয়তো বা সেই সোনালি ড্রাগনও মিথ্যে নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেরম্যান বললেন, 'আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। হয় মানুষ বাজাচ্ছে, নয়তো বাতাস বা অন্য কোনোভাবে দুলছে ঘণ্টাটা।'

সুদীপ্ত বলল, 'সালুইন বা তাঁর দলবল বাজাচ্ছেন না তো?'

হেরম্যান বললেন, 'তাদের আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। তারা নিশ্চয়ই নিজেদের উপস্থিতি জানান দেবে না। ঘণ্টার শব্দ দ্বীপের বাইরেও যায়।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাজার পর এক সময় থেমে গেল সেই শব্দ। হেরম্যান বললেন, 'শব্দটা আসছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। আলো ফুটলে ওই দিকেই এগোব।'

সুদীপ্ত তাকিয়ে দেখল শুকতারা ফুটে উঠেছে।

হেরম্যান হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা, জঙ্গলে ঢোকার পর তুমি ছেলেটাকে আর দেখেছিলে?'

সুদীপ্ত বলল, 'দেখিনি। হয়তো ওর সন্ধানেই সালুইনরা ফিরে এসেছিলেন।'

হেরম্যান বললেন, 'ওর জন্যই আমরা এখনও বেঁচে আছি। জানি না আর ওর সঙ্গে দেখা হবে কিনা!' উত্তর দিক থেকে বেশ ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছে। হেরম্যান বললেন, 'সম্ভবত সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থান করছি আমরা। ঠান্ডা হাওয়া সেখান থেকেই আসছে।'

সুদীপ্তরা ছেলেটার কথা ভাবতে-ভাবতে ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষা করতে লাগল। একসময় সত্যিই ভোর হল।

সুদীপ্তরা উঠে দাঁড়াল, হাঁটতে শুরু করল উত্তর-পশ্চিম দিকে।

একসময় জঙ্গল ফিকে হয়ে এল। আর তারপরই গাছপালার ফাঁক দিয়ে সুদীপ্তরা দেখতে পেল খোলা জায়গায় সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে কালো পাথরে তৈরি ভগ্নপ্রায় বিশাল এক প্রাচীন মন্দির!

হেরম্যান সুদীপ্তকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আছে! আছে! দ্যাখো, ভাগ্য আমাদের ঠিক জায়গায় এনে ফেলেছে! আমার মন বলছে কষ্ট বিফলে যাবে না।' জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাঁরা এগোলেন মন্দিরের দিকে।

সুদীপ্তরা হাজির হল মন্দির চত্বরে। পাথর বাঁধানো চত্বরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে প্যাগোডা ধাঁচের বিশাল মন্দির। সুদীপ্তরা অনুমান করল, মন্দিরের উচ্চতা অন্তত আড়াইশো ফুট হবে। মহাকাল আর দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের নোনা বাতাস মন্দিরের গায়ে থাবা বসালেও তার কাঠামোটা মোটামুটি অক্ষতই আছে। চত্বর থেকে প্রশস্ত ধাপ উপরে উঠে মিশেছে মূল প্রবেশদ্বারে। চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নানা ধরনের মূর্তি-স্তম্ভ। তবে তাদের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। মন্দিরের অন্য তিন দিক ঘিরে রেখেছে গভীর জঙ্গল।

সুদীপ্তরা মন্দির প্রদক্ষিণ করতে লাগল। চত্বরে আর মন্দিরের গায়ে কত অপরূপ সব মূর্তি। কোথাও বিষ্ণু, কোথাও ব্রহ্মা, কোথাও বা মহাদেব। কয়েক জায়গায় আবার রয়েছে বুদ্ধমূর্তি বা স্তম্ভের গায়ে খোদিত জাতক-কাহিনির নানা দৃশ্য। ঠিক তেমনই রামায়ণের কিছু দৃশ্যও চোখে পড়ল। সুদীপ্ত ব্যাপারটা হেরম্যানকে বুঝিয়ে বলার পর তিনি বললেন, 'সম্ভবত দুই ধর্মের ঐক্য স্থাপন করতে কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজা এ মন্দির তৈরি করান।'

সুদীপ্ত বলল, 'তা হলে মন্দিরে সোনা লুকিয়ে রাখার গল্পটাও সত্যি হতে পারে?'

হেরম্যান বললেন, 'হয়তো তাই।'

হঠাৎই এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন হেরম্যান। বললেন, 'আরে, ওই দ্যাখো...!'

মন্দিরের গায়ে খোদিত একটা ছবি। কয়েকজন মানুষ লড়াই করছে বিরাট এক কোমোডো ড্রাগনের সঙ্গে! এর পর এরকম আরও কয়েকটা মূর্তি। কোথাও কোমোডো ড্রাগনকে পুজো করা হচ্ছে, কোথাও তার মুখে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে অপরাধীকে। হেরম্যান ছবিগুলো দেখতে-দেখতে একটা ছবির সামনে থমকে দাঁড়ালেন।

গোটা দশেক লোক সেখানে একটা কোমোডো ড্রাগনের পিঠে সওয়ার। লোকগুলো সশস্ত্র। সম্ভবত কোমোডোর পিঠে চেপে যুদ্ধে যাচ্ছে! ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে হেরম্যান বললেন, 'ছবিটা অদ্ভুত তো! ড্রাগনটা দানবাকৃতি, নাকি ওর পিঠের লোকগুলো বামন, নাকি দুটোই সত্যি?'

মন্দির চত্বরে বেশ কয়েকটা গভীর কুয়োও দেখতে পেলেন তাঁরা। মুখগুলো বেশ চওড়া, ভিতরের দেওয়াল পাথর দিয়ে বাঁধানো। নীচে নামার জন্য দেওয়ালের খাঁজের অংশবিশেষ এখনও কিছুটা রয়েছে। তবে ভিতরটা এত অন্ধকার যে, তার তল পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে না।

মন্দিরের পিছনে একটা ছোট জলাধার আছে। সম্ভবত বৃষ্টির জল জমা আছে সেখানে। পাথুরে সিঁড়ি নেমেছে ওই জায়গায়। সুদীপ্তরা নীচে নেমে প্রাণ ভরে জল খেয়ে নিল।

হেরম্যান বললেন, 'চলো, মন্দিরের ভিতরটা এবার দেখব। তারপর কীভাবে অনুসন্ধান চালাব সে নিয়ে ভাবতে হবে।'

সুদীপ্তরা মন্দির চত্বর ঘুরে উপরে ওঠার সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল। হেরম্যান বললেন, 'দেশলাই আমার কাছে আছে। ভিতরে নিশ্চয়ই অন্ধকার। উপরে যাওয়ার আগে মশাল বানিয়ে নিতে হবে। এখানকার কিছু গাছে রজন আছে, মশালের মতো জ্বলে। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশের জঙ্গল থেকে কিছু ডাল জোগাড় করে আনলেন তিনি। তারপর সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তাঁরা উপরে উঠতে শুরু করলেন।

তিনটে ধাপে তৈরি মন্দির। প্রায় সত্তর ফুট উঠে প্রথম ধাপে পৌঁছলেন তাঁরা। আরও সিঁড়ি মন্দিরের গা বেয়ে ক্রমশ উঠে গিয়েছে উপরে। রেলিংহীন ধাপ, কিনারে দাঁড়ালে বেশ ভয় করে। উপর থেকে নীচের চত্বর পুরো দেখা যায়। ধাপের মাঝখান থেকে চারপাশে ছড়িয়ে আছে মন্দিরের অনেক ঘর। আর ঘরগুলোর চারপাশে প্রতি তলার ধাপে গোল রেলিংহীন বারান্দা। ঘরের বাইরেও নানা দেবমূর্তি, নক্‌শার অলঙ্করণ। ঘরের ভিতর জমাটবাঁধা অন্ধকার। মশাল জ্বালিয়ে তাঁরা ঢুকলেন ভিতরে। মাটিতে পুরু বালুকণার স্তর। শতাব্দীর পর-শতাব্দী ধরে সমুদ্রের বাতাস বয়ে এনেছে এই বালুকণা। মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে দেওয়ালের গায়ে একের পর এক দেবমূর্তি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের। মূর্তিগুলো জায়গায়-জায়গায় ক্ষয়ে গেলেও তাদের সৌন্দর্য এখনও অটুট।

বিস্মিত সুদীপ্তরা এ-ঘর থেকে সে-ঘর দেখে বেড়াতে লাগল। একটা ঘরে রয়েছে সেই সময়ের দ্বীপবাসীদের জীবনযাত্রার খোদাই-করা চিত্র। শিকার-দৃশ্য, মাছ ধরার দৃশ্য, যুদ্ধযাত্রা, ধর্মানুষ্ঠানের দৃশ্য। সেখানে আবারও একটা অদ্ভুত ছবি দেখল তারা। একটা বিরাট কোমোডো ড্রাগনের হাঁ-করা মুখের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ!

ছবিটা দেখে সুদীপ্ত বলল, 'আপনার সেই সোনার ড্রাগন সত্যি আছে বা ছিল কি না জানি না, তবে দানবাকৃতির কোমোডো ড্রাগন এক সময় নিশ্চয়ই ছিল। নইলে কোমোডোর মুখের ভিতর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বা কোমোডোর পিঠে বসে একদল লোক যুদ্ধে যাচ্ছে, এমন আশ্চর্য কল্পনা সে যুগের প্রাচীন শিল্পীরা করলেন কীভাবে?'

মন্দিরের এ ধাপের ঘরগুলো দেখা শেষ হতে তারা বাইরে বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় ধাপের দিকে উঠতে শুরু করল। মন্দিরের গায়ের সিঁড়িগুলো কোথাও-কোথাও ভেঙে গিয়েছে। পা ফসকালেই মৃত্যু নিশ্চিত। দ্বিতীয় ধাপে উঠে এল তারা। প্রায় দেড়শো ফুট নীচে মন্দিরের সেই শান বাঁধানো চত্বর। এত উঁচু থেকে জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে অনেক দূর দেখা যাচ্ছে। হেরম্যান হঠাৎ জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে দূরে একদিকে আঙুল তুলে বললেন, 'আরে, ওই তো সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।'

সুদীপ্তও দেখতে পেল। তবে তার দূরত্ব মন্দির থেকে অন্তত মাইল তিনেক হবে। সুদীপ্তরা এত উঁচুতে বলে দেখতে পাচ্ছে। ভালো করে সেদিকে দেখার পর আরও দূরে সমুদ্রের ভিতর কালো বিন্দুর মতো কী একটা নজরে এল দুজনেরই।

হেরম্যান বললেন, 'ওটা সম্ভবত আস্কারি দ্বীপ। তার মানে আমরা দ্বীপের পিছনের অংশে এসে পৌঁছেছি। আস্কারি দ্বীপের কাছাকাছি বলে দ্বীপের এ অংশ বিপজ্জনক। সালুইনরা যে কারণে এদিকে জাঙ্ক ভিড়াননি।'

দ্বিতীয় তলায় অনেক ঘর, তবে এখানকার দেওয়ালের সমুদ্রের বাতাসে আরও বেশি ক্ষতি হয়েছে। জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে নোনা বাতাস গায়ে এসে লাগছে। এখানকার ঘরগুলোয় শুধু বিভিন্ন ভঙ্গিমার বুদ্ধমূর্তি।

হেরম্যান বললেন, 'রিচার্ড তাঁর লেখায় মন্দিরকে হিন্দু মন্দির হিসেবে চিহ্নিত করলেও আসলে এ মন্দির ছিল দু'ধর্মের মিলনক্ষেত্র। ইতিহাসের গতি বড় বিচিত্র। এই দ্বীপরাজ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা নিজেদের আধিপত্য কায়েমের চেষ্টায় দীর্ঘদিন লড়াই চালালেও পরবর্তীকালে উভয়ের নিরাপত্তার স্বার্থেই পরস্পরের কাছাকাছি আসতে বাধ্য হয়েছিল।'

সুদীপ্ত বলল, 'আচ্ছা, মন্দিরে মূল গর্ভগৃহ বলতে যা বোঝায়, সেরকম কিছু তো দেখছি না।'

হেরম্যান বললেন, 'ব্যাপারটা আমারও মনে হয়েছে। আমি আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করছি। বৃত্তাকারে সাজানো তলাগুলোর এ-মাথা থেকে সে-মাথার ব্যাস প্রায় একশো ফুটের বেশি। কিন্তু প্রতি তলার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দু'পাশের ঘরের দৈর্ঘ্য পাওয়া যাচ্ছে আশি ফুটের মতো। আমার ধারণা বৃত্তাকার তলের কেন্দ্রবিন্দুতে ফাঁপা জায়গা আছে। হয় ঘর অথবা টানেলের মতো কিছু। যেখানে ঢোকার পথ হয়তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

হেরম্যান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অনেক দূর থেকে বাতাসে গুমগুম একটা শব্দ ভেসে আসতে লাগল। রাইফেলের শব্দ! সুদীপ্তরা তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে সংকীর্ণ অলিন্দে এসে দাঁড়াল। শব্দটা আসছে জঙ্গলের ওপাশে সমুদ্রতীরের দিক থেকে। পরপর গুলির শব্দ!

তাদের মনে হল, রাইফেলের শব্দ যেন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধীরে-ধীরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু তারপরই হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

সুদীপ্ত বলল, 'হঠাৎ সব কিছু থেমে গেল কেন?'

হেরম্যান বললেন, 'ঘটনাটা কী তা বোঝা যাচ্ছে না, তবে যাই হোক না কেন, মন্দিরের বাইরে যাওয়া উচিত নয়।'

সুদীপ্তরা উপর থেকে জঙ্গলের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ সুদীপ্তর চোখ গেল অনেক নীচে চত্বরের দিকে। কী যেন একটা নড়ছে! সে বলল, 'আরে, দেখুন-দেখুন, ছেলেটা! টুসু!'

একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা বিষ্ণুমূর্তির পাদদেশে খোলা চত্বরে বসল সে। এত উঁচু থেকে তার মুখ বোঝা না গেলেও মনে হয় বেশ ধীরস্থির ভাব। সম্ভবত সে রোদে বসে চারপাশে তাকাচ্ছে।

সুদীপ্ত বলল, 'ওকে ডাক দেব?'

হেরম্যান বললেন, 'এত উঁচু থেকে ওকে ডাকলে, সে শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত যাবে। সালুইনের দলবল কাছাকাছি থাকলে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে। তবে ওকে আমাদের দরকার। আমরা নীচের ধাপে নামি। তারপর একজন আরও নীচে নেমে ওকে তুলে আনব।'

হেরম্যানের কথা মতোই উপর থেকে প্রথম ধাপে নেমে এলেন দুজনে। ঠিক তখনই হেরম্যান তাকে থামিয়ে বনের দিকে ইশারা করলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে চত্বরের দিকে আসছেন সালুইন। বেশ সন্ত্রস্ত ভঙ্গি তাঁর। চলতে-চলতে পিছন ফিরে জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছেন। চত্বরে উঠে তিনি কিছুটা এগোতে দুজনে দুজনকে দেখতে পেয়ে গেলেন। লাফিয়ে উঠে ছেলেটা অমনি দৌড়তে শুরু করল মন্দিরের দিকে। তার পিছু ধাওয়া করলেন সালুইন। ছেলেটা মন্দিরের কাছাকাছি এসেও আবার বাঁক নিয়ে হঠাৎই চত্বরের মাঝখানে ছুটে এসে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেরম্যান আঁতকে উঠে বললেন, 'ও সম্ভবত কোনো কুয়োয় ঝাঁপ দিল।'

সালুইন জায়াও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পৌঁছলেন কুয়োর কাছে। কয়েক মুহূর্ত সেখানে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর তিনিও ঝাঁপ দিলেন। চত্বর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দুজনেই।

হেরম্যান এবার বললেন, 'ছেলেটা নয় বাঁচার জন্য ঝাঁপ দিল, কিন্তু সালুইন লাফালেন কেন? নাকি ওই কুয়োর মধ্যে দিয়ে নামার রাস্তা আছে?'

সুদীপ্তরা মন্দিরের উপর দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল তাদের কর্তব্য কী? কিন্তু এর পরই

এমন ঘটনা তারা চাক্ষুষ করল, যা না করলেই ভালো হত। একটা ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে চত্বরটা লক্ষ করছিল দুজনে। হঠাৎ জঙ্গল থেকে ছুটতে-ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এল লু-সেন। স্পষ্টতই সে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। তার হাতে ধরা আছে রাইফেল। সে এসে চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে সম্ভবত সালুইনকে খুঁজল। তারপর চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'সালুইন, সালুইন আপনি কোথায়?' কোনো উত্তর না পেয়ে আবার সে তার নাম ধরে ডেকে বলল, 'আপনি কি মন্দিরে? যে ক'টা জংলি এসেছিল নিকেশ করেছি। আমাদের সব লোকও গিয়েছে। জংলিদের বড় দল আসার আগে দ্বীপের অন্য দিকে পালাতে হবে।'

তার কথার জবাব মিলল না।

আরও বার দুই ডাকার পর মনে হল, একটু ঘাবড়ে গেল লু-সেন। সে রাইফেল উঁচিয়ে শূন্যে কয়েকবার গুলি চালাল। শূন্য মন্দির চত্বরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই শব্দ। আর এর পরেই সূচনা হল সেই ভয়ংকর ঘটনার। ঘুম ভেঙে মনে হয় একটা স্তম্ভের মাথার উপর থেকে লু-সেনের সামনে লাফিয়ে নামল বিরাট এক কোমোডো। সুদীপ্তরা তার উপস্থিতি খেয়ালই করতে পারেনি। প্রাণীটা এগোল লু-সেনের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাল সে। কিন্তু তার গুলি শেষ। কোনো শব্দ হল না। প্রাণীটা এগোচ্ছে তার দিকে। বেশ বড় আকার। সুদীপ্তরা অনুমান করল ন'-দশ ফুট হবে। গুলি না চলায় লু-সেন একটু হতভম্ব হয়ে রাইফেলের নলটা ধরে অস্ত্রটাকে মুশলের মতো করে ধরল। ড্রাগনটা এসে কামড়ে ধরল বন্দুকের কুঁদো। কিন্তু প্রাণীটা অসীম শক্তিধর। সে এক ঝটকায় অস্ত্রটা লু-সেনের হাত থেকে খসিয়ে ছুড়ে ফেলল দূরে। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে আবার লু-সেনকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল। সুদীপ্তরা অবাক হয়ে দেখল লু-সেন কিন্তু পালাল না। জামার নীচ থেকে একটা লম্বা ছুরি বের করল। সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠল তার ফলা। তারপর মুহূর্তেই প্রাণীটা ঝাঁপাল তার দিকে, আর সে-ও প্রাণীটার দিকে। ড্রাগনটাকে জড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল লু-সেন। শুরু হল মরণপণ লড়াই। প্রাণীটা দাঁতের কামড়ে, লেজের ঝাপটায় ঘায়েল করতে চাইছে শত্রুকে, আর লু-সেন নিজেকে বাঁচিয়ে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছে ড্রাগনের শরীরে। রুদ্ধশ্বাসে তারা দেখতে লাগল ভয়ংকর লড়াইয়ের দৃশ্য। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এ লড়াইয়ে লু-সেনের জয় হল। একটা অদ্ভুত আর্তনাদ করে প্রাণীটা উলটে স্থির হয়ে গেল। লড়াইয়ের জায়গাটা লাল হয়ে গিয়েছে। ড্রাগনটার বুকের উপর বসে রাগে তার বুকে আরও কয়েকবার ছুরি চালাল। তারপর উঠে দাঁড়াল। তারও সর্বাঙ্গ লাল। হেরম্যান বিস্ময়ে মন্তব্য করলেন, 'লোকটা মানুষ না দানব?'

লু-সেন উঠে দাঁড়িয়ে ঘৃণায় একটা লাথি কষাল মৃত কোমোডোর শরীরে। তারপর আবার সালুইনের নাম ধরে ডেকে মন্দিরের দিকে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল।

ও দাঁড়াল কেন?

তার পরমুহূর্তেই সুদীপ্তরা দেখল এক বিস্ময়কর দৃশ্য। চত্বরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল মূর্তি-স্তম্ভের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অনেক কোমোডো! অন্তত সংখ্যায়

গোটা দশেক হবে। ব্যূহ রচনা করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা লু-সেনের দিকে!

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে লু-সেন। ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে চক্রব্যূহ। শেষ মুহূর্তে একটা কাজ করল লু-সেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা লাফ দিয়ে উলটো দিকে ছুটল।

ড্রাগনগুলোও বিদ্যুৎগতিতে অনুসরণ করল তাকে। লু-সেন পালাতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। বাঁচার জন্য সে তার শরীরটাকে গড়িয়ে নিয়ে অদৃশ্য হল একটা মূর্তি-বেদিকার আড়ালে। কোমোডোর দলও ছুটল সেদিকে। তারাও অদৃশ্য হল বেদির আড়ালে। সুদীপ্ত আর হেরম্যান উত্তেজনায় ধাপের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই বেদির আড়ালে কী ঘটছে তা তাঁরা দেখতে না পেলেও কোমোডোদের সম্মিলিত শব্দ আর লু-সেনের আর্তনাদে বুঝতে অসুবিধে হল না সুদীপ্তদের। ব্যাপারটা অনুমান করে কাঁটা দিয়ে উঠল সুদীপ্তর শরীরে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লু-সেনের গগনভেদী শেষ আর্তনাদ শোনা গেল। তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। একটা রক্তস্রোত বেদির আড়াল থেকে বেরিয়ে জমা হতে লাগল চত্বরের মাঝে। সুদীপ্তদের কানে মাঝে-মাঝে ভেসে আসতে লাগল বেদির আড়ালে ড্রাগনগুলোর ঝটাপটির অস্পষ্ট শব্দ। নরমাংস নিয়ে সম্ভবত তারা ভোজ শুরু করেছে।

হেরম্যান আক্ষেপের স্বরে বললেন, 'এরকম একটা সাহসী লোক নিজের কর্মফলে প্রাণ হারাল!' এর পরেই তিনি বললেন, 'আমাদের এভাবে দাঁড়ানো ঠিক নয়, চলো আড়ালে যাই।' ধাপের কিনার ছেড়ে সুদীপ্তরা একটা ঘরে আত্মগোপন করল।

সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'কিন্তু ছেলেটা আর সালুইনের কী হল?'

তিনি বললেন, 'জানি না। তবে অন্ধকার যতক্ষণ না নামবে, ততক্ষণ বাইরে যাওয়া যাবে না। সারাদিন এখানেই কাটাব আমরা।' এক জায়গাতে সামান্য কিছু শুকনো ঘাস পড়ে আছে দেখলাম। তা দিয়ে একটা মশাল বানিয়ে ফেলি। রাতে কাজে লাগতে পারে।'

সময় এগিয়ে চলল। দুপুরের দিকে সুদীপ্ত একবার উঁকি দিল নীচে চত্বরের দিকে। নিঝুম দুপুরে কেউ কোথাও নেই। জঙ্গলের দিকটাও কেমন যেন থমকে আছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর এক সময় জঙ্গলে-ঢাকা প্রাচীন মন্দিরের মাথায় দিনান্তের লাল আভা ছড়িয়ে সূর্যদেব সমুদ্রে নেমে গেলেন। ধীরে-ধীরে অন্ধকারে ঢেকে গেল মন্দির চত্বর। অন্ধকার গাঢ় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সুদীপ্তরা। তারপর বাইরে বেরিয়ে মন্দিরের গায়ের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। অন্ধকার হাতড়ে সাবধানে উঠতে থাকল তারা। অনেকক্ষণ সময় লাগল দ্বিতীয় ধাপে উঠতে। কিন্তু এর পরেই সমস্যায় পড়ে গেল। এই দ্বিতীয় ধাপ পর্যন্ত তাদের চেনা পথ ছিল। কিন্তু মন্দিরের সর্বোচ্চ ধাপে তারা ওঠেনি। খসে যাওয়া মন্দিরের গায়ের সিঁড়ি বেয়ে প্রায় পাঁচতলা বাড়ির সমান উচ্চতায় অন্ধকারের মধ্যে ওঠা আত্মহত্যারই নামান্তর। হাত-পা একটু ফসকালেই দুশো ফুট নীচে পাথুরে চত্বরে আছড়ে পড়তে হবে। সুদীপ্তরা চাঁদ ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চাঁদ উঠল। ধোঁয়া-ধুলোহীন আকাশে সোনার থালার মতো উজ্জ্বল চাঁদ। তার আলো মন্দিরের গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা ধীরে-ধীরে উঠতে লাগল উপরে।

কোথাও-কোথাও সিঁড়ির ধাপ খসে গিয়েছে। দেওয়ালের খাঁজে হাত রেখে অনেকটা সাপের মতো উঠতে হচ্ছে। প্রথমে হেরম্যান, পিছনে সুদীপ্ত। অরণ্যের মাথায় চাঁদ যেন রহস্যময় হাসি হাসছে তাদের দুজনকে দেখে।

সুদীপ্তরা তখন সর্বোচ্চ তলে প্রায় পৌঁছে গিয়েছে, মাথার উপরে হঠাৎ একটা শব্দে আর-একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল সুদীপ্ত। মাথার উপরে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। তার শব্দ মন্দিরের চূড়া থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে চন্দ্রালোকিত অরণ্যের মাথায়, দূরে সমুদ্রের দিকে।

সুদীপ্তরা থামল। হেরম্যান মুহূর্ত খানেক ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমরা উপরে যাব। যা আছে কপালে! এ রহস্যের সমাধান করতেই হবে!'

সতর্কভাবে ধীর পায়ে আবার তিনি সুদীপ্তকে নিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। মাথার উপর বেজেই চলল ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং...।

শেষে এক সময় উপরে উঠল তারা। আর সেখানে পা রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেল। চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে ঘরগুলো। তার মাথায় স্তম্ভের উপর ঘণ্টাঘর দেখতে পেল তারা। তবে তার চারপাশ আচ্ছাদিত। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে

না। সুদীপ্তরা এগোল ঘরগুলোর দিকে। তাদের ঢোকার মুখে দু'পাশে বিশাল দুটো কোমোডো ড্রাগনের মূর্তি। সুদীপ্তরা ঢুকল ভিতরে। আর তারপরই তারা বুঝতে পারল এ তলে একটাই মাত্র ঘর। বিরাট বড় হলঘর। তার ছাদ নেই। ঘরের মাঝখানে একটা কোমর সমান উঁচু বেদির মতো জায়গা। তার চারদিক থেকে উঠেছে ঘণ্টাঘরের স্তম্ভ। ছাদহীন ঘর হলেও চারপাশের দেওয়ালের কোণে বিরাজ করছে গাঢ় অন্ধকার। সুদীপ্তরা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই বেদির সামনে। উলটো দিকের দেওয়ালের ছায়া সেখানে ঢেকে রেখেছে চাঁদের আলো। বেদির গায়ে দাঁড়িয়ে তারা তাকাল মাথার উপর ঘণ্টাঘরের দিকে। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বড় ঘণ্টা। একটা মোটা দড়ি সেখান থেকে নেমে এসেছে মাটিতে।

হেরম্যান দড়িটা ধরে বললেন, 'ঘাসে বোনা দড়ি। নিশ্চয়ই আদিবাসীরা লাগিয়েছে।'

সুদীপ্ত তাকিয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করছিল ঘণ্টাটা। তার মনে হল, বেদির উপর দাঁড়িয়ে ভালো করে ঘণ্টাটা দ্যাখে। এই ভেবে সে হাতে ভর দিয়ে বেদিতে উঠতে যেতেই হঠাৎ তার হাত দুটো যেন শূন্যে ঢুকে গেল। আর একটু হলেই সামনে ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছিল। মুহূর্তের মধ্যেই তাকে ধরে ফেললেন হেরম্যান।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল দুজনে। এটা আসলে বেদি নয়, বিরাট গহ্বর। তার চারপাশে পাথরের রেলিং থাকায় অন্ধকারে বেদি বলে ভুল হয়েছে। আর-একটু হলেই সুদীপ্ত পড়ে যাচ্ছিল ভিতরে। বিস্মিত সুদীপ্ত আর হেরম্যান রেলিং ধরে ঝুঁকে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার ভিতর শুধুই অন্ধকার।

হেরম্যান বেশ বড় একটা পাথরখণ্ড নিয়ে তার ভিতর ফেললেন। অনেক নীচে নেমে অস্পষ্ট ক্ষীণ শব্দ তুলল পাথরটা।

হেরম্যান বললেন, 'এটা সম্ভবত একটা বিরাট কূপ বা টানেল। মন্দিরের চূড়া থেকে অন্যতল ফুঁড়ে নীচে নেমেছে। একে কেন্দ্র করেই নীচের তাকের ঘরগুলো গোল করে সাজানো। যে কারণে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের হিসেব মিলছিল না।'

হেরম্যান এর পর একটা দেশলাই জ্বালালেন। হালকা আলো কূপের মুখ আলোকিত করল। তাতে হাত খানেক নীচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কূপের মুখের একপাশে নীচে নামার জন্য দেওয়ালের গায়ে খাঁজগুলো অস্পষ্টভাবে দেখা গেল।

দেশলাই নিভে গেল। হেরম্যান তাকিয়ে রইলেন অন্ধকার গহ্বরের দিকে।

সুদীপ্ত বলল, 'আপনি নীচে নামবেন নাকি?'

হেরম্যান বললেন, 'তা এখন আর সম্ভব নয়। আমি ভাবছি এরকম অদ্ভুত কূপ সেই প্রাচীন মানুষরা বানিয়েছিলেন কেন? নিশ্চয়ই জল তোলার জন্য নয়!'

এরপর হেরম্যান খসে পড়া দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালেন। জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে দূরে সমুদ্রতট দেখা যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'ওই তট বরাবর যেদিকে জাঙ্ক নোঙর করেছিল, সেদিকে যাব আমরা। চলো, এবার নীচে নামি।'

সুদীপ্ত বুঝতে পারল, কথাগুলো বলার সময় ব্যর্থ অভিযানের চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে

এল তাঁর বুক থেকে। সুদীপ্তরা পিছন ফিরল। ঠিক সেই সময় ছাদহীন বিরাট হলঘরের একটা কোণ থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ কানে এল। দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। দেওয়াল-খসা পাথরে একটা ঢিপিমতো হয়ে আছে সেখানে। চাঁদের আলো সেখানে যাচ্ছে না। খুব অন্ধকার।

সুদীপ্তরা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে শব্দের কারণ বুঝতে না পেরে আরও দু'পা এগোতেই এবার বেশ স্পষ্ট শব্দ হল। তারপর সম্ভবত ঢিপির উপর থেকেই পাথরের একটা ছোট টুকরো গড়িয়ে এল ঘরের মাঝখানে। সঙ্গে-সঙ্গে থেমে গেল তারা। অন্ধকারে সেদিকে কিছু না দেখা গেলেও সম্ভবত সেখানে জীবন্ত কেউ আছে। তার নড়াচড়ায় পাথার খসছে!

সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'কী, ওখানে কোমোডো নয় তো?'

পরমুহূর্তে তাদের মনে পড়ে গেল চত্বরে দেখা লু-সেনের শেষ মুহূর্তগুলো!

হেরম্যান চাপাস্বরে বললেন, 'হয়তো তাই। আমাদের ছুরি ছাড়া অস্ত্র নেই। আর উপায় নেই। মশাল জ্বালাতে হবে। আগুনকে সব প্রাণী ভয় করে। মশাল দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করতে হবে।'

মুহূর্ত খানেক ব্যবধান। দেশলাই ঘসার খস-খস শব্দ, আর তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মশালের আলোয় ঘরের অন্ধকার কেটে গেল। কোণের দিকের ঢিপি লক্ষ করে মশাল তুলে ধরতেই তারা দেখতে পেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে বুকের মধ্যে কী যেন চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সালুইন জায়া!

সালুইন কিছুটা টলোমলো ভঙ্গিতে ঢিপি থেকে নেমে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন। তারা এবার ভালোভাবে দেখা পেল তাঁর। পোশাক শতছিন্ন, সারা গায়ে রক্ত মাখা, বাঁ হাত দিয়ে বুকের কাছে ধরে রেখেছেন একটা ছোট কাঠের বাক্স। মুখে ফুটে উঠেছে পৈশাচিক হাসি। তবে চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে।

সাপের মতো হিসহিস করে তিনি বললেন, 'আমি জানি, আপনারাও আমার মতো সোনা খুঁজতে এসেছিলেন। পাননি, আমি পেয়েছি। ছেলেটাই শেষ পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিল সেখানে। সোনা! সোনা! অনেক সোনা সেখানে...! সব আমার...সব আমার...!'

হেরম্যান বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, সোনা খুঁজতে আমরা আসিনি। ওতে আমার আগ্রহ নেই। পথ ছাড়ুন, আমরা বাইরে যাব।'

পৈশাচিক হেসে সালুইন বললেন, 'যাবেন তো যান। বাইরে যাওয়ার একটাই দরজা নাকি? আমি যে পথে এখানে এলাম, সে পথে যান, নিশ্চিন্তে নীচে পৌঁছে যাবেন।' এই বলে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন কুয়োটা।

সুদীপ্ত আর হেরম্যান এবার সেখানে সালুইনের উপস্থিতি কীভাবে ঘটল বুঝতে পারলেন। চত্বর থেকে সুড়ঙ্গ-পথেই জায়গাটায় পৌঁছেছেন তিনি।

হেরম্যান বললেন, 'না, ও পথে আমরা যাব না। যে পথে উঠেছি সে পথেই নামব।'

সালুইন জায়া ঘোলাটে চাউনিতে তাকিয়ে বললেন, 'এত কাছে এলেন, সোনা

দেখবেন না? সোনা? রাশি-রাশি, ঘর-ভর্তি সোনা! নামুন-নামুন, কুয়োয় নামুন, ঠিক পৌঁছে যাবেন সেখানে। সারা জীবন এই স্বর্ণভাণ্ডার খুঁজেছি আমি। কতজনকে মেরেছি, আমার কত লোক মরেছে এর জন্য! লু-সেন পর্যন্ত বাঁচল না! শুধু আমিই মৃত্যুকে ফাঁকি দিলাম। কুকুরের মুখে রুটির টুকরোর মতো সামান্য ত্যাগ করতে হয়েছে আমাকে। এ ক্ষতি আমি পুষিয়ে নেব।' এই বলে বাঁ পা সামান্য একটু তুলে ধরে হা হা করে হাসতে লাগলেন সালুইন জায়া।

সালুইন জায়ার হাসির ভঙ্গি আর চোখের দৃষ্টি দেখে সুদীপ্তর কেন জানি মনে হল, সালুইন কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। সুদীপ্ত বইয়ে পড়েছে, প্রচুর সম্পদ কেউ হাতে পেলে অনেক সময় ভারসাম্য হারায়। আর তারপরেই সুদীপ্তর দৃষ্টি গেল সালুইনের পায়ের দিকে। তাঁর ডান পা'টা ঠিকই আছে, কিন্তু বাঁ পায়ের পাতা কেউ যেন জুতোসুদ্ধ ছিঁড়ে নিয়েছে। তাঁর হাইহিল বুটের ছিন্ন অংশ থেকে উঁকি দিচ্ছে লাল মাংস! শিউরে উঠল সুদীপ্ত।

হেরম্যান সুদীপ্তকে মশালটা দিলেন। তারপর কঠিন কণ্ঠে সালুইনকে বললেন, 'অনেক হয়েছে। এবার আমরা যাব। নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। সরে যান।' এই বলে সামনে এগোতে গেলেন তিনি।

তাঁর কথা কানে যাওয়া মাত্রই হাসি থামিয়ে সালুইন চিৎকার করে বললেন, 'যেতে হলে আপনাদের ওই কুয়ো দিয়েই নামতে হবে। আমি চাই না আপনারা কোনো দিন এখানে ফিরে আসুন।'

হেরম্যান আবার দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'না, যাব না।'

সালুইন জামার নীচ থেকে রিভলভার বের করে চিৎকার করে বললেন, 'যাবেন না?'

আর তারপরই তিনি হেরম্যানকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল ঘর। গুলির আঘাতে বেশ কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে স্থির হয়ে গেলেন হেরম্যান। টলোমলো পায়ে সালুইন এগোতে থাকলেন সুদীপ্তর দিকে। মুখে পৈশাচিক হাসি। ঠোঁটের কষ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। মশালের আলোয় তাঁকে মনে হচ্ছে জীবন্ত প্রেতমূর্তি।

হঠাৎ একটা অন্যরকম শব্দ কানে এল। ফোঁস-ফোঁস শব্দ। সুদীপ্ত শব্দ অনুসরণ করে তাকাল কুয়োর দিকে। কুয়োর ভিতর থেকে লাফ দিয়ে ঘরের মেঝেয় নামল বিশাল এক কোমোডো ড্রাগন। তাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে সুদীপ্তর মনে হল, কেউ যেন তার পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে ধরেছে। মুহূর্তের মধ্যে সুদীপ্ত ভুলে গেল সে একটা হিংস্র মানুষের রিভলভারের সামনে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। চোখ ফেরাতে পারল না সুদীপ্ত। মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাগন। মশালের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে প্রাণীটার সোনার শরীর! হেরম্যানের সোনার ড্রাগন! জ্বলন্ত চোখে সে তাকিয়ে আছে সুদীপ্তর দিকে। মাঝে-মাঝে তার চেরা জিভ ছুড়ে দিচ্ছে বাতাসে।

সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে নিয়ে প্রাণীটা মুখ ফেরাল সালুইনের দিকে। সালুইনের চোখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। দরজার দিকে পিছোচ্ছেন তিনি। তাঁর রিভলভারের নল প্রাণীটার দিকে। তাঁকে দেখামাত্র প্রাণীটা বাতাসে শ্বাস নিয়ে এগোতে শুরু করল তাঁর দিকে। রক্তের গন্ধ পেয়েছে প্রাণীটা। আর দেরি না করে আতঙ্কিত সালুইন তাঁর শেষ গুলিটা চালিয়ে দিলেন প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে। গুলি তার গায়ে লাগল কি না বোঝা গেল না। পনেরো ফুটের দানব ড্রাগন মাটি থেকে একটু লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে লেজ দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল সালুইনকে। দরজার কাছাকাছি মাটিতে ছিটকে পড়লেন তিনি, হাতের বাক্সটাও ছিটকে গেল মেঝেয়।

ড্রাগনটা আক্রমণ করার জন্য আবার এগোল তাঁর দিকে। প্রাণ বাঁচানোর একটা শেষ চেষ্টা করলেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে সালুইন উঠে দাঁড়িয়ে তিরগতিতে ছুটলেন দরজার বাইরে। তাঁকে তাড়া করল সোনার ড্রাগন। কিন্তু দরজার বাইরে কয়েক হাত তফাতে যে অতলস্পর্শী রেলিংহীন গহ্বর অপেক্ষা করছে তা বোধ হয় খেয়াল করেননি তিনি। দরজার বাইরে পা রাখার পরই সুদীপ্তর কানে এল সালুইনের আর্ত চিৎকার। সেই চিৎকার ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে নীচের দিকে। ড্রাগনটা দরজার মুখেই ছিল। সে ঘুরে-ঘুরে ধীর গতিতে এবার এগোতে লাগল সুদীপ্তর দিকে। ভাঁটার মতো জ্বলছে তার দুটো চোখ। আধো অন্ধকারে উজ্জ্বল আভা ছড়াচ্ছে তার সোনালি দেহ। ক্রুদ্ধ ফোঁস-ফোঁস শব্দের সঙ্গে তার দীর্ঘ জিভ বাতাসে লাফাচ্ছে। সুদীপ্ত ঘরের এক কোনায় পিছু হটতে লাগল। কোনোও অস্ত্র নেই তার হাতে, শুধু একটা মশাল। ঘরের মাঝে এসে একবার থমকে দাঁড়িয়ে বিরাট হাঁ করল প্রাণীটা। চোয়ালে সারবদ্ধ ভয়ংকর দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল সুদীপ্ত।

আবার এগোতে শুরু করল প্রাণীটা। সুদীপ্ত জ্বলন্ত মশালটা বেশ কয়েকবার নাড়াল। প্রাণীটা ভ্রুক্ষেপই করল না। সে এগোতে থাকল। সুদীপ্তর হাত-পনেরো দূরে এসে সে দাঁড়াল। সম্ভবত সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে সে আক্রমণ হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুদীপ্ত শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল মশাল। প্রাণীটা কাছে এলেই জ্বলন্ত মশালটা গুঁজে দেবে তার মুখে। বাঁচার শেষ চেষ্টা সে করবে। দুজনের সতর্ক দৃষ্টি দুজনের চোখের দিকে স্থির। এগোতে শুরু করল জীবন্ত ড্রাগন...!

হঠাৎ মাথার উপর ঘণ্টাটা আবার ঢং ঢং করে প্রচণ্ড জোরে বেজে উঠল। আর তারপরই যেন শূন্য থেকে সুদীপ্ত আর কোমোডোর ঠিক মাঝখানে ঘরের মেঝেয় এসে নামল সেই ছেলেটা! ঘণ্টাঘরের অন্ধকার থেকে দড়ি ঝুলে নেমে এসেছে সে।

তাকে দেখে ভয়ংকর প্রাণীটা কেমন যেন থমকে দাঁড়াল। ছেলেটা আর প্রাণীটা দুজনেই পাথরের মতো স্থির। প্রাণীটা কি ছেলেটার উপর লাফিয়ে পড়বে? এর পরই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখল সুদীপ্ত। ছেলেটা মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত টক-টক শব্দ করতে-করতে এগোল প্রাণীটার দিকে। ছেলেটা একবার মুহূর্তের জন্য সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় থেমে থাকতে বলে, তারপর হাঁটুমুড়ে বসে হাত রাখল সেই ভয়ংকর প্রাণীটার মাথায়!

প্রাণীটা কিন্তু কিছু করল না তাকে। এবার ছেলেটা তার মাথায় হাত বোলাতে লাগল, ঠিক যেমন পোষা প্রাণীকে কেউ যেভাবে আদর করে, সেভাবে। বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল ছেলেটা, মুখ দিয়ে দু'বার অদ্ভুত শব্দ করল। এতক্ষণ পর প্রাণীটা নড়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে ধীরে-ধীরে এগোল কুয়োর দিকে। কুয়োর পাথুরে রেলিংয়ে উঠে একবার সে তাকাল সুদীপ্তদের দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার সোনালি দেহ ধীরে-ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়োর অন্ধকারে।

সুদীপ্ত এবার ফিরে তাকাল হেরম্যানের দিকে। কখন যেন উঠে বসেছেন তিনি। তাঁর বিস্ফারিত চোখ কুয়োর দিকে। সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে দাঁড় করাল। সালুইনের গুলি তাঁর কোমরের চামড়া ছুঁয়ে চলে গিয়েছে। রক্তপাত হলেও আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। ইতিমধ্যে ছেলেটা ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা সালুইনের সেই বাক্সটা কুড়িয়ে এনে দাঁড়িয়েছে তাদের সামনে। হাসি-হাসি মুখে সে বাক্সটা তুলে ধরে দেখাল। কাঠের তৈরি কারুকাজ করা ছোট্ট বাক্স। তার উপর খোদিত আছে কোমোডো ড্রাগনের ছবি। দেখেই বোঝা যায় জিনিসটা অনেক প্রাচীন। ছেলেটা এর পর বাক্সটা নিয়ে এগোল কুয়োর দিকে। সুদীপ্তদের দিকে পিছন ফিরে বাক্স খুলে ভিতরটা উপুড় করে দিল কুয়োর মধ্যে। তারপর বাক্স বন্ধ করে সেটা নিয়ে এসে তুলে দিল হেরম্যানের হাতে। সুদীপ্তদের সে ইশারা করল তাকে অনুসরণ করার জন্য।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল তারা। মাথার উপর জ্যোৎস্না। চাঁদ যেন হাসছে তাদের দিকে চেয়ে। হঠাৎ নীচের দিকে চোখ যেতেই চমকে উঠল তারা। অরণ্যের ভিতর থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে জংলিরা। কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই মন্দিরের নীচে জমা হয়েছে। তাদের মশালের আলোয় ইতিমধ্যেই চত্বর আলোকিত। সম্ভবত ছেলেটার ঘণ্টাধ্বনি আস্কারি দ্বীপ থেকে ডেকে এনেছে তাদের। প্রাচীন মন্দির রক্ষা করতে ছুটে এসেছে তারা। সুদীপ্তরা তাদের দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। কী হবে এবার? নিচ থেকে তাদেরও দেখতে পেয়ে গিয়েছে লোকগুলো। অচেনা ভাষায় ক্রুদ্ধ গর্জন শুরু হল। দু'-একজন তির-ও ছুড়তে শুরু করল। ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ধাপের কিনারে। তাকে দেখে যেন একটা উল্লাস ধ্বনি উঠল সমবেত জনতার মধ্যে। তির ছোড়াও বন্ধ হল। নীচের লোকগুলোর উদ্দেশে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিৎকার করে যেন কী বলল ছেলেটা। ধীরে-ধীরে শান্ত হতে শুরু করল আদিবাসীরা। ছেলেটা এর পর সুদীপ্তদের দিকে ফিরে ইশারায় জানাল তার পিছন-পিছন নীচে নামার জন্য।

সুদীপ্তরা চত্বরে নেমে এল। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ঘিরে ফেলল আদিবাসীরা। অনেক লোক। অন্তত শ-তিনেক তো হবেই। বিচিত্র তাদের সাজ-পোশাক। মুখে কালো উল্কি। কাঁধে ধনুক, টাঙ্গি। অস্ত্রের ফলা ঝলকাচ্ছে মশালের আলোয়। মাথায় পালকের সাজ, নাকে বাঁশের টুকরো বেঁধানো, বাহুতে কোমোডোর উল্কি আঁকা। বর্শাধারী এক দীর্ঘদেহী প্রথমে কাছে এগিয়ে এল। দুর্বোধ্য ভাষায় তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর ছেলেটা সুদীপ্তদের দিকে তাকিয়ে হাসল। ছেলেটা এর পর সর্দারকে কী যেন বলল। তা শুনে

সে উচ্চস্বরে কী যেন বলল তার সঙ্গীদের। ভিড়টা একটু ফাঁকা হয়ে গেল। আর তাদের আড়াল থেকে বেরিয়ে সুদীপ্তদের সামনে এসে দাঁড়াল যেন বাচ্চাদের একটা দল। তাদের পিঠে ধনুক, হাতে ছোট বর্শা। তারা আকারে অনেকে ছেলেটার চেয়েও চেয়েও ছোট। কী আশ্চর্য! যুদ্ধ করতে এরা বাচ্চাদেরও সঙ্গে আনে নাকি? ছেলেটাকে দেখেই তারা তাকে ঘিরে আনন্দে নাচতে শুরু করল। যাকে বলে উদ্দাম নৃত্য। সুদীপ্তরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল সেই নাচ। ইতিমধ্যে একজন এসে ধরিয়ে দিয়ে গেল সুদীপ্তদের ব্যাগ দুটো। আরও অবাক হল তারা। সম্ভবত জঙ্গলে লোকগুলো কুড়িয়ে পেয়েছে সেগুলো। নাচ শেষ হতে সুদীপ্তদের নিয়ে তারা বনের মধ্যে দিয়ে এগোল সমুদ্রের দিকে। চত্বরের এক পাশে পড়ে রইল সালুইন জায়ার নিথর দেহ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্তরা পৌঁছে গেল সমুদ্রতীরে। অনেক নৌকো সেখানে। সেই ছেলেটা, হেরম্যান, সুদীপ্ত আর জনাতিনেক চাপল একটায়। বাকিরা অন্যগুলোয়। সেই লোক-বোঝাই নৌকোগুলো এগোল আস্কারি দ্বীপের দিকে, সঙ্গে সেই ছেলেরা। আর চাঁদের আলোয় সমুদ্রে সুদীপ্তদের নৌকো পাড়ি দিল অন্য দিকে। পিছনে পড়ে রইল 'ওরা' দ্বীপ, তার প্রাচীন মন্দির আর সেই মন্দিরের কোনো প্রাচীন ঘরে হেরম্যানের সোনালি ড্রাগন। ঢেউয়ের ছন্দে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল সুদীপ্তদের নৌকো।

আস্কারি দ্বীপের লোকরা যখন সুদীপ্তদের একটা দ্বীপে নামিয়ে দিল, তখন ভোর হতে বেশি বাকি নেই। ছেলেটা তার ভাষায় কী যেন বলল সুদীপ্তদের উদ্দেশে। সম্ভবত বলল, 'আমার আর কোনো দিন দেখা হবে না তোমাদের সঙ্গে। বিদায় বন্ধু। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য ধন্যবাদ। মনে রাখব তোমাদের...!'

সুদীপ্তও মনে-মনে একই কথা বলল তার উদ্দেশে। লোকগুলো ছেলেটাকে নিয়ে উঠে বসল নৌকোয়। উত্তাল ঢেউয়ে ভাসতে-ভাসতে আস্কারি দ্বীপের দিকে যাত্রা করল তাদের নৌকো।

সুন্দা ধীবরদের একটা বিরাট মাছ-ধরা নৌকোয় ফিরছিল সুদীপ্তরা। আস্কারি দ্বীপের লোকরা তাদের যে দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তার পাশ দিয়ে ধীবরদের নৌকো যাওয়ার পথ। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানা ছিল সেই দ্বীপবাসীদের। একটা ধীবরের নৌকো তুলে নিয়েছে তাদের। উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নৌকোর এক কোণে পাশাপাশি বসে ছিলেন দুজনে। হেরম্যান এক সময় বললেন, 'সোনালি ড্রাগনের ব্যাপারটা তুমি বুঝেছ?'

সুদীপ্ত বলল, 'আবছা একটা অনুমান করছি।'

হেরম্যান তাঁর ব্যাগ থেকে সেই ছোট্ট কাঠের বাক্সটা বের করে খুললেন। তারপর তর্জনী দিয়ে শূন্য বাক্সের ভিতরটা ঘসে আঙুলটা ধরলেন সুদীপ্তর সামনে। সোনালি রঙে মাখামাখি আঙুলটা সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে।

হেরম্যান আঙুলটা দেখিয়ে বললেন, 'সোনার গুঁড়ো! সালুইন ছেলেটাকে তাড়া করে পৌঁছে গিয়েছিল স্বর্ণকক্ষে। সোনার গল্পটা মিথ্যে নয়। আমার ধারণা, কোনো কারণে গুঁড়ো অবস্থায় মাটির নীচে সোনা লুকিয়ে রেখেছিল সেদিনের মানুষেরা। আস্কারি দ্বীপের মানুষরা ওই সোনাই যুগ-যুগ ধরে পাহারা দিচ্ছে। ওদিকে তারা তাই কাউকে যেতে দিতে চায় না। ঘণ্টাধ্বনিতে তারা সতর্ক করে সবাইকে। আর ওই মাটির নীচের ঘরেই বাস করে সেই অতিকায় জীবন্ত ড্রাগন। কাজেই আমার এই আঙুলের মতো তারও...!' কথাটা আর শেষ করলেন না তিনি।

সুদীপ্ত একটু বিমর্ষভাবে বলল, 'তা হলে এবারও দেখা মিলল না ক্রিপটিডের?'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'দেখা পেয়েছি তো!'

সুদীপ্ত অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

হেরম্যান বললেন, 'তা হলে শোনো। ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপে নাকি এক সময় ছোট্ট বামনরা বাস করত বলে প্রচলিত ধারণা ছিল। ব্যাপারটা প্রাথমিক অবস্থায় সুন্দা ধীবরদের লোককাহিনি বলেই মনে করা হত। কিন্তু কিছুদিন আগে ফ্লোরেসের লিয়াং বুয়া গুহা থেকে নৃতত্ত্ববিদরা খুঁজে পান সাতটি খুব ছোট মানবকঙ্কাল। তাদের বয়স তিরিশ হাজার বছর। নৃ-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে রায় দিয়েছেন, তাদের গড় উচ্চতা ছিল সাড়ে তিন ফুটের মতো। অর্থাৎ পিগমিদের চেয়েও এক ফুট কম। তিরিশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর আগে এ অঞ্চলে বসবাস করত তারা। শিকার করা, সাঁতার কাটায় বেশ দক্ষ ছিল সেই আদিম মানুষরা। বিজ্ঞানীরা তাদের নামকরণ করেছেন 'হোমো ফ্লোরেসিয়েনসিস'। ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের বিশ্বাস, ওই বামন মানুষরা নাকি আজও এই সুন্দাদ্বীপমালায় লুকিয়ে আছে। যদিও বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ কথা বিশ্বাস করেন না।' কথাগুলো বলে একটু চুপ করে থেকে হেরম্যান বললেন, 'আমার বিশ্বাস, আমাদের উদ্ধারকর্তা ছেলেটা বা দ্বীপবাসীদের সঙ্গে আসা ওর মতো ছোট্ট ছেলেরা আসলে ছোট নয়। যে কারণে ছেলেটা সমুদ্রে ঝাঁপাতে পেরেছে, ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে পেরেছে, সব কাজই পরিণত মানুষের মতো। ছেলেটা আসলে তোমারই মতো একজন পূর্ণাঙ্গ যুবক। ফ্লোরেস দ্বীপে হাজার-হাজার বছর ধরে একসঙ্গে কাটিয়েছে কোমোডো ড্রাগন আর ফ্লোরেসিয়েনসিসরা। তাই হয়তো কোমোডাকে বশ মানানোর কৌশল জানা আছে ছেলেটার। আস্কারি দ্বীপের লোকরা ওদের নিজেদের দলে নিয়ে রক্ষা করছে। প্রতিদানে তারাও হয়তো কোমোডোর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে তাদের। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা টিকিয়ে রেখেছে ক্ষুদ্র মানুষের অস্তিত্ব।'

সব শুনে বিস্মিত সুদীপ্ত বলল, 'আপনার ধারণা যদি সত্যি হয় তবে ওরা ব্যাগ ফিরিয়ে দেওয়ার পর ছেলেটার ফোটো তুলে রাখলেন না কেন?'

হেরম্যান উদাসভাবে দার্শনিকের মতো বললেন, 'কী হবে ফোটো তুলে? আমার হয়তো কিছু খ্যাতি হবে তাতে, কিন্তু এ ফোটো বিপন্ন করতে পারে ওদের জীবন। মানুষের লোভ সর্বগ্রাসী। তার চেয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে তারা সুখে থাকুক। খ্যাতি নয়, জ্ঞান সঞ্চয় করাই আসল ব্যাপার।' এরপর তিনি বললেন, 'তবে এ দ্বীপরাজ্যে আবার আসব আমি।'

লোকশ্রুতি, জাভার জঙ্গলে আজও নাকি পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক উড়ন্ত দানব। তার ডাক শোনা যায়। স্থানীয় আদিবাসীরা তাকে বলে, 'আ-হুল...'!

নতুন এক ক্রিপটিডের গল্প শোনাতে শুরু করলেন হেরম্যান। সুন্দাদ্বীপমালার সমুদ্র তরঙ্গে দুলতে-দুলতে ভেসে চলল সুদীপ্তদের নৌকো।

শেবামন্দিরের
সিংহমানুষ
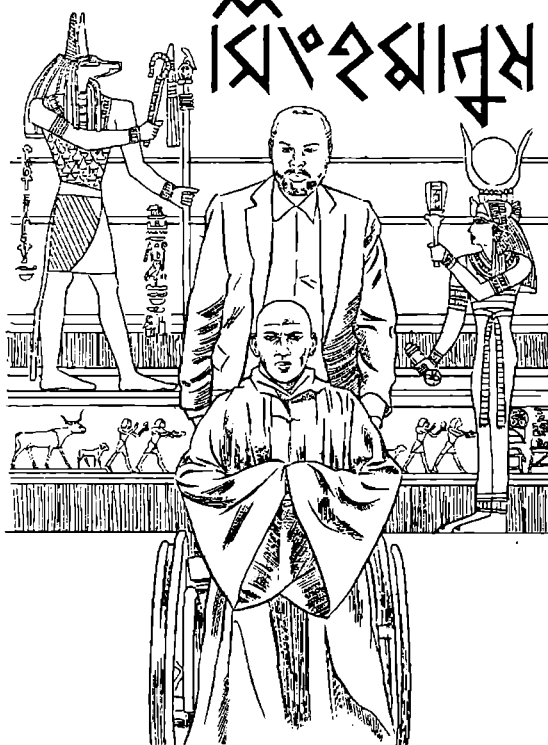
বিরাট মূর্তিটার দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়েছিল সুদীপ্ত। ইতিহাস বইয়ের এ মূর্তির ছবি সে বহুবার দেখেছে। বিশালাকার এক মূর্তি সামনের দুটো থাবা মেলে বসে আছে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে। তার দেহটা সিংহের, আর মাথাটা মানুষের। সিংহ-মানুষ বা স্ফিংস। হাজার হাজার বছর ধরে একইভাবে বসে সে যেন পাহারা দিচ্ছে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পিরামিডগুলোকে। নীল নদের উপত্যকায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার একমাত্র সাক্ষী এই সিংহ-মানুষ। কত মরু-ঝড় বয়ে গেছে এই মূর্তির ওপর দিয়ে, তবু সে আজও জেগে আছে অতন্দ্র প্রহরীর মতো। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'জানো, ঠিক আমরা যেভাবে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এমনি-ভাবেই এই মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়নের মতো মহাবীররা! মহাকাল তাঁদের সবাইকে গ্রাস করে নিলেও এখনও এই মূর্তিটা স্বমহিমায় বিরাজমান। সত্যি, মানুষের জীবন কত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর!'

সুদীপ্ত মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রাচীন মিশরীয়দের কল্পনাশক্তি খুব বেশি ছিল, নইলে এমন এমন মূর্তি কেউ বানাতে পারে না। আমাদের দেশে অবশ্য এক গল্প আছে। ভগবান বিষ্ণু নাকি একবার সিংহ-মানুষ বা নরসিংহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদকে বাঁচাতে। তাঁর মাথাটা ছিল সিংহের।'

হেরম্যান বললেন, 'তাই নাকি? তবে আজ হোটেলের ঘরে খবরের কাগজে একটা অদ্ভুত খবর দেখলাম।'

'কী খবর?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'সিংহ-মানুষের। আফ্রিকার বহু মানুষ এই সিংহ-মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তাদের ধারণা, স্থানীয় ওঝা বা জাদুকর মারা যাবার পর তাদের প্রেতাত্মারা সিংহ-মানুষের রূপ নিয়ে মানুষের রক্তপান করে। তুমি হয়তো জানো যে সাহারা মরুভূমির কিছু অংশে সংখ্যায় অল্প হলেও সিংহ পাওয়া যায়। এই মিশরের সুদান সীমান্তে একটা গ্রামে নাকি সিংহ-মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তার পায়ের ছাপ মিলেছে। দুজন মানুষকে ইতিমধ্যে হত্যাও করেছে সে। স্থানীয় মানুষের অভিমত তাই। খবরের কাগজে তাই লিখেছে।'

সুদীপ্ত বলল, 'এমন তো হতে পারে যে, কোনো সিংহই আসলে সে মানুষগুলোকে মেরেছে?'

হেরম্যান বললেন, 'তা পারে। কিন্তু সিংহের পায়ের ছাপ যেখানে পাওয়া গেছে

সেখানে মানুষের যে অন্য হাত-পায়ের ছাপ মিলেছে, তা মৃত মানুষের নয়।'—এরপর হেরম্যান রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে দেরি হয়ে গেল! শো মনে হয় শেষ হয়ে গেল! চলো চলো!'

কাছেই ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসে ট্যুরিস্টদের জন্য একটা স্লাইড শোর টিকিট এখানে আসার পরই কেটে রেখেছিল সুদীপ্তরা। হেরম্যানের কথা শোনার পরই আশেপাশের ট্যুরিস্টদের ভিড় ঠেলে দুজনে ছুটল সেদিকে।

ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের যে ঘরটায় শো চলছে, তারা যখন সেখানে ঢুকে চেয়ারে বসল তখন শো প্রায় শেষের পথে। ছোট্ট হলঘরটা অন্ধকার। পর্দায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে ফুটে উঠছে নানা ছবি। আর একজন ভদ্রলোক মাইক্রোফোন হাতে বলে যাচ্ছেন সেই ছবিগুলো সম্বন্ধে, মিশরের ইতিহাস সম্বন্ধে। সুদীপ্তরা দেখতে লাগল সেই ছবি।

একসময় পর্দায় ফুটে উঠল মিশরীয় দেবতাদের সার সার ছবি। নানা প্রাচীন দেবদেবীর অদ্ভুত সব মূর্তি! যে ভদ্রলোক বিবরণ দিচ্ছিলেন, তিনি এবার বললেন, 'ছবিগুলো আপনারা ভালো করে লক্ষ করুন। অন্য দেশের দেবদেবীদের সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় দেবদেবীর বিশেষ পার্থক্য আছে। আপনারা স্ফিংস দেখেছেন। তার দেহটা সিংহের, মুখটা মানুষ বা ফারাওয়ের। তেমনই মিশরের প্রায় প্রত্যেক দেবদেবীর মাথা অথবা দেহ কোনো-না-কোনো পশুপাখির। মানুষের মাথা, আর ভেড়ার দেহ, যে মূর্তি আপনারা পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন, তা হল সূর্যদেবতা 'হ্যাথরের' মূর্তি। মানুষের দেহ আর বাজপাখির মাথাঅলা মূর্তি হল, আকাশদেব 'হোরাসের'। বাঁকানো ঠোঁটের পাখির মাথাঅলা মূর্তি হল বিচারের দেবতা 'কা'-এর। ওই যে, কুকুরের মাথাঅলা দেবতা তো আপনাদের অনেকেরই পরিচিত—'মৃত্যুর দেবতা অনুবিস।' আর এই সারসের মাথাঅলা দেবী হলেন, প্রাচীন মিশরীয়দের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও চিকিৎসার দেবী 'থট' বা 'থথ্'। সে যুগে মিশরবাসী নানা পশুপাখি পুষতেন। ষাঁড়, বিড়াল, বাজপাখি এদের দেবতা জ্ঞানে পুজোও করা হত। অনুমান করা হয় সেজন্যই এ ধরনের দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করা হত...।'

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে কে হো হো করে হেসে উঠল!

হাসিটা শুনে মুহূর্তের জন্য থামলেন ভাষ্যকার। তারপর আবার শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, প্রাচীন মিশরীয়রা এসব কল্পিত মূর্তি বানিয়েছিলেন...।'

'হা, হা, হা!' আবারও হাসির শব্দ! এবার আরও জোরে। দর্শকরা ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করতে লাগল হাসির উৎস কোথায়?

ঘোষক এবার স্পষ্ট বিব্রত হয়ে বললেন, 'সাইলেন্স প্লিজ! হাসবার মতো কোনো ব্যাপার ঘটেনি।'

হাসি আর শোনা গেল না। ঘোষক আবার বলতে শুরু করলেন। অবশ্য আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শো শেষ হয়ে গেল। জ্বলে উঠল প্রেক্ষাগৃহের আলো। আসন ছেড়ে উঠে সবাই বাইরে বেরোবার জন্য এগোল। সুদীপ্তরাও বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল, ঠিক

এই সময় তারা দেখতে পেল একজনকে। গলা থেকে পা পর্যন্ত সাদা আলখাল্লায় মুড়ে হুইল চেয়ারে বসে আছেন এক মুণ্ডিতমস্তক মিশরীয় ভদ্রলোক। আর হুইল চেয়ারটাকে ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে একজন দীর্ঘদেহী কাফ্রি। বেরোবার সময় হঠাৎ সেই লোকটার সঙ্গে ঘোষকের চোখাচোখি হতেই সেই ঘোষক হুইল চেয়ারে বসা লোকটার উদ্দেশে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, 'ও ডক্টর টিউনিস আপনি! তাই ভাবছিলাম কে হাসে!'

টিউনিস বলে লোকটা বললেন, 'তুমি হাসার মতো কথা বললে হাসব না? তুমি কী করে জানলে ওই মূর্তিগুলো সব কল্পিত? ওসব প্রাণীর বাস্তবে অস্তিত্ব কোনোদিন ছিল না? হয়তো অমন প্রাণী ছিল সে সময়?' প্রথমজন এবার তাঁর কথা শুনে বললেন, 'মরুভূমির অশিক্ষিত লোকজনের সঙ্গে থাকতে থাকতে আপনার মাথাটা আরও বেশি খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। খবরের কাগজে পড়লাম, আপনি যেখানে থাকেন সেখানে নাকি সিংহ-মানুষ বেরিয়েছে! আপনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে নাকি? তবে তার সঙ্গে একটা ছবি তুলে পাঠাবেন। স্লাইড শো-তে দেখাব।' বিদ্রুপের স্পষ্ট সুর শোনা গেল তাঁর গলায়।

মুণ্ডিতমস্তক হুইল চেয়ারে বসা লোকটা বক্তার উদ্দেশে একটা ছোট্ট মন্তব্য করলেন—'মূর্খ!' কাফ্রিটা এরপর তাঁকে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

সে বাইরে যেতেই একজন ট্যুরিস্ট কৌতূহলবশত ঘোষককে জিজ্ঞেস করল, 'এ লোকটা কে?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'লোকটা ইজিপ্টোম্যানিয়াক। উনি অধ্যাপনা করতেন। পাগলামির জন্য সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। সভ্য সমাজ ছেড়ে এখন অনেক দূরে দিন কাটান। মিশরের ইতিহাস নিয়ে অনেক উদ্ভট চিন্তা আছে ওঁর! ইজিপ্টোম্যানিয়াক মানে ইজিপ্ট নিয়ে গবেষণা করতে করতে যাঁরা আধপাগল হন।'

সুদীপ্তরা এসব কথোপকথন শুনে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'চলো তো, একবার বাইরে বেরিয়ে ওই হুইল চেয়ারে বসা লোকটার সঙ্গে কথা বলা যাক। খবরের কাগজের সিংহ-মানুষের ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং। যদি লোকটা ও ব্যাপারে কিছু বলতে পারে।'

সুদীপ্ত তাঁর কথা শুনে হেসে বলল, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে!'

হেরম্যান বললেন, 'তবে আমরা যে ক্রিপটিড বা গল্পকথার প্রাণী নিয়ে অনুসন্ধান করি সে কথা বলার প্রয়োজন নেই লোকটাকে। আমরা ট্যুরিস্ট হিসাবেই নিজেদের পরিচয় দেব।'

সুদীপ্ত বলল, 'ঠিক আছে চলুন।'

বাইরে বেরিয়ে এল তারা। চারপাশে তাকিয়ে তারা দেখতে পেল লোকটাকে নিয়ে হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলেছে তাঁর অনুচর।

'এক্সকিউজ মি।' লোকটার সামনে গিয়ে হেরম্যান কথাটা বলতেই থেমে গেল হুইল চেয়ার। তাতে বসা ভদ্রলোক, কিছুটা বিস্মিতভাবে তাকালেন সুদীপ্ত আর হেরম্যানের দিকে।

হেরম্যান লোকটার উদ্দেশে বললেন, 'একটু আগে আমরাও ট্যুরিস্ট সেন্টারে স্লাইড শো দেখছিলাম। বেরোবার সময় আপনার একটা কথা কানে এল। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।'

'কোন কথাটা?' মৃদু সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

'ওই যে আপনি বললেন লোকটাকে যে সে কী করে জানল পশুপাখির দেহঅলা মানুষ কোনোদিন ছিল না? আপনার কি মনে হয় সে সব প্রাণী ছিল?' জানতে চাইলেন হেরম্যান।

ভদ্রলোক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কে?'

হেরম্যান নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার নাম হেরম্যান। জার্মানির লোক। আর এ হল সুদীপ্ত। ইন্ডিয়ান। আমরা দুই বন্ধু পৃথিবী ঘুরে বেড়াই। ইজিপ্ট বেড়াতে এসেছি।'

ভদ্রলোক শুনে হুইল চেয়ার থেকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমার নাম ডক্টর টিউনিস। ইজিপ্টেরই লোক। চলুন ওই ছায়ায় গিয়ে কথা বলি।'

কিছুদূরে বালির মধ্যে একটা প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল সবাই। একটু চুপ করে থেকে টিউনিস বললেন, 'হ্যাঁ, এ কথাটা আমি বিশ্বাস করি। নইলে এ কল্পনা মিশরের প্রাচীন মানুষদের মনে এল কীভাবে? সবই কি নিছক কল্পনা? এখানে প্রায় সর্বত্রই এ ধরনের মূর্তির ছবি পাওয়া গেছে। এসনার মন্দিরে ছবিতে সিংহ-মানুষের ছবি আছে। রানি শেবার মন্দিরে ছবি আছে যে রানি সিংহাসনে বসে আছেন, আর তাঁর হাতের শিকলে বাঁধা আছে দুটো প্রাণী। তাদের দেহ সিংহর, আর মুণ্ডু দুটো বাচ্চা ছেলের। আমি যেখানে থাকি সেখানেও বহু প্রাচীন স্থাপত্যের গায়ে ওই ছবি আছে।'

হেরম্যান বললেন, 'আজকের খবরের কাগজেও তো সিংহ-মানুষের খবর বেরিয়েছে। মিশর-নুবিয়ান সীমান্তে সিংহ-মানুষ হত্যা করেছে দুজনকে। এ ব্যাপারে আপনার কী মত?'

ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, 'আমিও দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি মৃতদেহ দুটোও দেখেছি। ছিন্নভিন্ন ক্ষতবিক্ষত দুটো মৃতদেহ। সিংহর নখ ফালাফালা করে চিরেছে তাদের। বীভৎস ব্যাপার!'

'আপনার কি মনে হয় সিংহ-মানুষই কাজটা করেছে? ওটা তো সিংহের কীর্তিও হতে পারে?' প্রশ্ন করল সুদীপ্ত।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'তা হতে পারে। এক সময় সাহারা মরুভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে সিংহ দেখা যেত। তাদের কিছু বংশধর এখনও টিকে আছে ও তল্লাটে। কিন্তু বুশম্যানদের অভিমত, সিংহর পায়ের ছাপের পাশে অন্য মানুষের হাত-পায়ের ছাপ মিলেছে। আমার নিজস্ব অভিমত হল যে কাজটা সিংহ-মানুষের কিনা তা শুধুমাত্র সিংহর ছাপের পাশে অন্য ছাপ দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তবে এক সময় ও ধরনের মানুষ বা প্রাণী নিশ্চয়ই ছিল, নইলে ওই যে ফিংসের মূর্তি, ওর ধারণা মানুষ কোথা থেকে পেল? প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি বা হিয়ারোগ্লিফিকেও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত আছে। আমার এ সব নিয়ে কিছুটা চর্চা আছে।'

হেরম্যান বললেন, 'বিভিন্ন আফ্রিকান উপকথায় তো সিংহ-মানুষের কথা আছে তাই না?'

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আফ্রিকার উপজাতিদের মধ্যে অনেক জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস প্রেতাত্মারা মৃত্যুর পর রক্তপানের লোভে সিংহ-মানুষের রূপ ধারণ করে। কোনো কোনো সময় জাদুকররাও এ রূপ ধারণ করে। সাধারণত এদের দেহটা সিংহর হয়। তবে ইচ্ছা করলে তারা আবার পরিপূর্ণ মানুষের বা সিংহর রূপ ধারণ করে। এ নিয়ে বেশ কয়েকটা ঘটনাও খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। তার দু-একটা ঘটনার কথা আমার আজও মনে আছে।'

'যেমন?' প্রশ্ন করলেন হেরম্যান।

একটু ভেবে নিয়ে টিউনিস বললেন, 'যেমন বছর কুড়ি আগে একটা ঘটনা সংবাদপত্রে খুব হইচই ফেলে দিয়েছিল। উইলিয়ম নামের এক ইউরোপীয় 'লেক নাসের'-এ উপস্থিত হয়েছিলেন সিংহ ধরার জন্য। তাঁর কাজ ছিল সার্কাস আর চিড়িয়াখানার জন্য বন্য জন্তু সরবরাহ করা। সে সময় এক বিরাটাকায় সিংহর কথা শোনা যাচ্ছিল ও তল্লাটে। সে খবর শুনেই সেখানে হাজির হয়েছিলেন উইলিয়াম। স্থানীয় বুশম্যানরা তাঁকে সতর্ক করে বলেছিল, 'সাহেব ওটা আসলে সিম্বা নয়, ও হল জাদুকর মুরুবি। তুমি অন্য সিংহ ধরো।'

উইলিয়াম বিশ্বাস করলেন না সে কথা। শুধু তাই নয়, তিনি সটান গিয়ে হাজির হলেন গ্রামের বাইরে জাদুকর ওঝার ডেরায়। জাদুকর হেসে বলল, 'হ্যাঁ, সাহেব, ওই সিংহটা আমি। রাতে সিংহর রূপ ধরি।' তার কথা শুনে আরও খেপে গেলেন সাহেব। তিনি জাদুকরকে বললেন, ফের যদি সে এসব প্রচার করে নিরীহ গ্রামবাসীদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করে তবে তিনি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। সে যেন রাতের মধ্যেই সে তল্লাট ছেড়ে চলে যায়।

যাই হোক সে রাত্রেই একটা ভেড়ার টোপ দিয়ে সেই সিংহটার যাত্রাপথে একটা দাঁত ফাঁদ পাতলেন উইলিয়াম। মাঝরাতে সিংহর রক্ত জল করা চিৎকার শুনে বুঝতে পারলেন প্রাণীটা ফাঁদে পড়েছে।

পরদিন ভোরে ফাঁদের কাছে গিয়ে সাহেব দেখতে পেলেন সত্যিই ইস্পাতের দাঁতে আটকে গেছে বিরাট একটা সিংহর পিছনের পা। সিংহ গজরাচ্ছে, ছটফট করছে, কিন্তু কিছুতেই মুক্ত হতে পারছে না। ইস্পাতের দাঁত কেটে বসেছে তার পায়ে। ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে সিংহটাকে কব্জা করে তাকে পোরা হল বিরাট এক কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো বাক্সে। সেই বাক্সে খাবার দেবার জন্য একটাই ছোট ছিদ্র। বাক্সের বাইরে দরজা বন্ধ করার জন্য বিরাট ছিটকিনির বন্দোবস্ত। সিংহটাকে বন্দি করার পর সাহেব খোঁজ নিয়ে জানলেন সেই জাদুকর আর তার কুঁড়েতে নেই। সম্ভবত তার হুমকিতে কাজ হয়েছে। আটক রইল সিংহ। সাহেব এবার লেগে পড়লেন চিতা ধরার কাজে। কিন্তু তৃতীয় দিন ভোরে সাহেব খবর পেলেন সিংহ খাঁচার দরজা খুলে পালিয়েছে। সাহেব হাজির হলেন অকুস্থলে। খাঁচায় সিংহ নেই। দরজা ভাঙা হয়নি, ছিটকানি খোলা হয়েছে। সিংহ কি তবে খাবার দেবার ফুটো দিয়ে থাবা বাড়িয়ে ছিটকানি খুলল? কিন্তু মানুষের হাত ছাড়া তো সিংহর থাবায় ছিটকানি খোলা সম্ভব নয়! কী হল ব্যাপারটা? আর এরপরই সাহেব দেখতে পেলেন কাঠের বাক্সের ভিতর সিংহর দাঁতের লকেটঅলা পাথরের একছড়া হার পড়ে আছে। স্থানীয় লোকেরা মালাটাকে শনাক্ত করল সেই জাদুকরের বলে। এবং তিনদিন পর জাদুকর নাকি আবার তার কুটিরে ফিরে এসেছে বলেও তারা জানাল।' টানা কথা বলে থামলেন ভদ্রলোক।

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে সেই জাদুকরই খাঁচার দরজা খুলে সিংহকে মুক্ত করেছিল। তারপর ওই উইলিয়ামকে বিভ্রান্ত করার জন্য তার মালাটা খাঁচায় ফেলে দিয়ে গেছিল? খাঁচা খোলার ব্যাপারটা বিপজ্জনক হলেও অসম্ভব নয়।'

টিউনিস মৃদু হেসে বললেন, 'আমার গল্প সামান্য একটু এখনও বাকি আছে। হ্যাঁ, উইলিয়ামও আপনার মতোই ভেবেছিলেন। এরপরই তিনি ছুটলেন সেই জাদুকর ওঝা মুরুব্বির ডেরায়। মুরুব্বি তাঁকে দেখে হেসে বলল, 'বুঝলে সাহেব, অমন নধর ভেড়াটা দেখে লোভ সামলাতে পারিনি। তাই তোমার ফাঁদে পড়ে গেছিলাম। কাল হাত বাড়িয়ে ছিটকানি খুলে বাইরে বেরোলাম।'

সাহেব তার কথা শুনে চিৎকার করে বললেন, 'তুমি একটা মিথ্যাবাদী!'

জাদুকর হেসে বলল, 'না, মিথ্যাবাদী নই। তবে পায়ের ঘা'টা ক'দিন ভোগাবে। ফাঁদটা জব্বর ছিল তোমার!'

কথাটা শুনে উইলিয়াম চমকে উঠে তাকালেন লোকটার পায়ের দিকে। জাদুকরের বাঁ-পায়ের ওপর আঁকা হয়ে আছে একটা দিন তিনেকের পুরোনো ক্ষতচিহ্ন। সাহেব দেখেই বুঝতে পারলেন সেটা কিসের ক্ষত। ইস্পাতের দাঁতের। ঠিক এমনই ক্ষতচিহ্ন আঁকা হয়ে গেছিল সেই সিংহটার বাঁ পায়ে! বলাবাহুল্য, এরপর উইলিয়ামকে বাধ্য হয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ, স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে সাহায্য করে আর জাদুকরের কোপে পড়তে রাজি ছিল না। তবে মানুষ বা প্রেতাত্মা সিংহমানুষ হয়, এ ব্যাপারটা আমি ঠিক বিশ্বাস করি না। প্রাচীন মিশরে সিংহমানুষ বলে যা ছিল তা সিংহ-মানুষই

বলে আমার অনুমান।'—এই বলে কথা শেষ করলেন ডক্টর টিউনিস।

সুদীপ্ত শুনে বলল, 'বাঃ দারুণ গল্প!'

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'হ্যাঁ, এমন আরও ঘটনা শোনা যায় সিংহ-মানুষদের ব্যাপারে। তা আপনারা এ দেশে কোথায় কোথায় বেড়ালেন? কোথায় বেড়াবেন?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আমরা গতকালই এসেছি এখানে। লাক্সর, এসনা এসব জায়গা দেখার ইচ্ছা আছে। নীলনদে রিভার ক্রুজে যাবার ইচ্ছাও আছে। তবে এখনও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। আপনার কোনো সাজেশন আছে এ ব্যাপারে?'

ভদ্রলোক একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'যদি একটু অন্যরকম জায়গা দেখতে চান তবে আমাদের ওদিকেও যেতে পারেন। ও জায়গা ইজিপ্ট আর সুদানের সীমান্ত অঞ্চল। রানি শিবা বা শেবার প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে সেখানে। কেউ কেউ বলে রানির গুপ্তধন নাকি সেখানে লুকানো আছে। একসময় ভাগ্যান্বেষীরা ওখানে গুপ্তধন খুঁজতে যেত। তবে ট্যুরিস্ট ওখানে খুব একটা যায় না। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের পক্ষে জায়গাটা আদর্শ। এসনা বা লাক্সর তো সবাই দেখে। আর ওখানে গেলে সিংহ-মানুষের দেখা পান বা না পান দুর্লভ সাহারা মরুভূমির সিংহর দেখা পেতে পারেন। কালো কেশরঅলা সাহারার সিংহ এখনও কিছু টিকে আছে সেখানে। আর কিছুদিন পর তারাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।'

হেরম্যান শুনে বললেন, 'কীভাবে যেতে হয় সেখানে?'

ডক্টর টিউনিস আবারও যেন একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'ইচ্ছে হলে আমি আপনাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারি। আমার একটা ছোট ফোর সিটার ফকার প্লেন আছে। সেটা নিয়ে আমি ওখান থেকে কায়রো আসা-যাওয়া করি জিনিসপত্র কিনতে। ট্রেনে আসতে একরাত লাগে। আপনারা আমার সঙ্গে যেতে পারেন। ট্রেনে ফিরবেন। দশ মাইল দূরে হলেও সেখানে একটা রেলস্টেশন আছে মরুভূমির মধ্যে। আপনারা গেলে আমার বাড়িতেই থাকবেন। আপনাদের সঙ্গলাভ করা যাবে।'

সুদীপ্ত একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'নিজস্ব প্লেন?'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, নিজস্ব প্লেন। অকশন থেকে সস্তায় কিনেছি। ওর জ্বালানি ভরার জন্যও আমাকে কায়রো আসতে হয়।'

হেরম্যান ডক্টরের উদ্দেশে বললেন, 'আপনি ওখানে কী করেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'তেমন কিছু নয়। একলা মানুষ, নিজে নিজের মতো থাকি। এই প্রাচীন সভ্যতার নানা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করি। বিশেষত হিয়ারোগ্লিফিক নিয়ে চর্চা করি। আপনারা গেলে ক'টা দিন গল্প করার, শোনাবার লোক পাব।' এরপর তিনি বললেন, 'আমার প্লেনটার সুবিধা হল ওটা ওঠানো-নামানোর জন্য এয়ারপোর্টের দরকার হয় না। স্ফিংসের উত্তরে ওই যে দূরে বালিয়াড়িটা দেখছেন ওর আড়ালে প্লেনটা রাখা আছে। এখন বেলা বারোটা। আমার শহর থেকে কিছু কেনাকাটার দরকার আছে। বিকাল চারটে নাগাদ ফ্লাই করব আমি। ইচ্ছে হলে, ভরসা থাকলে চলে আসুন। আমার এই

অ্যাসিস্টেন্ট মোগাবো শুধু হুইল চেয়ার ঠেলে না, প্লেনও চালাতে পারে, এমনকী সিংহ শিকারও করতে পারে।'

ডক্টরের কথা শুনে ধবধবে সাদা দাঁত বার করে হাসল মোগাবো।

এভাবে ঘটনাচক্রে যে ডক্টর টিউনিসের সঙ্গে আলাপ হবে, এবং হেরম্যান তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হবেন তা সুদীপ্তর কল্পনায় ছিল না। ডক্টর টিউনিসের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে গীজা থেকে কায়রোর হোটেলে ফিরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে, খাওয়া সেরে বেলা তিনটে নাগাদ আবার গীজাতে সেই স্ফিংসের সামনে প্রথমে ফিরে এল তারা। তারপর উট নিয়ে যাত্রা শুরু করল যেখানে ডক্টর টিউনিস হেরম্যান আর সুদীপ্তর জন্য অপেক্ষা করছেন সেদিকে। সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল 'আপনি যে ভদ্রলোকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবেন ভাবিনি।' যেতে যেতে হেরম্যান পাশের উটে বসা সুদীপ্তকে বললেন, 'আমি একজন ক্রিপটোজ্যুলজিস্ট। ক্রিপটিড বা লোককথা-উপকথার প্রাণী খোঁজা আমার কাজ। তুষারবৃত হিমালয় থেকে কখনো ইন্দোনেশিয়ার সুন্দাদ্বীপ, কখনো বা আফ্রিকার বুরুন্ডিতে তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি ইয়েতি, সোনার ড্রাগন বা সবুজ মানুষের সন্ধানে। বলতে গেলে সত্যি তেমন কিছুর সন্ধান পাইনি। কে বলতে পারে এবার হয়তো কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই 'সিংহ-মানুষের' দেখা মিলতে পারে। ভাগ্য-দেবতা কখন যে কার প্রতি প্রসন্ন হন তা আগাম বলা যায় না! ডক্টর টিউনিসের সঙ্গে দেখা হবার কোনো কথাই ছিল না। অথচ হল!'

সুদীপ্ত হেসে বলল, 'আমরা যে ওখানে রানি শেবার গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাচ্ছি না তা জানি। তবে তা পেলে মন্দ হয় না।' উটের পিঠে চেপে বালিয়াড়িটা অতিক্রম করতেই তারা দেখতে পেল এরোপ্লেনটাকে। এক জায়গাতে গঙ্গাফড়িং-এর মতো মাথাটা কিছুটা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সাদা রঙের ছোট্ট প্লেনটা। তার কাছাকাছি পৌঁছে উট ছেড়ে দেওয়া হল। একটু হেঁটে প্লেনের কাছে পৌঁছে গেল সুদীপ্তরা। সেই হুইল চেয়ার সমেতই চালকের আসনের পাশে বসে আছেন ডক্টর। কীভাবে তাঁকে সেখানে ওঠানো হল কে জানে! মোগাবো নীচে দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ্তদের দেখে ডক্টর টিউনিস বললেন, 'নিন, এবার উঠে পড়ুন। এ প্লেনটা একটু পুরোনো হলেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আশা করি পৌঁছে যাব।' আর বাক্যব্যয় না করে মালপত্রসমেত প্লেনে উঠে পড়ল সুদীপ্তরা। মোগাবো নামের লোকটাও উঠে বসল চালকের আসনে। গোঁ গোঁ শব্দে ইঞ্জিন স্টার্ট হল। বালির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়াতে লাগল তার চাকা। তারপর একসময় ছোট্ট ফকার প্লেনটা ডানা মেলে আকাশে উঠল। সুদীপ্তরা রওনা হল অজানার সন্ধানে

সিংহ-মানুষের দেশে।

বেশ নীচ দিয়েই দক্ষিণ দিকে উড়ে চলল প্লেনটা। পায়ের নীচে দিকচিহ্নহীন বালির সমুদ্র, অসংখ্য বালিয়াড়ি, কখনো কখনো সেই বালির সমুদ্রে দেখা যাচ্ছে খণ্ডহর প্রাচীন স্থাপত্যর চিহ্ন। হয়তো কোনো দেওয়াল বা স্তম্ভ বালির স্তূপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে। এক জায়গাতে মরুভূমির ভিতর উটের কাফেলাও চোখে পড়ল। ডক্টর টিউনিস বললেন, 'এরা যাযাবর গোষ্ঠীর লোক মরুভূমির এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়।' এরপর তিনি কী বললেন প্লেনের শব্দে আর তা শোনা গেল না। প্লেনটা এত কাঁপছে যে সুদীপ্তর ভয় লাগছিল প্লেনটা ভেঙে না পড়ে। প্লেনের ভিতরটা মালপত্রে ঠাসা। তার মধ্যে একটা মুরগির ঝুড়িও আছে। হাত-পা নাড়ানো যাচ্ছে না। আকাশ থেকে নীচের দিকে দেখতে দেখতে চলল সুদীপ্তরা। মাঝে মাঝে দু-একটা মরূদ্যান। তার নীচে কয়েকটা ঘর। এত নীচ দিয়ে উড়ে যাওয়া প্লেন দেখে হাত নাড়ছে ছোট ছোট বাচ্চারা। কখনো দিকচক্রবালে ফুটে উঠছে কোনো অজানা শহরের ছবি, হাইরাইজ বিল্ডিং-এর শীর্ষদেশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও পশ্চিম দিকে ঢলতে শুরু করেছে। রঙের খেলা শুরু হয়েছে আকাশ জুড়ে। বদলে যাচ্ছে বালিয়াড়ির রং। তাদের ঢালে বাতাস এঁকে দিচ্ছে অদ্ভুত আলপনা।

ঘণ্টাখানেক চলার পর সুদীপ্তরা দূর থেকে মাটিতে একটা নীল রঙের চিহ্ন দেখতে পেল। তার গায়ে সবুজের ছাপও যেন আছে। ডক্টর টিউনিস বললেন, 'ওটা হল, লেক নাসের'। ওখানেই আসোয়ান বাঁধ। দক্ষিণে আর একটু এগোলেই সুদান। আমরা গন্তব্যর কাছাকাছি চলে এসেছি।' আর এরপরই প্লেনটা বাঁক নিল পূর্বদিকে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মরুভূমির মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল প্রাচীন স্থাপত্যের নানা চিহ্ন। কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে সেসব। সুদীপ্তরা এগিয়ে চলল সেদিকে।

অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক জায়গাতে পৌঁছে চক্রাকারে পাক খেতে লাগল প্লেনটা। তাদের পায়ের নীচে প্রাচীন এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভ, গম্বুজ, মন্দির, মিনারের চুড়ো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তার মাঝে বেশ কয়েকটা বিশালাকৃতি পাথরের মূর্তিও চোখে পড়ল তাদের। দিনের শেষ সূর্যালোক এসে পড়েছে সেই প্রাচীন নগরীর ও মূর্তিগুলোর ওপর। কেমন যেন এক অদ্ভুত মায়াময় লাগছে সে জায়গা।

প্লেনটা বেশ কয়েকবার পাক খেয়ে সাঁ করে নামতে লাগল সেই নগরীর দিকে। মূল কাঠামোগুলোর বাইরে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে থামল সুদীপ্তদের প্লেন।

মোগাবো প্রথমে নামল প্লেন থেকে, সুদীপ্তরা নামল তারপর। তাদের ঠিক কিছুটা তফাতেই দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার এক প্রাচীন পাথুরে মূর্তি। সে যেন স্বাগত জানাচ্ছে আগন্তুকদের। আর এরপরই মোগাবো বলে লোকটার অসীম শক্তির পরিচয় পেল সুদীপ্তরা। প্লেন থেকে হুইল চেয়ারসহ ডক্টর টিউনিসকে ওপর থেকে তুলে নীচে নামল

সে। নীচে নেমে টিউনিস হেসে বললেন, 'মালপত্রগুলো মোগাবো আনবে, চলুন আমরা এগোই।' এই বলে চেয়ারের চাকা ঘোরালেন তিনি।

দু-পাশে অসংখ্য ভাঙা স্থাপত্যের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। নানা ধরনের মূর্তি, স্তম্ভ, ছাদহীন দেওয়াল অবাক হয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে ডক্টর টিউনিসকে অনুসরণ করল তারা। টিউনিস বললেন, 'অনেক কিছু দেখার আছে এখানে। কাল সকালে শেবার মন্দিরে নিয়ে যাব আপনাদের।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'এখানে তো জঙ্গল নেই! সিংহ কোথায় থাকে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'এই প্রাচীন নগরী অনেক বড় জায়গা নিয়ে। ভিতরে না ঢুকলে বুঝবেন না। নগরীর ভিতর ঘাসবন ঘেরা প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ওদের ডেরা। স্থান-মাহাত্ম্যের জন্যই ওর ভিতর এখানও অল্পসংখ্যায় টিকে আছে ওরা। ওখানেই বাচ্চাকাচ্চা দেয়। একসময় বহু হাজার বছর আগে এই সিংহবাহিনী আর সিংহ-মানুষরা নাকি এ নগরী পাহারা দিত। গুপ্তধন অভিলাষী বেশ কিছু মানুষও একসময় সিংহর আক্রমণে মারা পড়েছে।'

কথা বলতে বলতে সুদীপ্তরা এক সময় হাজির হল একটা বাড়ির সামনে। প্রাচীন স্থাপত্যের পাথর খুলে এনে এ বাড়িটা বানানো হয়েছে। ডক্টর টিউনিস বললেন, 'দশ বছর আগে ডক্টর স্মল নামে এক প্রত্নবিদ রত্নসন্ধানী এ বাড়িতে থাকতেন। এখন এটা আমার ডেরা।'

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন?'

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'আমার ব্যাপারটা ঠিক জানা নেই। কিছুকাল এ বাড়িতে আমরা একসঙ্গে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু ভদ্রলোক সিংহর আক্রমণে মারা যান। ওঁর মতো বহু পর্যটকই সিংহর হানায় মারা গেছে।'

বাড়ির ভিতর পা রাখল সুদীপ্তরা। প্রথমেই একটা বড় ঘর। ডক্টর টিউনিস বললেন, 'এটা আমার কাজের ঘর।' সারা ঘর জুড়ে দেওয়ালের গা থেকে মেঝেতে ছড়ানো আছে হিয়ারোগ্লিফিক প্লেট। সেগুলো প্রাচীন কোনো স্থাপত্যর অংশ ছিল। সুদীপ্তরা যে ঘরে থাকবে এরপর তাদের সে ঘরে আনলেন ডক্টর টিউনিস। পাথুরে মেঝে, আর লোহার গরাদের জানলা দেওয়া একটা ঘর। তিনি বললেন, 'আজ আর কথা হবে না আপনাদের সঙ্গে। আমার কিছু কাজ আছে। আর আপনারাও বিশ্রাম নিন।' আর সামান্য কয়েকটা কথা বলে টিউনিস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই বাইরে সেই প্রাচীন নগরীতে অন্ধকার নামল।

রাতে ঘরে এসে খাবার দিয়ে গেছিল মোগাবো। তা খেয়ে শুয়ে পড়েছিল সুদীপ্তরা। মাঝরাতে হঠাৎ হেরম্যানের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে সুদীপ্ত উঠে বসল। হেরম্যান তাকে বললেন, 'কিছু শুনতে পাচ্ছ?' ঠিক সেই সময় তার কানে এল বাইরে দূর থেকে ভেসে আসা শব্দটা—'আহ্-অন্‌ন্-ন্-ন-ন...।' সিংহর ডাক!!

এ ডাক এর আগে আফ্রিকা অভিযানের সময় সুদীপ্তর শোনা। সে তাড়াতাড়ি বিছানা

ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, হেরম্যানও তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বাইরে চাঁদের আড়ালে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। তার ভিতর থেকেই ডাকটা আসছে—'আ-উ-উ-ং-হ-ন্‌ন!'

মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে প্রাণীটা। সুদীপ্তদের মনে হল ডাকটা যেন গড়িয়ে গড়িয়ে ভিতর থেকে জঙ্গলের প্রান্তসীমার দিকেই আসছে। ক্রমশ তীব্র হচ্ছে সেই রক্ত জল করা শ্বাপদের গর্জন—'হ-ন্‌-ন্‌, উ-য়া-ং!'

হেরম্যানের অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বললেন, 'ডাক শুনে মনে হচ্ছে প্রাণীটা তার সঙ্গীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে ডাক। একসময় ডাকটা খুব কাছে চলে এল। কিছুটা দূরে একটা ভাঙা প্রাচীর আছে। সিংহটা সম্ভবত তার পিছনে চলে এসেছে। রুদ্ধশ্বাসে নিশ্চুপভাবে তার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করতে লাগল সুদীপ্তরা। শেষ একটা ডাক শোনা গেল—'আ-হ-অ-ন্‌-ন্‌!' আর তারপরই প্রাচীরের আড়াল থেকে আবির্ভূত হল একটা অবয়ব। কিন্তু এ তো সিংহ নয়! চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষের অবয়ব! কে ও? মানুষ না সিংহ-মানুষ! সে যেন দূর থেকে এ বাড়িটার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি যেন তাই বলছে। মিনিট খানেক মাত্র, তারপর সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল প্রাচীরের আড়ালে। এরপর কিছুক্ষণ মাঝে মাঝে সিংহ ডাক শোনা গেল ঠিকই, কিন্তু সুদীপ্তরা বুঝতে পারল সে ডাক ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'চলো আবার শুয়ে পড়ি, কাল একবার ও জায়গায় যাব।'

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রাচীন স্থাপত্যগুলোর ওপর। হাজার হাজার বছর ধরে এই প্রাচীন নগরী এমন কত সূর্যোদয় দেখেছে কে জানে! প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার কত উত্থান-পতনের সাক্ষী চারপাশে ছড়িয়ে থাকা এই সব মূর্তি, স্তম্ভ, দেওয়ালগুলো! হাজার হাজার বছর আগে হয়তো সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলতানে মুখরিত হয়ে উঠত এ নগরী। মন্দির থেকে ভেসে আসত মিশরীয় পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ, শোনা যেত সৈনিকদের পদধ্বনি, রথের চাকার ঘড়ঘড় শব্দ। সোনার সর্পখোদিত ফারাওদের সোনার উষ্ণীষে, রানিদের অঙ্গ-আভরণে ঝিলিক দিত প্রভাতি সূর্য। কখনো কখনো নগরীর ভিতর থেকে ভেসে আসত খাঁচায় বন্দি পোষা সিংহ বা অন্তঃপুরে শিকলবন্দি রানিদের পোষা চিতাবাঘের ডাক, নতুন সূর্যের আলো ডানায় মেখে নেবার জন্য আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হত বাজপাখি। সেসব দিন এখন সুদূর অতীত। শুধু মহাকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ পাথরগুলো।

নগরীর ভিতর এগোচ্ছিল সুদীপ্তরা। হুইল চেয়ারে ডক্টর টিউনিসকে নিয়ে এগোচ্ছিল মোগাবো। তার পাশাপাশি হাঁটছিল সুদীপ্তরা। এগোতে এগোতে ডক্টর বললেন, 'রানি শেবা বা শিবার কথা হয়তো আপনারা জানেন। বাইবেলে বর্ণিত আছে তাঁর কথা। জ্ঞানী রাজা সলেমনের বুদ্ধিমত্তার ওপর পরীক্ষা নিয়েছিলেন। সলেমন ছিলেন ইজরায়েলের রাজা। কিন্তু রানি শেবা বা শিবার রাজ্য কোথায় ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন শেবার রাজধানী ছিল লোহিত সাগরের তীরে আরবে। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন মিশরীয়। রাজা সলেমনের প্রথম পত্নী ছিলেন মিশরীয়। আরবি পুঁথিতে উল্লেখ আছে সলেমনের প্রথম স্ত্রী ছিলেন মিশরীয় এবং সেই স্ত্রী নাকি শেবা। প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন তিনি। আরবীয়ন ও ব্যবলীয়ন পুঁথিতে আবার শেবাকে একজন জাদুকরী বা মায়াবী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যাই হোক অনেকে আবার মনে করেন ইয়েমেনের মতো এখানেও আস্তানা ছিল শেবার। তিনি এখানেই তাঁর সম্পত্তি অর্থাৎ সোনাদানা লুকিয়ে রেখে যান। এখানে পাথরের গায়ে খোদিত কিছু হিয়ারেগ্লিফিকেও ওই বক্তব্যের সমর্থনে ইঙ্গিত মিলেছে।'

কথা বলতে বলতে সুদীপ্তরা হাজির হল এক জায়গাতে। সে জায়গাতে একসময় সম্ভবত একটা তোরণ ছিল। তা আজ ভেঙে পড়েছে। দু-পাশের স্তম্ভ দুটোই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। আর তার গায়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো প্রাচীন মূর্তি। অন্তত ত্রিশ ফুট উঁচু হবে মূর্তি দুটো। তাদের দেহ সিংহর, মুখ মানুষের। সিংহ-মানুষ! বা দণ্ডায়মান ফিংস। ডক্টর বললেন, 'এই মূর্তি দুটো এই প্রাচীন নগরীর পাহারাদার। সিংহ-মানুষ। আপনাদের বলছিলাম না, প্রাচীন জনশ্রুতি একসময় সিংহ-মানুষরা এ নগরী পাহারা দিত!'

এগোতে থাকল সুদীপ্তরা। অসংখ্য প্রাচীন মূর্তি ছড়িয়ে আছে চারপাশে। মরুঝড়ে, কালের প্রকোপে তাদের অনেকেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খসে পড়েছে। তাদের মধ্যে কোনোটা ভেড়ার দেহঅলা হ্যাথোরের, কোনোটা বা সূর্যদেব 'আমনের', কোনোটা বা কুকুরমুখী দেবতা অনুবিসের। ডক্টর টিউনিস বুঝিয়ে দিতে লাগলেন সবকিছু। পাথুরে পথ সোজা এগিয়েছে খণ্ডহর নগরীর ভিতর। পাথুরে মাটিতে আজও জেগে আছে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন ধাতুর বেড়ি পড়ানো রথের চাকার ঘষটানির দাগ! ডক্টর টিউনিস সেটা দেখালেন সুদীপ্তদের। একসময় সুদীপ্তরা দেখতে পেল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বড় এক প্রাচীন কাঠামো। রোদে পোড়া ধূসর রঙের ঘাসবন তার চারপাশে। মোগাবো এবার তার কাঁধ থেকে রাইফেলটা খুলে নিল। সুদীপ্ত খেয়াল করল হেরম্যান মুহূর্তের জন্য হাত দিলেন কোমরে। ওখানে জামার নীচে তাঁর রিভলভারটা রাখা আছে। ডক্টর টিউনিস আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওই হল, রানি শেবার মন্দির।'

সুদীপ্তরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল সে জায়গাতে। বিশাল পাথুরে চত্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটা। বিরাট বিরাট থাম ধরে রেখেছে মন্দিরের ছাদটাকে। থামের গায়ে আঁকা আছে সিংহ-মানুষের মূর্তি। কালের প্রকোপে কিছুটা ক্ষয়ে গেলেও তাদের চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। শেবার মন্দির থেকে আরও বেশ কিছুটা দূরে ঘাসবনের

মধ্যে দূর থেকে চোখে পড়ছে আর একটা জীর্ণ মন্দির। সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'ওই স্থাপত্যটা কী?'

ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, 'ওটা দেবী থেট' বা 'থথের' মন্দির। প্রাচীন মিশরীয়দের জ্ঞান ও জাদুবিদ্যার দেবী ছিলেন তিনি। তবে ওখানে এখন আর ঢোকা যায় না। একেবারে ধ্বংসস্তূপ। রানি শেবা দেবী থথ-এর উপাসক ছিলেন।'

শেবার মন্দিরের দিক থেকে মানুষ সমান ঘাসবন চলে গেছে থথ মন্দিরের দিকে। মোগাবো একবার সতর্কভাবে রাইফেল উঁচিয়ে দেখে নিল সেদিকটা। তারপর চত্বর পেরিয়ে তারা প্রবেশ করল মন্দিরের ভিতর। অসংখ্য স্তম্ভ ধরে রেখেছে বিরাট ছাদটাকে। ভাঙা ছাদের ছিদ্র গলে সূর্যকিরণ ঢুকছে, তবুও বিরাট বিরাট থামের আড়ালে অন্ধকার খেলা করছে। একটা বেশ গা-ছমছমে পরিবেশ মন্দিরের ভিতর। প্রথমে একটা বেশ বড় হলঘর। তার ঠিক মাঝখানে উঁচু বেদিতে পাশাপাশি বসে আছেন এক রাজা ও তাঁর রানি। আর সেই বেদির ঠিক নীচে নতজানু ভঙ্গিতে বসে আছে দু-জন সিংহ-মানুষ। ডক্টর টিউনিস বললেন, 'অনেকের অনুমান এটা রাজা সলেমন ও রানি শেবার মূর্তি। লক্ষ করে দেখুন, রাজার মুকুটটা মিশরীয় ফারাওদের মতো নয়, অন্য ধরনের। এ জন্যই এমন ধারণা করা হয়।'

মন্দিরের ভিতর ঘুরতে শুরু করল সুদীপ্তরা। অসংখ্য ঘর। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মূর্তি। নানা বিচিত্র ভঙ্গি তাদের। কেউ বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। কোনোটা ফ্যারাওয়ের, কোনোটা পাথরের, কোনোটা আমনের। দেওয়ালে প্যানেলের গায়েও রয়েছে অসংখ্য চিত্রলিপি। সুদীপ্ত ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে শুরু করল। নানা ধরনের বিচিত্র সব ছবি। মিশরীয়দের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে, তাদের রাজসভা, বিচারসভা, মায় শেষযাত্রার দৃশ্য অব্দি। তাদের কিছু অংশ খসে পড়লেও বা বিবর্ণ হলেও মহাকাল তাদের সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিতে পারেনি। হাত দিয়ে ঘষে ধুলোর আবরণ একটু সরালেই তার আড়াল থেকে ঝিলিক দিচ্ছে ছবির উজ্জ্বল সোনালি বা নীল রং। ছবি আঁকার সময় এ দুটো রঙের খুব বেশি ব্যবহার করত সে সময়ের মানুষরা।

হেরম্যান ডক্টর টিউনিসকে বললেন, 'আপনি হিয়ারোগ্লিফিক পড়তে জানেন?'

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'কিছুটা পারি। সবটা নয়। কারণ এই চিত্রভাষা এক এক সময় এক এক ভাবে লেখা হয়েছে। ফরাসি পণ্ডিত শ্যাঁপলিয় প্রথম এই বর্ণমালার পাঠোদ্ধার করেন 'রোসেটা স্টোন' থেকে। ওই পাথরটা নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের সময় তাঁর এক সেনাপতি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।'

কথা বলতে বলতে ডক্টর টিউনিসের হুইল চেয়ার দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গাতে। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ওই ছবিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, ওটা দেখুন।—'

একদিকে দেওয়াল জুড়ে বিরাট একটা ছবি। এক রাজা ও তার রানি তাঁদের ভৃত্য পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের একজন ভৃত্যের হাতে শিকল বাঁধা বেশ কয়েকটা ছোট ছোট প্রাণী। কুকুরের মতো তারা বসে আছে পায়ের কাছে। একজন রানির পা চাটছে। তাদের দেহ সিংহর, মাথাটা বাচ্চা ছেলের!

ছবিটা দেখার পর ডক্টর টিউনিস বললেন, 'এই সিংহ-মানুষরা সম্ভবত দেবতা ছিল না। তাহলে এদের হীনভাবে চিত্রিত করা হত না। কারণ, মিশরের রাজা-রানিদের মধ্যেও ধর্মভাব প্রবল ছিল। এ ধরনের প্রাণীর নিশ্চিত উপস্থিতি ছিল সে সময়। কল্পিত প্রাণী ছিল না তারা। আপনাদের অন্য একটা জায়গাতে এবার নিয়ে যাব।' কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এরপর হাজির হলেন মন্দিরের পিছন দিকে। জায়গাটা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আশেপাশে ঘাসের জঙ্গল। একটা ছাদহীন কাঠামো শুধু দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত কাঠামো। তার দেওয়ালের পরিবর্তে রয়েছে পাথরের লম্বা লম্বা শিক বা দণ্ড। ঠিক যেন এটা ছিল পাথরের তৈরি বিরাট খাঁচা বা গরাদ ঘর। মাথার ওপরটাও পাথরের শিকের ছিল। সেগুলো অবশ্য খসে পড়েছে। ঘরটাতে সুদীপ্তদের নিয়ে ঢুকলেন ডক্টর। তাঁর ইঙ্গিতে মোগাবো মেঝের ওপর এক জায়গাতে ধুলো সরাতেই সেখানে ফুটে উঠল বেশ কিছু পায়ের ছাপ। আরও এক জায়গার ধুলো সরাতেই একই রকম ছাপ বেরিয়ে এল। থাবাঅলা পায়ের ছাপ। পাথর খোদিত ছাপ। হেরম্যান নীচু হয়ে বসে সেই প্রাচীন ছাপগুলো পরীক্ষা করে বললেন, 'সিংহর পায়ের ছাপ!'

টিউনিস হেসে বললেন, 'সিংহ নয়, সিংহ-মানুষের পায়ের ছাপ। এই মন্দির পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। ঘরের মেঝেতে নরম স্যান্ডস্টোনের গুঁড়োর প্রলেপ দেওয়া হত। সেই নরম কাঁচা মেঝেতে আঁকা হয়ে গেছিল তাদের পায়ের ছাপ। সিংহর পরিবর্তে সিংহ-মানুষ বলছি কারণ, ঘরের কোনায় মাটিতে গাঁথা ওই পাথরের জলের পাত্রটা দেখুন। সিংহ শ্রেণির প্রাণীরা সাধারণত জল চেটে খায়। ওই পাত্রে মুখ ডুবানো যেত না, জল অন্য কোনো ছোট পাত্রে তুলে পান করতে হত, নিছক সিংহর পক্ষে যা সম্ভব নয়। এ মন্দিরের একটা ঘরে ঠিক এ জায়গায় ছবি আছে। যেখানে দেখানো হয়েছে এখানে এই ঘরে বেশ কয়েকটা সিংহ-মানুষ বসে আছে।'

কথা বলছিলেন মিস্টার টিউনিস। কিন্তু হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে তাঁর কথা থেমে গেল। কিছুটা তফাতে একটা থামের গায়ের ঘাসের বন যেন দুলে উঠল। মোগাবো সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তাগ করল সে দিকে। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। ঝোপটা আবার দুলে উঠল। আর তারপরই থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। তার কাঁধে রাইফেল।

লোকটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। সে-ও মনে হয় তাদের দেখে অবাক হল। তাকে যুবকই বলা যায়। গায়ের সাদা চামড়া রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। পরনে খাকি শার্ট আর হাফপ্যান্ট। পায়ে হাই হিল রাবার সোলের বুট, মাথায় শোলার টুপি। বুকে আড়াআড়ি কার্তুজের বেল্ট ঝুলছে।

ঘাসবন ছেড়ে চাতালে উঠে সোজা সুদীপ্তদের সামনে উপস্থিত হয়ে সে টিউনিসের উদ্দেশে বলল, 'আপনি তো ডক্টর টিউনিস? গ্রামের মানুষদের মুখে আপনার কথা শুনলাম। কাল বিকালে আপনার প্লেনটাকেও নামতে দেখেছি।'

লোকটার কথা শুনে টিউনিস বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই টিউনিস। আপনার পরিচয়টা?'

লোকটা টুপি খুলে জবাব দিল, 'আমার নাম স্মিথ। পেশায় শিকারি, লাক্সরে থাকি। কাল সকালেই এখানে এসেছি। যদিও আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইউরোপীয় কিন্তু আমার জন্ম ইজিপ্টেই। শিকারের সন্ধানে আমার পিতামহ এদেশে এসেছিলেন। তারপর এদেশেই রয়ে গেছিলেন।'

ডক্টর টিউনিস তাকে বললেন, 'কী শিকার করতে এসেছেন, সিংহ? কিন্তু নিশ্চয়ই জানেন সিংহ শিকার নিষিদ্ধ?'

স্মিথ জবাব দিল, 'সিংহ শিকার নিষিদ্ধ, কিন্তু সিংহ-মানুষ তো নয়? গ্রামের লোকেরা তো বলছে এটা সিংহ-মানুষের কাজ!' এরপর সে ঘামে ভেজা খাকি পোশাকের ভিতর থেকে একটা কাগজ বার করে হেসে বলল, 'আমি জানি সাহারার এই সিংহ অত্যন্ত দুর্লভ প্রাণী। কিন্তু মানুষের জীবন সবচেয়ে দুর্লভ। ইতিমধ্যে দুজন লোক সিংহর আক্রমণে মারা গেছে। সরকার থেকে সিংহটাকে মারার অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছে।'

ডক্টর টিউনিস এবার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'বুঝলাম। তবে নরখাদক সিংহ খুব ধূর্ত প্রাণী। এই ধূসর ঘাসের জঙ্গলে এমনভাবে মিশে থাকে যে বোঝাই যায় না। এর আগেও বেশ কয়েকজন শিকারি নিজেরা শিকার হয়ে গেছিল শিকার করতে এসে। রানি শেবার আশীর্বাদ নাকি শিকারিদের হাত থেকে সিংহদের রক্ষা করে। সিংহটা খুব কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে মনে হয়।'

স্মিথ বলল, 'হ্যাঁ, কাল রাতে আমি তার ডাক শুনেছি। বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সে।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, আমরাও শুনেছি।'

স্মিথ তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা?'

হেরম্যান বললেন, 'আমরা ট্যুরিস্ট।' তারপর দুজনের পরিচয় দিয়ে এখানে কীভাবে

তাঁরা এসে উপস্থিত হলেও তা-ও বললেন।

স্মিথ সুদীপ্তর সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'তুমি ইন্ডিয়ান? আমার গ্র্যান্ডফাদার একবার আয়োধের দেশীয় রাজার আমন্ত্রণে ইন্ডিয়াতে বাঘ শিকারে গেছিল। সে বাঘের মাথাটা এখনও আমাদের বাড়িতে আছে।'

মাথার ওপর রোদ উঠতে শুরু করেছে চড়চড় করে। আফ্রিকার প্রখর রোদ গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে। ডক্টর টিউনিস বললেন, 'আপাতত এবার আমাদের ফিরতে হবে।'

স্মিথ বলল, 'চলুন, আমিও ফিরব। গ্রামে যেতে হবে।'

সুদীপ্ত বলল, 'গ্রামটা কোথায়? এখনও তাদের একটা লোকও চোখে পড়ল না!'

ডক্টর টিউনিস হেসে বললেন, 'গ্রামটা আমার বাড়ির পিছনে কিছুটা তফাতে। দেখবেন কী করে! সবে তো কাল সন্ধ্যায় এলেন। তারপর আজ সকালেই আবার এখানে চলে এলেন। গ্রামের লোকরা সিংহর ভয়ে আতঙ্কিত। তাই সম্ভবত বাইরে আসছে না।'

স্মিথ সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তো সেখানে যাচ্ছি, কিন্তু ইচ্ছা হলে তোমরাও আমার সঙ্গে যেতে পারো।'

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'হ্যাঁ, দেখে আসতে পারেন। তবে আমি ঘরে ফিরব। দীর্ঘক্ষণ হুইল চেয়ারে ঘোরাফেরা করা আমার পক্ষে সমস্যা। বেশ কষ্টকর।'

হেরম্যান সাদা আলখাল্লা ঢাকা তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পায়ে কী হয়েছে? পক্ষাঘাত?'

ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, 'পক্ষাঘাত নয়। মাস আটেক আগের ঘটনা। এই শেবার মন্দিরের এক জায়গাতে ছাদ থেকে বিরাট একটা পাথরের চাঙড় খসে পড়েছিল আমার ওপর। লাফিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। পা চাপা পড়েছিল তার নীচে। পায়ের হাড় একদম ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছিল। নেহাত নিজে ডাক্তার বলে হয়তো বেঁচে গেছি।' হেরম্যান আর সুদীপ্ত এবার তাঁর কথা শুনে বুঝল 'ডক্টর' মানে তিনি চিকিৎসক। তাদের ধারণা হয়েছিল যেহেতু টিউনিস অধ্যাপনা করতেন তাই 'ডক্টর' শব্দের অর্থ হয়তো 'ডক্টরেট' উপাধিপ্রাপ্ত।

সুদীপ্তরা এরপর ফেরার পথ ধরল। ডক্টর টিউনিস বাড়ির কাছে পৌঁছে কথামতো তাঁর বাড়িতে ঢুকে গেলেন। আর বাড়িটাকে বেড় দিয়ে স্মিথের সঙ্গে সুদীপ্তরা এগোল গ্রামের দিকে। টিউনিসের বাড়ি থেকে কিছুটা এগিয়েই এক জায়গাতে একটা বেশ উঁচু প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। কোনো প্রাচীন স্থাপত্যেরই অংশ ছিল প্রাচীরটা। তার আড়ালেই গ্রামটা। গ্রাম মানে কিছু কুঁড়েঘর। তাদের মাথায় ঘাসের আচ্ছাদন। কয়েকটা গবাদি পশুও চোখে পড়ল। সুদীপ্তরা সেখানে উপস্থিত হতেই কুটিরগুলো থেকে লোকজনেরা একে একে বেরিয়ে এল। কাফ্রিদের মতো কালো না হলেও এদের গাত্রবর্ণও কৃষ্ণবর্ণ। তবে আকারে একটু খর্বাকায়। বুশম্যান, আফ্রিকার প্রাচীন জনজাতির লোক এরা। স্মিথের সঙ্গে সুদীপ্তদের দেখে মৃদু অবাক হল তারা। গায়ে পশুর চামড়া আর গলায় নানা রকমের মালা পরা একটা লোক এসে স্মিথের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'বাওয়ানা, হুই নামের

একজন তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। আমাকেও সে কথাটা বলতে চাচ্ছে না। তবে নাকি খুব জরুরি কথা সেটা। গ্রামের ভালোর জন্যই সে নাকি কথাগুলো তোমাকে জানাতে চায়।'

মোড়ল এরপর গলা তুলে হাঁক দিতেই একটা কুটির থেকে বেরিয়ে সুদীপ্তদের সামনে এসে দাঁড়াল একজন তরুণ। তার হাতে একটা বর্শা ধরা। ছেলেটা আসতেই প্রথমজন কাছ থেকে সরে গেল। একটু ভয়ার্তভাবে দুর্বোধ্য ভাষায় সে কী যেন বলতে লাগল স্মিথকে। তারপর তার পোশাকের ভিতর থেকে ধূসর রঙের ক'টা লোম বার করে স্মিথকে দিল। মোড়ল অথবা ছেলেটার ভাষা অবশ্য বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারেনি সুদীপ্তরা। ছেলেটার কথা শেষ হবার পর হেরম্যান স্মিথের কাছে জানতে চাইলেন, 'ও কী বলছে তোমাকে?'

স্মিথ একটু গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'ওর দাবি, কাল রাতে ও সিংহ-মানুষকে দেখেছে! ক'দিন পর ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু তার আগে ওর হবু পত্নীকে একটা শিয়ালের চামড়া যৌতুক দিতে হবে। এটাই তাদের প্রথা। বিকালে কিছু দূরে ঘাসবনে সে একটা গাছের নীচে শিয়ালের গর্তর পাশে একটা ফাঁদ পেতে এসেছিল। বিয়ের ব্যাপার বলে কথা। রাত গভীর হতে হঠাৎ তার মাথায় খেয়াল চাপে যে ফাঁদে শিয়াল পড়ল কিনা দেখে আসে। কিন্তু সে জায়গার কাছে পৌঁছতেই দূর থেকে সে দেখতে পায় গাছের নীচে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে একটা পা তুলে গাছের গায়ে ঘষছে! হুইকে সে দেখতে পায়নি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই ছায়ামূর্তি ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে মন্দিরের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। হুই নামের এই ছেলেটা তারপর উপস্থিত হয় সেই গাছের নীচে। চাঁদের আলোতে সে দেখতে পায় ফাঁদ পাতার জন্য সে যে মাটি খুঁড়েছিল তার ওপর জেগে আছে সিংহর পায়ের টাটকা ছাপ। গাছের গুঁড়িতেও লেগে আছে থাবা ঘষার চিহ্ন। তখনও গাছের গা থেকে রস বেরোচ্ছে নখের আঁচড় লাগা জায়গা থেকে। আর এই সিংহর লোমগুলোও লেগেছিল গাছের গায়ে। ভয় পেয়ে এরপর ছেলেটা আর সেখানে দাঁড়ায়নি। লোমগুলো নিয়ে একছুটে গ্রামে চলে আসে। তবে এ ব্যাপারটা গ্রামে সে এখনও কাউকে জানায়নি। আমিও ওকে জানাতে বারণ করলাম। নইলে গ্রামে আরও আতঙ্ক তৈরি হবে।'

হেরম্যান শুনে বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার!'

এ গ্রামে দেখার মতো তেমন কিছু নেই। হুই বলে ছেলেটা চলে যাবার পর স্মিথের সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে সুদীপ্তরা ডক্টর টিউনিসের বাড়ির পথ ধরল।

বাইরের ঘরে হুইল চেয়ারে বসে কোলের মধ্যে একটা হিয়ারোগ্লিফিকের প্যানেল নিয়ে আতস কাচ দিয়ে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন ডক্টর টিউনিস। সুদীপ্তরা ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'বসুন। গ্রাম দেখলেন? কী বলল গ্রামবাসীরা?'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর হুই নামের যুবকের সঙ্গে কথোপকথনের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, 'আপনি ঘটনাটা বিশ্বাস করেন?'

ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, দেখুন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একসময় সিংহ-মানুষ ছিল। তবে এখন তার উপস্থিতি অসম্ভব বললেই চলে। হয়তো লোকটা গ্রামের অন্য কাউকে দেখেছে। আর সে লোকটার আগে সিংহ সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সিংহর ডাক তো অনেকেই শুনেছে গত রাতে।'

সুদীপ্তর এরপর নজর পড়ল ডক্টর টিউনিসের হাতে ধরা হিয়ারোগ্লিফিকের প্লেটটার ওপর। সে হেসে বলল, 'রানি শেবার মন্দিরে গুপ্তধনের প্রবাদের কথা আপনি বলছিলেন। আপনি তো এসব হিয়ারোগ্লিফিক নিয়ে কাজ করেন, কোনো গুপ্তধনের ইঙ্গিত পাননি এ সবের মধ্যে?'

ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, 'পেয়েছি তো।'

'পেয়েছেন?' বিস্মিতভাবে একসঙ্গে বলে উঠল সুদীপ্ত আর হেরম্যান।

ডক্টর টিউনিস হেসে বললেন, 'যা পেয়েছি তা সোনাদানার থেকেও মূল্যবান।'

'কী সেটা?' প্রশ্ন করল সুদীপ্ত।

টিউনিস জবাব দিলেন, 'আমি সেটা এখন বলব না। কাল আমি শেবার মন্দিরে আবার আপনাদের নিয়ে যাব। তখন বলব। ওটা সারপ্রাইজ হিসাবে থাক।'

টিউনিস এরপর চলে গেলেন প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনায়। ফারাও, খুফু, তুতেন খামেন, মেনকুরু, রানি নেফারটিটি, হাটশেপসুট, ক্লিওপেট্রা থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ন কত নাম উঠে এল আলোচনাতে। এঁদের কেউ এই পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার শাসক ছিলেন, কেউ কেউ আবার সুদূর রোম বা ফ্রান্স থেকে এই নীলনদের দেশে ছুটে এসেছিলেন সোনার খোঁজে। কত গল্প লুকিয়ে আছে এ দেশের ইতিহাসে! এসব আলোচনা করতে করতে অনেকটা সময় কেটে গেল। সুদীপ্তরা তারপর নিজেদের ঘরে ফিরে এল। ঘরে ঢুকে একটু বিমর্ষভাবে হেরম্যান বললেন, 'টিউনিস কিন্তু আজ বেশ দৃঢ়ভাবেই এখানে সিংহ-মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। কিন্তু সারা আফ্রিকা জুড়ে চলে আসা প্রাচীন মানুষদের এই যে প্রবাদ তা কি মিথ্যা হতে পারে? তিনি জোর দিয়ে বলছেন একসময় তারা ছিল। সাহারার সিংহদের মতো তারাও তো আজ কিছু টিকে থাকতে পারে?'

সুদীপ্ত হেসে বলল, 'সিংহ-মানুষ এখানে থাক বা না থাক একটা অচেনা জায়গা তো ঘোরা হচ্ছে আমাদের। কত কিছু জানাও হচ্ছে।'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'তা ঠিক। দেখি ডক্টর টিউনিস আমাদের আগামীকাল নতুন কী দেখান।'

বিকালবেলা রোদ একটু কমতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সুদীপ্তরা। কথা বলতে বলতে তারা এগোল যে রাস্তাটা প্রাচীন নগরীর দিকে এগিয়েছে সেদিকে। মরু অঞ্চলে সূর্যাস্তের সময়টা বেশ মনোরম। সারা আকাশ জুড়ে রঙের খেলা শুরু হয়। তপ্ত দিনের শেষে মৃদুমন্দ বাতাস বইতে শুরু করে। দূরের মরুভূমি থেকে তেমনই একটা ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে সুদীপ্তদের গায়ে। দিনের শেষ আলো এসে পড়েছে। সুদীপ্তদের যাত্রাপথে এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন মূর্তি, স্তম্ভগুলোর গায়ে। অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে তারা যেন নীরবে স্মরণ করছে হাজার বছরের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা। চারপাশের পরিবেশ খুব সুন্দর হলেও কেমন যেন বিষণ্ণতা জেগে আছে তার মধ্যে। মহাকাল বড় নিষ্ঠুর।

গল্প করতে করতে হাঁটছিল তারা। হঠাৎ তারা দেখতে পেল উল্টোদিকের রাস্তা ধরে স্মিথ এগিয়ে আসছে। পরনে সেই একই পোশাক। কাঁধে বন্দুক। রাস্তার পাশে একটা মুণ্ডুহীন ফারাওয়ের মূর্তির সামনে এসে মিলিত হল তারা তিনজন। স্মিথের সারা দেহ ঘামে ভেজা। বোঝা যাচ্ছে সম্ভবত সে সারা দুপুর বাইরে কাটিয়েছে। সুদীপ্ত তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সিংহর খোঁজে গেছিলে?'

সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি শেবার মন্দিরের ওদিকে গেছিলাম প্রাণীটার খোঁজে।'

হেরম্যান তাকে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা তো তিন পুরুষ ধরে শিকারি। শিকারের খোঁজে বহু জায়গাতে তোমাদের যেতে হয়েছে। সিংহ-মানুষের অস্তিত্ব তুমি বিশ্বাস করো? এই যে হুই নামের ছেলেটা আজ যে কথা বলল?'

স্মিথ প্রশ্নর জবাব না দিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আপনারা কি সত্যিই সাধারণ টুরিস্ট? ডক্টর টিউনিসের সঙ্গে আপনাদের কী সম্পর্ক?'

হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যতটুকু পরিচয় দিয়েছি তার মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই। টিউনিসের সঙ্গে হঠাৎই কাকতালীয়ভাবে আমাদের পরিচয়। তাঁর আমন্ত্রণেই আমরা এখানে এসেছি। তোমার সন্দেহের কারণ?'

স্মিথ বলল, 'আমাকে মাপ করবেন। আসলে এখানে তো কোনো টুরিস্ট আসে না। একসময় শুধু ট্রেজার হান্টাররা আসত। তাই আপনাদের দেখে একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল।'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে আমরা এখানে রানি শেবার গুপ্তধন খুঁজতে আসিনি।'

স্মিথ হেসে বলল, 'আচ্ছা এবার বিশ্বাস করলাম। এবার আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই। একটা সংশোধন করে দিই। আমরা ঠিক তিন পুরুষ শিকারি নই। আমার ঠাকুরদা আর আমি শিকারি হলেও আমার বাবা কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিশর-গবেষক। ঠিক এই জায়গাতে তিনি বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন। আর আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্নর উত্তরে বলি, সিংহ-মানুষের ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি একটা জায়গাতে রেখেছি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলি আপনাদের। আমার বাবা এই শেবা মন্দিরেই সিংহর দ্বারা আক্রান্ত হন। তিনি এখানে রানি শেবার গুপ্তধন খুঁজতে এসেছিলেন। বছর কুড়ি আগের ঘটনা সেটা। তিনি সিংহর আক্রমণে মারাত্মক জখম হবার পর এক ইওরোপীয় পর্যটক দলের সহায়তায় লাক্সরে পৌঁছান। তিনি তখন অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুর আগে একবার তিনি চোখ মেলে দুটো কথা বলেন। একটা কথা, 'খুঁজে পেয়েছি।' আর দ্বিতীয় কথাটা হল 'সিংহ-মানুষ!' তারপরই মৃত্যু হয় তাঁর। আমি তখন নেহাতই ছোট। কিন্তু বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে এ কথা শুনেছিলাম আমি। আমার ধারণা, দুটো কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রথমত তিনি গুপ্তধন জাতীয় কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি সিংহ-মানুষের আক্রমণের কথা হয়তো বলতে চেয়েছিলেন। যদিও সিংহ-মানুষের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করা একটু কঠিন।'

সুদীপ্তরা বেশ অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে। হেরম্যান স্মিথকে কিছু একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই স্মিথ একটা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, সিংহর মাংস কেউ খায় বলে শুনেছেন?'

হেরম্যান বললেন, বুরুন্ডিতে আমি মাসাইদের সিংহর হৃৎপিণ্ড খেতে দেখেছি। সুদীপ্ত সে ঘটনা তোমারও নিশ্চয়ই মনে আছে। আফ্রিকান ওঝা বা জাদুকররা সিংহর গোঁফ, নখ, হৃৎপিণ্ড তাদের কাজের জন্য সংগ্রহ করে।'

স্মিথ একটু কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'আমি যতটুকু জানি, বুশম্যানরা সিংহর মাংস খায় না। তাহলে?'

সুদীপ্ত বলল, 'ব্যাপারটা কী খুলে বলো তো?'

স্মিথ বলল, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার। হুই বলে ছেলেটার কথা শোনার পর আমি সেই গাছটার কাছে যাই। সত্যিই মাটিতে সিংহর থাবার দাগ, আর গাছের গুঁড়িতে তার থাবার আঘাতে ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাই। সিংহটা যে পথ ধরেছিল তা অনুমান করে সেদিকে এগোই। পথটা একটু ঘুরপথে গেছে শেবা মন্দিরের পিছনে দিকে। সেখানে একটা ঘাসজমির মধ্যে একটা মৃতদেহ আবিষ্কার করি আমি। তবে সেটা সিংহর নয়, সিংহীর। দেহটা দেখে আমার অনুমান পরশু রাতে মারা হয়েছে তাকে। যার জন্য সেদিন রাতে তার জুড়িদার সিংহটা ডেকে বেড়াচ্ছিল। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হল সে দেহ সম্পূর্ণ নয়, অর্ধেক। কেউ যেন নিপুণভাবে তার দেহের কোমর থেকে কেটে নিয়ে গেছে!'

সুদীপ্ত বলল, 'ব্যাপারটা সত্যি বড় অদ্ভুত তো!'

বেলা পড়ে আসছে। স্মিথ বলল, 'সাথীহারা সিংহ খুব মারাত্মক প্রাণী। সন্ধ্যা নামবে

একটু পর। ওদিকে আর এগিয়ে আপনাদের দরকার নেই। এবার ফিরে চলুন।'

তার কথামতো তিনজন মিলে ফেরার পথ ধরল। হাঁটতে হাঁটতে স্মিথ একসময় বলল, 'আপনারা ডক্টর টিউনিসের আতিথেয়তায় আছেন তবুও একটা কথা বলি। এই যে টিউনিস এতদিন ধরে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে বাস করছেন, এটা কি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ঠিকই। তবে অনেক পণ্ডিত-মানুষ নিরিবিলিতে থাকতে ভালোবাসেন। তাতে জ্ঞানচর্চার সুবিধা হয়।'

স্মিথ কী একটা ভেবে নিয়ে বলল, 'হয়তো তাই হবে। তবে একটা অনুরোধ, আমাদের তিনজনের কথাবার্তা আশা করি গোপন থাকবে।'

হেরম্যান বললেন, 'এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই টিউনিসের বাড়ির কাছাকাছি চলে এল সুদীপ্তরা। স্মিথ তাদের থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামের দিকে এগোল, আর সুদীপ্তরা বাড়ির ভিতর ঢুকল। ঠিক সেই সময় দূরে শেবার মন্দিরের আড়ালে সূর্য ডুবল।

কাজের ঘরে বসে মোমের আলোতে দুপুরবেলার মতোই একটা হিয়ারোগ্লিফিক পরীক্ষা করছিলেন ডক্টর টিউনিস। সুদীপ্তদের দেখে তিনি বললেন, কোন দিকে বেড়াতে গেছিলেন?'

হেরম্যান বললেন, 'যে রাস্তাটা নগরীর দিকে গেছে সেটা ধরে কিছুটা গেছিলাম।'

ডক্টর টিউনিস জিজ্ঞেস করলেন, 'স্মিথ বলে ওই শিকারি ছেলেটার সঙ্গে দেখা হল? কিছু বলল সে?'

প্রশ্নটা শুনে মুহূর্তর জন্য দৃষ্টি বিনিময় হল সুদীপ্ত আর হেরম্যানের মধ্যে। হেরম্যান কৌশলে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ হল, ওদিক থেকেই আসছিল সে। তবে কথাবার্তা তেমন বিশেষ কিছু হল না। সে শুধু বলল, সে সিংহর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ডক্টর টিউনিস, তাঁর হাতের হিয়ারোগ্লিফিকের প্লেটটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'ছেলেটার গতিবিধি বেশ সন্দেহজনক। সে দুপুরবেলা শেবা মন্দিরের দিকে গেছিল ঠিকই তবে সম্ভবত সিংহর সন্ধানে নয়। ধুলো সরিয়ে টর্চের আলো ফেলে সে মন্দিরের দেওয়ালে আঁকা ছবি দেখছিল। সকালে গিয়ে আমি লক্ষ করেছি। মন্দিরের গায়ের থেকে একটা ছোট হিয়ারোগ্লিফিক প্যানেল খসে পড়ে আছে। ওটা ওখানে পড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে বলে সেটা আমার এখানে আনার জন্য মোগাবোকে মন্দিরে পাঠিয়েছিলাম। তখনই মোগাবোর চোখে পড়ে ব্যাপারটা। তাকে অবশ্য সে দেখতে পায়নি। আমার ধারণা সে এখানে অন্য কিছু খুঁজতে এসেছে। শিকার করতে আসা একটা অজুহাত মাত্র।'

হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কী খুঁজতে এসেছে? গুপ্তধন?'

ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, 'আমার ধারণা তাই। অথবা প্রাচীন কোনো পুরাকীর্তি সংগ্রহ করতে এসেছে সে। জানেন তো এসব প্রাচীন হিয়ারোগ্লিফিক প্যানেল, ছবি

বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। এভাবে আমাদের দেশের কত অমূল্য সম্পদ যে বিদেশে পাচার হয়েছে তার হিসাব নেই। ছেলেটার কথায় সন্দেহজনক কিছু পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। এ সব সম্পদ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।'

সুদীপ্ত বলল, 'তেমন কিছু বুঝলে নিশ্চয় জানাব।'

ডক্টর টিউনিসের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের ঘরে ফিরে এল দুজন। তারপর হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'স্মিথ আর টিউনিসের কথা শুনে বুঝতে পারছি তারা দুজনেই এখানে একে অন্যের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে! ব্যাপারটার মধ্যে কোনো গূঢ় কারণ আছে।'

ডক্টর টিউনিস আর স্মিথকে নিয়ে, এ জায়গা নিয়ে নানা কথা আলোচনা করতে লাগল দুজন। রাত আটটা নাগাদ মোগাবো খাবার দিয়ে গেল। লোকটা কেমন যেন নিশ্চুপ ধরনের। শুধু ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসে। কোনো কথা বলে না। খাবার বলতে রুটি আর মুরগির ঝোল। খেতে শুরু করল দুজন। খেতে খেতে হেরম্যান হঠাৎ মুখ বিকৃত করলেন। তারপর আঙুল দিয়ে মুখ থেকে সুতোর মতো কী যেন বার করলেন। গ্লাসের জল দিয়ে সেটা ধুয়ে হাতের চেটোতে রেখে সেটা মেলে ধরলেন মোমবাতির সামনে। কালচে খয়েরি রঙের সুতোর মতো দেখতে কয়েকটা জিনিস।

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'কী এগুলো?'

হেরম্যান গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'লোম, আমার ধারণা সিংহর লোম!'

'সিংহর লোম খাবারের মধ্যে কীভাবে এল?'

খাওয়াটা এরপর আর ভালো করে শেষ হল না। এর উৎস কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল তারা। কিন্তু ঘুম আসছে না। রাত বারোটা নাগাদ প্রথমে শিয়ালের ডাক কানে এল তাদের। গ্রামের দিক থেকে বারকয়েক ডেকে উঠল প্রাণীটা। তারপর সামান্য কিছু সময়ের জন্য নিস্তব্ধতা। এরপর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দূর থেকে ভেসে এল একটা শব্দ—'আউং-হন্-ন্-ন! হন্ন্!' সিংহর ডাক!

এরপর ডেকেই চলল শ্বাপদটা। স্মিথের কথা যদি সত্যি হয় তবে সাথীহারা সিংহটা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গিনীকে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল সুদীপ্ত।

ভোরবেলা বাইরে থেকে আসা লোকজনের কণ্ঠস্বরে ঘুম ভাঙল সুদীপ্তদের। পোশাক বদলে তারা বাইরে আসতেই দেখতে পেল বাড়ির ঠিক বাইরেই যেন উঠে এসেছে বুশম্যানদের গ্রামটা। হুইল চেয়ারে বসে আছেন ডক্টর টিউনিস, তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে

মোগাবো। আর তাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে নিজস্ব ভাষায় উত্তেজিতভাবে কী যেন বলে চলেছে বুশম্যানরা। ঠেলে ভিড় সরিয়ে ডক্টর টিউনিসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সুদীপ্তরা। হেরম্যান ডক্টর টিউনিসের কাছে জানতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা কী?'

তিনি বললেন, 'সিংহ মানুষ নিয়েছে। ওই যে হুই বলে সেই ছেলেটাকে।'

'কীভাবে?' সুদীপ্ত জানতে চাইল।

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'এদের যা বক্তব্য তা হল, ছেলেটা তার মার সঙ্গে একটা কুটিরে থাকে। কাল মাঝরাতে সে তার ঘরের পিছন দিকে শিয়ালের ডাক শুনতে পায়। এত কাছে শিয়ালের ডাক শুনে সে আর ঘরে থাকতে পারেনি। একটা চামড়ার খুব প্রয়োজন তার। অথচ সিংহর ভয়ে নগরীর ঘাসবনে ঢোকা যাচ্ছে না। কাজেই এ সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চায়নি। ঘর ছেড়ে সে বর্শা হাতে বেরিয়ে পড়ে শিয়াল মারবে বলে। কিন্তু সে আর ফেরেনি। গ্রাম থেকে বেরিয়ে নগরীর দিকে যাবার একটা রাস্তা আছে, সেখানে তার বর্শা আর ছেলেটার রক্ত মিলেছে। তার সঙ্গে সিংহর পায়ের ছাপ ও ভারী কোনো জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ। সম্ভবত সিংহটা তাকে টেনে নিয়ে গেছে প্রাচীন নগরীর ঘাসবনের মধ্যে।'

হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'এখন এরা কী বলছে?'

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'এখন এরা নগরীর ভিতর ঘাসবনে ঢুকতে চায় ওই ছেলেটাকে খুঁজতে। বলা ভালো তার দেহাবশেষ আনতে। এদের ধারণা, তার দেহ সৎকার না করলে তার আত্মা আবার সিংহ-মানুষ হয়ে গ্রামে হানা দেবে। এখন এদের দাবি, মোগাবোর কাছে যেহেতু বন্দুক আছে সেহেতু মোগাবোকেও যেতে হবে এদের সঙ্গে। ওকে পাঠাব কিনা ভাবছি।'

সুদীপ্ত বলল, 'স্মিথ কোথায়? সেই তো সিংহ শিকার করতে এসেছে।'

'ওরা তো বলছে যে কাল বিকাল থেকে সে-ও বেপাত্তা। তারও কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এটাও আমাকে ভাবাচ্ছে। নগরীর ভিতর ঘাসবনে সিংহ ছাড়াও ভয়ংকর বিষাক্ত অ্যাডর সাপ আছে! স্মিথকে না পেয়েই তো ওরা মোগাবোকে যেতে বলছে।'

হেরম্যান বললেন, 'গ্রামের লোকরা যদি নগরীর ঘাসবনে ঢোকে তবে সঙ্গে কোনো বন্দুকধারী থাকা অনেক বেশি নিরাপদ ব্যাপার। নইলে হয়তো আরো কারো জীবন যেতে পারে!'

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'তা ঠিক।' তারপর তিনি মোগাবোর উদ্দেশ্যে বললেন, 'গ্রামের লোকেরা যখন চাচ্ছে তখন তুমি ওদের সঙ্গে ঘুরে আসো। দেখো কিছু পা-ও কিনা। তাছাড়া বলা যায় না, শিকারি ছেলেটারও কিছু হতে পারে।'

ডক্টর টিউনিসের কথায় মোগাবো ঘাড় নাড়ল ঠিকই, কিন্তু তার চোখ-মুখ দেখে মনে হল, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন সে বন্দুক আনতে গেল।

রাইফেল কাঁধে বেরিয়ে মোগাবো বুশম্যানদের ইঙ্গিত করল এগোবার জন্য। তাদের মধ্যে যারা সক্ষম পুরুষ ও অস্ত্রধারী তারা অনুসরণ করল মোগাবোকে। হেরম্যান ডক্টর

টিউনিসকে বললেন, 'আপনি যে জায়গা আমাদের আজ দেখাবেন বলেছিলেন, সেখানে নিশ্চয় এখনই যাওয়া হচ্ছে না। আমরাও ওদের পিছন পিছন কিছুটা ঘুরে আসি।' এই বলে হেরম্যানও সুদীপ্তকে নিয়ে তাদের অনুসরণ করলেন।

প্রথমে যাওয়া হল সে জায়গাতে যেখানে প্রথম চিহ্ন মিলেছিল। সেখানে ধুলো-মাটিতে বেশ অনেকখানি রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে। ধুলোতে ধস্তাধস্তির স্পষ্ট চিহ্ন, আর সিংহর পায়ের ছাপ আঁকা। হেরম্যান জায়গাটা দেখে বললেন, 'সম্ভবত লড়াই দেবার চেষ্টা করেছিল ছেলেটা। সিংহ বা বাঘের শিকার ধরার কায়দা হল, তারা পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে কামড় বসায়। দাঁত মাংসর মধ্যে যতক্ষণ গেঁথে থাকে ততক্ষণ বেশি রক্তপাত হয় না। সেজন্য শিকার ধরার জায়গার তুলনায় যেখানে তার শিকারকে নামায় সেখানেই বেশি রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এখানেই যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে।'

মাটির মধ্যে দিয়ে ভারী জিনিস ঘষটে টেনে নিয়ে যাবার দাগ এগিয়েছে সামনের দিকে। এদিক দিয়েও সেই প্রাচীন নগরীতে প্রবেশের একটা পথ আছে। নগরীর ভিতর প্রবেশমুখে দু'পাশে উঁচু ঢালযুক্ত বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে মাথা-ভাঙা এক ফারাও মূর্তি। সেই বেদির ওপরও বেশ কিছু রক্ত পাওয়া গেছে। সম্ভবত সেই হতভাগ্য যুবকের দেহটা টানতে টানতে এখানে জিরোবার জন্য কিছুটা থেমেছিল সিংহটা। এ জায়গাটা অতিক্রম করলেই ঘাসজমিপূর্ণ নগরীর ভিতর প্রবেশ করবে সুদীপ্তরা। তারা কিন্তু থামল না, এরপরও দলটাকে অনুসরণ করতে দেখে মোগাবো বরং একবার থমকে দাঁড়িয়ে একটু বিস্মিতভাবে তাকাল সুদীপ্তদের দিকে। তার চোখে একটু অসন্তোষ ফুটে উঠলেও সে মুখে কিছু বলল না। হয়তো তার ধারণা ছিল যে সুদীপ্তরা এ পর্যন্ত এসে থেমে যাবে। নগরীর ভিতরে ঢুকবে না।

আবার এগোতে লাগল সবাই। সামনে শুরু হল ঘাসবন। অনুমানে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল এই ঘাস-জমিটা অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়েছে রানি শেবার মন্দিরের পেছনের দিকে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মন্দিরটা, যার সামনে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা থামগুলো।

প্রথমে রাইফেল উঁচিয়ে এগোচ্ছে মোগাবো। আর তার ঠিক পিছনেই সুদীপ্তদের ঘিরে একটা অর্ধবৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করে একটু ঝুঁকে হাতের বর্শা একটু তুলে ধরে চলছে জনা কুড়ি বুশম্যান। কখনো ঘাসজমি সামান্য নড়ে উঠলেই অথবা কোনো প্রাচীন মূর্তি বা স্থাপত্যের পিছনে সিংহর আত্মগোপন করার সম্ভাবনা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে সবাই। তারা যে ঠিক পথে এগোচ্ছে তার প্রমাণ এ পথে ঘাসবন লম্বা ফালির মতো নুইয়ে পড়েছে। এ পথেই শিকারকে টেনে নিয়ে গেছে সিংহ। মাঝে মাঝে হয়তো বুশম্যানদের তীক্ষ্ণ নজরে ধরা দিচ্ছে ধূসর ঘাসের গায়ে কালচে হয়ে যাওয়া এক ফোঁটা রক্ত। যা সঠিক পথ নির্দেশ করছে। মন্দিরের পিছনে বেশ কাছাকাছি পৌঁছে ঘাসজমিতে একছড়া হার কুড়িয়ে পেল একজন। বুশম্যানরা সেই পাথরের

হারটাকে হতভাগ্য সেই যুবকেরই হার বলে শনাক্ত করল। বাগদানের সময় এই হারটাই তাকে পরিয়েছিল তার হবু বউ। এর পরিবর্তে তার একটা শিয়ালের চামড়া পাবার কথা ছিল।

শেবা মন্দিরের পিছনে এসে পৌঁছল সবাই। কিছুটা তফাত থেকে সুদীপ্তরা দেখতে পেল সেই খাঁচার মতো জায়গাটাকে। ডক্টর টিউনিসের বক্তব্য অনুযায়ী সেখানে রাখা হত সিংহ-মানুষদের।

শেবার মন্দিরের পিছনটা ঘাসে পরিপূর্ণ। বুক সমান উঁচু ধূসর ঘাস। তার মাঝে মাঝে কিছুটা তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট নানা ভগ্নপ্রায় স্থাপত্য, কিছু ঘর, ছাদহীন স্তম্ভ, দেওয়াল ইত্যাদি। টিউনিস বলেছিলেন, গুহার পরিবর্তে ওইসব ভগ্নপ্রায়, ধসে পড়া ঘরগুলোকেই সিংহরা গুহা হিসাবে ব্যবহার করে। এইসব ধূসর ঘাসবন সিংহর লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। মন্দিরের পিছনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। কারণ ঘাসবন ভাঙার চিহ্ন এ জায়গাতে আর নেই। সম্ভবত মৃত শিকারকে এ পর্যন্ত ঘষটে টেনে আনার পর সে তাকে পিঠে তুলে এগিয়েছে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন স্থাপত্যগুলোর কোনো একটার ভিতর। এবার আরও সতর্ক হতে হবে। ওই ভাঙা ঘরবাড়িগুলোর কোনো একটার ভিতর থেকে আকস্মিক আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে পশুরাজের। 'ক্যান!' একটা ধাতব শব্দ হল। রাইফেলের সেফটি ক্যাচ খুলে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হল মোগাবো। বুশম্যানরাও সামনে এগোবার আগে শক্ত মুঠিতে বর্শাগুলো ধরল। হেরম্যানের হাতও চলে আসে কোমরে। তার পরক্ষণেই চাপা স্বরে সুদীপ্তকে বললেন, 'একটা ভুল হয়ে গেছে। তাড়াহুড়োতে বেরোতে গিয়ে রিভলভারটা বালিশের তলায় রেখে এসেছি! আমরাই এখন শুধু নিরস্ত্র!'

ঘাসবনের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল তারা। একসময় দলটা পৌঁছে গেল সেই ধসে পরা ঘরগুলোর কাছে। মাঝখানে বেশ কিছু ফাঁকা জায়গা, তাকে ঘিরে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেশ বড়বড় ঘরগুলো। ঘর নয়, আসলে এগুলো প্রাচীন মন্দির। প্রত্যেকটা মন্দিরের প্রবেশমুখের ঠিক পাশেই উঁচু বেদিতে দাঁড়িয়ে আছে নানা মিশরীয় দেবদেবীর এক-একটা মূর্তি। আমন, হোরাস, আনুবিস...

হেরম্যান ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এগুলো সম্ভবত এক-একটা দেবতার মন্দির অথবা তাদের উপাসনা কক্ষ ছিল। আমরা যে ঘাসজমিতে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সম্ভবত চাতাল ছিল, এবং তাকে ঘিরেই মন্দিরগুলো।' এ জায়গাতে পৌঁছবার পর সবাই একটু ধন্দে পড়ে গেল। দেহটাকে সিংহটা কোথায় নিয়ে গেল? ওই মন্দিরগুলোর কোনোটার মধ্যে! ওপর থেকে পাথর খসে পড়ে বেশ ক'টা মন্দিরের মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ছোট গুহামুখের মতো ছিদ্র আছে ভিতরে ঢোকার জন্য। সিংহ ওসব ঘরের কোনো একটার ভিতর দেহটাকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওখানে ঢোকা মানে সিংহর গুহায় প্রবেশ করা। যে করবে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এবার কী করা উচিত তা নিয়ে চাপা স্বরে আলোচনা শুরু করল বুশম্যানরা। মোগাবোকেও একবার তারা

কী কথা বলাতে সে ঘাড় নাড়ল। সম্ভবত সে জানিয়ে দিল, সে ওই ঘরগুলোতে ঢুকবে না। তারপর পিছন দিকে হাত দেখিয়ে বুশম্যানদের ফেরার ইঙ্গিত দিল।

আর কিছু করার নেই, সম্ভবত এবার ফিরতেই হবে। সেই সিদ্ধান্তই এবার নিতে হবে। আলোচনা শেষে ব্যর্থ মনোরথে বুশম্যানরা সেই সিদ্ধান্তই নিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তোমরা যেটা খুঁজছ সেটা এখানেই আছে।'

সুদীপ্তরা অবাক হয়ে দেখল, একটা মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আনুবিসের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে তাদের হাত নেড়ে ডাকছে স্মিথ!

তাকে দেখামাত্রই সবাই এগোল তার দিকে। মন্দির চাতালে ওঠার পর সে ইশারায় দেখিয়ে দিল আনুবিসের পিছনটা। মূর্তি বেদি আর মন্দিরের দেওয়ালের মধ্যে একটা খাঁজ। সেখানে পড়ে আছে হতভাগ্য যুবকের দেহটা। তার সারা শরীর কেউ যেন ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে দিয়েছে। সিংহর দাঁত-নখের চিহ্ন।

সুদীপ্ত স্মিথকে বলল, 'তুমি কাল বিকালে গ্রামে ফেরোনি?'

স্মিথ বলল, 'না, তোমাদের সঙ্গে কথা বলে ফেরার পর, আমি আর গ্রামে না ঢুকে এখানে চলে এসেছিলাম। সারা রাত সিংহটার ডাক অনুসরণ করেছি।'

হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'প্রাণীটা শিকার ধরে যখন এখানে এল তুমি দেখেছ তাকে?'

স্মিথ জবাব দিল, 'না দেখিনি। তবে আমার ধারণা প্রাণীটা কাছাকাছি কোনো মন্দিরের মধ্যেই আছে।'

এরপর সে বলল, 'তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলাম! ছেলেটার দেহের ক্ষতচিহ্নগুলো আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। সিংহ তার নখ দিয়ে ফালা ফালা করে চিরেছে দেহটাকে। পেটের নাড়িভুঁড়িও বেরিয়ে এসেছে নখের আঘাতে। কিন্তু শিকারের ঘাড়ে বা দেহে দাঁত বসাবার কোনো চিহ্ন নেই। এ ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত!' এরপর কী একটা যেন বলতে গিয়েও সামনে তাকিয়ে থেমে গেল স্মিথ। কিছুটা তফাত থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে মোগাবো। তার চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ ভাব।

কিছুক্ষণের মধ্যে মৃতদেহটাকে তুলে নিয়ে গ্রামে ফেরার জন্য প্রস্তুত হল বুশম্যানরা।

সুদীপ্ত স্মিথকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী করবে এখন?'

সে জবাব দিল, 'আমি এখন এখানেই থাকব। মন্দিরগুলোর ভিতর থেকে বা অন্য কোনো গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে সিংহটা রাতে নিশ্চয়ই তার ফেলে যাওয়া শিকারের খোঁজে এখানেই আসবেই। আর তখন...।'

এরপর সে জানতে চাইল, 'ডক্টর টিউনিস কোথায়?'

হেরম্যান বললেন, 'উনি বাড়িতেই। তিনি তোমার অনুপস্থিতি নিয়ে বেশ চিন্তিত।'

স্মিথ বলল, 'আমার আজ এখানে রাত্রিবাসের খবরটা ওনাকে জানিয়ে দিও।'

সুদীপ্তরা যখন ডক্টর টিউনিসের আস্তানায় ফিরে এল তখন মাঝ দুপুর। ডক্টর টিউনিস তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। হেরম্যান আর সুদীপ্ত বিস্তৃতভাবে সব কথা জানাল

তাঁকে। সিংহর সন্ধানে স্মিথ যে সে জায়গায় রাত্রিবাস করবে তা-ও জানানো হলো। ডক্টর টিউনিস এ কথাটা শুনে বেশ চিন্তান্বিতভাবে বললেন, 'সিংহ বা অন্য যা কিছুর খোঁজেই হোক ও জায়গাতে রাত্রিবাস করা খুব বিপজ্জনক। প্রাচীন নগরীর মধ্যে ওই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর। ওই ভাঙা মন্দিরগুলোই এখন সাহারার সিংহদের মূল আস্তানা। ওর মধ্যেই বাচ্চাকাচ্চাও দেয় তারা। যেসব গুপ্তধন-সন্ধানী এখানে এসে সিংহর হাতে মারা গেছেন তাঁরা ঠিক ওখানেই সিংহর আক্রমণের শিকার হয়েছেন। আরও সিংহ আছে ওখানে। শিকারি না শেষে শিকার হয়ে যায়! যাই হোক, এটা স্মিথের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমার দুশ্চিন্তা ছাড়া কিছু করার নেই।'

এরপর তিনি বললেন, 'আজ তো হতভাগ্য ছেলেটার ঝামেলায় আপনাদের যেখানে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম সেখানে যাওয়া হল না। কাল সকালে ঘুরিয়ে আনব। আর একটা কথা, এখান থেকে আপনাদের কষ্ট করে দশ মাইল দূরে ট্রেন ধরতে যেতে হবে না। মোগাবোকে একটা কাজে আমাকে কাল কায়রো পাঠাতে হবে। আপনারা ওর সঙ্গেই প্লেনে ফিরবেন।'

হেরম্যান তাঁকে বললেন, 'এর জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। আপনার আতিথেয়তা আমরা মনে রাখব।'

ডক্টর টিউনিসের সঙ্গে কথা বলে ঘরে ফিরে খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে বিকালের দিকে বেরোল সুদীপ্তরা। প্রাচীন নগরীর দিকে নয়, তারা গেল মরুভূমির দিকে সূর্যাস্ত দেখতে। মরুভূমির বুকে অপূর্ব, অবর্ণনীয়, আশ্চর্য সুন্দর রঙের খেলা প্রত্যক্ষ করল তারা দুজন। তারপর ঘরে ফিরে এল।

সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের ঘরে বসে গল্প করতে করতে সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'কালই তো আমরা চলে যাচ্ছি। যাবার বেলায় ডক্টর টিউনিস আমাদের কী দেখান দেখি? আপনি যার খোঁজ পাবেন বলে এখানে এসেছিলেন সেই সিংহ-মানুষ হয়তো আমরা পেলাম না। কিন্তু এখানে যা আমরা দেখলাম, এই প্রাচীন নগরী, মরুভূমির বুকে সূর্যাস্ত, এসব দেখার সৌভাগ্যই বা সাধারণ টুরিস্টদের ক'জনের হয়?'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'ঠিক তাই। এসবই বা কম কী? তবে আজকের একটা ঘটনায় একটা খটকা লাগছে!'

'কী ঘটনা?' জানতে চাইল সুদীপ্ত।

হেরম্যান প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। কাল আবার ফেরার ধকল আছে।'

মোগাবো খাবার দিয়ে গেল আটটা নাগাদ। খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল দুজনেই। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের চাঁদের আলোর সঙ্গে গ্রামের দিক থেকে ভেসে আসছিল দ্রিমি দ্রিমি ঢাকের শব্দ আর সম্মিলিত করুণ বিলাপের অস্পষ্ট শব্দ। সেই হতভাগ্য যুবকের শেষকৃত্য পালন করছে বুশম্যানরা। সেসব শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল সুদীপ্ত আর হেরম্যান।

ভোরবেলা সুদীপ্ত ঘুম থেকে উঠতেই হেরম্যান বললেন, 'কাল মাঝরাতে আমি বারকয়েক রাইফেলের শব্দ শুনেছি! কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে!'

সুদীপ্ত বলল, 'তাহলে সম্ভবত স্মিথের সঙ্গে সিংহর মোলাকাত হয়েছিল।'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

সুদীপ্ত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই দরজাতে টোকা পড়ল। হেরম্যান দরজা খুলতেই হুইল চেয়ারে বসা ডক্টর টিউনিস হেসে বললেন, 'সুপ্রভাত। আপনারা তো আজ চলে যাবেন, তাই আমি নিজেই সুপ্রভাত জানাতে এলাম। এখন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। প্রাচীন নগরীর সে জায়গা আপনাদের দেখাতে নিয়ে যাব। ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে প্লেনে চাপবেন আপনারা। আশা করি বিকালের মধ্যে আপনারা কায়রো পৌঁছে যাবেন। দুটো দিন আপনাদের সঙ্গে ভালোই কাটল। সিংহটা ঝামেলা না করলে আরো ভালো কাটত।' হেরম্যান তাঁকে সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন, 'আমাদেরও বেশ ভালো লাগল এ জায়গা।'

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'আসল জায়গাটা দেখলে আরও ভালো লাগবে।'

হেরম্যান তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাতে গুলির শব্দ শুনেছেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি। আশা করছি স্মিথ আর মৃত সিংহটার সঙ্গে নগরীর ভিতর আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আপনারা তৈরি হয়ে নিন। আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি।' এই বলে তিনি হুইল চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডক্টর টিউনিসের ডেরা থেকে সবাই বেরিয়ে পড়ে যাত্রা শুরু করল সেই প্রাচীন নগরীর দিকে। সকালের নরম আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের পথে। দু-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার বছরের প্রাচীন মূর্তিগুলোর গায়ে। নগরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে সেই ফিংস মূর্তি দুটো। মানুষের মুখ, সিংহর দেহ। সিংহ-মানুষ! কতকাল ধরে তারা এই নগরীর দ্বাররক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে! যেন মহাকালের প্রহরী। পাথুরে মূর্তিদুটোর ঠোঁটের কোণে ভোরের আলোতে যেন আবছা হাসির রেশ। সুদীপ্ত বেশ কয়েকটা ছবি নিল মূর্তিগুলোর।

ভগ্ন তোরণ পেরিয়ে খণ্ডহর নগরীতে প্রবেশ করল তারা। এগোতে এগোতে হেরম্যান টিউনিসকে বললেন, 'আপনার তো এই প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে অনেক পড়াশোনা আছে। এ সভ্যতার কোন দিকটা আপনার সব থেকে আকর্ষণীয় মনে হয়?'

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'মিশরীয় সভ্যতার যেটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক তা হল তাদের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা। তবে সেটা শুধু সীমাবদ্ধ থাকত মিশরীয় পুরোহিত ও ফারাওদের

মধ্যে। তাঁরা জাদু দেখাতে পারতেন, থথের উপাসনা করতেন। জাদুবিদ্যা তো আসলে বিজ্ঞানেরই কৌশল। বিজ্ঞানের সব শাখায় থথের উপাসকরা অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ভাবুন একবার, পিরামিড ও তাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষপথ নির্মাণের জন্য কী অসাধারণ জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল! লোহার ব্যবহার ছাড়াই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দক্ষতায় তারা নির্মাণ করেছিল বিশাল বিশাল স্তম্ভ, ছাদ। আর ভেষজবিদ্যা ও শরীরবিদ্যায় তাদের জ্ঞান ছিল আধুনিক পৃথিবীকে চমকে দেওয়ার মতো। নিপুণ শল্য-চিকিৎসক ছিল তারা। আমরা এখন 'ওপেন হার্ট সার্জারি'র কথা জানি। আবু সিম্বল নামের জায়গাতে কিছু ছবি মিলেছে, যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে একজন চিকিৎসক বা পুরোহিত জীবন্ত মানুষের হৃৎপিণ্ড বার করে তার শল্যচিকিৎসা করছেন। তারপর সে মানুষ আবার হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। ভাবতে পারেন পাঁচ হাজার বছর আগে 'ওপেন হার্ট সার্জারি'!'

কথা বলতে বলতে সবাই আগে উপস্থিত হল শেবার মন্দিরের কাছে, তারপর মন্দিরটাকে একপাশে রেখে পাথরের ব্লক বসানো সরু একটা রাস্তা ধরে এগোল যেদিকে থথ মন্দির আছে সেদিকে। দু'পাশে ঘাসের ঘন জঙ্গল রাস্তার ওপর নুইয়ে পড়েছে। মোগাবো কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে নিয়েছে। তার সতর্ক চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে।

ঘাসবনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে তারা এসে দাঁড়াল শেবা মন্দির আর থথের মন্দিরের মাঝামাঝি জায়গাতে একটা জীর্ণ স্থাপত্যের সামনে। এটাও একটা ছোট মন্দির মতো। তার দরজা আগলে বসে আছে পাথরের তৈরি দুজন সিংহ-মানুষ। বাড়িটার বড় বড় থামের আড়ালে জীর্ণ ঘরগুলোর ভিতর আধো অন্ধকার খেলা করছে। সুদীপ্তরা ভিতরে প্রবেশ করল। বেশ অনেক কটা কক্ষ মন্দিরের ভিতর। টর্চের আলোতে সুদীপ্তদের চোখে পড়ল, দেওয়ালের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে সারসের মাথাঅলা দেবী থথের মূর্তি। সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'এটা কী থথের মন্দির ছিল?'

ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, 'না, থথের মন্দির নয়, তবে এ মন্দিরের সঙ্গে থথের মন্দিরের বিশেষ একটা সম্পর্ক ছিল। সেটা পরে জানবেন।'

দুটো ঘর অতিক্রম করে একটা ঘরে এসে থামল সবাই। ঘরটা ধুলো আর মাকড়সার জালে ভর্তি। আর আড়াল থেকে অস্পষ্টভাবে উঁকি দিচ্ছে নানা ছবি। ডক্টর টিউনিস সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি কিনা? একটা জিনিস আপনাদের দেখাই।' এই বলে তিনি ইশারা করলেন মোগাবোকে। সে দেওয়ালে এক জায়গাতে হাত দিয়ে ঘষে ধুলো সরিয়ে ফেলল। তার আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল সোনালি আর নীল রঙে আঁকা কোনো এক ফারাওয়ের ছবি। আধো অন্ধকারেও সেই উজ্জ্বল সোনালি রং যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। রঙের কী মহিমা! এত বছর পরও সেই সোনালি আর নীল রংগুলো আজও উজ্জ্বল! মোগাবো এরপর একটা ছোট পেনসিল কাটার ছুরি বার করে ছবিটার সোনালি অংশতে চাড় দিতেই ছুরির ডগায় এক ইঞ্চিমতো সোনালি রঙের টুকরো উঠে এল। সেটা সে হেরম্যানের হাতে দিতেই তিনি সেটা নিয়ে পরীক্ষা করে বিস্মিতভাবে বলে

উঠলেন, 'আরে এ তো রং নয়, সোনার পাত!'

ডক্টর টিউনিস হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, সোনার পাত! ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত এ ঘরের সব ছবিতে সোনার পাত লাগানো আছে। কেউ আগে এটা ধরতে পারেনি। কত ট্রেজার হান্টার এল গেল! তবে এসবে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এর চেয়ে চমকপ্রদ আর একটা জিনিস আপনাদের দেখাব। চমকে যাবেন আপনারা।'

পাশের আর একটা বেশ বড় ঘরে সুদীপ্তরা এরপর হাজির হল। ঘরটার ঠিক মাঝে একটা পাথরের বেদি আছে। তারা বেদিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেদির গায়ে বেশ কিছুটা অংশের ধুলো আগেই কে যেন সাফ করেছে। তার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা প্যানেল। বেশ কয়েকটা ছবি তাতে। ডক্টর টিউনিস একটু বিস্মিতভাবে বললেন, 'সম্প্রতি কেউ এখানে এসেছিল, সম্ভবত স্মিথ। আমার অনুমানই ঠিক, সে গুপ্তধন খুঁজতে এসেছে। কিন্তু সে ওই কায়রোর টুরিজিম সেন্টারের লোকটার মতোই মূর্খ ছিল। আসল জিনিস উদ্ধার করতে পারল না।'

এরপর তিনি বললেন, 'ছবিগুলোকে ভালো করে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন কীভাবে মানুষ-সিংহ মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে।' সুদীপ্তরা দেখতে লাগল ছবিগুলো। প্রথম ছবিটাতে একটা মানুষ তার পায়ের থাবা সিংহর, দ্বিতীয় ছবিটা অর্ধেক দেহ সিংহ ও অর্ধেক মানুষের, তৃতীয় ছবিতে তার মাথা বাদ দিয়ে সারা শরীর পরিণত হয়েছে সিংহতে। আর প্রত্যেক ছবির পাশে ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিত।

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'হ্যাঁ, সে সময় যে সত্যি-সিংহ-মানুষ ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আপনাদের আমি দেব। তার জন্য নীচে নামতে হবে আপনাদের। আমি তো নীচে নামতে পারব না, মোগাবোই দেখিয়ে আনবে সে ছবি।'

'নীচে মানে কোথায়?'

সুদীপ্ত তার প্রশ্নের জবাব কয়েক মুহূর্তর মধ্যেই পেয়ে গেল। একটু ঝুঁকে মোগাবো ধাক্কা দিল বেদির এক বিশেষ জায়গাতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড় শব্দে সরে গেল বেদিটা, তার আড়ালে উঁকি মারছে এক গহ্বর। পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে তার ভিতর। ডক্টর টিউনিস বললেন, 'ওখানে একটা গুপ্ত কক্ষ আছে।'

হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, 'কী আছে এর ভিতর?'

তিনি জবাব দিলেন, 'সেটা নীচে নামলেই বুঝতে পারবেন। তবে যদি আশা করেন যে ওখানে জ্যান্ত সিংহ-মানুষ দেখবেন সেটা ভুল। অতটা আশা করা ঠিক নয়।' এই বলে হাসলেন তিনি।

সুদীপ্ত প্রথমে উঁকি দিল সেই গহ্বরে। আবছা আলো খেলা করছে ঘরটাতে। মাটির নীচে ঘর হলেও কোনো আলোর উৎস আছে সেখানে। তবে সেটা কী তা নীচে না নামলে বোঝা যাবে না।

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'নীচে নামুন, কোনো অসুবিধা নেই। আমি একসময় ওখানে

বহুবার নেমেছি। মোগাবো নামছে আপনাদের সঙ্গে। নীচে নামলে চমকে যাবেন।'

মোগাবো সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসল। তারপর টর্চ বার করে সিঁড়িতে আলো ফেলে ইশারা করল তাদের নীচে নামার জন্য।

প্রথমে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন হেরম্যান, তারপর সুদীপ্ত, সব শেষে মোগাবো। বেশ ক'টা ধাপ নীচে নেমেছে সুদীপ্ত। হেরম্যান তখন প্রায় নীচে পৌঁছে গেছেন। হঠাৎই পিছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সুদীপ্ত সিঁড়ির ধাপ থেকে ছিটকে পড়ল হেরম্যানের ওপর। তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে পাথুরে মেঝেতে ছিটকে পড়ল! সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য উঠে দাঁড়াল তারা। মোগাবো ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওপরে। ঘড়ঘড় শব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওপরের ফাঁকটা। সুদীপ্তরা যখন ছুটে সিঁড়ির ওপরের ধাপে উঠল ঠিক সেই সময় ওপরের ফাঁকটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। সুদীপ্ত সুড়ঙ্গমুখের পাথরটা ঠেলে সরাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ওপর থেকে চাপানো পাথরটা এক ইঞ্চিও সরাতে পারল না সে। হেরম্যান চিৎকার করে উঠলেন, 'ডক্টর টিউনিস! ডক্টর টিউনিস! আমাদের এভাবে আটকালেন কেন? এ ধরনের রসিকতা ভালো নয়। তাড়াতাড়ি পাথরটা সরান!' ওপর থেকে ডক্টর টিউনিসের অট্টহাসি ভেসে এল। তিনি বললেন, 'আমি মোটেও রসিকতা করছি না। ওখানে আপনাদের না আটকালে শেবা মন্দিরের সিংহ-মানুষের রহস্যটা তো আপনি জানতে পারবেন না। আপনি তো একজন ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্ট। লোককথা, পৌরাণিক গল্পকথার প্রাণীর সন্ধান করেন, তাই না! সিংহ-মানুষের ব্যাপারে আগ্রহের জন্যই আপনি আসলে এখানে এসেছেন তাই না? তা শেষ পর্যন্ত জানবেন না সিংহ-মানুষ কীভাবে হয়?' তাঁর কথা শুনে সুদীপ্ত-হেরম্যান দুজনেই বিস্মিত হল। হেরম্যান চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমার এ পরিচয় আপনি জানলেন কীভাবে? আর তা সত্যি হলেও আপনার কী? পাথরটা ওঠান বলছি। আমরা কিন্তু পুলিশে রিপোর্ট করব।' ওপর থেকে টিউনিস প্রথমে বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পরই মনে হয়েছিল আপনাদের দুজনের কথা কোথায় শুনেছি। পরে খেয়াল হল, বছর তিন আগে এখানকার সংবাদপত্রে আপনাদের দুজনের খবর বেরিয়েছিল। আফ্রিকার বুরুন্ডিতে সেবার সবুজ বাঁদরের সন্ধানে গেছিলেন আপনারা। এসব ব্যাপারে আমারও আগ্রহ আছে বলে খবরটা মনে আছে।'

তারপর তিনি হেসে বললেন, 'চিৎকার করে কোনো লাভ হবে না। এখানে কেউ আসে না। আর একটা শুভ সংবাদ জানাই। আপনাদের স্মিথ গুপ্তধন খুঁজতে এসে শেষ পর্যন্ত সিংহর পেটেই গেল। তার রক্তমাখা জামাকাপড় আজ আনুবিস মন্দিরের চাতালে পাওয়া গেছে। আর কেউ আপনাদের ডাক শুনতে আসবে না।'

সুদীপ্ত বলে উঠল, 'পাগলামি করবেন না ডক্টর। খুলুন বলছি! পাথরটা খুলুন।'

ডক্টর হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ, খুলব খুলব। নিশ্চয়ই খুলব। আপনাদের তো থথের মন্দিরে আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। নইলে সিংহ-মানুষের ব্যাপারটা আপনারা জানবেন কী করে! তবে এখন নয়, কিছু কাজ বাকি আছে, সেগুলো মিটে যাবার পর।'

সুদীপ্ত আবার চিৎকার করে উঠল, 'কী আবোল-তাবোল বকছেন? আমাদের বাইরে বেরোতে না দিলে ফল ভালো হবে না।'

টিউনিস এ কথার আর কোনো জবাব দিলেন না। তিনি হাসতে থাকলেন। সুদীপ্ত আর হেরম্যান ধাক্কা দিয়ে যেতে লাগল পাথরটা সরাবার জন্য। ওপরে টিউনিসের হাসি ক্রমশ অস্পষ্ট হতে লাগল। সুদীপ্তরা বুঝতে পারল ডক্টর ওপরের ঘরটা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

পাথরটাকে ঠেলে সরাবার ব্যর্থ চেষ্টার পর হাঁফাতে হাঁফাতে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল সুদীপ্ত আর হেরম্যান।

মাটির তলায় হলেও ঘরটা বেশ বড়। সিঁড়ি যেদিকে তার ঠিক উল্টোদিকের দেওয়ালের মাথার কাছে গোলাকার একটা গর্ত আছে। ফোকরটা সম্ভবত ঘরের বাইরে মাটির সমতলের কিছুটা ওপরে অবস্থিত। বাইরের পৃথিবীর আলো আসছে সেখান দিয়ে। ওই ফোকর দিয়ে মানুষ গলতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেটা এতটাই ওপরে যে সুদীপ্ত বা হেরম্যান কেউ কারো কাঁধে চেপেও তার নাগাল পাবে না। মসৃণ দেওয়াল বেয়েও সেই ফোকরের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব।

সিঁড়ির ধাপে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর নীচে মাটিতে নেমে সুদীপ্তরা ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। নিরেট পাথুরে দেওয়াল, বাইরে যাবার কোনো পথ নেই। দেওয়ালের গায়ে চিত্রিত প্রাচীন ফিংসের মূর্তিগুলোর ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি। জোড়া জোড়া চোখ দিয়ে তারা যেন দেখছে সুদীপ্তদের। সুদীপ্ত বলল, 'ডক্টর টিউনিস আমাদের এভাবে আটক করলেন কেন? ওঁর মতলবটা কী?'

হেরম্যান গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'সঠিক ধারণা আমার নেই। তবে এই বিপদের মধ্যেও টিউনিসের কথা শুনে আমার একটা ধারণা হচ্ছে। সিংহ-মানুষের ব্যাপারে উনি নিশ্চিতভাবে কিছু জানেন। হয়তো বা এ তল্লাটে সত্যিই সিংহ-মানুষ আছে। জঙ্গলাকীর্ণ এই প্রাচীন নগরীর এই ভূগর্ভস্থ কুঠুরি যতটা অপরিচ্ছন্ন হবার কথা ততটা কিন্তু নয়।' ঘরের এককোণে একটা লাঠির মাথায় আধপোড়া একটা মশাল পড়ে থাকতে দেখে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল, এ ঘরে ডক্টর টিউনিস বা অন্য কারো যাওয়া-আসা আছে। মশালটা হাতে নিয়ে দেখছিল সুদীপ্ত, হঠাৎ হেরম্যান মাটির ওপর ঝুঁকে পড়ে সুদীপ্তকে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার দেখো!' মাটির ওপর যেখানে দেওয়ালের মাথার ফোকর গলে আলোকরশ্মি এসে পড়েছে। সেই আলোতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মেঝের নরম ধুলোর ওপর মানুষের পায়ের ছাপের পাশাপাশি জেগে আছে সিংহর থাবার দাগ!

সুদীপ্ত বলে উঠল, 'এ ঘরে সিংহ আর মানুষ দু-ধরনের প্রাণীরই আনাগোনা আছে নাকি? নাকি এ একজনেরই পায়ের ছাপ! আফ্রিকানদের প্রবাদ সত্যি! সিংহ-মানুষ দুটো রূপই ধারণ করতে পারে!'

হেরম্যান বললেন, 'কে জানে! তবে আপাতত আমাদের ডক্টর টিউনিসদের পুনঃআগমনের প্রতীক্ষা করা ছাড়া কোনো কাজ নেই। তবে রিভলভারটা সঙ্গে আছে। সেটার উপস্থিতি ওদের জানা নেই। আমার ধারণা যে এখানে আমাদের আটকে রেখে তিলে তিলে মারার জন্য সে আমাদের বন্দি করেনি। সে বা মোগাবো আসবে। তখন একটা লড়াই দেওয়া যাবে।'

সুদীপ্তরা নিজেদের পূর্ব অভিযানের অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হলে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করলে কাজ দেয়। এর আগে বেশ কয়েকবার 'ক্রিপটিড' বা 'গল্পকথার প্রাণীর' খোঁজে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হেরম্যানের সঙ্গী হয়েছিল সুদীপ্ত। অনেক বিপদের সাক্ষীও থেকেছে। এবারই বরং নিছক মিশর ভ্রমণে এসে বিপদে জড়িয়ে পড়ল তারা। কখনো তারা গেছে নেপাল-হিমালয়ের প্রাচীন বৌদ্ধমঠে 'বরফদেশের ছায়া মানুষ' বা 'ইয়েতি'র খোঁজে, কখনো ইন্দোনেশিয়ায় 'সুন্দাদ্বীপের সোনার ড্রাগন'কে খুঁজতে, আবার টাঙ্গানিকার তীর ধরে গ্রেট রিফট্ অতিক্রম করে অভিযানে সামিল হয়েছে শ্বাপদসঙ্কুল আফ্রিকার গহীনতম প্রদেশে 'বুরুন্ডির সবুজ মানুষ'-এর খোঁজে। এসব অভিযান সুদীপ্তদের শিখিয়েছে প্রচুর। কতবার যে তারা দুজন মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছে তার হিসাব নেই। সেসব ঘটনা ভবিষ্যতে মনকে আরও দৃঢ় করেছে। মাটির নীচের প্রাচীন কুঠুরিতে বসে সে সব গল্পই করে চলল তারা। বাইরে সময়ও এগিয়ে চলল তার সঙ্গে।

দুপুর আর বিকালে পালা করে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিল দুজন। সুদীপ্ত যখন ঘুম থেকে উঠল তখন ঘরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাইরের পৃথিবীতে সূর্য ডুবছে। সারা দিন তারা কাটিয়ে দিল মাটির নীচে। হেরম্যান বললেন, 'রাতটা সতর্ক থাকতে হবে। হয়তো তারা আসবে। সঙ্গে দেশলাই আছে। মশালটা জ্বালানো যেতে পারে, তবে এখন নয়। কারণ, মাটির নীচে বাতাস ভারী হয়ে যেতে পারে তাতে। শ্বাস নিতে সমস্যা হবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে সূর্য ডুবে গেল। ঘরটা ঢেকে গেল অন্ধকারে। এক দুঃসহ অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইল দুজন। সুদীপ্তর মনে হতে লাগল, এ অন্ধকার যেন কোনোদিন কাটবে না! অন্তহীন এ অন্ধকারে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে তারা। এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা ঘণ্টার মতো ভারী। পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন নগরীর মৃত্যুকূপে আটকে পড়েছে তারা।

কিন্তু একসময় আবার অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করল। বাইরে চাঁদ উঠছে। সেই আলো ঢুকছে ঘরেও। মিশরীয়দের স্থাপত্য-কৌশল সত্যিই আশ্চর্য ছিল সে সময়। নইলে মাটির নীচে চাঁদের আলো ঢোকার কথা নয়। ঘরের ভিতরটা মোটামুটি স্পষ্ট

হয়ে গেল। ফোকরের আলোক উৎসর দিকে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, 'আজ বোধ হয় পূর্ণিমা!' পাথুরে মেঝেতে বসে, সিঁড়ির মাথার পাথর সরানোর কোনো শব্দ বা টিউনিসের ফেরার কোনো শব্দর প্রতীক্ষা করতে লাগল তারা।

ঘণ্টাতিনেক নিস্তব্দভাবেই কেটে গেল। তারপর একটা অস্পষ্ট খসখস শব্দ শোনা গেল। সুদীপ্তরা বুঝতে পারল শব্দটা আসছে সিঁড়ির মাথা থেকে নয়, দেওয়ালের মাথার ফোকর থেকে। সম্ভবত বাইরে ওখানে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে ও? সুদীপ্তরা উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল সেই ফোকরের দিকে। হ্যাঁ, শব্দটা হচ্ছেই!

মিনিটখানেক মাত্র। হঠাৎই যেন ফোকরের আলোটা ঢেকে গেল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বিস্মিত সুদীপ্তরা দেখল তার ভিতর দিয়ে ভিতরে উঁকি দিচ্ছে বিরাট বড় একটা মাথা! সিংহ! সিংহর মাথা! ওপর থেকে সে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে! প্রাণীটা একবার মুখটা ফাঁক করল। অন্ধকারের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার হিংস্র দাঁতগুলো। তার মুখের জান্তব দুর্গন্ধ মাটিতে দাঁড়িয়েও টের পেল তারা। হতভম্ব সুদীপ্তরা দেখতে লাগল তাকে। কালো কেশরঅলা বিরাট একটা সিংহর মাথা! সিংহটা এরপর কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথা সরিয়ে নিল। আবার আলোয় ভরে উঠল ঘর। সুদীপ্ত খেয়াল করল হেরম্যানের হাতে রিভলভার উঠে এসেছে।

দ্বিতীয়বার মাথা ঢোকাল সিংহটা। চোখে সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি। টপ্ করে সুদীপ্তর হাতে একফোঁটা গরম জল পড়ল। সিংহর লালা। কী বীভৎস দুর্গন্ধ! সারা গা গুলিয়ে উঠল সুদীপ্তর। আর এরপরই সে খেয়াল করল পশুটা তার মাথার সঙ্গে সামনের থাবা দুটোও ভিতরে ঢোকাচ্ছে। হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওর মতলব ভালো নয়। ও গুঁড়ি মেরে ফোকর দিয়ে নীচে নামার চেষ্টা শুরু করেছে! ও ভিতরে চলে আসতে পারে। ওকে থামাতে হবে।' এই বলে হেরম্যান তাঁর রিভলভার তুললেন সেই জন্তুকে লক্ষ করে।

খট্! খট! ট্রিগার টানার দুটো ধাতব শব্দ হল মাত্র, গুলি বেরোল না! হেরম্যান তাড়াতাড়ি রিভলভারটা পরীক্ষা করে বললেন, 'সর্বনাশ! ডক্টর টিউনিস আমাদের চেয়ে অনেক বেশি চালাক। সকালে আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তিনি রিভলভার থেকে গুলি সরিয়ে নিয়েছেন!' সিংহটা একটা চাপা 'গ-র-র' শব্দ করল। হয়তো সে নিজের ভাষায় বিদ্রুপ করল সুদীপ্তদের অবস্থা দেখে। একটা পা-ও সে গলিয়ে ফেলেছে। হেরম্যান আর সময় নষ্ট না করে চিৎকার করে উঠলেন, 'মশালটা জ্বালাতে হবে। ওটা দিয়ে ওকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে হবে।'

সুদীপ্ত মশালটা উঠিয়ে আনল, সৌভাগ্যক্রমে সেটা জ্বলেও উঠল। সিংহটা গজরাতে শুরু করেছে, সম্ভবত সে বুঝতে পারছে মানুষগুলো তাকে আটকাবার কোনো বন্দোবস্ত করছে। সে-ও দ্রুত ফোকর দিয়ে তার দেহটাকে গলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

বেশ জ্বলে উঠল মশালটা। আলোকিত হয়ে উঠল সারা ঘর। সেই আলোতে সিংহটাকে আরও হিংস্র দেখাচ্ছে। কুচকুচে কালো কেশর ফোলানো মাথা, হিংস্র সবুজ

চোখ দুটো যেন প্রবল জিঘাংসায় মরকত মণির মতো জ্বলছে, তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো ভয়ংকর দাঁতগুলো যেন সেই মুহূর্তেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাচ্ছে সুদীপ্তদের।

মশালটা ঠিকভাবে জ্বলে ওঠার পরই সুদীপ্তরা চোখের ভাষাতে নিজেদের কর্তব্য ঠিক করে ফেলল। হেরম্যান ঠিক ফোকরটার নীচে দেওয়াল ধরে মাটিতে বসে পড়লেন। সুদীপ্ত মশালটা ধরে হেরম্যানের কাঁধের ওপর উঠে দাঁড়াল। পাঁচ ফুট লম্বা লাঠির আগায় দাউ দাউ করে জ্বলছে মশালটা। সুদীপ্ত তাঁর কাঁধে পা রাখার পর দেওয়াল ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে শুরু করলেন হেরম্যান। মশালের আলোতে সিংহটার মুখের ভিতর আল-জিভটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে সুদীপ্ত। তার শ্বাসের গরম হলকা পর্যন্ত সে টের পাচ্ছে! লম্বা জিভ থেকে টপটপ করে লালা খসে পড়ছে সুদীপ্তর গায়ে। আর দেরি করা যাবে না। সিংহটা তার দ্বিতীয় পা'টা প্রায় গলিয়ে ফেলেছে ভিতরে। ওটা ভিতরে ঢোকাতে পারলেই দেহটা ভিতরে ঢোকাতে কোনো সমস্যা হবে না। সে নেমে আসবে নীচে। তারপর?

সুদীপ্ত মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে প্রস্তুত হল ঘটনাটা ঘটাবার জন্য। তারপর হাত উঁচু করে জ্বলন্ত মশালের আগাটা ঢুকিয়ে দিল সিংহর করাল মুখগহ্বরে।

প্রচণ্ড গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠল সারা ঘর। মাথার ওপর থেকে পলেস্তরা খসে পড়ল। সিংহটা মুহূর্তের মধ্যে সেই ফোকর থেকে টেনে হিঁচড়ে নিজের দেহটাকে বাইরে বার করে নিল। তার ক্রুদ্ধ গর্জনে বাইরেটাও যেন কেঁপে উঠল বেশ কয়েকবার। পাতালঘরে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তরা শুনল সে শব্দ। তারপর একসময় সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হেরম্যান বললেন, 'হতে পারে এটা সেই সাথীহারা সিংহটা। আবার এমনও হতে পারে এটা হয়তো ডক্টর টিউনিসের পোষা কোনো সিংহ। ঘরে সিংহ ঢুকিয়ে তিনি মারতে চেয়েছিলেন আমাদের। হয়তো প্রাচীনকালে এই গুপ্ত কুঠুরিতে ওই ফোকর দিয়ে এভাবেই সিংহ ঢুকিয়ে মারা হত বন্দিদের। তারপর কফিনের পাথরটা সরিয়ে আবার প্রাণীটাকে বাইরে বার করে নিয়ে যাওয়া হত। হতভাগ্য বন্দির পরিণতি কেউ জানত না। শুধু জিভ চাটতে চাটতে সিংহটা মন্দির ছেড়ে বেরোত।' এরপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে হেরম্যান বললেন, 'আমার প্রথম অনুমানটাই ঠিক। ওটা সাথীহারা সিংহটাই। ডক্টর টিউনিস আমাদের খুন করতে চাইলে সিংহ পাঠিয়ে খুন করতেন না। ওই ফোকর দিয়ে মোগাবো তার রাইফেলের নলটা ভিতরে ঢোকালেই কাজ মিটে যেত। তবে সিংহটা নিশ্চয়ই আর দ্বিতীয়বার ওপথে ফিরে আসবে না। আগুনকে শ্বাপদ প্রাণীরা এমনিতেই ভয় পায়। তারপর আগুনের আঘাতে সে নিশ্চয়ই কম-বেশি আহত হয়েছে। সিংহর ভয় থেকে আপাতত আমরা নিরাপদ। আপাতত ডক্টর টিউনিস কখন আসে দেখা যাক। মশালটা আপাতত নিভিয়ে দাও। কার্বন ছড়াচ্ছে। শেষকালে না এর জন্য মরতে হয়!'

মশাল নিভিয়ে দিল সুদীপ্ত। আবার চাঁদের আলোতে আলোকিত হল ঘর। সিংহর

ঘটনার আকস্মিকতা একটু স্তিমিত হবার পর একসময় হেরম্যান বললেন, জানো, পিরামিডের নীচেও প্রাচীন গুপ্তকক্ষে সারকোফেগাস অর্থাৎ কফিন রাখার পাথরের আধারের ওপরও এমনই পূর্ণিমার চাঁদের আলো এসে পড়ত। অথচ বাইরে থেকে দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। রানি হাটশেপমুট, বা বালকরাজা তুতেনখামেনের সমাধিতেও নাকি এ ব্যবস্থা ছিল। দেবীমায়ের উপাসকদের ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান কত উন্নত ছিল ভাবো!'

একসময় পুরো চাঁদটাই তারা দেখতে পেল সেই গহ্বর দিয়ে। সোনার থালার মতো, ছবির বইতে দেখা প্রাচীন মিশরীয় রানিদের সোনার মুকুটে বসানো স্বর্ণবলয়ের মতো চাঁদ। সুদীপ্তরা তাকিয়ে রইল সেদিকে।

আরও ঘন্টাখানেক সময় কেটে গেল। সুদীপ্তরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে মাথার ওপরের ঘরটাতে কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা সেজন্য। বাইরে থেকে আসা সোনার আলোতে চিক্‌চিক্ করছে দেওয়ালগাত্রে দাঁড়িয়ে থাকা ফিংস মূর্তির আভরণ। সুদীপ্তর মনে হল ওই ছবিগুলোতেও সম্ভবত সোনার পাত বসানো। পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন ফারাওদের অঙ্গ আভরণ আজও ঝলকাচ্ছে চাঁদের আলোতে। ঠোঁটের কোণে তাদের দুর্বোধ্য হাসি!

হেরম্যান একসময় বললেন, 'রাত দশটা বাজে।'

ঠিক এই সময় আবারও একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল তাদের। আর এবারও সেই শব্দটা আসছে মাথার ওপরের গর্তটার দিক থেকেই। সিংহটা আবার ফিরে এল নাকি!

সুদীপ্ত আর হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল। সুদীপ্ত মাটির ওপর থেকে উঠিয়ে নিল মশালটা। আবার তাহলে সেটাকে জ্বালাতে হবে।

না, সিংহ নয়। এবার ধীরে ধীরে সেই গর্তের ভিতর প্রবেশ করল রাইফেলের একটা নল! তাহলে কী সিংহ পাঠিয়ে ব্যর্থ হয়ে ডক্টর টিউনিস এবার গুলি করে তাদের মারতে চাচ্ছেন! সঙ্গে সঙ্গে হেরম্যান আর সুদীপ্ত ঘরের অন্ধকারতম কোণে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। যদিও রাইফেলের নলের সামনে ফাঁদে আটকানো ইঁদুরের মতো তাদের অবস্থা। আর তার পরই রাইফেলের নলের সঙ্গে সেই গহ্বরে আত্মপ্রকাশ করল একটা মানুষের মাথা। লোকটা ফোকরে মাথা গলিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল ভূগর্ভস্থ কক্ষের ভিতরটা। আর তার রাইফেলের নল তাগ করে ঘুরে যেতে লাগল ঘরের সর্বত্র। আর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ্তরা। রাইফেলের নলটা হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে সুদীপ্তরা ঘরের যে কোণে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তাগ করে থেমে গেল! এবার কী গুলি চলবে? তবে খরগোশের মতো মরতে হবে তাদের। সেই প্রতীক্ষাই করতে লাগল তারা দুজন। নিস্তব্ধ রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত!

হঠাৎ চাঁদের আলোকে ধরা দিল লোকটার মুখের একপাশ। তাকে দেখে অনেকটা বাহ্যজ্ঞান-শূন্য অবস্থাতেই সুদীপ্ত অন্ধকার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, 'আরে স্মিথ তুমি! তোমাকে না সিংহতে মেরেছে!'

স্মিথের চাপা বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ওপর থেকে—'তোমরা এখানে! শুধু টিউনিস আর মোগাবোকে যখন এই মন্দিরের বাইরে বেরোতে দেখলাম, কিন্তু তোমাদের দুজনকে দেখলাম না, তখন আমার এমন অনুমান হয়েছিল। কিন্তু তোমরা ওখানে ঢুকলে কীভাবে?'

অন্ধকার ছেড়ে ঘরের মাঝখানে এসে সুদীপ্তর পাশে দাঁড়িয়ে হেরম্যান বললেন, 'ডক্টর টিউনিস আমাদের এখানে দেখার জিনিস আছে বলে নীচে নামিয়ে মোগাবোর সাহায্যে বাইরে বেরোবার পথ বন্ধ করে দিলেন। এই ঘরটার ঠিক মাথার ওপরের ঘরটাতে একটা পাথরের বেদি আছে, সেটা ঠেললেই এই ঘরের সিঁড়ির মাথাটা ফাঁক হয়ে যায়। ওই বেদির নীচেই এ ঘরের সিঁড়ির মুখটা লুকানো। ওই পথেই এসেছি আমরা।'

স্মিথ বলল, 'দাঁড়ান দেখছি আপনাদের উদ্ধার করা যায় কিনা?' স্মিথের মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরে। সুদীপ্তরা মুহূর্ত গুনতে লাগল মুক্তির প্রতীক্ষায়। একটু পর সত্যিই সিঁড়ির মাথার বন্ধ অংশটা ঘড়ঘড় শব্দে ফাঁক হয়ে গেল। ওপর থেকে স্মিথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তাড়াতাড়ি ওপরে আসুন।'

যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি বেয়ে ফাঁক গলে সেই অন্ধকূপ থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। তাদের সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে স্মিথ!

কয়েক মিনিটের মধ্যে সুদীপ্ত পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল স্মিথকে। সে শুনে বলল, 'আজ সকালে তোমাদের চারজনকে আড়াল থেকে এ মন্দিরে ঢুকতে দেখেছি, কিন্তু বেরোতে দেখিনি। সন্দেহ আমার হয়েছিল। আরও আগেই আমি আসতাম, কিন্তু সিংহকে অনুসরণ করছিলাম। শেষে অবশ্য তারই পিছন পিছন হাজির হলাম এখানে। তার এই গর্তের ভিতর ঢোকার আকুলতা দেখে, এবং তার আঘাত পেয়ে ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা দেখে আমি অনুমান করেছিলাম এর নীচে মানুষ আছে। সম্ভবত হয়তো বা আপনারাই। কিন্তু সিংহটা আঘাত পাবার পর কাছেপিঠেই চক্কর কাটছিল বলে ফোকরের ভিতর মাথা দিতে পারিনি।'

হেরম্যান বললেন, 'তুমি সিংহটাকে লক্ষ করে গুলি চালালে না কেন? গর্তের ভিতর যখন সে মাথা ঢুকিয়েছিল তখনই তো তাকে মারা সহজ হত।'

স্মিথ বলল, 'তা নিশ্চয়ই হত। কিন্তু গুলি চললেই নিশ্চয়ই টিউনিস সতর্ক হয়ে যেতেন। সেটা আমি চাইনি।'

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু টিউনিস তো আমাদের জানিয়েছেন তুমি সিংহর আক্রমণে মারা গেছ।'

স্মিথ বলল, 'ওটা তাকে আমি বোকা বানাবার জন্যই করেছি। একটা শেয়াল মেরে জামা ছিঁড়ে তাতে তার রক্ত মাখিয়ে ফেলে এসেছিলাম। যাতে সে মনে করে সিংহ

টেনেছে আমাকে! আমাকে সে কাজের সুবিধার জন্য মৃত ভাবতে পারে। আমাকে সরাবার জন্য গতকাল রাতে মোগাবো একবার আড়াল থেকে গুলি চালিয়েছিল! তা অবশ্য লাগেনি। আমার উপস্থিতি ডক্টর টিউনিসের কাছে অন-অভিপ্রেত। এবং তা এতটাই যে তার জন্য তিনি আমাকে খুন করতে পারেন। অবশ্য ফাঁদটা পাতার জন্য আমি যে জঙ্গলাকীর্ণ এই প্রাচীন নগরীতে রাত কাটাব সেটা নিজেই আপনাদের জানাতে বলেছিলাম টিউনিসকে। আমার অনুমান সেটা আপনারা ঠিক জানিয়েছিলেন তাঁকে। যে কারণে তিনি রক্তমাখা জামা পেয়ে ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন। সেটা অবশ্য কুড়িয়ে পায় মোগাবো। আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধা আর আসবে না বুঝতে পেরেই আপনাদের আটক করে তারা।'

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু আমাদের তারা আটকাল কেন বলো তো? ডক্টর টিউনিস আমাদের বলেছিলেন, তাঁর অনুমান তুমি গুপ্তধন সন্ধানী। তিনি নিজেও হয়তো এখানে কোনো গুপ্তধন আগলে বসে আছেন। পাছে তুমি সেটা পা-ও তাই হয়তো তিনি সরাতে চেয়েছেন তোমাদের, কিন্তু আমাদের বেলা তো সে ব্যাপারটা খাটে না? আমরা গুপ্তধন খুঁজতে আসিনি এখানে।'

স্মিথ বলল, 'আমি এখানে ঘুরতে ঘুরতে দেবী থথের মন্দিরে বেশ কিছু প্রাচীন চিত্র দেখেছি। আমার অনুমান তোমাদের আটকানোর কারণটা সেই সিংহ-মানুষ ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্ত। থথের মন্দিরের ছবি আর সেখানে রাখা কিছু জিনিস দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে।'

'কী আছে থথের মন্দিরে?' প্রশ্ন করল সুদীপ্ত।

স্মিথ সম্ভবত তার জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল বাইরে। চাঁদের আলোতে তারা দেখতে পেল মোগাবো ঢুকছে এ জায়গাতে।

তাকে দেখামাত্রই সবাই সতর্ক হয়ে গেল। স্মিথ লাফিয়ে উঠে আত্মগোপন করল মানুষ সমান উঁচু বেদিটার মাথায় খাঁজের মধ্যে। একসময় হয়তো সেখানে মমির আধার বা সে জাতীয় অন্য কিছু থাকত। আর সুদীপ্তরা নিজেদের লুকাল কাছেই দুটো স্ফিংস মূর্তির আড়ালে।

বাইরের ঘরগুলো পেরিয়ে সেই ঘরটাতে প্রবেশ করল মোগাবো। ভিতরে প্রবেশ করে মুহূর্তের জন্য একবার থমকে দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল, তারপর যেন নিশ্চিন্তে এগোল বেদিটার দিকে। আধো অন্ধকারেও ঝকঝকে করছে তার সাদা দাঁতগুলো। তার কাঁধে বন্দুক, আর সঙ্গে একটা বস্তা। কিন্তু বেদির কাছে গিয়ে সেটা সরানো দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল সে। চট করে বন্দুক খুলে নিয়ে ঘরের চারপাশে বন্দুকের নলটা ঘোরাতে শুরু করল, কান খাড়া করে সে বোঝার চেষ্টা করল আধো অন্ধকার বিরাট ঘরের কোনো কোনা থেকে বা কোনো স্তম্ভ বা মূর্তির আড়াল থেকে কোনো ছায়া নড়ে ওঠে কিনা বা কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা তা বোঝার জন্য। পাথরের মূর্তির মতো যে যার জায়গাতে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে সুদীপ্ত আর হেরম্যান। স্মিথের

অবস্থা আরও খারাপ। মোগাবোর শ্বাস নেবার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে, তার গা থেকেও সিংহর মতো একটা জান্তব গন্ধ টের পাচ্ছে স্মিথ। দুজনের মধ্যে এক হাতেরও ব্যবধান নেই। মোগাবো কোনো কারণে যদি পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে বেদির মাথায় উঁকি দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গে স্মিথকে পেয়ে যাবে!

সময় যেন থেমে গেছে এ ঘরের মধ্যে। আধো অন্ধকারে মোগাবোর মুখ দেখে মনে হল সে ধন্দে পড়ে গেছে। এখনই সে ছুটে গিয়ে খবরটা জানাবে তার প্রভুকে? নাকি তার আগে নীচে নেমে দেখে নেবে লোক দুটো ভিতরে আছে কিনা? শেষ পর্যন্ত সে দেখার সিদ্ধান্তই নিল। ততক্ষণে সে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এ ঘরে কেউ নেই। প্রথমে সে তার বন্দুকটা বেদির মাথায় অজান্তেই স্মিথের গায়ের ওপর রাখল, ব্যাগটাও মেঝের ওপর রেখে উবু হয়ে সিঁড়ির মুখটায় বসে সন্তর্পণে দেখার চেষ্টা করল নীচটা। তারপর ব্যাগ থেকে টর্চ বার করে আলো ফেলতে লাগল মাটির তলার ঘরের প্রতিটা কোণে। ঠিক এই সময় একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড করল স্মিথ। নিঃশব্দে উঠে বসল সে। তারপর মোগাবোর রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল মোগাবোর মাথার পিছনে। 'আঁক!' করে একটা শব্দ তুলে মোগাবো ছিটকে পড়ল গহ্বরে। সুদীপ্ত আর হেরম্যান আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে এল, তারপর তিনজন মিলে বেদিটাকে ঠেলে সরিয়ে সিঁড়ির মুখ বন্ধ করে দিল।

কিন্তু অমন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েও নিজেকে সামলে নিল মোগাবো। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে সে নীচ থেকে ঠেলতে লাগল বেদিটা। ওপারে দাঁড়িয়ে তার দানবীয় শক্তির আভাস পেতে লাগল তারা তিনজন। সুদীপ্ত আর হেরম্যান যে পাথরটাকে দুজনে ঠেলে একচুল নড়াতে পারেনি সেই ভারী পাথরটা থরথর করে কাঁপছে মোগাবোর আঘাতে। যেন যে-কোনো মুহূর্তে পাথর-চাপা দানব বাইরে বেরিয়ে আসবে! মোগাবোর ব্যাগ থেকে বেরোল বেশ মোটা দড়ি, একটা ছুরি আর তরলপূর্ণ মুখবন্ধ একটা কাচের জার। তার মুখটা একটু ফাঁক করতেই মিষ্টি একটা গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল সবার। জারের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে স্মিথ বলে উঠল, 'আরে এ তো ক্লোরোফর্ম! এত ক্লোরোফর্ম! সঙ্গে দড়িও আছে। ওপর থেকে ক্লোরোফর্ম ঢেলে আপনাদের অচেতন করে বেঁধে নিয়ে যাবার মতলব ছিল! ওকে কিছুতেই ওপরে উঠতে দেওয়া যাবে না। এই বেদির নীচে পাথরের পুলি বসানো আছে। প্রাচীন পুলিগুলো ওর চাপে ভেঙে গেলেই দানবটাকে আর রোখা যাবে না। আর গুলি চালালে টিউনিস সতর্ক হয়ে যাবেন। তিনি নিশ্চিয়ই মোগাবোর প্রতীক্ষা করছেন। তিনি কোথায় আমি জানি। মোগাবোর অস্ত্রেই তাঁকে ঘায়েল করতে হবে। হেরম্যান আপনি এখানে রাইফেল পাহারা দিন। মোগাবো যদি বেরিয়ে আসে তখন নিরুপায় হয়ে গুলি চালাবেন। আমি আর সুদীপ্ত এখনই আসছি।' বেদিটা থরথর করে কাঁপছে। স্মিথ আর সময় নষ্ট করল না, হেরম্যানের হাতে মোগাবোর রাইফেল তুলে দিয়ে, কাচের জারটা সাবধানে ধরে সে সুদীপ্তকে নিয়ে ছুটল বাইরের দিকে।

চাঁদের আলোতে বাইরে বেরিয়ে তারা হাজির হল সেই ফোকরের কাছে। যেখান দিয়ে আলো ঢুকছে মাটির নীচের সেই কুঠুরিতে। সেই গহ্বরের বাইরে মাটিতে তখনও জেগে আছে সিংহর পায়ের দাগ, গহ্বরের গায়ে লেগে আছে সিংহর গোছাগোছা লোম। এখান দিয়ে সুদীপ্তদের ধরার জন্য ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল প্রাণীটা। স্মিথ নিচু হয়ে গহ্বরের মুখটাতে বসল, তারপর জারটা ফোকর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল ঘরের ভিতর। পাথুরে মেঝেতে আছড়ে পড়ে কাচের পাত্রটার চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার শব্দ শুনতে পেল সুদীপ্ত। কাজ মিটিয়ে তারা যখন আবার হেরম্যানের কাছে ফিরে এল, তখন নীচ থেকে ধাক্কায় বেদিটা আর কাঁপছে না। ক্লোরোফর্মের প্রভাবে চেতনা লুপ্ত হয়েছে সেই দানবের।

হেরম্যান স্মিথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার আমাদের কাজ কী?'

স্মিথ বলল, 'এবার আমরা দেবী থথের মন্দিরে যাব। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, জাদুবিদ্যার দেবী থথ। প্রাচীন মিশরীয়দের মতো ডক্টর টিউনিসও দেবী থথের উপাসক। আমি তাঁকে সে মন্দিরে ঢুকতে দেখেছি। তিনি সেখানেই আছেন। তাঁর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া বাকি আছে। আমারও, আর আপনাদেরও। একটা সত্যি কথা বলি, সিংহ শিকারের জন্য আমার এখানে আসা একটা অজুহাত মাত্র। যদিও আমি সত্যিই শিকারি, তবে আমি এখানে এসেছি অন্য এক সত্য অনুসন্ধানে। চলুন এবার সেখানে যাওয়া যাক। পরে সব কথা খুলে বলব আপনাদের।'—এবার যেন স্মিথের কথাগুলোও বেশ রহস্যময় শোনাল সুদীপ্তর কানে। হেরম্যান বললেন, 'ঠিক আছে তবে সেখানেই যাওয়া যাক।'

পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন নগরীর মাথায় সোনার থালার মতো গোল চাঁদ উঠেছে। তার আলো এসে পড়েছে রানি শেবার মন্দিরের স্তম্ভে, এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা খণ্ডহর স্থাপত্য, হাজার বছরের প্রাচীন ফিংস, আনুবিস মূর্তির গায়ে। চাঁদের আলো যেন চারপাশের রহস্যময়তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ঘাসবনের মাঝে মাঝে দণ্ডায়মান মূর্তিগুলো যেন বহু হাজার বছর পর ঘুম থেকে জেগে উঠে উঁকি মেরে দেখছে সুদীপ্তদের। যেন যে-কোনো মুহূর্তে নড়ে উঠবে তারা। বিশেষত থামের ওপর সামনে পা ছড়িয়ে বসে থাকা মৃত্যুদেবতা আনুবিসের চোখগুলো চাঁদের আলোতে যেন জ্বলছে। সুদীপ্তর খালি মনে হচ্ছে তাদের নীচ দিয়ে যাবার সময়ই এই বুঝি বেদির ওপর থেকে তাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা। প্রাচীন এই পবিত্র নগরীতে অনধিকার প্রবেশের জন্য তাদের শাস্তি দেবে মৃত্যুদেবতা আনুবিস।

ঘাসবনের ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে এগোতে থাকল সবাই। স্মিথ একবার চাপা স্বরে বলল, 'সিংহটাও নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে। সাথীহারা, আহত সিংহর প্রতিহিংসা বড়

মারাত্মক!' স্মিথ আর হেরম্যানের হাতে রাইফেল, সুদীপ্তর হাতে মোগাবোর ব্যাগ থেকে পাওয়া ছুরিটা। ক্রমশ থথের মন্দির কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। একসময় থথের মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেল তারা।

জ্ঞানের দেবী থথ, বিজ্ঞানের দেবী থথ, প্রাচীন মিশরীয়দের নানা গুপ্তরহস্য, জাদুকরী বিদ্যার দেবী থথ। খণ্ডহর নগরীর ঘাসবনের মধ্যে চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ মন্দিরটা। শেবার মন্দিরের মতো বড় না হলেও এ মন্দিরটাও বেশ বড়, এবং এখনও মোটামুটি অক্ষতই আছে। মন্দিরের প্রবেশমুখের দু'পাশে ঈষৎ ঝুঁকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ফারাওদের প্রস্তরমূর্তি। যেন নত মস্তকে তারা শ্রদ্ধা জানাচ্ছে জ্ঞানের দেবীকে। এই প্রথম ফারাওদের এ ধরনের মূর্তি দেখল সুদীপ্তরা। সারা মিশরবাসী মাথা নত করত ফারাওদের সামনে, আর তাঁরা মাথা নত করে আছেন এ জায়গাতে। আর মন্দিরের সদর দরজার ঠিক পাশেই হাতে জাদুদণ্ড নিয়ে বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং দেবী থথ। সারসমুখী বিরাট মূর্তিটা আকাশের দিকে মুখ তুলে যেন তারাদের দিকে চেয়ে আছেন। ওই অনন্ত আকাশের মতোই রহস্যময় দেবী থথ। চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়ছে তাঁর গা বেয়ে। এখনই হয়তো দেবী ডানা মেলে উঠে যাবেন নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তার রহস্য সন্ধানে।

সুদীপ্তরা মন্দির চত্বরে উঠে এল। স্মিথ বলল, 'ডক্টর টিউনিস মন্দিরের ভিতরেই আছেন। কোথায় আছেন তা আমি জানি। গত দু'রাতই তিনি এসেছেন এখানে। আমি তাঁকে অনুসরণ করে সে জায়গাতে গেছি। তবে আমরা তিনজন একসঙ্গে তাঁর সামনে হাজির হব না। আমি প্রথমে হাজির হব তাঁর সামনে, তারপর আপনারা। আপনাদের মুক্তির খবর তাঁকে আমি প্রথমে দিতে চাই না। দেখি তিনি প্রথমে আমাকে কী বলেন?'

নিঃশব্দে মার্জারের মতো থথ মন্দিরের বিরাট তোরণ দিয়ে সুদীপ্তরা মন্দিরগর্ভে প্রবেশ করল। মন্দিরের ভিতরটা অন্ধকার। তবে ভাঙা ছাদের ফাটল চুঁইয়ে, উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও আলো ঢুকছে। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে নানা ধরনের মূর্তি, স্তম্ভ। ঘরগুলোর দেওয়ালে আঁকা নানা ধরনের চিত্রলিপি, ফারাওদের বিরাট বিরাট ছবি। বাইরে থেকে আসা চাঁদের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে সেগুলো। স্মিথকে অনুসরণ করে সন্তর্পণে একের পর এক ঘর, থামে ঘেরা অলিন্দ, উন্মুক্ত ছোট চত্বর পেরিয়ে চলল সুদীপ্তরা। সেই সব চত্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নানা ধরনের মূর্তি। থথ তো আছেই তার সঙ্গে হ্যাথোর, আমন, হোরাস, আনুবিস সহ অন্য দেবদেবীর মূর্তি। চলতে চলতে হঠাৎই সেরকম একটা চত্বরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্মিথ। দাঁড়িয়ে পড়ল সুদীপ্তরাও। স্মিথ আঙুল তুলে তাদের ইশারা করল কিছুটা তফাতে এক জায়গাতে। সেখানে একটা নিচু বেদিতে সামনের দু-পা ছড়িয়ে পরিচিত ভঙ্গিতে বসে আছেন মৃত্যুদেবতা আনুবিস। প্রাচীন মিশরীয়রা এই দেবতাকেই সব থেকে বেশি ভয় পেতেন। স্মিথের অঙ্গুলি নির্দেশে সুদীপ্তরা ভালো করে তাকাল মূর্তিটার দিকে। আর তারপরই তাদের মনে হল সেই আনুবিসের মূর্তির চোখ দুটো খুব বেশি জীবন্ত। চোখ দুটো জ্বলছে।

আর এরপরই সুদীপ্তদের অবাক করে দিয়ে একদিকে ঘাড় ফেরাল মৃত্যুদেবতা আনুবিস! সুদীপ্তর পা-দুটো কেউ যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে মনে হল। তাহলে কী দেবী থথের মায়া মন্দিরে মৃত্যুর দেবতা আনুবিস জীবন্ত হয়ে উঠল। স্পষ্ট নড়ছে প্রাণীটা। হেরম্যানও কম আশ্চর্য হননি। নিজের অজান্তেই তিনি রাইফেলের নল ওপরে তুলতে শুরু করলেন। কিন্তু ঠিক এই সময় মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল প্রাণীটা। একটা ছোট্ট লাফে বেদি থেকে নেমে সে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল কাছেই একটা অন্ধকার ঘরে। স্মিথ চাপা স্বরে বলল, 'শিয়াল! প্রাণীটা আমাকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। একা কেউ এ দৃশ্য দেখলে নিশ্চয়ই হার্টফেল করত!'

সেই চত্বর পেরিয়ে কিছুটা এগোতেই মন্দিরের ভিতর এক জায়গা থেকে আলোর রেশ ভেসে আসতে লাগল। স্মিথ ইশারায় বুঝিয়ে দিল টিউনিস সেখানেই আছেন। সেই আলোর রেশ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সুদীপ্তরা একসময় পৌঁছে গেল সেই ঘরটার কাছে। থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা উঁকি দিল ঘরের ভিতর। হলঘরের মতো একটা উঁচু ছাদঅলা ঘর। সম্ভবত এটাই ছিল মন্দিরের গর্ভগৃহ। বিরাট বিরাট থাম ধরে রেখেছে ছাদটাকে। ঘরের মধ্যে ছোট ছোট বেশ কটা পাথুরে স্তম্ভের মাথায় বসানো কড়াইয়ের মতো ধাতব পাত্রে মশালের মতো আগুন জ্বলছে। সেই আলোতে আলোকিত ঘরটা। একদিকের দেওয়াল জুড়ে আঁকা আছে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দেবী থথের বিরাট মূর্তি। মশালের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে সোনার পাত বসানো তার অঙ্গ আভরণ, হাতের জাদুদণ্ড। ঘরের অন্য দু'পাশের দেওয়ালের গায়ে মুণ্ডিত মস্তক প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতদের ছবি। তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের শলাকা। আর ঠিক তাদের পায়ের কাছে দেওয়ালের গা ঘেঁষে অপারেশন টেবিলের মতো শ্বেত পাথরের লম্বা লম্বা বেদি। সুদীপ্তরা খেয়াল করল তার একটার ওপর সবুজ চাদর চাপা কী যেন শোয়ানো আছে। ঘরের এককোণে অন্য একটা বেদির ওপর নানা ধরনের শিশি, বোতল, পাত্র, আধুনিক যন্ত্রপাতি রাখা, তারই পাশে একটা অগ্নিকুণ্ডে বিরাট ধাতব পাত্রে কী যেন ফুটছে। সেখান থেকে ওষুধের মতো কোনো কিছুর গন্ধ সুদীপ্তদের নাকে এসে লাগছে। আর এ সবের মধ্যেই দেবী থথের ছবির ঠিক পায়ের কাছে হুইল চেয়ারে বসে আছেন ডক্টর টিউনিস। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে কোলে রাখা একটা পাথরের লম্বা প্লেট মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। কোনো প্রাচীন হিয়ারোগ্লিফিক হবে হয়তো। মুণ্ডিত মস্তক, গলা থেকে হুইল চেয়ারের প্রান্ত ছোঁয়া টিউনিসকে প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতের মতোই দেখাচ্ছে। স্মিথ ইশারায় দরজার কাছে থামের আড়ালে সুদীপ্তদের আত্মগোপন করতে বলে সটান এগোল ঘরের ভিতর। ডক্টর টিউনিস তার পায়ের শব্দ শুনে মুখ না তুলে তাকে মোগাবো ভেবে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, 'একটা মানুষকে বয়ে আনতে এত সময় লাগল তোমার! রাত যে শেষ হতে চলল!'

তিনি সম্ভবত ধারণাই করতে পারেননি মোগাবো ছাড়া অন্য কেউ এ সময় সেখানে উপস্থিত হতে পারে।

স্মিথ কাছে গিয়ে তাঁর কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, 'আমি স্মিথ, মোগাবো নই। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ডক্টর টিউনিস কথাটা শুনে চমকে উঠে তাকালেন তার দিকে। তারপর বিস্মিতভাবে বললেন, 'তুমি! কিন্তু তোমাকে তো সিংহ টেনে নিয়ে গেছিল!'

স্মিথ মৃদু হেসে জবাব দিল, 'না, সিংহ আমাকে মারতে পারেনি। আর আমিও তাকে মারতে পারিনি। দুজনেই বর্তমান। তবে কাল আমি ফিরে যাচ্ছি, যাবার আগে কিছু কথা জানতে এলাম।'

স্মিথের চলে যাবার কথা শুনে মনে হয় খুশি হলেন টিউনিস। একটু হেসে তিনি বললেন, 'কী কথা?'

স্মিথ এবার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'ওই যে, যে দুজন ভদ্রলোক আপনার অতিথি ছিলেন তাঁরা কোথায়?'

প্রশ্ন শুনে ডক্টর টিউনিসের মুখটা মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি যেখানে বসে আছেন তার পাশেই দেওয়ালের গায়ে একটা বড় জানলা মতো আছে, তার মধ্যে দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তাদের এ জায়গা দেখা হয়ে গেছিল। আজ দুপুরে মোগাবো তাদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে। এ কথাটাই কী জানতে এসেছ? কেন?'

স্মিথ জবাব দিল, 'না, এমনি জানতে চাইলাম। আমার আসল প্রশ্ন অন্য। তার আগে আমার আর একটা পরিচয় বলি, আমার বাবাকে আপনি চিনতেন। তাঁর নাম ছিল ডক্টর স্মল। শল্যবিদ ও মিশর গবেষক ডক্টর স্মল। যিনি কুড়ি বছর আগে এই থথ মন্দিরের বাইরে সিংহর আক্রমণে আহত হয়ে দু-দিনের মধ্যে প্রাণ হারান।'

তার কথা শুনেই হুইল চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ডক্টর টিউনিস স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন স্মিথের দিকে। সে এরপর বলল, 'যতটুকু জানি সে সময় এক ব্রিটিশ পর্যটকদল এখানে এসেছিল। তারা ভোরবেলা আমার বাবার ক্ষতবিক্ষত অচৈতন্য দেহটাকে উদ্ধার করে তাঁকে কায়রো পাঠান। সেখানেই আমি তাঁর বীভৎস দেহটা দেখতে পাই। এ ঘটনার ক'দিন আগেই তিনি বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে তাঁর কাজ শেষ, এবার তিনি বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু তাঁর ফেরা হয়নি।' ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই। দুর্ঘটনার আগের দিন আমি আবুসিম্বল গেছিলাম। ফিরে এসে ঘটনাটা শুনি। তখন তাঁকে কাঁয়রো পাঠানো হয়ে গেছে। অনেক পুরোনো ঘটনা এসব।'

স্মিথ বলল, 'হ্যাঁ, পুরোনো ঘটনা। এবার সরাসরি প্রশ্ন করি, আপনারা কি এখানে দুর্মূল্য কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন? যদি পেয়ে থাকেন, তবে সেটা কী?'

ডক্টর টিউনিস বললেন, 'এই সব প্রাচীন স্থাপত্যের সব কিছুই দুর্মূল্য। দুর্মূল্য বলতে তুমি কি তুতেনখামেনের সমাধির মধ্যে যেমন রত্নপেটিকা পাওয়া গেছিল তেমন কিছু বলছ? না, তেমন কিছু তিনি বা আমি কেউ পাইনি। দেওয়ালের গায়ে সোনার পাত অবশ্য পেয়েছি। তুমি কি এখানে গুপ্তধনের ভাগ নিতে এসেছ?'

'না, গুপ্তধনে আমার আগ্রহ নেই। আমি সত্য সন্ধানে এসেছি। আমার ধারণা আমার বাবা কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন, যা তাঁর মৃত্যু ডেকে আনে। আমার ধারণা আপনি জানেন সেটা কী? হয়তো সেজন্যই সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে এখানে আপনি পড়ে আছেন।'

ডক্টর টিউনিস জানলার বাইরে একবার তাকিয়ে নিয়ে হেসে বললেন, 'আমি সভ্য সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি প্রাচীন মিশর নিয়ে গবেষণার কাজে। তাই এখানে থাকি। কোনো সম্পদ আগলে রাখার জন্য নয়। তাছাড়া গরিব গ্রামবাসীরাও আমার চিকিৎসায় উপকৃত হয়। তবে তোমার কল্পনাশক্তিকে প্রশংসা জানাতে হয়। কিন্তু তোমার এ ধারণা হল কেন?'

স্মিথ বলল, 'ধারণার স্পষ্ট কারণ আছে, কারণ তিনি তাঁর শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন যে আপনারা এখানে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছেন যা তুতেনখামেনের সমাধি মন্দির আবিষ্কারের চেয়েও চমকপ্রদ। যা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। সেটা কী তিনি অবশ্য বলেননি। সেটাই আমি জানতে চাই আপনার কাছে। আর মৃত্যুর আগে একবার চোখ মেলে তিনি ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, 'থথের মন্দির!' এ মন্দিরে কী পেয়েছিলেন আপনারা?'

থামের আড়াল থেকে বিস্মিতভাবে দুজনের কথোপকথন শুনতে লাগল সুদীপ্তরা। ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, 'তোমায় তো বললাম, আমার এসব ব্যাপারে কিছু জানা নেই। হয়তো তিনি জানতেন, আমাকে জানাননি। আমি মিথ্যা বলি না। আর কিছু প্রশ্ন থাকলে তাড়াতাড়ি বলো, আমায় আর বিরক্ত করো না।' এই বলে তিনি আবার জানলার দিকে তাকালেন। সম্ভবত তিনি মোগাবোর প্রতীক্ষা করছেন।

স্মিথ হেসে বলল, 'ও আপনি মিথ্যা বলেন না? একটু আগেই তো আপনি জলজ্যান্ত একটা মিথ্যা বললেন। আপনার বাড়ির অতিথি দুজন ফিরে যাননি। তাঁদের এক পুরোনো মন্দিরের নীচে আটকে রেখেছেন।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টিউনিসের মুখে যেন চাবুক পড়ল। মশালের আলোতে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। স্মিথ এবার ঘুরতে শুরু করেছে ঘরের মধ্যে। ডক্টর টিউনিস বললেন, 'ওরা প্রাচীন প্রত্নবস্তু চুরি করতে এসেছিল। তাই আটক করেছি। কাল পুলিশে খবর দেব।'

স্মিথ ছোট্ট জবাব দিল, 'এটাও মিথ্যা কথা। আপনি ওদের নিয়ে কী করবেন বলুন তো?'

ঘরটাতে ঘুরতে ঘুরতে স্মিথ তখন চলে এসেছে দেওয়ালের কাছে সেই টেবিলগুলোর সামনে। হঠাৎ সে এরপর সেই সবুজ চাদর দিয়ে ঢাকা দেওয়া জিনিসটা সরিয়ে ফেলে বিস্মিতভাবে বলে উঠল, 'আরে এ যে সিংহীর দেহ! নিশ্চয়ই যেটা ক'দিন আগে মারা গেছিল সেটার দেহ! যার সঙ্গী সিংহটা এখন নগরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা নিয়ে কী করছেন আপনি?'

ডক্টর টিউনিস জবাব দিলেন, 'তুমি হয়তো জান আমি শল্য-চিকিৎসার অধ্যাপক

ছিলাম। অ্যানাটমি নিয়ে আগ্রহ আছে আমার। দেহটা তুলে আনার মধ্যে অন্যায় আছে নাকি?' এবার মৃদু ব্যঙ্গের সুর ডক্টর টিউনিসের গলাতেও ফুটে উঠল।

স্মিথ ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বলল, 'আমি জানি, আপনি আর আমার বাবা দুজনেই শল্যবিদ ছিলেন। ওটা ছিল আপনাদের পেশা, আর মিশর নিয়ে গবেষণা ছিল নেশা। দুটোতেই সফল ছিলেন আপনারা। প্রাচীন মিশরীয়রা শল্যবিদ্যা, শরীরবিদ্যায় অনেক উন্নত ছিলেন। আচ্ছা, এমনকী কিছু আপনারা খুঁজে পেয়েছিলেন যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত? এ ঘরটা দেখে আমার তেমনই মনে হচ্ছে।'

এরপর সে কাছেই একটা পাত্রর থেকে কয়েকটা সার্জিকাল ক্যালপল বা শল্যচিকিৎসার ছুরি উঠিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে ছবির পুরোহিতদের হাতে ধরা অস্ত্রগুলোর সঙ্গে এ জিনিসের খুব মিল তো! আর এই বেদিগুলো দেখেও মনে হচ্ছে এ ঘরটা সম্ভবত অপারেশন থিয়েটার ছিল। দেবী থথের এই মন্দিরেই তো বিজ্ঞানচর্চা হত তাই না? যে গোপন বিদ্যাকে লোকে ভাবত জাদুবিদ্যা।'

সুদীপ্তরা বিস্মিতভাবে আড়াল থেকে সব দেখে যাচ্ছে। হুইল চেয়ারে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন ডক্টর টিউনিস। তবে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্মিথের দিকে নিবদ্ধ। স্মিথ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের আনাচে-কানাচে। কিছুক্ষণের জন্য একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা স্মিথ এরপর বলল, 'আমার একটা অনুমান হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে। আপনি বলুন কিসের সন্ধান পেয়েছিলেন আপনারা?'

ডক্টর টিউনিস এবার বেশ রুক্ষস্বরে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা আমার নেই। তুমি এখান থেকে যাও।'

স্মিথও বেশ উত্তেজিতভাবে বলল, 'ব্যাপারটা যতক্ষণ না জানব ততক্ষণ যাব না।'

টিউনিস এবার বললেন, 'যদি না বলি তবে কী করবে?'

স্মিথ বলে উঠল, 'আমার ধারণা, আমার বাবাকে সিংহ মারেনি। কারণ, তাহলে সে তাঁকে খেয়ে নিত। অচৈতন্য অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তাঁকে ফেলে রেখে যেত না। ঘটনাচক্রে ব্রিটিশরা তাঁকে দেখে। সিংহর আক্রমণ আসলে সাজানো ঘটনা। আমার বাবার হত্যারহস্য আপনি জানেন। হয়তো বা আপনিই...।'

তার কথার জবাব না দিয়ে ডক্টর টিউনিস জানলার বাইরে তাকালেন।

উত্তর না পেয়ে স্মিথ বলল, 'বাইরে তাকিয়ে লাভ নেই। মোগাবো এখন আসবে না। সে এখন পাতালঘরে ক্লোরোফর্মের প্রভাবে ঘুমুচ্ছে। বলুন বলুন, কী খুঁজে পেয়েছিলেন আপনারা? উত্তর না দিয়ে রাইফেলের নলে কথা বলাব।'

তার কথা শুনে দপ করে জ্বলে উঠল ডক্টর টিউনিসের চোখ। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, জানতে যখন চাইছ শোনো। এই মন্দিরে আমরা দেওয়ালগাত্রে কিছু ছবিতে খুঁজে পেয়েছিলাম মানুষকে সিংহ বানাবার কৌশল। হাজার হাজার বছর ধরে যে গুপ্তবিদ্যা মিশরীয় পুরোহিতরা গোপন রেখেছিলেন বাইরের পৃথিবীর কাছে। কোনো কল্পনা নয়, তারা একসময় সত্যি ছিল। এই নগরীর অতন্দ্র প্রহরী ছিল তারা।'

স্মিথ বলল, 'আমি এমনই কিছু আন্দাজ করেছিলাম। সিংহীর দেহটা এখানে এনেছেন কেন? ওই ভদ্রলোক দুজনকেই বা আটকে রেখেছেন কেন?'

একটা অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল ডক্টর টিউনিসের মুখে। সুদীপ্ত স্পষ্ট শুনল তিনি স্মিথকে বললেন, 'সিংহমানুষ বানাব বলে।' স্মিথ বিস্মিত ভাবে বলে উঠল, 'সিংহ-মানুষ বানাবেন বলে! পাগলের কল্পনা এটা। এবার বলুন, আমার বাবাকে মরতে হল কেন?'

ডক্টর টিউনিস হিসহিস করে বললেন, 'এটাও তবে তোমাকে জানাই। জানাচ্ছি তোমার বন্দুকের ভয়ে নয়। সিংহ মারার চেয়ে মানুষ খুন করা অনেক কঠিন কাজ। তুমি মানুষ খুন করতে পারবে না। জানাচ্ছি তোমারও আয়ু শেষ হয়ে আসছে বলে। তোমার বাবাকে মরতে হয়েছিল কারণ তিনি কাজ অসম্পূর্ণ করে চলে যাচ্ছিলেন বলে। আর হ্যাঁ, তোমার বাবাকে আমিই মেরেছি। তবে তাতে আমার কোনো অনুশোচনা নেই। বিজ্ঞানের স্বার্থে ব্যাপারটার গোপনীয়তা রাখতে কাজটা করেছি।'

কথাটা শুনেই উত্তেজনায় রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল স্মিথ। বাবার হত্যাকারীর সামনে সে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো অন্য কেউ হলে এ কথা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি চালিয়ে দিত। কিন্তু সত্যিই সিংহর চেয়ে মানুষ মারা অনেক শক্ত কাজ। স্মিথ গুলি চালাতে না পেরে রাইফেলের নল ধরে তার কুঁদোটাকে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরে ঘরের প্রান্ত থেকে ডক্টর টিউনিসের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে চিৎকার করে বলল, 'শয়তান, তোমাকে আমি ছাড়ব না, কী এমন কাজ তিনি অর্ধসমাপ্ত রেখে যাচ্ছিলেন? কী এমন গোপন ব্যাপার যার জন্য তাঁকে খুন করা হল?'

দুর্বোধ্য হাসি ডক্টর টিউনিসের ঠোঁটের কোণে। শীতল কণ্ঠে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মৃত্যুর আগে সে সত্যটা অবশ্যই জেনে যাবে তুমি।'

এই বলে তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হুইল চেয়ারটাকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিলেন। তারপর এক ঝটকায় তাঁর সাদা আলখাল্লাটা মাথার ওপর দিয়ে খুলে দূরে ছুড়ে ফেললেন। সম্পূর্ণ নিরাবরণ তাঁর দেহ। কোনো অন্তর্বাস নেই। বৃষস্কন্ধ, আজানুলম্বিত পেশিবহুল হাত, কপাটের মতো চওড়া বুক। কিন্তু তাঁর কোমরের নীচ থেকে সম্পূর্ণ অংশটা রোমশ বাদামি বর্ণের সিংহর দেহ। মশালের আলোতে তাঁর পায়ের থাবাতে উঁকি দিচ্ছে বাঁকানো ছুরির মতো তীক্ষ্ণ নখর! পিছন থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা লেজের শেষ প্রান্তের কালো চুলের গুছিটা চাবুকের মতো মৃদু মৃদু আছড়াচ্ছে মেঝের ওপর! সিংহ-মানুষ!!!

স্মিথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সুদীপ্তরাও নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি সিংহ-মানুষ! এ-ও কী সম্ভব!

আগুনের আভা এসে পড়েছে ডক্টর টিউনিসের মুখে। জিঘাংসা ফুটে উঠেছে সে মুখে। রক্তলোলুপ কোনো হিংস্র প্রাণীর মুখ যেন! শ্বাপদের চোখ যেন তাকিয়ে আছে স্মিথের দিকে। চোখ নয়, যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।

টিউনিস স্মিথের উদ্দেশে বললেন, 'আমাকে নিয়ে আর কাজ করতে রাজি ছিল না স্মল। যদিও সে এটুকু কাজও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করেছিল। বাজারে অনেক ধার ছিল তার, আমি সেটা শোধ দেব বলে। আরও দুটো থাবা থাকলে সুবিধা হত আমার। পৃথিবীকে আমি বুঝিয়ে দিতাম সিংহ-মানুষ কল্পনা ছিল না। ফিংস বাস্তব। অনেকে আমাকে ইজিপ্টোম্যানিয়াক বলে। সম্পূর্ণ সিংহ-মানুষ বানিয়ে আমি তাদের বুঝিয়ে দেব আমি পাগল নই, তারা মূর্খ। নিজে নিজের গায়ে তো আর ছুরি-কাঁচি চালানো যায় না। যে দুজনকে আটকে রেখেছি তাদের একজনকে সিংহ-মানুষ বানাব। সব জানা হল তোমার, এবার মরবার জন্য প্রস্তুত হও।' এই বলে প্রথমে তিনি ছাদের দিকে মুখ তুললেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল এক রক্ত জল করা শব্দ—'আ-উ-উ-ং-হ-ন্-ন্!' সিংহর ডাক!

সিংহ-মানুষ এগোতে লাগল স্মিথের দিকে। তার লেজটা আছড়াতে লাগল মেঝের ওপর। সপাৎ সপ্! এতটাই হতভম্ব যে সে রাইফেলের ব্যবহারও ভুলে গেছে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে সে। এক পা-এক পা করে এগোচ্ছে সিংহ-মানুষ। তার থাবার নখগুলো রক্তের স্বাদ পাবার জন্য থাবা থেকে ঢুকছে-বেরোচ্ছে। লেজ আছড়ানোর শব্দ উঠছে—সপাৎ-সপ্, সপাৎ-সপ্!

আর দেরি করা উচিত হবে না। থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে হেরম্যান আর সুদীপ্ত সোজা ছুটল ঘরের ভিতর। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সিংহ-মানুষ ঝাঁপ দিল স্মিথের ওপর। জড়াজড়ি করে মাটিতে ছিটকে পড়ল দুজনেই।

হেরম্যানের হাতে রাইফেল থাকলেও গুলি চালানো যাচ্ছে না। সে গুলি স্মিথের গায়ে লাগতে পারে। দুজনেই দুজনের গলা চেপে ধরেছে। স্মিথের রাইফেল ছিটকে সেই অবস্থাতেই দুটো গুলি বেরিয়ে দেওয়ালে গিয়ে লাগল। সারা ঘর কেঁপে উঠল সেই শব্দে। তার আঘাতে খসে পড়ল দেওয়ালে আঁকা দেবী থথের হাতের ছড়ির সোনার পাত। স্মিথ আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে সিংহ-মানুষের পায়ের থাবার আঘাত এড়াবার জন্য। সে সেটা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে স্মিথের পেটে। ইতিমধ্যেই তার আঘাতে স্মিথের উরু লাল হয়ে উঠেছে। মরণপণ লড়াই চালাচ্ছে তারা। মাঝে মাঝে সিংহ-মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরোচ্ছে রক্ত জল করা গর্জন—'হ-ন্-ন্-ন্!' কেঁপে উঠছে সারা ঘর। লড়তে লড়তে ঘরের এদিক থেকে ওদিক গড়িয়ে যাচ্ছে দুজন। তছনছ হয়ে যাচ্ছে ঘরের সবকিছু। দুটো আগুনের কড়াই মেঝেতে ছিটকে পড়ল, টিউনিসের হুইল চেয়ারটা রোলার স্কেটের মতো গড়িয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেল। উল্টে গেল সেই তরলপূর্ণ ফুটন্ত পাত্রটা! সিংহ-মানুষকে লক্ষ করে গুলি চালানো যাচ্ছে না দেখে হেরম্যান তাকে ভয় দেখাবার জন্য মাথার ওপর দুটো গুলি চালালেন। আবারও প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল

ঘর। এবার সুদীপ্ত আর হেরম্যানের উপস্থিতি টের পেল সিংহ-মানুষ। স্মিথকে ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ সে স্প্রিং-এর মতো উঠে দাঁড়াল। তারপর জান্তব লাফে অন্তত পনেরো ফুট জায়গা অতিক্রম করে থাবা উঁচিয়ে লাফ দিল হেরম্যানের দিকে। হেরম্যানের রাইফেলের দুটো ব্যারেলই ফাঁকা। সেই নখরের আঘাত তিনি বাঁচালেন ঠিকই কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লেন একটা স্তম্ভের গায়ে। সজোরে পাথরে ঠুকে গেল তাঁর মাথা। চেতনা হারালেন তিনি। কিন্তু সিংহ-মানুষ নিজেও টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে ছিটকে পড়েছিল। সে একবার দেখে নিল মাটিতে পড়ে থাকা হেরম্যান আর স্মিথকে। হেরম্যান অচৈতন্য, আর স্মিথ ওঠার চেষ্টা করেও পারছে না। তার দেহের নীচের অংশ রক্তাক্ত। সিংহর থাবা বসে গেছে তার উরুতে। তাদের দুজনকে দেখে আবার একটা উল্লাসধ্বনি করল সিংহ-মানুষ—'আ-হ-ন্-ন্-ন্!' যেন যুদ্ধ জয়ের উল্লাস। সিংহ-মানুষ এরপর উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সুদীপ্তর ওপর। শেষ শত্রু নিপাত করলেই কেল্লাফতে। সুদীপ্তকে মারতে পারলে আহত অন্য দুজনকে এরপর খুন করতে সিংহ-মানুষের বেশি সময় লাগবে না। সুদীপ্তও ছুরি হাতে প্রস্তুত হল শেষ লড়াইয়ের জন্য।

সুদীপ্তর হাতে ছুরিটা দেখেই হয়তো অন্যবারের মতো সিংহ-মানুষ ঝাঁপাল না তার ওপর। দুজনে দুজনের কাছে এগিয়ে এসে বক্সিং রিং-এ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পরকে আঘাত করার জন্য পাক খায় তেমন পাক খেতে লাগল। কখনো কেউ এক-পা এগোচ্ছে, অন্যজন এক-পা পিছোচ্ছে, এমনভাবে তারা ঘুরতে লাগল ঘরের মধ্যে। কোনো সময় সিংহ-মানুষ তার নখরযুক্ত থাবা চালাচ্ছে সুদীপ্তকে লক্ষ করে, কখনো বা সুদীপ্ত ছুরি চালাচ্ছে সিংহ-মানুষের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নখের আঘাত বা ছুরির ফলা হাওয়া কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, কারো দেহ স্পর্শ করছে না। হঠাৎ কৌশল বদলে সিংহ-মানুষ বেশ কাছে এগিয়ে এল। সুদীপ্ত ভেবেছিল সে পা চালাবে, তার বদলে সে তার লেজটা চাবুকের মতো চালাল সুদীপ্তর ছুরি ধরা হাত লক্ষ করে। সুদীপ্তও ছুরি চালাল। সিংহ-মানুষের লেজের ডগার চুলটা শূন্যে উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। সেটা দেখে মুহূর্তের জন্য যেন হতভম্ব হয়ে গেল সিংহ-মানুষ। প্রচণ্ড আক্রোশে সে চিৎকার করে উঠল—'উং-হ-ন্-ন্-ন্!' তাদের সামনেই একটা স্তম্ভের ওপর একটা ছোট আনুবিসের মাথা বসানো ছিল। আসুরিক শক্তির অধিকারী সিংহ-মানুষ সেটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল সুদীপ্তকে। সে আঘাতটা সুদীপ্ত পুরোপুরি এড়াতে পারল না। ছুরিটা পড়ে গেল হাত থেকে, আর সে নিজে ছিটকে পড়ল জানলার কাছে মেঝেতে। তার দিকে তীক্ষ্ণ নখর উঁচিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল সিংহ-মানুষ। আগুনের আভায় সিংহ-মানুষের মুখটা বীভৎস লাগছে। নিরস্ত্র সুদীপ্তর দিকে এগিয়ে আসছে সে! স্মিথ একবার চিৎকার করল, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না সিংহ-মানুষ। সুদীপ্ত চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারল না।

আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই সিংহ-মানুষের নখরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সুদীপ্তর

শরীর। শেষ আঘাত হানার আগে মুহূর্তের জন্য একবার থমকে দাঁড়াল সিংহ-মানুষ। হাত দুটোকে মাথার ওপর দু'পাশে তুলে ধরে বিজয়ীর ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল, 'আ-উ-উ-ং, হ-ন্-ন্।'

ঠিক সেই সময় আর একটা শব্দ হল—'হ-ন্-ন্-ন্।' সিংহ-মানুষের ডাকটাই প্রতিধ্বনিত হল কিনা বুঝতে পারল না সুদীপ্ত, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই একটা সোনালি বিদ্যুৎ যেন পিছন থেকে সুদীপ্তর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ডক্টর টিউনিসের ওপর পড়ল। বিশালবপু কালো কেশরঅলা এক সাহারার সিংহ কামড়ে ধরেছে তার ঘাড়! সিংহ যেমন শিকার ধরে ঠিক তেমনভাবে। সিংহ-মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে পারল না সেই মরণ কামড় থেকে। মট্ করে একটা শব্দ হল। মনে হয় সেটা ঘাড় ভাঙার শব্দ। কয়েক মুহূর্ত সময় মাত্র। তারপর সিংহ তার শিকারকে তুলে নিয়ে যে পথে সে ভিতরে ঢুকেছিল সেই খোলা জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরো ঘটনাটাতে ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল সুদীপ্তর। ততক্ষণে হেরম্যানের সংজ্ঞা ফিরেছে। তিনিও শেষ ঘটনাটা দেখেছেন। সুদীপ্ত উঠে দাঁড়াল এরপর। সে আর হেরম্যান স্মিথের কাছে গিয়ে তার পরিচর্যা শুরু করল। জামা ছিঁড়ে বেঁধে দিল তার ক্ষতস্থানে। স্মিথও একসময় উঠে দাঁড়াল। তারপর সুদীপ্তদের বলল, সবই তো শুনলেন, জানলেন, দেখলেন। নতুন করে তেমন কিছু বলার নেই। আমার অনুমান সিংহর থাবাসুদ্ধ চামড়া মানুষের দেহে শল্য-চিকিৎসার মাধ্যমে বসানো হত। তবে যা আমরা দেখলাম পৃথিবীর কেউ তা বিশ্বাস করবে না। তবে হই বলে ওই ছেলেটাকে মরতে হল। কারণ ডক্টর টিউনিস হয়তো ধারণা করেছিলেন যে ছেলেটা তাঁকে চিনে থাকতে পারে। তাই শেয়ালের ডাক ডেকে বাইরে এনে তিনি তাকে মারলেন। আর যারা মারা গেছে তাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল সম্ভবত।'

হেরম্যান বললেন, লোকটাকে কী বলা যায় বলো তো? খুনি? না বিজ্ঞানসাধক? না পাগল?'

সুদীপ্ত একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল—'সিংহ-মানুষ!'

ঠিক সেই সময় বাইরে দূর থেকে ভেসে এল সিংহর ডাক—'আ-উ-ং-হ-ন্-ন্!'

বেদির ওপর রাখা সিংহীর মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে স্মিথ বলল, 'সাথীহারা সিংহটা শেষ পর্যন্ত প্রতিশোধ নিল। আমাদের অনুসরণ করে সম্ভবত সে এ পর্যন্ত এসেছিল। তারপর...।'

আবার বাইরে থেকে সিংহর ডাক ভেসে এল। এবার কিছুটা অস্পষ্ট। স্মিথ বলল, 'সিংহ তার শিকার নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। কাল সকালে ডক্টর টিউনিসের খোঁজে একবার সন্ধান চালাব, তবে তাঁর জীবিত থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আপাতত রাত্রিটা এখানেই কাটাতে হবে।'

অন্ধকার কেটে গেল একসময়। সুদীপ্তরা যখন থথ মন্দিরের বাইরে পা রাখল তখন দিনের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ছে হাজার বছরের এই প্রাচীন নগরীর মন্দির, স্তম্ভ,

মূর্তিগুলোর গায়ে। ভোরের বাতাস দোলা দিচ্ছে ঘাসবনে। জেগে উঠছে পৃথিবী। সুদীপ্তর মনে হল গতকাল রাতের ঘটনা নেহাতই যেন দুঃস্বপ্ন! অমন ঘটনা হতে পারে না। ওই যে দণ্ডায়মান ফিংসের মূর্তিগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলো সবই প্রাচীন মিশরীয়দের কল্পনা মাত্র।

থথের মায়ামন্দির থেকে তারা রওনা হল শেবা মন্দিরের দিকে। সেখানে পৌঁছে তারা দেখতে পেল উল্টোদিক থেকে গ্রামবাসীদের একটা বড় দল তির-ধনুক, বর্শা এসব নিয়ে আসছে। গতরাতে অনেকবার গুলির শব্দ শুনেছে তারা। হেরম্যান-সুদীপ্ত-টিউনিস-মোগাবো কারো খোঁজ না পেয়ে তারা নগরীর ভিতরে ঢুকেছে ব্যাপারটা অনুসন্ধানের জন্য। তাদের নিয়ে সুদীপ্তরা প্রথমে গেল সেই জায়গাতে, যেখানে মোগাবো ছিল। তাকে তোলা হল ঠিকই, কিন্তু তার জ্ঞান তখনও ফেরেনি। তাকে কিছু লোকের জিম্মায় রেখে বাকিদের নিয়ে সুদীপ্তরা ডক্টর টিউনিসের খোঁজ শুরু করল।

ঘাসবনের এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে দেবী থথের একটা মূর্তি। জাদুর দেবী থথ, বিজ্ঞানের দেবী থথ, রহস্যের দেবী থথ! সুদীপ্তর মনে হল ভোরের আলোতে সারা পৃথিবী প্রাণ পেলেও কেমন যেন বিষণ্ণ লাগছে এই প্রাচীন মূর্তিটাকে। ঠোঁট নীচু করে ম্রিয়মাণভাবে মাটির দিকে চেয়ে আছেন জ্ঞানের দেবী থথ।

সেই মূর্তির পায়ের নীচে কী যেন একটা রয়েছে দেখতে পেয়ে সেখানে এগিয়ে গেল সবাই। না, সেখানে ডক্টর টিউনিসকে দেখতে পেল না গ্রামবাসীরা। সেখানে পড়ে আছে কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত সিংহর অর্ধেক দেহ। ওপরের অংশটা কোনো প্রাণী খেয়ে গেছে। সিংহই হবে হয়তো। বেশ অবাক হল গ্রামবাসীরা। সিংহ কি সিংহর মাংস খায়?

সুদীপ্তদের এবার চোখ পড়ল সিংহর লেজের দিকে। তার লেজের শেষ প্রান্তটা কাটা!

অক্টোপাসের
লাল মুক্তো
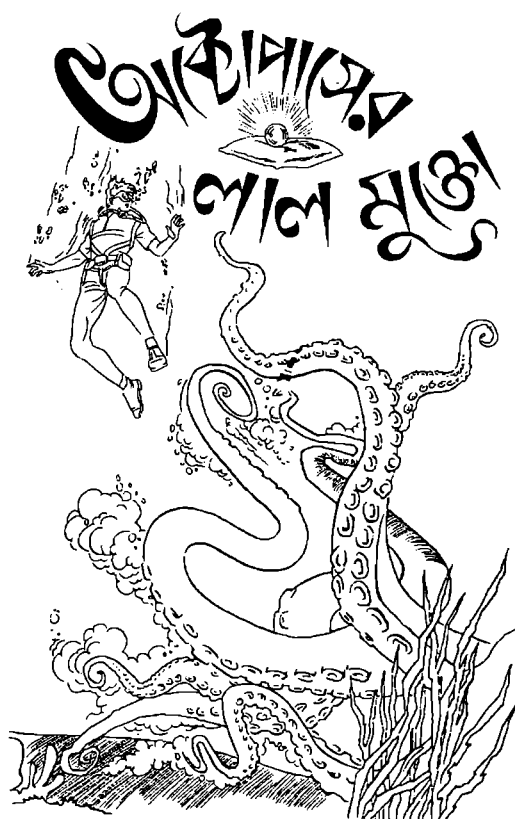
মারমেড সৈকতে একটা কফিশপে বসে কথাবার্তা চলছিল। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের সমুদ্রতট অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নীল আকাশের নীচে অপার অসীম জলরাশি। ছোট ছোট ঢেউ এসে ভাঙছে বেলাভূমিতে। পর্যটকরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সমুদ্রস্নান বা সূর্যস্নান করছে। সৈকতের যে-পাশে পাহাড় এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে তার মাথার ওপরের আকাশে একঝাঁক গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে।

খোলা জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে মিস্টার আকিরা বললেন, 'ওই অতল জলরাশির নীচ থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তো সংগ্রহ করে আনি আমরা। জানবেন, আমরা জাপানিরা এ কাজে সবচেয়ে দক্ষ। বিভিন্ন রত্নর মধ্যে মুক্তো সংগ্রহই সব থেকে কঠিন কাজ। প্রচণ্ড চাপ থাকে জলের নীচে। বাইরে থেকে দেহের ওপর জলের প্রচণ্ড চাপ আর অক্সিজেনের অভাবে দেহের ভিতর ফুসফুসের ওপর চাপ দেহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে কারণে মুক্তোসংগ্রহকারী ডুবুরিরা বেশিদিন বাঁচে না। প্রচণ্ড জলের চাপের জন্য ডুবুরিরা দু-মিনিটের বেশি জলের নীচে থাকতে পারে না। ওই সময়ের মধ্যে সঙ্গের ঝুড়িতে যতগুলো সম্ভব 'মাদার অব পার্ল' বা ঝিনুক সংগ্রহ করে ভেসে উঠতে হয়। তারপর তিন মিনিটের বিশ্রাম নিয়ে আবার ডুব। এভাবে প্রতিদিন দুঘণ্টা কাজ করতে হয়। অন্য জাতের ডুবুরিরা এ কাজ একটানা সাতদিনের বেশি করতে পারে না। কিন্তু আমরা জাপানিরা মাসের পর মাস এ কাজ করি। জাপান, সিংহল, পারস্য অর্থাৎ ইরাকের বসরা আর এই অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র থেকেই সবচেয়ে বেশি মুক্তো সংগ্রহ করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার মুক্তো সংগ্রহকারী ডুবুরিদের সত্তর শতাংশই কিন্তু জাপানি।'

সুদীপ্ত বলল, 'সব শুক্তিতেই তো মুক্তো পাওয়া যায় না। তাই না?'

আকিরা বললেন, 'ঠিক তাই। ঝিনুক নিয়ে ফিরে আসার পর তার অর্ধেক অংশ সরকারকে দিতে হয়। তারপর যে যার অংশ ভেঙে দেখে তার মধ্যে মুক্তো আছে কিনা। কোনো সময় হয়তো একশো ঝিনুক ভেঙে কিছুই মিলল না, আবার কেউ হয়তো পেয়ে গেল কোনো দুষ্প্রাপ্য মুক্তো। একটা মুক্তো বেচেই ভাগ্য ফিরে গেল তার। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে পায়রার ডিমের মতো একটা মুক্তো ছিল। পোর্তুগালের রাজকোষে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুক্তো রাখা আছে। আকারে সেটা পেয়ারার মতো। মিশর সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা নীল মুক্তোর মালা পরতেন। ওসব মুক্তোর দাম কোটি কোটি টাকা। তবে সাধারণ মানুষেরও তো মুক্তোর প্রতি আকাঙ্ক্ষা আছে। তার দামও কম নয়। নিজেদের পেট চালাতে মূলত তাদের জন্যই মুক্তো সংগ্রহ করি আমরা।'

এরপর একটু থেমে আকিরা বললেন, 'এবার আপনাদের বলি সে ঘটনার কথা। যে ঘটনা আপনারা সংবাদমাধ্যমে জেনে এত দূর ছুটে এসেছেন, আমার সঙ্গে সে জায়গাতে যেতে চাচ্ছেন।'

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন হেরম্যান।

আকিরা বলতে শুরু করলেন, 'ঘটনাটা যে জায়গার সেটা এই সমুদ্রতট থেকে প্রায় দশ নটিকাল মাইল দূরে এক জায়গা। জলের নীচে বেশ কিছু ডুবো পাহাড় আছে সেখানে। সমুদ্রের নীচে বেশ কিছু গুহাও আছে যেখানে বিচিত্র সব সামুদ্রিক প্রাণীদের বাস। সাধারণত অত দূরে মুক্তো আহরণে যাই না আমরা। একটা সময় ছিল যখন যে যেখান থেকে খুশি মুক্তো সংগ্রহ করতে পারত। এমনকী জাপানি ধীবররাও জাপান থেকে জলপথে অস্ট্রেলীয় জলসীমায় মুক্তো সংগ্রহ করত। কিন্তু এখন সময় বদলেছে, আইন বদলেছে। সরকার ঠিক করে দেয় কে কোথায় মুক্তো সংগ্রহ করবে। এবং তার জন্য আবেদন করতে হয়। এ মরশুমে আমি যখন ঝিনুক সংগ্রহের জন্য প্রথমবার আবেদন করলাম তখন ভুলবশত ফর্মের একটা নির্দিষ্ট জায়গা পূরণ না করার জন্য সেটা বাতিল হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার যখন নতুনভাবে আবেদন করলাম তখন ওই নির্দিষ্ট দূরবর্তী জায়গাটা ছাড়া কাছাকাছি সব জায়গা সরকার অন্য লোকদের ইজারা দিয়ে দিয়েছেন। ও জায়গাটা পড়েছিল দুটো কারণে। প্রথমত, জায়গাটা গভীর সমুদ্রে। জলের চাপ প্রচণ্ড। দক্ষ ডুবুরি ছাড়া কাজ করা মুশকিল। আর দ্বিতীয়ত, ওই জায়গাটা নিয়ে অপবাদ আছে। বেশ কয়েকবার ওখানে মুক্তো সংগ্রহকারীরা গিয়ে আর সেখান থেকে ফিরে আসেনি। এ ব্যাপারে যদিও সরকারপক্ষ দাবি করেন যে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেসব ক্ষেত্রে ধীবর ডুবুরিদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার পাশাপাশি অন্য একটা ব্যাপারও লোকমুখে প্রচলিত। প্রাচীন ধীবররা বলে ওখানে নাকি জলদানব আছে। যে শুঁড় দিয়ে নৌকাকে জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়। জেলেদের জলে ডুবিয়ে মারে। শিক্ষিত লোকেরা অবশ্য এ সব বিশ্বাস করেন না...'

হেরম্যান তাঁর কথার মাঝেই বললেন, 'হ্যাঁ, তারা বিশ্বাস না করলেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নাবিকরা কিন্তু ওই দানবীয় অক্টোপাস বা জলদানবের কাহিনি বলে আসছেন অন্তত পাঁচশো বছর ধরে। বহু সমুদ্র অভিযাত্রীও তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। জলদস্যু ফ্রান্সিস ড্রেক নাকি ওই প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। কলম্বাস নাকি তাঁর সমুদ্র অভিযানে দূর থেকে জলের ওপর ভেসে উঠতে দেখেছিলেন ওই প্রাণীকে! লন্ডনের জাদুঘরে কোনো অজানা নাবিকের আঁকা সাতশো বছরের প্রাচীন পার্চমেন্ট আছে। যাতে আঁকা আছে বিশাল আকৃতির এক অক্টোপাস জল থেকে উঠে মাঝি-মাল্লা সমেত গোটা জাহাজকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে জলে ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছে। ভয়ংকর কুৎসিত সেই প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করছে আতঙ্কিত নাবিকরা। ফরাসি মিউজিয়ামে রক্ষিত পাঁচশো বছরের প্রাচীন একটা লিথোগ্রাফেও একই ধরনের ছবি আছে। এ সবই কি নিছক কল্পনা?'

সুদীপ্ত বলল, 'অক্টোপাসের জাতভাই দানব স্কুইডের অস্তিত্বও এই সেদিন পর্যন্ত বিশ্বাস

করতেন না অনেক জীববিজ্ঞানী। অশিক্ষিত মাল্লাদের গল্পকথা ভেবে ব্যাপারটা তাঁরা উড়িয়ে দিতেন। আমরা ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্ট, অর্থাৎ যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রূপকথা, উপকথা বা যেসব প্রাণী বহুযুগ আগে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলা হয় তাদের খোঁজ করি, আমরা কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে ওই প্রাণীর খোঁজ চালাচ্ছিলাম। অবশেষে সন্ধান মিলল। মাত্র বছরখানেক আগে আপনাদের জাপানি জীববিজ্ঞানীদের দল প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে গিয়ে জায়েন্ট স্কুইডের মুভি ফোটোগ্রাফ তুলে এনেছেন। জাহাজ ডোবাতে না পারলেও সেই বিশাল প্রাণী তার শুঁড় দিয়ে ছোটখাট নৌকা ডুবিয়ে দিতে পারে।'

হেরম্যান আর সুদীপ্তর কথা শুনে আকিরা প্রশংসার দৃষ্টিতে প্রথমে বললেন, 'এত কথা আমার জানা ছিল না।' তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'যাই হোক, ওই দানোর ব্যাপারে আমার তেমন বিশ্বাস ছিল না। দূরবর্তী সমুদ্রে কাজ করতে যাওয়া যেমন অসুবিধার তেমন আবার সুবিধাও আছে। অন্য নৌকা যায় না বলে সেখানে নির্বিঘ্নে কাজ করা যায়। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি ওখানেই ঝিনুক আনতে যাব। সেই মতো তিনমাস আগে আমি প্রথমবারের জন্য আমার যন্ত্রচালিত ছোট বোটটা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। ছজনের দল। আমি, তিনজন ডুবুরি, বোটের চালক আর তার সহকারী। আমরা চারজন জাপানি। বোটের চালক ও তার সহকারী অস্ট্রেলিয়ান। জায়গাটা ভারী পছন্দ হল আমার। শান্ত নির্মল সমুদ্র। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে নাক উঁচু করে ভেসে আছে ডুবোপাহাড়। দেখেই বুঝলাম সমুদ্রর নীচে সে জায়গাটা শামুক-ঝিনুক-কোরালদের থাকার পক্ষে আদর্শ। বয়স হবার কারণে আমি খুব প্রয়োজন না হলে আর জলে নামি না। আমার লোকরাই নামে। প্রথম যে ডুব দিল সেখানে সে ওপরে উঠেই জানাল যে আমার অনুমানই ঠিক। সমুদ্রর তলে গুহামুখগুলোর সামনে কেউ যেন ঝিনুকের বিছানা পেতে রেখেছে। তার ওপর খেলে বেড়ায় নানা রঙের নানা ধরনের মাছের ঝাঁক। কাজ শুরু হল। দুদিন ধরে ডুবুরিরা তুলে আনতে লাগল ঝুড়িভর্তি ঝিনুক। দু-রাত সেখানে কাটিয়ে সেবার বন্দরে ফিরে দেখলাম প্রায় প্রতি তিনটে ঝিনুকের মধ্যে একটাতে মুক্তো আছে! অর্থাৎ ও জায়গাটা মুক্তোর খনি...'

হেরম্যান এবার তাঁর কথার মাঝেই জানতে চাইলেন, 'তবে প্রথম যাত্রায় সেখানে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি?' আকিরা বললেন, 'হয়তো ঘটেছিল কিন্তু তখন আমরা ব্যাপারটাকে আমল দিইনি। প্রথম দিন মাঝরাতে একবার বোটটা প্রচণ্ড জোরে দুলে উঠেছিল মুহূর্তখানেকের জন্য। আমাদের ধারণা হয়েছিল যে জলস্রোত ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঢেউ তোলার কারণে অমন হচ্ছে। আর দ্বিতীয় রাতের পর ভোরবেলা চালকের সহকারী বলেছিল সে নাকি ঘুমের ঘোরে দেখেছে যে হাতির শুঁড়ের মতো বিরাট একটা শুঁড় জানলা দিয়ে তার কেবিনে ঢুকেছে। মাঝ সমুদ্রে হাতি আসবে কীভাবে? ব্যাপারটা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসিও করি।'

এরপর আকিরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললেন, 'এবার বলি সেই ভয়ংকর

ঘটনার কথা। প্রথমবার অত মুক্তো সংগ্রহের ব্যাপারটা আমাদের উৎসাহিত করেছিল। বেশ পয়সা এসেছিল হাতে। কাজেই দিন পনেরো আমোদ-আহ্লাদ করে আমরা আবার দ্বিতীয় দফার মুক্তো সংগ্রহ করার জন্য সে জায়গার উদ্দেশে একই দল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দুপুর নাগাদ সেদিন আমরা সেখানে পৌঁছেছিলাম। একজন ডুবুরি হালচাল পরীক্ষার জন্য জলে নেমেছিল। সে ওপরে উঠে বলল, নীচে সব ঠিকঠাকই আছে। শুধু মাঝের ঝাঁকগুলো আর নেই। ঠিক হল পরদিন সকাল থেকে ঝিনুক সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। সারাদিন খোশমেজাজেই কাটল আমাদের। সমুদ্রর বুকে সন্ধ্যা নামল এক সময়। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কেউ যেন প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে বোটটাকে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম সবাই। ঝাঁকুনিটা স্থায়ী হয়েছিল আধ মিনিটেরও কম সময়। তা থামবার পর আমরা লঞ্চের ছোট্ট ডেকে বেরিয়ে সার্চলাইটের আলো ফেললাম চারপাশের সমুদ্রে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না আমাদের। আমরা আবার শুয়ে পড়লাম। সমুদ্রের বুকে সূর্যস্নাত সকালে ঘুম ভাঙল আমাদের। চারপাশের পরিবেশ অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবু কেন জানি না একটা অস্বস্তি হচ্ছিল আমার মনের ভিতর। কাজ শুরু হল এক সময়। তিনজন ডুবুরিই জলে নামল। প্রতিক্ষেপে তারা তুলে আনতে লাগল ঝুড়িভর্তি ঝিনুক। ঘণ্টাখানেক পর একজন ডুবুরি জানাল যে সে আর দম রাখতে পারছে না। ফলে সে ওপরে উঠে এল। অন্য দুজন কাজ করে যেতে লাগল। তখন সম্ভবত বেলা বারোটা মতো হবে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দুজন ডুবুরি সেই মুহূর্তে জলের তলায়। হঠাৎই আমাদের বোটটা প্রচণ্ড জোরে কেঁপে উঠল। যেন জলের তলায় নোঙরটা ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিল বোটটাকে। কী ঘটল জলের নীচে? ডুবুরিদের কোমরে ঘটল জলের নীচে? ডুবুরিদের কোমরে দড়ি বাঁধা থাকে নৌকার সঙ্গে। আমি দুটো দড়ির একটা ধরে টান দিতেই অনুভব করলাম তার নীচে কোনো ভার অনুভব হচ্ছে না। অর্থাৎ একটা দড়ি খসে গেছে একজন ডুবুরির কোমর থেকে। ঠিক এই মুহূর্তে বোটের চালকের সহকারী চিৎকার করে একটা জিনিসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। বোট থেকে কয়েক হাত তফাতে জলের একটা অংশ লাল হয়ে উঠেছে। আর সেখানে ভেসে উঠেছে ডুবুরির ফ্লিপারসহ হাঁটু থেকে ছিন্ন একটা পা! দেখেই বুঝতে পারলাম যে দড়িতে টান অনুভব হচ্ছে না ওটা সেই ডুবুরির পা। আমি আর বোটের ওপরে থাকা ডুবুরি এরপর দুজন মিলে অন্য দড়িটা ধরে জলের নীচে থাকা অপর ডুবুরিকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হল বোটে। চিৎকার করে উঠল সবাই। অসীম শক্তিধর কেউ যেন নোঙরের শিকল টেনে জলের নীচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বোটসুদ্ধু সবাইকে। একদিকে কাত হতে শুরু করেছে বোট। কোনোরকমে সেই অবস্থার মধ্যে আমরা বোটের ওপর টেনে তুললাম প্রায় অচৈতন্য দ্বিতীয় ডুবুরিকে। জ্ঞান হারাবার আগে সে শুধু বলল, 'পালাও, পালাও, দানো!' বোট ঘিরে জলরাশি তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কেউ যেন তোলপাড় করে ফেলছে জলতল! বোট প্রায় ডুবতে বসেছে!

কালক্ষেপ না করে চালক বোট থেকে ছিন্ন করে দিল নোঙরের শিকল। তারপর কোনোরকমে ইঞ্জিন স্টার্ট করে আমরা সে জায়গা ছেড়ে রওনা দিলাম পাড়ের দিকে...'

একটানা কথাগুলো বলে চোখ বন্ধ করে সেই ভয়ংকর স্মৃতিতে যেন মৃদু কেঁপে উঠলেন আকিরা। তারপর এক চুমুকে কফির পাত্রটা নিঃশেষ করে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সেই ডুবুরিকেও বাঁচাতে পারিনি। কোনো প্রাণীর কঠিন নিষ্পেষণে তার দেহের হাড়গুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছিল। তবে মৃত্যুর আগে কিছু সময়ের জন্য তার একবার জ্ঞান ফিরেছিল। তখন সে সেই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যা বলে তা মোটামুটি এইরকম। আপনাদের আগেই বলেছি যে যেখানে তারা মুক্তো সংগ্রহ করছিল সেখানে ডুবো পাহাড়ের নীচে বেশ কয়েকটা গুহামুখ আছে। একটা বিরাট গুহামুখের সামনে দূর থেকে অনেক ঝিনুক পড়ে আছে দেখে তারা দুজন এগোয় সেদিকে। গুহার পনেরো-কুড়ি ফুট সামনে গিয়ে প্রথমে থামে তারা। সূর্যের আলো জলতল ভেদ করে সেই গুহার মুখে গিয়ে পড়েছিল। ঠিক তখনই তারা লক্ষ করে একটা বিশাল মাথা নড়ছে গুহার ভিতর। আকারে সেটা একটা ছোটখাট হাতির মতো। হিংস্র চোখে সে তাকিয়ে আছে ডুবুরিদের দিকে। বীভৎস প্রাণীটাকে দেখামাত্রই পিছু হটতে যাচ্ছিল তারা দুজন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই হাতির শুঁড়ের মতো মোটা, কিন্তু তার থেকে অনেক লম্বা বেশ কটা শুঁড় মাটি থেকে উঠে আক্রমণ করে ডুবুরি দুজনকে। প্রাণীর মাথাটা গুহার মধ্যে থাকলেও তার বাহু বা শুঁড়গুলো গুহার বাইরে সমুদ্রতলের বালির আড়ালে বিছানো ছিল। ডুবুরিরা তা বুঝতে পারেনি। সেই বীভৎস জলদানবের দুটো বাহু জাপটে ধরে বক্তা ডুবুরিকে। ছোটখাটো প্রাণীদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ডুবুরিদের কোমরে লম্বা ছুরি থাকে। সঙ্গীকে শুঁড়ের নাগপাশ থেকে বাঁচাবার জন্য অপর ডুবুরি তখন তার ছুরি দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে ডুবুরিকে পেঁচিয়ে ধরা সমুদ্রদানবের বাহুতে। তাতে প্রথম ডুবুরি বন্ধনমুক্ত হয় ঠিকই কিন্তু সেই দানবীয় প্রাণীর অন্য বাহুগুলো জাপটে ধরে ছুরি হাতে থাকা ডুবুরিকে। একটা বাহু তার পা ছিঁড়ে নেয় একটানে। সংজ্ঞা হারাবার আগে প্রথম ডুবুরি দেখতে পায় ছিন্ন পা-অলা তার সঙ্গীকে সমুদ্রদানব টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার গুহার দিকে। মরার আগে এ কথাগুলো বলে গেছিল লোকটা।'—তাঁর কথা শেষ করলেন আকিরা।

আকিরার কাহিনি শেষ হবার পর হেরম্যান বললেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওই ভয়ংকর প্রাণীটা কোনো দানবীয় অক্টোপাসই হবে। প্রাচীন নাবিকদের গল্পে, ছবিতে যার বিবরণ আছে। তা আমরা সেখানে যাচ্ছি কবে?'

আকিরা জবাব দিলেন, 'কালকের দিনটা প্রস্তুতির জন্য সময় নেব। পরশু ভোরে রওনা দেব। একটা বড় বোটের ব্যবস্থা করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি আপনারা আর মিস্টার রাইখ না বললে আমি হয়তো আর সেই অভিশপ্ত জায়গাতে যেতাম না।'

'মিস্টার রাইখ কে?' জানতে চাইল সুদীপ্ত।

আকিরা জবাব দিলেন, 'তিনি জন্মসূত্রে জার্মান হলেও কর্মসূত্রে জাপানে থাকেন।

ঝিনুক বিশেষজ্ঞ। তিনি ক'দিন হল এখানে এসেছেন। মুক্তো নিয়ে একটা বইও লিখেছেন।'

স্বজাতির লোকের কথা শুনে হেরম্যান হেসে বললেন, 'আমিও জার্মানির লোক। জার্মানির লোকরা মুক্তো নিয়েও গবেষণা করেন জেনে ভালো লাগল।'

আকিরা প্রত্যুত্তরে বললেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান-জার্মানির হাত মেলাবার পিছনে নাকি হিটলারের মুক্তো-লোভও ছিল। তিনি নাকি ভেবেছিলেন যুদ্ধে জয়ী হবার পর বন্ধু জাপানের সমুদ্র উপকূল ইজারা নেবেন মুক্তো আহরণের জন্য। আর পরাজিত দেশগুলোর উপকূল থেকেও মুক্তো তুলবেন। সে জন্য তিনি একদল লোককে শিক্ষানবিশ ডুবুরি হিসাবে জাপানে পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সে সাধ পূর্ণ হয়নি।' এ কথাগুলো বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আকিরা বললেন, 'আমাকে এবার যেতে হবে। অনেক কাজ বাকি। আজ আর কাল আশেপাশের জায়গাটা ঘুরে দেখে নিন। এখানে কয়েকটা 'সি-পার্ক' আছে। ডুবুরির পোশাক পরিয়ে জলের নীচে দেখানোর ব্যবস্থাও আছে। পারলে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। সবকিছুর প্রাথমিক পাঠ নেওয়া ভালো। কাল আবার দেখা হবে।' এই বলে কফি পাব ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আকিরা।

মিস্টার আকিরা চলে যাবার পর বিকালটা সি-বিচে ঘুরেই কাটিয়ে দিল সুদীপ্তরা। কোনো অভিযানে যাবার আগে একটু হালকা মেজাজে সময় কাটাতে পারলে ভালো। স্নায়ুতন্ত্রের বিশ্রাম হয়, যাতে তারা পরবর্তী সময় অভিযানের কঠিন ধকল সহ্য করতে পারে। সমুদ্রসৈকতে ঘুরতে ঘুরতেই সুদীপ্তদের চোখে পড়েছিল বিরাট বড় হোর্ডিংটা—'শিককু সি-পার্ক।' সেখানে মেরিন অ্যাকোরিয়াম, স্কুবা ডাইভিং ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। হেরম্যান হোর্ডিংটা দেখে বললেন, 'ডুবুরি হবার প্রাথমিক পাঠটা চলো আমরা কাল নিয়ে নেব। ক্রিপটিড খুঁজতে আমরা দুজন এর আগে নানা জায়গাতে গেছি। কখনো সিংহ-মানুষের খোঁজে ইজিপ্টের প্রাচীন মন্দিরে, কখনো ইয়েতির সন্ধানে তুষারাবৃত হিমালয়ে; আবার কখনো বা সবুজ মানুষের খোঁজে পিগমি অধ্যুষিত আফ্রিকার অরণ্য প্রদেশে। কিন্তু সমুদ্রের নীচে কখনো যাবার সুযোগ হয়নি। সে সাধটা পূর্ণ করতে হবে।'

সুদীপ্তও সমর্থন করল তাঁর প্রস্তাব।

সুদীপ্তরা যে হোটেলে রাত্রিবাস করছে সেখান থেকে সমুদ্রের পাড় বরাবর পাঁচ কিলোমিটার দূরে পার্কটা। পরিকল্পনা মতো পরদিন সকালে একটা গাড়ি নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেল তারা। পার্কের প্রবেশমুখে খুব সুন্দর বিশাল একটা তোরণ। তার বাহু দুটোতে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর প্রতিকৃতি বসানো। আর তোরণের মাথায় একটা বিরাট

অক্টোপাসের মূর্তি। সে তার বাহুগুলো দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তোরণের মাথাটা। ভিতরে ঢুকে টিকিট কাটার পর পার্কের গাইড বলল, 'আগে আপনারা নীচে নেমে মেরিন অ্যাকোরিয়াম দেখে নিন। তারপর আপনাদের বোটে করে সমুদ্রতে নিয়ে যাওয়া হবে স্কুবা ডাইভিং-এর জন্য।'

পার্কের বেসমেন্টের ওপর একটা ছোট্ট সামুদ্রিক মিউজিয়াম আছে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের ঝিনুক, শামুক, মাছ ইত্যাদির ফসিল রাখা আছে। আর অ্যাকোরিয়াম হল ভূগর্ভে বা বেসমেন্টের নীচে। মিউজিয়াম দেখে নিয়ে অন্য টুরিস্টদের সঙ্গে দল বেঁধে নীচে নামল সুদীপ্তরা। লম্বা একটা টানেল সোজা চলে গেছে। তার দুপাশে বিরাট ঘরের মতো সার সার অ্যাকোরিয়াম। তাতে খেলে বেড়াচ্ছে নানা ধরনের মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী। কত রঙের বাহার তাদের; কত অদ্ভুত দেখতে! হাতুড়ির মতো মাথাঅলা 'হ্যামার শার্ক', তলোয়ারের মতো মুখঅলা 'সোর্ডফিশ', প্যারাশুটের মতো দেখতে জ্যান্ত জেলিফিশ, রঙবেরঙের ছোট-বড় মাছের ঝাঁক। দুপাশে সেসব দেখতে দেখতে হেঁটে যেতে যেতে সুদীপ্তদের মনে হতে লাগল তারা যেন সমুদ্রের নীচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এক সময় টানেলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল তারা। সেখানে একটা অ্যাকোরিয়ামের সামনে বেশ ভিড়। দুটো বাচ্চা ছেলে ভয় পেয়ে চিৎকার করছে। তাদের বাবা-মায়েরা শান্ত করার চেষ্টা করছে তাদের। ব্যাপারটা কী? সেখানে পৌঁছে সুদীপ্তরাও থমকে গেল। কাচের বিরাট জলাধারের মধ্যে একটা বিশাল অক্টোপাস! কী ভয়ংকর তাকে দেখতে! আকারে সেটা প্রায় পঁচিশ ফুট হবে। ড্যাবড্যাবে চোখে সে তাকিয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে তার বাহুগুলোকে কাচের দেওয়ালের ওপর বোলাচ্ছে সম্ভবত কাচের পর্দা ভেদ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে নিজের কাছে টেনে নেবার জন্য। অক্টোপাসটার কোলের কাছে একটা বাক্স মতো রাখা। সম্ভবত ওই বাক্সে তাকে খাবার দেওয়া হয়। বাচ্চাগুলো সমেত টুরিস্টরা চলে যাবার পর হেরম্যান বললেন, 'প্রাণীটা যদি বাচ্চাগুলোর নাগাল পেত তবে কী ভয়ংকর কাণ্ড ঘটত ভাবো! এর ছবি আমি আগে বইতে দেখেছি। ডলফিনি অক্টোপাস। তিরিশ ফুট পর্যন্ত বড় হয়। মাংসাশী প্রাণী। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়।' সুদীপ্ত হেরম্যানের কথায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই কে যেন বলে উঠল, 'শুধু বাচ্চা নয়, আপনার মতো শক্তসমর্থ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকেও অনায়াসে ও পিষে মারতে পারে। জলের নীচে অসীম শক্তি ওদের।' একটু চমকে উঠে সুদীপ্তরা দেখল সুড়ঙ্গর শেষ মাথায় একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন মাঝবয়সি একজন ভদ্রলোক। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত তিনি জাপানি হবেন। ভদ্রলোক এরপর তাঁর পিছনে দরজাটা বন্ধ করতে করতে সুদীপ্তদের অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আপনারাই তো আকিরার সঙ্গে কাল সমুদ্রে যাচ্ছেন তাই না?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে? আপনার পরিচয়টা?'

ভদ্রলোক দরজার চাবিটা পকেটে পুরে হেসে জবাব দিলেন, 'আকিরা একটা কাজে এসেছিল আমার কাছে। সে বলছিল যে একজন জার্মান আর একজন ভারতীয় তার

মুক্তো খোঁজার সঙ্গী হচ্ছেন। আপনাদের চেহারা দেখে আন্দাজ করলাম যে আপনারা তারাই। আমার নাম শিকোকু। আমি এই "সি-পার্কের" মালিক।'

হেরম্যান-সুদীপ্ত তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে নিজেদের নাম-পরিচয় দেবার পর হেরম্যান বললেন, 'আপনার এই ব্যবসা কত বছরের? কতদিন আছেন এখানে?

শিকোকু জবাব দিলেন, 'পার্কটার বয়স কুড়ি বছর হবে। আসলে আমার বাবা পঞ্চাশ বছর আগে শুরু করেন এই প্রোজেক্টটা। তিনি মারা যাবার পর কুড়ি বছর কাজ বন্ধ ছিল। আমিই তারপর পার্কটা গড়ে তুলি। এখনও কাজ চলছে। এই বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে সমুদ্রের ভিতর কাচ-ঢাকা একটা টানেল তৈরি হয়েছে। এরপর থেকে আর অ্যাকোরিয়ামে নয় ওই টানেল দিয়ে সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে টুরিস্টরা সামুদ্রিক প্রাণী দেখতে পাবে। আমার ঠাকুর্দা, বাবা, আমি, তিনজনেই জাপানি নৌ-বিভাগে ডুবুরির কাজ করেছি। এই পার্ক চালানো ছাড়াও মুক্তো সংগ্রহের ব্যবসাও করি। বোটও ভাড়া দিই। সমুদ্রের সঙ্গে তিন পুরুষের ব্যবসা আমাদের।'

হেরম্যান শুনে বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে বংশপরম্পরায় সমুদ্রের যোগাযোগ। আচ্ছা, দানব স্কুইড বা দানব অক্টোপাসের ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করেন?'

ভদ্রলোক যেন একটু থমকে গেলেন এ প্রশ্ন শুনে। তারপর জবাব দিলেন, 'এখানকার ওই ঘটনাটা আপনারাও শুনেছেন তাহলে! সমুদ্রতল পৃথিবীর ওপরের অংশের থেকেও অনেক বেশি রহস্যময়। সেখানে কী আছে আর কী নেই বলা কঠিন। খুঁজলে অনেক কিছুই মিলতে পারে, আবার কিছু না-ও মিলতে পারে। যাক, আজ এলেন ভালো। কাল থেকে পার্ক বন্ধ থাকবে।' কথা শেষ করে আর দাঁড়ালেন না ভদ্রলোক। জাপানি কায়দায় মাথা ঝুঁকিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এগোলেন অন্যদিকে। সুদীপ্তরাও নীচ থেকে ওপরে উঠে এল।

গাইড বাইরে অপেক্ষা করছিল। সে তাদের এরপর নিয়ে চলল স্কুবা ডাইভিং-এর জন্য। সি-পার্কের পিছনটা ছুঁয়ে আছে সমুদ্রকে। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা যন্ত্রচালিত নৌকা। জনা সাতেক লোক আছে তাতে। হাঁটুজল ভেঙে গাইডের সঙ্গে বোটে উঠল দুজন। বোটে যারা আছে তারা জাপানিজ হলেও চেহারা দেখে মনে হল তাদের মধ্যে একজন ইওরোপিয়ান। বোট চালু হতেই হেরম্যান তার উদ্দেশে সৌজন্যবশত বললেন, 'আপনিও নিশ্চয়ই ট্যুরিস্ট? কোথা থেকে আসছেন?'

সোনালি চুলের ছেলেটা জবাব দিল, 'আমার নাম রাইখ। জন্মসূত্রে আমি জার্মান হলেও কর্মসূত্রে জাপানে থাকি।'

তাহলে এই সেই রাইখ! যার কথা আকিরা বলেছিলেন! হেরম্যান নিজেদের পরিচয় দিতেই রাইখও চিহ্নিত করতে পারল তাদের। আকিরার মুখে সে-ও শনেছে তাদের কথা। সে বলল, 'ভালোই হল আপনাদের সঙ্গে আগাম পরিচয় হয়ে। একসঙ্গে তো কাল থেকে বেশ কটাদিন কাটাতে হবে।'

রাইখের বয়স তিরিশের অনেক নীচেই হবে। হেরম্যান তার উদ্দেশে হেসে বললেন,

আপনি ঝিনুক বিশেষজ্ঞ, আর বই লিখেছেন শুনে আমার ধারণা ছিল আপনার বয়স একটু বেশি হবে।'

রাইখ হেসে জবাব দিল, 'আমার ঠাকুর্দা নাবিক ছিলেন। অনেক ছোটবেলা থেকেই এসব ব্যাপারে আমার আগ্রহ। বিশেষত শামুক-ঝিনুক নিয়ে।' রাইখের সঙ্গে সামান্য কিছু কথা বলতে না বলতেই দ্রুতগামী বোট এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পাড় থেকে কিছুটা তফাতে সমুদ্রের মধ্যে। এখানেই নামা হবে জলের নীচে।

প্রস্তুতি শুরু হল সেই মতো। সুদীপ্ত, হেরম্যান, রাইখকে প্রথমে পরানো হল সুইমিং কস্টিউমের মতো পোশাক। নৌকার অন্য দুজনও পরল সে পোশাক। তারা জলের তলায় সুদীপ্তদের সঙ্গে যাবে। একে একে এরপর তাদের পরানো হল পায়ে হাঁসের পায়ের মতো ফ্লিপার, চোখে গগলস। মুখে অক্সিজেনের মাস্ক, পিঠে সিলিন্ডার। কোমরে ধাতব কোমর-বন্ধনিতে দড়ি। একজন ডুবুরি বলল সে প্রথমে যে ভাবে ডুব দেবে ঠিক তেমন ভাবে ডুব দিতে হবে সুদীপ্তদের। নৌকার কার্নিশে সমুদ্রের দিকে পিছন করে বসে উল্টোদিকে ডিগবাজি খেয়ে প্রথমে ডুব দিল সে। তারপর নিখুঁত ভাবে সে কাজটা করল রাইখ। সম্ভবত ব্যাপারটাতে সে ইতিপূর্বে অভ্যস্ত। রাইখের পর তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে তাকে অনুসরণ করল সুদীপ্ত।

জলে ঝাঁপ দেবার পর কয়েক মুহূর্ত বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় ছিল সুদীপ্ত। চোখের পাতা হয়তো আপনা থেকেই বুজে গেছিল। পা মাটিতে ঠেকতেই আপনা থেকেই খুলে গেল তার চোখের পাতা। ভালো করে চারপাশে তাকাতেই বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে গেল। তার চেনা-জানা পৃথিবীর সঙ্গে কোনো মিল নেই এ জায়গার। এ সম্পূর্ণ অচেনা এক জগৎ। তার পায়ের তলায় সাদা বালির গালিচা পেতে রেখেছে কেউ। তার মধ্যে থেকে মাথা তুলে আছে অচেনা সব উদ্ভিদ। জলস্রোতে আন্দোলিত হচ্ছে তারা। জলতলের শুভ্র গালিচার ওপর খেলে বেড়াচ্ছে অসংখ্য শামুক-ঝিনুক আর রঙবেরঙের মাছের ঝাঁক। বেশ কিছু বড় মাছও আছে। তাদেরই একটা সুদীপ্তর গগলস-ঢাকা চোখের ওপর ঠোকর দিয়ে গেল। অদ্ভুত এক পৃথিবী! যেন স্বপ্ন দেখছে সুদীপ্ত। ইতিমধ্যে হেরম্যানও সুদীপ্তর পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিস্মিতভাবে তিনিও দেখতে লাগলেন আশ্চর্য জগৎটাকে। তাঁর ফ্লিপারের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল কাঁকড়ার মতো দেখতে না-মাছ-না.কাঁকড়া অদ্ভুত এক প্রাণী। শেষ ডুবুরিও নেমে পড়ল। রাইখ তো প্রথমেই নেমেছে। তবে সুদীপ্তরা হাঁটতে যেতেই বুঝতে পারল যে প্রচণ্ড জলের চাপ তাদের ঠেলে ওপরে তুলতে চাচ্ছে। তবে রাইখ কিন্তু অন্য ডুবুরি দুজনের মতো অবলীলায় এদিক-ওদিক যাচ্ছে। একবার সে বেশ বড় একটা মাছকে জড়িয়ে ধরে আবার ছেড়ে দিল। তারপর এগোল সামনে একটা প্রাচীরের দিকে। যতদূর চোখ যায় চলে গেছে সেটা। সম্ভবত সেটা প্রবাল প্রাচীর। জলতলের উপর থেকে ভেসে আসা সূর্যালোকে এক অদ্ভুত লাল আভা ছড়াচ্ছে জলতলের প্রাচীরটা। তার গায়ে অজস্র ফোকর। প্রাচীরের গায়ে জলজ উদ্ভিদের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, ডোরাকাটা মাছের ঝাঁক। ওই প্রাচীরের

গায়ের ছিদ্রগুলো তাদের বাসস্থান। দু-একটা মাছকে চিনতে পারল সুদীপ্ত। ডোরাকাটা ক্লাউন ফিশ, ক্ষুদ্রাকৃতি উজ্জ্বল কমলাবর্ণের প্যারট ফিশ। রাইখ সেই প্রবাল প্রাচীরের কাছে পৌঁছে কী যেন দেখতে লাগল। সুদীপ্ত আর হেরম্যানও সেদিকে কিছুটা এগিয়ে দেখতে লাগল সমুদ্রতলের অদ্ভুত সৌন্দর্য, মাছেদের খেলা। হঠাৎ একসময় তাদের কোমরের দড়িতে টান পড়ল। সঙ্গী ডুবুরি দুজন হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল তাদের সময় শেষ। এবার উঠতে হবে। মাত্র দশ মিনিট সময় বরাদ্দ সমুদ্রতলে থাকার জন্য। দড়ির টানে এরপর বোটের ওপর উঠে এল সবাই। হেলমেট খোলার পর হেরম্যান মন্তব্য করলেন, 'অবিশ্বাস্য সুন্দর এক অভিজ্ঞতা হল। সমুদ্রর নীচটা এত সুন্দর হতে পারে জানা ছিল না!'

রাইখ বলল, 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। তবে একটা ব্যাপার বেশ অদ্ভুত লাগল!'

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল সুদীপ্ত।

প্রশ্নটা শুনেই রাইখ বলল, 'না না, তেমন কিছু নয়, আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে সমুদ্রের তলার প্রবাল-প্রাচীরটা বড় অদ্ভুত! এত লম্বা প্রবাল-প্রাচীর আগে দেখিনি।'

সুদীপ্ত বলল, 'আপনি তো একজন মুক্তো বিশেষজ্ঞ। আশা করি আপনার সাহচর্যে অনেক কিছু জানতে পারব আমরা।'

মৃদু হেসে রাইখ প্রশ্ন করল, 'আপনাদের পেশা কী?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আমরা ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্ট। অর্থাৎ...'

তিনি কথা শেষ করার আগেই রাইখ বলল, 'ও শব্দের মানে আমি জানি। অর্থাৎ যাঁরা রূপকথা, উপকথা বা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রাণী খুঁজে বেড়ান। এবার আমার কাছে স্পষ্ট হল যে কেন আপনারা আকিরার সফরসঙ্গী হচ্ছেন। সেই দানব অক্টোপাসের খোঁজে তো?'

সুদীপ্ত বলল, 'ঠিক তাই। আপনি কি ওই প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?'

কী যেন একটা ভাবতে ভাবতে রাইখ জবাব দিল, 'সমুদ্রের গভীরে অনেক কিছুই এখনও আমাদের অজানা। তবে দানব অক্টোপাসের গল্প যুগ যুগ ধরে জাহাজিদের মুখে প্রচলিত।'

কথা বলতে বলতেই বোটে চেপে আবার পাড়ে পৌঁছে গেল সবাই। বোট থেকে নেমে রাইখ বলল, 'আবার কাল দেখা হবে। আশা করি আমাদের দিনগুলো ভালোই কাটবে।'

রাইখ চলে যাবার পর সি-পার্ক ছেড়ে সুদীপ্তরাও ফেরার পথ ধরল।

বিকালবেলা একবার কিছু সময়ের জন্য সুদীপ্তদের হোটেলে এলেন মিস্টার আকিরা। তিনি এসে জানিয়ে গেলেন আয়োজন মোটামুটি সম্পন্ন। তবে বোট জোগাড় করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে তাঁকে। ও জায়গার বদনাম হয়ে যাওয়াতে কেউ সেখানে যেতে চাচ্ছিল না বোট নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনগুণ ভাড়ার লোভ দেখিয়ে একজনকে রাজি করানো হয়েছে।

পরদিন সুদীপ্তদের যখন ঘুম ভাঙল তখন খোলা জানলা দিয়ে সমুদ্রতটের প্রথম আলো তাদের ঘরে এসে প্রবেশ করেছে। সবে সূর্যোদয় হয়েছে। প্রভাতী কিরণ এসে ছড়িয়ে পড়েছে উন্মুক্ত তটে। সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ এসে ভাঙছে পাড়ে। একঝাঁক গাঙচিল সমুদ্রের জল যেখানে পাড় ছুঁচ্ছে সেখানে ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের জলে ভেসে আসা শামুক-ঝিনুকের সন্ধান করছে। দূরে ঊর্মিমালার ওপর ভাসছে একটা ছোট নৌকো। হয়তো সে সাগর পাড়ি দিচ্ছে মুক্তোর সন্ধানে। সব মিলিয়ে সমুদ্রতটটা যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো মনে হচ্ছে। ঘুম ভাঙার পর কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল তারা দুজন। এর অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন মিস্টার আকিরা। তাঁর সঙ্গে রয়েছে রাইখ। সুদীপ্তরা উঠে বসল গাড়িতে। সমুদ্রকে পাশে রেখে চলতে শুরু করল গাড়ি। হঠাৎ রাইখ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ওই দেখুন!' সমুদ্রতটে কে যেন বানিয়ে রেখেছে একটা বালু-ভাস্কর্য—মারমেড বা মৎস্যকন্যার মূর্তি। হেরম্যান বললেন, 'এই মৎস্যকন্যাও কিন্তু ক্রিপটিড বা লোকগাথার প্রাণী। যুগ যুগ ধরে বহু গল্পকথা প্রচলিত আছে এদের নিয়ে। বহু নাবিক নাকি এদের দূর থেকে দেখেছেন বলেও দাবি করেন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এসে থামল সেই 'শিকোকু সি-পার্কের' সামনে। জায়গাটা দেখে সুদীপ্ত আকিরাকে বলল, 'আমরা কাল এসেছিলাম এখানে। পার্কের মালিক মিস্টার শিকোকুর সঙ্গেও পরিচয় হল। উনি আপনার কথাও বললেন।'

গাড়ি থেকে নামতে নামতে আকিরা বললেন, 'এখন ওঁর কাছেই এসেছি। বোটের ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ওঁর মাধ্যমেই হয়েছে। বোটের চালক বা পাইলটও ওঁরই লোক। তবে বোটে বাদবাকি যারা যাচ্ছে তারা আমার নিজস্ব লোক। আর বোটটাও এখানে আছে। সবাইকে এখানে নামতে হবে।'

গাড়ি থেকে সেই অক্টোপাসের মাথাঅলা তোরণের সামনে নামল সবাই। তাদের দেখতে পেয়েই মনে হয় তোরণের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুজন লোক। একজন মিস্টার শিকোকু, অন্যজন বেশ শক্তপোক্ত চেহারার একজন মাঝবয়সি অস্ট্রেলিয়ান। তাকে দেখিয়ে আকিরা বললেন, 'উনি হলেন বোটের পাইলট মরগ্যান।' তারা দুজন সুদীপ্তদের সামনে এসে দাঁড়াবার পর মিস্টার শিকোকু রাইখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি।'

রাইখ জবাব দিল, 'আমি কিন্তু আপনার পার্কে এসেছিলাম। স্কুবা ডাইভিং-ও করেছি। আমার নাম ফ্রেডরিখ রাইখ। আমি একজন মুক্তো বিশেষজ্ঞ।'

মিস্টার শিকোকু দু'বার বিড়বিড় করে বললেন, 'রাইখ, রাইখ!' তারপর করমর্দনের জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।'

মিস্টার শিকোকু তোরণের সামনেই দাঁড়িয়ে রইলেন। পাইলট মরগ্যানকে নিয়ে সবাই এগোল সমুদ্রের দিকে। কিছুটা এগোতেই সুদীপ্তদের চোখে পড়ল বোটটা। বোট মানে ছোটখাট একটা লঞ্চ। তার নাম 'ব্ল্যাক পার্ল'। হাঁটু-জল ভেঙে সুদীপ্তরা উঠে পড়ল বোটে। তারা ছাড়া চারজন ধীবর আছে বোটে। সব মিলিয়ে লোকসংখ্যা নয়জন। তাদের থাকার জন্য বেশ কয়েকটা ছোট ছোট কেবিনও আছে। ডেকের ওপর রাখা আছে একটা ছোট নৌকো, আর মুক্তো সংগ্রহের নানা সরঞ্জাম। বোটটার বিশেষত্ব হল একটা মাস্তুলে পাল গোটানো আছে। অর্থাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হলেও পালের সাহায্যে চলতে পারবে বোট। পাইলট মরগ্যান চালকের আসনে গিয়ে বসলেন। খোলের মধ্যে ইঞ্জিন চালু হল। সুদীপ্তদের নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়ল ব্ল্যাক পার্ল। ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল তটরেখা। ডেকে একটা আচ্ছাদনের নীচে চেয়ার পেতে বসল সবাই। হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'পৌঁছতে কত সময় লাগবে?' আকিরা জবাব দিলেন, 'এমনিতে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে এক ঘণ্টা লাগে। কিন্তু ও জায়গাতে ডুবো পাহাড় আছে বলে সাবধানে খুব শ্লথ গতিতে যেতে হয়। ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে যেতে।'

সুদীপ্ত বলল, 'কাল আমরা "সি-পার্কে" জলের তলায় যখন নামলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন দেখছি। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!'

আকিরা বললেন, 'আপনারা যেখানে নেমেছিলেন সেটা অগভীর জায়গা। গভীর সমুদ্রের তলদেশ আরও সুন্দর। সে সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্য মুক্তো সংগ্রহকারী ডুবুরি ছাড়া অন্যদের সাধারণত হয় না। আপনারা তো নিশ্চয়ই মাস্ক পরে, অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে নীচে নেমেছিলেন। আমার এ বোটে অমন জিনিস কয়েকটা থাকলেও মুক্তো সংগ্রহকারী জাপানি ডুবুরিরা কিন্তু ওসব ব্যবহার করে না। সিলিন্ডার ছাড়া দমবন্ধ করে নীচে নামে। অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে নীচে নামলে অনেকক্ষণ নীচে থাকা যায় ঠিকই কিন্তু যন্ত্রে ত্রুটি হলে বাতাস প্রচণ্ড বেগে ফুসফুসে প্রবেশ করে ফুসফুস ফাটিয়ে মৃত্যু ঘটায় ডুবুরিদের। বিশেষত গভীর সমুদ্রের তলদেশে জলের প্রচণ্ড চাপে অনেক সময় যন্ত্র বিকল হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অস্ট্রেলিয়ার উপকূল ভাগ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় দু-হাজার মাইল বিস্তৃত। পৃথিবীর আশি শতাংশ ঝিনুক তোলা হয় অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে। আর এ কাজের সিংহভাগ করে থাকে অক্সিজেন সিলিন্ডারহীন জাপানিরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি ধীবররা অস্ট্রেলীয় উপকূল থেকে ১২০০ টন শুক্তি সংগ্রহ করেছিল।'

রাইখ বলল, '১৯১৭ সালে এই অস্ট্রেলীয় উপকূল থেকে এক ঐতিহাসিক মুক্তো পাওয়া গেছিল। তার নাম দেওয়া হয় 'স্টার অব দি ওয়েস্ট।' সে সময় সেটা এক লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়। ভাবতে পারেন!'

আকিরা বললেন, 'আমি শুনেছি, আমাদের জাপানি সমুদ্রতলে নাকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

সময় তার থেকে বড় একটা মুক্তো পাওয়া গেছিল। রক্তবর্ণের পিংপং বলের আকারের একটা মুক্তো। তার নাম দেওয়া হয় "স্টার অব দি ইস্ট"। জাপান-জার্মানির যৌথ শুক্তি সংগ্রহকারী দল নাকি সেটা সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়তেই পতন ঘটে দুই দেশের। সেই গোলযোগের মুহূর্তে সেই মুক্তো কোথায় হারিয়ে যায় ইতিহাস তার খোঁজ রাখেনি। সেই মুক্তো আজ পাওয়া গেলে কয়েক কোটি ডলার দাম হবে তার।'

আকিরার কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে রাইখ বলল, 'হ্যাঁ, আমিও একটা বইতে পড়েছি 'স্টার অব দি ইস্ট'-এর কথা।' হেরম্যানের মাথায় সম্ভবত খালি ঘুরপাক খাচ্ছে সেই দানব অক্টোপাসের কথা। তিনি সুদীপ্তর উদ্দেশে বললেন, 'একটা ব্যাপার বলি, সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখতে হলেও অক্টোপাস কিন্তু আদতে শামুক-ঝিনুক গোত্রের অর্থাৎ মোলাস্কা শ্রেণির প্রাণী। স্কুইডও একই গোত্রের।'

আকিরা বললেন, 'এটা আমার জানা ছিল না। আর দানব অক্টোপাসের গল্প শুনলেও তাতে আমার তেমন বিশ্বাস ছিল না। ওই ভয়ংকর ঘটনা ঘটার পর এখনও মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ওটা অন্য কোনো সামুদ্রিক প্রাণী নয় তো? সমুদ্রতলের কত কিছুই তো এখনও আমাদের অজানা। তবে আবার সেই মৃত্যুপথযাত্রী নাবিকের কথাও অবিশ্বাস করি কীভাবে?' হেরম্যান বললেন, 'ওই দানবীয় অক্টোপাসের খোঁজ মেলে প্রথম স্ক্যান্ডেনেভিয়ান লোকগাথায়। নরওয়ের উপকথাতে ওই জীবের বর্ণনা আছে। ওখানে ওদের বলে 'ক্রাকেন'। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ভাষায় 'ক্রাকেন' শব্দর অর্থ—ভয়ংকর জন্তু। 'ক্রাকে' থেকে 'ক্রাকেন' শব্দ এসেছে। 'ক্রাকে' শব্দর অর্থ অক্টোপাস। তাদের আকার নাকি ৪০ থেকে ৫০ ফুট। শুঁড়ে জড়িয়ে তারা জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। মাছের ঝাঁক পরিবেষ্টিত গভীর সমুদ্রের তলদেশে তারা থাকে। সে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে ও নাসারন্ধ্র থেকে জল ছাড়ে। তখন চারপাশে বৃত্তাকার ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এভাবেই বর্ণিত হয়েছে সে।'

কখনো অক্টোপাস, কখনো মুক্তো সংগ্রহের ব্যাপার নিয়ে নানা কথা চলতে থাকল। আর তার সঙ্গে এগিয়ে চলল বোট। ঘণ্টা দুই এগোবার পর বোটের গতি বেশ শ্লথ হয়ে এল। সুদীপ্তরা দেখতে পেল কিছু দূরে জলের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সার সার ডুবো পাহাড়। পাইলট মরগ্যান অতি সাবধানে এগোতে লাগলেন সেদিকে। মাঝে মাঝে একদম থেমে যাচ্ছে বোট। তারপর আবার এগোচ্ছে ডুবো পাহাড়ের ফাঁক গলে। সবাই চুপচাপ হয়ে গেল। কোথাও সামান্য ধাক্কা খেলেই চুরমার হয়ে যাবে বোট। কখনো ইঞ্জিন বন্ধ করে, কখনো আবার তা চালু করে সেই ডুবো পাহাড়শ্রেণির মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল বোট। আকিরা ইতিমধ্যে ডেক ছেড়ে পাইলট রুমে মরগানের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পথ চেনাচ্ছেন তিনি। এভাবে প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় চলার পর এক জায়গাতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বোট। পাইলট রুম থেকে আকিরা চিৎকার করে বললেন, 'আমরা পৌঁছে গেছি। নোঙর ফেলো।' দুজন ধীবর নোঙর স্তম্ভ বা ক্যাপস্টন থেকে নোঙর খুলে সেটা নামিয়ে দিল জলে। মৃদু ঝাঁকুনি

খেয়ে জগদ্দল পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল বোটটা। আকিরা আর মরগ্যান দুজনেই এবার পাইলট কেবিন ছেড়ে ডেকে এসে পৌঁছলেন।

তিমির পিঠের মতো জল থেকে উঠে আসা প্রায় কুড়ি ফুট একটা ডুবো পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে বোটটা। সুদীপ্ত ভালো করে তাকাল চারদিকে। যেদিকেই চোখ যায় সেদিকেই কিছুটা তফাতে তফাতে জেগে আছে ছোটবড় ডুবো পাহাড়। সমুদ্রের জল এমনিতে স্থির-অচঞ্চল। শুধু জলতলের উপরিভাগ যেখানে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে সেখানে মৃদু ঘূর্ণিস্রোত আর দুগ্ধাভ ফেনার সৃষ্টি হচ্ছে। মরগ্যান জলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ডুবো পাহাড় থাকলেও এখানে জল কিন্তু খুব গভীর।'

হেরম্যানও তাকালেন জলের দিকে তারপর তাকালের সুদীপ্তর দিকে। তাঁর মনের ভাষা পাঠ করতে পারল সুদীপ্ত। তিনি বলতে চাচ্ছেন, এই অতল জলের গভীরেই হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে সেই দানবীয় অক্টোপাস। যুগ যুগ ধরে যার গল্প করে আসছে প্রাচীন জাহাজিরা। যে জলদানব তার শুঁড়ে পেঁচিয়ে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে!

সূর্য প্রায় মাথার ওপর। আকিরা বললেন, 'আমি ঝিনুক সংগ্রহের কাজ করব কাল থেকে। তবে আজ একবার জলের তলাটা দেখে আসা যেতে পারে।'

তাঁর কথায় সহমত পোষণ করে রাইখ বলল, 'আমারও নীচে নামার ইচ্ছা আছে।'

হেরম্যান বললেন, 'আমাদেরও নীচে নামার আগ্রহ আছে। কাল তো আমরা প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।' আকিরা তাঁর কথা শুনে বললেন, 'এখানে সমুদ্রের গভীরতা ও জলের চাপ কিন্তু অনেক বেশি। আপনারা নামলে কিন্তু সিলিন্ডার নিয়েই নামতে হবে। যেতে যখন চাচ্ছেন তখন যান। কিন্তু কোনো অসুবিধা বোধ করলেই দড়ি নাড়িয়ে সংকেত দেবেন। আমরা ওপরে তুলে নেব।'

রাইখ বলল, 'আমার অবশ্য গভীর জলে নামা অভ্যাস আছে। অসুবিধা হবে না।'

ঠিক হল, হেরম্যান, সুদীপ্ত, রাইখ ও আরও দুজন ডুবুরি নীচে নামবে। ওই দুই ডুবুরির মধ্যে একজনের নাম ওশো। সে আকিরার আগের মুক্তো সংগ্রহের সাথী হয়ে এসেছিল এখানে। বোটের অন্যরা ওপরে থাকবে সুদীপ্তদের টেনে তোলার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল সবাই। ডুবুরি দুজন অবশ্য সিলিন্ডার ছাড়াই নামবে। সিলিন্ডার, মাস্ক, ফ্লিপার ছাড়া সুদীপ্তদের তিনজনের ধাতব কোমর-বন্ধনি বা কারসেটে একটা করে বাড়তি জিনিস এবার দেওয়া হল। একটা করে এক বিঘত লম্বা একটা ছুরি। আর ওশো নিল একটা হারপুন গান। সেই জলদানবের মুখোমুখি হলে যাতে লড়াই দেওয়া যায়। প্রথমে ওশো ঝাঁপ দিল। তারপর একে একে সুদীপ্তরা।

ঝাঁপ দেবার পর নীচে নামতে নামতে সুদীপ্তর প্রথমে মনে হল সত্যিই যেন পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে। সত্যিই এখানে সমুদ্র খুব গভীর। অবশেষে একসময় মাটিতে পা ঠেকল তার। জলজ উদ্ভিদ এখানে কম। পায়ের তলায় কেউ যেন ঝিনুকের গালিচা পেতে রেখেছে। নানা আকারের ধবধবে সাদা ঝিনুক ঝিলিক দিচ্ছে সুদীপ্তদের হেলমেটে লাগানো ওয়াটার টর্চের আলোতে। তার ওপর খেলে বেড়াচ্ছে রঙবেরঙের মাছের ঝাঁক।

সুদীপ্তরা মাথা এপাশ-ওপাশে ঘোরাতেই আলো গিয়ে পড়তে লাগল ডুবো পাহাড়ের গুহামুখগুলোর গায়ে। তার ভিতর জমাটবাঁধা অন্ধকার। মাঝে মাঝে মাছের ঝাঁক বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। কত অজানা রহস্য সমুদ্রতলের ওই গুহামুখগুলোর ভিতর লুকিয়ে আছে কে জানে!

ওশো সুদীপ্তদের ইশারা করল একটা বেশ বড় গুহা দেখিয়ে। সম্ভবত ওখান থেকেই জলদানব টেনে নিয়ে গেছিল সেই হতভাগ্য ধীবরকে। প্রথমে রাইখ তারপর একে একে অন্যরা এগোল সেদিকে। সতর্কতা অবলম্বন করে গুহার একেবারে সামনে না গিয়ে কিছুটা তফাতে দাঁড়াল তারা। ওশো দম নেবার জন্য একবার ওপরে উঠেই আবার নীচে নেমে এল সঙ্গে সঙ্গে। হারপুনটা সে বাগিয়ে ধরল গুহামুখের দিকে। একসঙ্গে তিনটে ওয়াটার টর্চের আলো পড়ল গুহামুখের ওপর। বেশ বড় গুহামুখ। ছোটখাটো একটা হাতি গলে যেতে পারে তার ভিতর। কিন্তু ভিতরে কী আছে তা এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। সেখানে জমাটবাঁধা অন্ধকার। বেশি কাছে যাওয়া নিরাপদ হবে না। হয়তো প্রাণীটা ওর ভিতর থাকতে পারে। ওশো এবার সবাইকে ওপরে ফেরার ইঙ্গিত করল। ফিরতে যাচ্ছিল সবাই। হঠাৎ হেরম্যানের চোখে পড়ল একটা জিনিস। কিছুটা তফাতেই মাটিতে পড়ে আছে সেটা। গোলাকৃতি ঝিনুক নাকি! ছোট বলের মতো নিটোল একটা ধবধবে কিছু, তিনি সেটা রাইখকে দেখাতেই সে কয়েক পা এগিয়ে জিনিসটার সামনে বসে পড়ল। সে হাত দিয়ে আশেপাশের ঝিনুকগুলো সরাতেই একটা অদ্ভুত জিনিস আত্মপ্রকাশ করল। বলের মতো জিনিসটা আসলে একটা মানুষের মাথার খুলি! তফাত থেকে সেটাকে বল মনে হচ্ছিল। ওটা কি সেই হতভাগ্য ধীবরের মাথার খুলি? ওশোও গিয়ে হাত মেলাল রাইখের সঙ্গে। ঝিনুকের চাদরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আস্ত একটা কঙ্কাল! আশ্চর্যের ব্যাপার তার পায়ে একটা লোহার শিকল বাঁধা। সেটা আবার বাঁধা আছে তলদেশে প্রোথিত একটা লোহার খুঁটিতে। মাংসহীন কঙ্কাল থেকে অবশ্য সহজেই ছিন্ন করা গেল সেটা। তারপর সেই কঙ্কালটা নিয়ে সবাই ভেসে উঠল ওপরে।

কঙ্কালটা তুলে আনতেই ওপরে আকিরাসহ সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। কঙ্কালটা ডেকের ওপর সূর্যালোকে শোয়াতেই সবাই তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। না, এটা সেই ধীবরের কঙ্কাল নয়। কত বছর এই দেহটা জলের তলায় ঘুমিয়ে ছিল, কত বছর পর পৃথিবীর আলো দেখল কে জানে! অনেক প্রাচীন কঙ্কাল। সর্বাঙ্গে তার পুরু নুনের প্রলেপ জমেছে। আকিরা কঙ্কালটাকে ধরে একটু নাড়া দিতেই তার জলভর্তি খুলিগহ্বর থেকে, অক্ষিকোটর থেকে একটা ছোট মাছ তিড়িং করে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। বেচারা বুঝতেই পারেনি তার বাসস্থানটাকে ওপরে তুলে আনা হয়েছে। মাছটার প্রাণ রক্ষার্থে রাইখ সঙ্গে সঙ্গে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলল।

কঙ্কালটা দেখার পর মরগ্যান প্রথম মন্তব্য করলেন, 'হয়তো ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজ ডুবে লোকটার মৃত্যু হয়েছিল। আবার এমনও হতে পারে লোকটা কোনোভাবে মারা যাবার পর জাহাজ বা নৌকা থেকে তাকে জলে ফেলা হয়েছিল যেভাবে সমুদ্রে নাবিকদের অন্ত্যেষ্টি কার্য করা হয়ে থাকে সেভাবে।'

ওশো সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ব্যাপারটা সম্ভবত তা নয়। ওর পায়ে একটা শিকল বাঁধা ছিল, আর সেটা আবার গুহার সামনে একটা লোহার খুঁটিতে বাঁধা ছিল। লোকটাকে সম্ভবত খুন করা হয়।'

হেরম্যান বললেন, 'এমন হতে পারে ওই দানব অক্টোপাসের খাদ্য বানাবার চেষ্টা করা হয়েছিল ওকে।' হেরম্যানের মাথায় সবসময় সেই দানব অক্টোপাসের ভাবনাই ঘুরে চলেছে। কঙ্কালটা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল যে আপাতত সেটাকে ডেকের একপাশে কাঠের সিন্দুকটার মধ্যে রাখা হবে। পরে ঠিক করা হবে যে সেটাকে বন্দর কর্তৃপক্ষ হাতে তোলা হবে, নাকি সমুদ্রের জলে বিসর্জন দেওয়া হবে।

সেই ভাবনা মতো কঙ্কালটাকে ধরাধরি করে তুলতে যাচ্ছিল সবাই ঠিক তখনই সুদীপ্তর নজরে পড়ল একটা জিনিস। সে বলে উঠল, 'আরে এর হাতে একটা আংটি দেখছি! ডানহাতের অনামিকায় এখনও একটা আংটি রয়ে গেছে!'

ওশো আংটিটা খুলল আঙুল থেকে। জামায় সে সেটা ঘষার পরই সূর্যকিরণে ঝিলিক দিয়ে উঠল আংটি। সোনার আংটি! হাতে হাতে ঘুরতে লাগল সে আংটি। সুদীপ্তর হাতে সেটা এল একসময়। আংটির মধ্যে আঁকা আছে অক্টোপাসের একটা নিখুঁত ছবি। সবাই সেটা দেখার পর রাইখ বলল, 'এটা আমি আমার কাছে রাখতে পারি? কঙ্কালটাকে আমিই উদ্ধার করেছি।'

তার কথা শুনে হেরম্যান আর আকিরা প্রায় একসঙ্গে বললেন, 'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

কিন্তু বাধ সাধলেন মরগ্যান। তিনি বললেন, 'বোটের নিয়ম হল, সমুদ্রের তলদেশ থেকে কোনো সম্পত্তি উদ্ধার হলে সেটা বোটের চালক, অর্থাৎ পাইলট বা ক্যাপ্টেনের কাছে থাকবে। তাই ওটা আপাতত আমার সিন্দুকেই গচ্ছিত থাকা উচিত। এবার কী করবেন তা আপনারা সিদ্ধান্ত নিন।'

আইন মোতাবেকই কথা বলছেন মরগ্যান। অগত্যা আংটিটা পকেটে রাখতে গিয়েও সেটা মরগ্যানের হাতে তুলে দিল রাইখ। কঙ্কালটাকে এরপর ধরাধরি করে ডেকের একপাশে রাখা একটা কাঠের চেস্ট বা সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বেশ বেলা হয়েছে। আকিরা বললেন, 'এবার আমরা যে যার কেবিনে ফিরে বিশ্রাম নিই। খাবার কেবিনেই পৌঁছে যাবে।' কার জন্য কোন কেবিন বরাদ্দ সেটাও বলে দিলেন তিনি। সুদীপ্ত আর হেরম্যানের জন্য একটা কেবিন বরাদ্দ। তারা সে কেবিনে গিয়ে ঢুকল। কেবিনে ঢোকার পর হেরম্যান বললেন, 'আংটির ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। অক্টোপাসের চিহ্ন আঁকা আছে ওতে। হয়তো ওই জলদানব ওই গুহার মধ্যেই আছে। কঙ্কাল আর আংটিটা কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে তার।' কিছু সময়ের মধ্যেই খাবার চলে এল। খাওয়া সেরে হেরম্যান বসলেন একটা বই নিয়ে। আর সুদীপ্ত কাচের জানলা দিয়ে চেয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। সারা বোট কেমন যেন নিস্তব্ধ। সবাই নিশ্চয় যে যার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। শুধু মাঝে মাঝে কাছের ডুবো পাহাড়টার গায়ে জলের ধাক্কা খাওয়ার মৃদু ছলাৎছল, ছলাৎছল শব্দ কানে আসছে। সময় এগিয়ে চলল। তখন প্রায় বিকাল হবে। ইতিমধ্যে হেরম্যান বই রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সুদীপ্তর আর কেবিনে থাকতে ভালো লাগল না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সে ডেকে এসে দাঁড়াল। নিস্তব্ধ ডেক। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ সুদীপ্ত দেখতে পেল, ডেক সংলগ্ন রাইখের ঘরের দরজার একটা পাল্লা খোলা। কেবিনের ভিতর বসে সে যেন কী করছে। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য সুদীপ্ত এগোল সেদিকে। রাইখের কেবিনের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। দরজার দিকে পিছন ফিরে চেয়ারে বসে আছে রাইখ। তার এক হাতে একটা ফোটোগ্রাফ, অন্য হাতে একটা আতস কাচ। সেটা দিয়ে ছবিটা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সুদীপ্ত তার নাম ধরে ডাক দিতেই মৃদু চমকে উঠে পিছনে ফিরে সে বলল, 'ভিতরে এসো।' সুদীপ্ত ঘরের ভিতর পা রেখে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কিসের ছবি?'

ছবিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে রাইখ বলল, 'এ ছবিটা বহু বছর ধরে আমার কাছে আছে। পারিবারিক সম্পত্তি। আমার ঠাকুর্দার ছবি।'

সুদীপ্ত হাতে নিয়ে তাকাল ছবিটার দিকে। বেশ পুরনো বিবর্ণ একটা সাদা-কালো ছবি। বর্তুলাকার কোনো কিছুর ওপর বসে আছে সামরিক পোশাক পরা জনা পাঁচেক লোক। তাদের মধ্যে একজন সম্ভবত ইওরোপিয়ান, অন্যরা জাপানিজ বা চাইনিজ হবে। ক্লোজড ফোটোগ্রাফ। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ধরা আছে ওতে। রাইখ বলল, 'মাঝের

লোকটা আমার ঠাকুর্দা। জার্মান নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরাল ছিলেন। সাবমেরিনের পিঠের ওপর বসে ছবিটা তোলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের ছবি।' সুদীপ্ত ছবিটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, ছবির সবাই সামরিক পোশাক পরে থাকলেও ইওরোপিয়ান লোকটার পোশাক, টুপি অন্যদের থেকে আলাদা। সে জানতে চাইল, 'আর অন্যরা?'

'অন্যরা সবাই জাপানিজ নেভি অফিসার। সে সময় জাপান-জার্মানি একসঙ্গে লড়ছিল। সারা পৃথিবী তখন যুদ্ধে মত্ত'...রাইখ হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা গলা শোনা গেল। 'না, সারা পৃথিবী বললে একটু ভুল হবে। আমরা অস্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু যুদ্ধে অংশ নিইনি।'

মিস্টার মরগ্যান ঘরে ঢুকেছেন। তিনি এরপর হাত বাড়িতে ছবিটা নিয়ে ভ্রূ-কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ছবিটার দিকে। তারপর ছবিটা আবার ফেরত দিয়ে বললেন, 'আমি খোঁজ নিতে এলাম সবাই ঠিকঠাক আছেন কিনা? সমুদ্রে ভাসা যাদের অভ্যাস নেই, বোটের দুলুনিতে তাদের অনেক সময় "সি-সিকনেস" হয়। ঠিক আছে আমি এবার আমার কেবিনে ফিরি।'—এই বলে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। রাইখ এরপর সুদীপ্তর হাত থেকে ফটোগ্রাফটা নিয়ে নিজের জিনিসপত্তর মধ্যে রেখে বলল, 'চলো, বাইরের ডেকে গিয়ে বসি। আমার কেবিনটা বড়ো হলেও জানলার কাচটা আটকে গেছে। খুলছে না। বড্ড গুমোট লাগছে ভিতরটা।'

সুদীপ্ত আর রাইখ ডেকে চেয়ারে এসে বসল। রোদের তেজ এবার কমে এসেছে। মৃদু-মন্দ সমুদ্রবায়ু বইতে শুরু করেছে। বেশ আরাম লাগছে শরীরে। ইতিমধ্যে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে হেরম্যান আর আকিরাও যোগ দিলেন সুদীপ্তদের সঙ্গে। নানা কথা আলোচনা শুরু হল। হেরম্যান একসময় অন্যদের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, 'গুহার সামনে রাখা ওই কঙ্কালটার সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কী?'

আকিরা জবাব দিলেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট যে এ জায়গাতে সমুদ্রের তলে এক সময় মানুষের আনাগোনা ছিল। তারা মুক্তোসংগ্রহকারী ধীবরও হতে পারে, আবার অন্য কোনো লোকজনও অজানা কোনো কারণে নীচে নেমে থাকতে পারে। এমনও হতে পারে ওই গুহার মধ্যে জলদস্যুদের গুপ্তধন লুকোনো আছে। জলদস্যুরা কেমন ভাবে তাদের সম্পদ লুকিয়ে রাখত সে গল্প জানেন তো? কোনো নির্জন দ্বীপে গুপ্তধন লুকাবার জন্য তারা তাদের সিন্দুক নিয়ে নামত। এরপর জলদস্যু সর্দার বা ক্যাপ্টেন লটারির মাধ্যমে তারই একজন সহচরকে নির্বাচিত করত তার সঙ্গে তলোয়ার বা পিস্তল নিয়ে ডুয়েল লড়ার জন্য। দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে পরাজিত হত তার দেহ শিকল দিয়ে ওই রত্নসিন্দুকের সঙ্গে বেঁধে সিন্দুকটা ওই দ্বীপের কোনো গুহাতে লুকিয়ে রাখা হত বা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। তারপর তারা আবার পাড়ি দিত সমুদ্রে। হতভাগ্য সেই ব্যক্তির আত্মা নাকি প্রেত হয়ে পাহারা দিত সেই রত্নপেটিকা। সাধারণত জলদস্যু সর্দারের অনুচররাই প্রেত হত। আর দৈবাৎ সর্দার পরাজিত হলে তার স্থলাভিষিক্ত হত সেই অনুচর।'

সুদীপ্ত বলল, 'আমাদের দেশের গুপ্তধন লুকোনোর গল্পেও এ ধরনের ঘটনার কথা

শোনা যায়। মাটির নীচে গুপ্তধনের সঙ্গে বাচ্চা ছেলেদের নামিয়ে ওপর থেকে সে ঘরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হত। ছেলেদের প্রেতাত্মা নাকি আগলে রাখত সেই সম্পদ। ওদের বলা হত 'যখ'।'

'গল্পগুলো বেশ ভালোই। তবে এত নির্জন জায়গা থাকতে সমুদ্রতলে জলদস্যুরা গুপ্তধন রাখবে কেন? বিশেষত যখন সেটা নিজেদের পক্ষে উদ্ধার করাই কঠিন। আমার ধারণা লোকটা ঝিনুক সংগ্রহকারী ডুবুরি হবে। ওই জায়গাতে মুক্তো সংগ্রহ করতে নামত। ওটা তার প্রিয় জায়গা ছিল। অনেকে যেমন তার মৃত্যুর আগে বলে যায় যে তাকে কোথায় কবরস্থ করতে হবে ঠিক তেমনই ওই লোকটাও মৃত্যুর আগে বলে গেছিল তার প্রিয় ওই জায়গাতে তাকে কবর দেবার কথা। সে জন্য তাকে ওখানে ওভাবে সমাধি দেওয়া হয়েছিল।'

হেরম্যান বললেন, 'বাঃ, এটাও বেশ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা। আর কঙ্কালের হাতের অক্টোপাসের ছবি খোদাই করা ওই আংটি সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী? বিশেষত যখন এখানে ওই গুহার সামনে অক্টোপাসের আক্রমণেই মিস্টার আকিরার সঙ্গী দুই ধীবরের মৃত্যু হয়েছে বলা হচ্ছে?'

মরগ্যান জবাব দিলেন, 'দেখুন, নাবিকদের হাতে প্রায়শই সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রাণীর ছবি থাকে। এই দেখুন আমার হাতের এই আংটিতে যেমন "মারমেড" বা "মৎস্যকন্যার" ছবি আঁকা। অক্টোপাসের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই বলেই মনে হয়।' আকিরা হেরম্যানকে বললেন, 'ধরুন যদি সেই জলদানবকে আমরা দেখতে পেলাম, তবে সেক্ষেত্রেও বাইরের পৃথিবীর কাছে কীভাবে তার অস্তিত্ব প্রমাণ হবে। এখানকার সেই ভয়ংকর ঘটনার কথা যেমন অনেকে বিশ্বাস করেছে তেমনই এ দেশের বেশ কয়েকটা দৈনিক সংবাদপত্রে বেশ কিছু নামকরা বিজ্ঞানী লিখেছেন যে অমন দানব অক্টোপাসের কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না। ডুবুরি দুজনের অন্য কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, আর সে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছি।'

হেরম্যান বললেন, 'শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত পণ্ডিতপ্রবররা অনেক সময় অনেক কিছু বিশ্বাস করেন না। আপনার ওই দেশের ক্যাঙারুর অস্তিত্বও তো একশো বছর আগে ইওরোপীয়রা বিশ্বাস করত না। ঠিক যেমন সভ্য পৃথিবী বিশ্বাস করত না ইন্দোনেশিয়ার সুন্দা দ্বীপে কমোডো ড্রাগনের কথা। অথচ সব কিছুই ছিল। আমি একটা বিশেষ ধরনের ছোট্ট ক্যামেরা এনেছি যাতে জলের তলের ছবি তোলা যায়। আমরা বা আপনার লোকেরা তাতে ছবি তুলতে পারবে। চেষ্টা করব প্রাণীটার ছবি তুলে তা সভ্য পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করার।'

নানা আলোচনা চলতে লাগল। সূর্য ডুবে গেল এক সময়। তারপর ধীরে ধীরে চাঁদও উঠল। মুক্তোর মতোই নিটোল, স্নিগ্ধ গোল চাঁদ। তার আলোতে সমুদ্রের বুকে জেগে আছে আশেপাশের ডুবো পাহাড়গুলো। মৃদু ঢেউ খেলছে সমুদ্রের বুকে। অপূর্ব সুন্দর লাগছে চারপাশ। সুদীপ্তরা শহরের মানুষ। এ দৃশ্য তাদের চোখে পড়ে না। তন্ময়ভাবে

সুদীপ্ত-হেরম্যান-রাইখ চেয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। তবে ডুবুরিদের কোনো হেলদোল নেই। এ দৃশ্যে তারা অভ্যস্ত। ডেকের এক কোণে বসে তারা নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছে। মরগ্যান অনেক আগেই তাঁর কেবিনে ফিরে গেছিলেন। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সুদীপ্তরাও ডেক ছেড়ে নিজেদের কেবিনে ফিরল। ঘরে ফিরে হেরম্যান বললেন, 'প্রথম দিনটা তো ভালোই কাটল। আগামীকাল থেকে তো ঝিনুক তোলা শুরু হবে। ডুবুরিদের সঙ্গে পালা করে আমি-তুমিও নীচে নামব। দেখি যদি তার দর্শন মেলে। আর রাতটা একটু সজাগ থেকো। বলা যায় না কিছু ঘটতে পারে।'

খাওয়া সেরে বেশ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল সুদীপ্তরা। মাঝরাতে হঠাৎ এমনিই ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তর। তার খাটের পাশেই একটা গোলাকার জানলা আছে। তা দিয়ে বাইরে তাকাল সুদীপ্ত। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ডেকে। কেমন একটা অদ্ভুত আলো-আঁধারি খেলা করছে মাস্তুলের ছায়া আর চাঁদের আলো মিলেমিশে। হঠাৎ সুদীপ্ত খেয়াল করল কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে ডেকের একপাশে সেই কাঠের সিন্দুকটার সামনে। যার মধ্যে কঙ্কালটা রাখা। লোকটার পরনে বর্ষাতি বা ওভারকোটের মতো কিছু। পিছন ফিরে সিন্দুকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সে কী যেন দেখছে। লোকটার আকৃতি দেখে সুদীপ্তর মনে হল সে লোক রাইখ হলেও হতে পারে। কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারল না। আকিরা বা মরগ্যানের উচ্চতাও ওরকম মাঝারি ধরনের। কিন্তু এত রাতে ওখানে কী করছে সে? একটু ইতস্তত করে বিছানা ছেড়ে উঠল সুদীপ্ত। তারপর সন্তর্পণে দরজাটা খুলল। কিন্তু ওই দরজা খুলতে যতটুকু সময় লাগল, তার মধ্যেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেল লোকটা! সুদীপ্ত দেখল শূন্য ডেকের একপাশে সিন্দুকটা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে কেউ নেই! চারপাশের কেবিনগুলোর দরজাও সব বন্ধ। তাহলে কি সে ভুল দেখল লোকটাকে? ডেকের চারদিক আবারও একবারও ভালো করে দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করে সুদীপ্ত নিজের জায়গাতে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে ডেকে প্রচণ্ড চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দে ঘুম ভাঙল সুদীপ্তর। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে! সেই দানব অক্টোপাস দেখা দিয়েছে নাকি? হেরম্যান বললেন, 'তাড়াতাড়ি বাইরে চলো!'

সুদীপ্তরা ডেকের যে পাশে আছে তার উল্টোদিকে পরপর ক'টা কেবিন আছে। তার একটা যেটা রাইখের জন্য বরাদ্দ তার দরজার সামনে জড়ো হয়েছে বোটের প্রায় সকলেই। রাইখও আছে তাদের মধ্যে। সবার চোখে-মুখেই উত্তেজনার ভাব। সুদীপ্তরা সেখানে যেতেই আকিরা ইশারায় ঘরের ভিতরটা দেখালেন। খাটের ওপর সাদা চাদর

মুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন। আর তার পিঠটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্তের উৎসমুখে ছিন্ন চাদর ভেদ করে ক্ষতচিহ্নও দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত ছুরিকাঘাত। আকিরা বললেন, 'ওর নাম সামুরা। মিনিটখানেক আগে বোটেরই একজন ধীবর ওকে ডাকতে এসে এই দৃশ্য দেখতে পেয়েছে।' মরগ্যান বললেন, 'কিন্তু ও এঘরে এল কী ভাবে? মিস্টার রাইখ, এটা তো আপনার ঘর?'

রাইখ একটু আমতা আমতা করে বলল, 'আসলে, আমার ঘরের জানলাটা খুলছিল না। বড্ড গুমোট লাগছিল। তাই রাতে শোবার আগে পাশের ঘর থেকে ওকে ডেকে তুলে আমার শোবার জায়গা বদল করি।'

মরগ্যান তাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই বিছানাতে মৃতবৎ পড়ে থাকা লোকটা ছটফট করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ওশো 'ও বেঁচে আছে! বেঁচে আছে!' বলে চিৎকার করে কেবিনে ঢুকে পড়ল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাইও। জ্ঞান ফিরেছে লোকটার। ওশো তার মাথাটা তুলে ধরে বলল, 'তোমার এ অবস্থা কে করল?'

ধীবর অস্পষ্টভাবে বলল, 'কাউকে দেখিনি। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল। তারপর আর কিছু মনে নেই।' এই বলে আবার অজ্ঞান হলে গেল লোকটা।

আকিরা বলে উঠলেন, 'ফার্স্ট-এইড বক্স আনো এখনই। আর ডেক থেকে নৌকা নামাও। ক্ষতটা বেশ গভীর। তবে ওকে বন্দরে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো বেঁচে যাবে।'

দুজন ধীবর ছুটল নৌকা নামাতে। আর ওশো ফার্স্ট-এড বক্স এনে লোকটার ক্ষতস্থানে ব্যাভেজ বাঁধতে শুরু করল। আকিরাও হাত লাগালেন তাতে। মরগ্যান বললেন, 'কিন্তু এ ঘটনা কে ঘটাল? আমাদেরই কেউ? নাকি বাইরে থেকে কেউ উঠে এসেছিল বোটে?'

আকিরা বললেন, 'এই জনমানবহীন সমুদ্রে কে বোটে উঠবে?'

ওশো হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি যেন ঘুমের ঘোরে কাল ডেকের ওই কাঠের সিন্দুকটার সামনে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।' তার কথা শোনামাত্র সুদীপ্ত বলে উঠল, 'আমিও তো একই দৃশ্য দেখেছি। ভেবেছিলাম আমি ভুল দেখছি।'

হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কেউ মাঝসমুদ্র থেকে বোটে উঠে না আসুক, বোট ডাঙা ছাড়ার আগেই এ বোটে লুকিয়ে উঠে বসে নেই তো? চলুন তো ওই সিন্দুকের ওখানটা আগে দেখি। ওর আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে কেউ। সারা বোটের চারদিকে ভালো করে খুঁজতে হবে।'

তাঁর কথা শুনে সবাই ছুটল ডেকের একপাশে পড়ে থাকা সিন্দুকটার দিকে। না, তার আড়ালে কেউ নেই। এরপর সবাই বোটের খোলসহ লুকিয়ে থাকার মতো অন্য জায়গাগুলো খুঁজতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিছকই কৌতূহলবশত কঙ্কালটা একবার দেখার জন্য কালো কাঠের সিন্দুকের ডালাটা একবার তুলল সুদীপ্ত। অন্য কোনো লোক তার মধ্যে নেই ঠিকই কিন্তু সিন্দুকের ভিতর অন্য একটা দৃশ্য অপেক্ষা করছিল সবার জন্য। শোয়ানো কঙ্কালটা সিন্দুকের গায়ে ঠেস দিয়ে একটু ওপরে উঠে এসেছে। তার একটা হাত কোলের কাছে রাখা। সে হাতে ধরা আছে একটা রক্তমাখা তীক্ষ্ণ ছুরি! প্রাচীন কঙ্কালটার গায়েও

লেগে আছে এক বিঘত লম্বা সেই ছুরি থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত! সে দৃশ্য দেখেই এক ধীবর আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভূত ভূত! এই ভূতই ছুরি মেরেছে সামুরাকে।' তার চিৎকার শুনে অন্য ডুবুরিরাও ছুটে এল। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল সারা ডেকে। বেগতিক দেখে আকিরা এক ধমকে তাদের থামিয়ে একটা রুমাল দিয়ে সেই ছুরিটা তুলে নিলেন কঙ্কালটার হাত থেকে। ছুরিটা ভালো করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন, বেশ দামি ছুরি। হাতলটা মুক্তোখচিত। সাধারণত পয়সাঅলা মুক্তো ব্যবসায়ীরা এ ছুরি রাখে। মরগ্যান, আপনি আপাতত ছুরিটা আপনার জিম্মায় রাখুন।'

মরগ্যান ছুরিটা হাতে নিলেন। ঠিক এই সময় একজন ডুবুরি বলল, 'আমরা আর এ বোটে থাকব না। সামুরাকে নিয়ে চলে যাব।'

মরগ্যানও বললেন, 'আমারও এ জায়গায় থাকা সমীচীন মনে হচ্ছে না। অভিশপ্ত এ জায়গা। আমি বোট নিয়ে ফিরব।'

তাঁর কথা শুনে প্রাথমিকভাবে সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেলেও রাইখ হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠল, 'আমরা ভূতের ভয়ে পালিয়ে যাব? না, আমরা ফিরব না। তাছাড়া আমি অনেক অর্থব্যয় করে এখানে এসেছি।'

হেরম্যানও বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন, 'আমারও এই অভিমত। দানব অক্টোপাসের রহস্য উদ্ঘাটন না করে আমিও ফিরতে চাই না। সামুরাকে খুন করার চেষ্টা করে, কঙ্কালের হাতে ছুরি ধরিয়ে কেউ হয়তো ভয় দেখিয়ে আমাদের এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে।' মরগ্যান বললেন, 'কিন্তু আমি যদি বোট থেকে নেমে যাই, তখন আপনারা কী করবেন?'

রাইখ বেশ দৃঢ়ভাবে বলল, 'সে আপনার ইচ্ছা। তবে তাতে তেমন অসুবিধা হবে না। আমার দুই পুরুষ জার্মান নেভিতে কাজ করেছে। আমিও জার্মান নেভিতে ভলেন্টিয়ার হিসাবে ট্রেনিং নিয়েছি। এই বোট থেকে শুরু করে সাবমেরিনও চালাতে পারি আমি।' সুদীপ্ত বেশ অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে। আর মরগ্যান কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে তাহলে থাকি।' কিছুক্ষণের মধ্যেই ওশোর নেতৃত্বে আহত ডুবুরিকে নিয়ে বোট থেকে নেমে তীরের দিকে পাড়ি দিল ডুবুরিরা। প্রায় অর্ধেক লোক খালি হয়ে গেল। বোটে রয়ে গেল সুদীপ্তরা পাঁচজন।

বোট ছেড়ে সবাই চলে যাবার কিছুক্ষণ পর হেরম্যান আকিরাকে বললেন, 'আমি আর সুদীপ্ত একবার জলের নীচে ঘুরে আসতে চাই। আপনার আপত্তি আছে?'

আকিরা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আপত্তি নেই। তবে সঙ্গে থাকতে পারব না। দুজনকে তো ওপরে থাকতে হবে আপনাদের ওপরে টেনে তোলার জন্য।'

মরগ্যান ইতিমধ্যে তাঁর কেবিনে ফিরে গেছেন। রাইখ আকিরাকে বলল, 'ঠিক আছে আমি টেনে তোলার কাজে সাহায্য করব।'

হেরম্যান বললেন, 'আমি একটু ঘর থেকে আসছি। তারপর জলে নামব।'

মিনিট তিনেকের মধ্যেই ফিরে এলেন হেরম্যান। তাঁর হাতে একটা ছোট বাক্স। রাইখ

জিজ্ঞেস করল, 'আপনার হাতে কী?'

হেরম্যান হেসে জবাব দিলেন, 'বাক্স। ক'টা ঝিনুক সংগ্রহ করব। দেখি যদি মুক্তো পাওয়া যায়।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল সুদীপ্তরা। শুধু ঝাঁপ দেবার আগে আকিরা সুদীপ্তর হাতে ওশোর হারপুন গানটা ধরিয়ে তার কার্যকারিতা বুঝিয়ে দিলেন। জিনিসটা লম্বা নলঅলা বন্দুকের মতো। মুখে তিরের ফলার মতো হারপুন গোঁজা। ট্রিগার টিপলেই তা ছিটকে বেরিয়ে যায়। অক্সিজেন সিলিন্ডার পরীক্ষা করার পর প্রথমে হেরম্যান তারপর সুদীপ্ত ঝাঁপ দিল জলে।

আবার সেই আশ্চর্য পৃথিবীতে পৌঁছে গেল তারা। পায়ের নীচে ঝিনুকের বিছানা। চারদিকে ডুবো পাহাড়ের তলদেশের গুহা। হেরম্যান এগোলেন সেই বিশাল গুহাটার দিকে। তাঁর পিছনে তাঁকে অনুসরণ করল সুদীপ্ত। গুহাটার কিছুটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন হেরম্যান। আগের দিনের মতোই সুদীপ্তদের মাথার ল্যাম্পের আলো প্রবেশ করছে না বিশাল গুহামুখের ভিতর। গুহার ভিতর জমাটবাঁধা অন্ধকার। যে মাছের দল আগের দিন গুহামুখে খেলা করছিল তারা যেন হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে গেছে। জলতলে সেই গুহার সামনে কেমন যেন একটা থমথমে পরিবেশ! হেরম্যান গুহার কিছুটা তফাতে নিচু হয়ে বসে বাক্সটা খুলে কী একটা ছোট্ট জিনিস যেন মাটিতে বসিয়ে ঝিনুক চাপা দিলেন। তারপর সুদীপ্তকে ইশারা করলেন ওপরে ভেসে ওঠার জন্য।

ওপরে ওঠার পর আকিরা আর রাইখ সাগ্রহে একসঙ্গে জানতে চাইলেন, 'কী দেখলেন?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'তেমন নতুন কিছু চোখে পড়ল না।'

ডুবুরির পোশাক ছেড়ে সুদীপ্তরা কেবিনে ফিরে আসার পর সুদীপ্ত হেরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী বসিয়ে এলেন?' হেরম্যান তাঁর ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট মনিটর স্ক্রিন বার করে সেটা চালু করে বললেন, 'এই দ্যাখো। ওটা একটা ক্যামেরা। জলতলে অন্ধকারেও ওই ক্যামেরা ছবি তুলে এখানে পাঠাতে পারে।'

সত্যি সত্যিই মনিটরের পর্দায় ফুটে উঠেছে জলতলের ছবি। সেই গুহামুখ! সেদিকেই তাগ করা আছে ক্যামেরা। হেরম্যান আবার বললেন, 'সব ছবি স্টোর হয়ে থাকবে এতে। ওই দানব অক্টোপাস যদি গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসে তবে সে ধরা পড়বে ক্যামেরাতে। হয়তো সে কাছেই আছে। নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে মাছের ঝাঁকগুলো আর নেই?' হেরম্যানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় টোকা পড়ল। মনিটরটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেললেন হেরম্যান। সুদীপ্ত দরজা খুলল। মরগ্যান দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'শুধু একটা কথা জানাতে এলাম। কাল রাতে সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোককে আমিও দেখেছি। চিনতেও পেরেছি। তিনি হলেন রাইখ। তবে প্রমাণ নেই।'—এই বলে মরগ্যান চলে গেলেন। সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'আমারও যেন একবার মনে হয়েছিল লোকটা রাইখ!'

সারা দুপুর নিজেদের কেবিনেই কাটিয়ে দিল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। মাঝে মাঝে অবশ্য মনিটরটা খুলছিলেন হেরম্যান। সেই গুহামুখের একই ছবি বারবার ধরা দিচ্ছে। অন্ধকার পাতালপুরীর গুহামুখ। বৈচিত্র্য কিছু নেই। একবার শুধু দেখা গেল একটা ছোট হাঙর কোথা থেকে যেন এসে একবার সেই গুহামুখে ঢুকেই আবার বাইরে বেরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। এছাড়া নতুন কিছু চোখে পড়ল না সুদীপ্তদের।

বিকালবেলা আলো একটু নরম হতেই ডেকে এসে দাঁড়াল তারা দুজন। সকালবেলা থেকেই কেমন যেন থমথমে হয়ে আছে জাহাজের পরিবেশ। আকিরা একবার তাঁর কেবিন ছেড়ে সুদীপ্তদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর তিনি বললেন, 'কেন জানি আমার এ পরিবেশ ভালো লাগছে না। ভূতের ভয় নয়। আমার মনে হচ্ছে অশুভ কিছু যেন ঘটতে চলেছে। হয়তো আমাদের ফিরে যাওয়াই ভালো। ব্যাপারটা আপনারা ভাববেন।' হেরম্যান আনমনাভাবে দূরে সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে বললেন, 'আর একটা দিন দেখি। তারপর ভাবব ফিরব কিনা।' আকিরা আর কোনো কথা না বলে নিজের কেবিনে চলে গেলেন।

এর ঠিক পরপরই একটু হন্তদন্ত হয়ে কেবিন ছেড়ে সুদীপ্তদের কাছে উপস্থিত হল রাইখ। সে সুদীপ্তকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কাল আমার কেবিনে তোমাকে আর মরগ্যানকে আমি যে ফোটোগ্রাফটা দেখালাম, সেটা তোমরা দেখার পর আমাকে তুমি ফেরত দিয়েছিলে তো?'

সুদীপ্ত দিল, 'হ্যাঁ। তুমি সেটা তোমার ব্যাগে রাখলে। কেন কী হয়েছে?'

রাইখ জবাব দিল, 'ওটা খুঁজে পাচ্ছি না।'—এই বলে সে আবার দ্রুত ফিরে গেল তার কেবিনে।

সে চলে যাবার পর ফোটোগ্রাফের ব্যাপারটা সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল। হেরম্যান বললেন, 'রাইখের আচরণ সত্যিই একটু অদ্ভুত। ওই কি ছুরি মারল ডুবুরিটাকে? কিন্তু তার কী কারণ?'

সূর্য ডুবে গেল একসময়। তারপর চাঁদও উঠল। এ দিনের চাঁদটা কেমন যেন ফ্যাকাশে ম্রিয়মাণ। অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে আশেপাশে জেগে থাকা ডুবো পাহাড়গুলোকে কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। যেন এরা সব এক একটা জলদানব। জল থেকে মাথা তুলে দেখছে সুদীপ্তদের। ডেক ছেড়ে এক সময় নিজেদের কেবিনে ফিরে এল তারা। হেরম্যান বললেন, 'আজকের রাতটা সতর্ক থাকতে হবে।'

আকিরা এসে রাতের খাবার দিয়ে গেলেন। থমথমে মুখ। কিছু বললেন না তিনি। খাওয়া সেরে কাচের জানলার সামনে রাত পাহারায় বসল তারা দুজন।

তখন শেষ রাত হবে। ডেকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু তন্দ্রা এসে গেছিল সুদীপ্তর। হেরম্যানের মৃদু ধাক্কায় হুঁশ ফিরল তার। হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, 'ওই দ্যাখো!'

তাকাল সুদীপ্ত। আলো-আঁধারি খেলা করছে ডেকে। আকাশে মনে হয় মেঘ জমেছে। সুদীপ্ত দেখল একটা লোক সন্তর্পণে এগোচ্ছে রেলিং-এর দিকে! তার পরনে ডুবুরির পোশাক। পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার। মুখে মাস্ক থাকায় তাকে অবশ্য চেনা যাচ্ছে না। কে লোকটা? সে রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়াল। তারপর রেলিং টপকে জলে নেমে গেল। হেরম্যান বললেন, 'সিলিন্ডার নিয়ে যখন নামল তখন বেশি সময়ের জন্যই নামল। মনিটরটা চালু করি। দেখি লোকটাকে ক্যামেরায় ধরা যায় কিনা।'

সুদীপ্ত টেবিল থেকে মনিটরটা নিতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় তাদের অবাক করে দিয়ে আরও একজন হাজির হল ডেকে। তার পরনেও ডুবুরির পোশাক। মুখে মাস্ক। পিঠে সিলিন্ডার। লোকটা ডেকে এসে চারপাশে একবার ভালো করে দেখল। তারপর রেলিং-এর কাছে গিয়ে প্রথমজনের মতোই রেলিং টপকে সমুদ্রে নেমে গেল! উত্তেজিত হেরম্যান নিজেই টেবিলের কাছে গিয়ে মনিটরটা নিয়ে সেটা চালু করে দিলেন। পর্দায় ভেসে উঠল সমুদ্রতলের সেই গুহামুখের প্রতিচ্ছবি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ডুবুরি ধরা দিল ক্যামেরাতে। গুহার সামনে এসে দাঁড়াল সে। তারপর একটা টর্চ জ্বালিয়ে আলো ফেলল গুহার ভিতর। সুদীপ্তরা অবশ্য দেখতে পেল না গুহার ভিতরটা। ভাসতে ভাসতে ডুবুরি ঢুকে পড়ল গুহার ভিতরে। অদৃশ্য হয়ে গেল সে! এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হল দ্বিতীয় ডুবুরি। সে যেন বেশ কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল গুহার সামনে। তারপর গুহায় ঢুকে পড়ল। উত্তেজিত সুদীপ্তরা চেয়ে রইল মনিটরের দিকে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যেতে লাগল...

মিনিট পনেরো পর একজন ডুবুরি বেরিয়ে এল গুহা থেকে। সাঁতরে ক্যামেরার বাইরে চলে গেল সে। হেরম্যান বললেন, 'বাইরে নজর রাখো। নিশ্চয়ই সে এবার বোটে এসে উঠবে। আর একজন দেখি গুহা ছেড়ে কখন বেরোয়? তবে ও গুহায় অক্টোপাস নেই বলেই মনে হয়। থাকলে ওরা ভিতরে ঢুকত না।' শেষ কথাটা বেশ বিমর্ষভাবে হেরম্যান বললেন ঠিকই, কিন্তু এরপরই মনিটর স্ক্রিনে যা ফুটে উঠল তা দেখে চমকে উঠলেন হেরম্যান আর সুদীপ্ত। হেরম্যানের আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে সেই গুহার ভিতর থেকে বাইরে আবির্ভূত হল সত্যিই এক দানবাকৃতি অক্টোপাস! তার বাহু বা শুঁড়গুলো প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা হবে! মাথাটা সত্যি একটা ছোটখাটো হাতির মতন! ভয়ংকর কুৎসিত এক প্রাণী! ঠিক যেমন অক্টোপাসের ছবি আঁকত প্রাচীন নাবিকরা। সুদীপ্তদের বোট বা ছোটখাটো জাহাজকে সে শুঁড়ে পেঁচিয়ে অনায়াসে ডুবিয়ে দিতে পারে। এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই তো এতদূর ছুটে এসেছে হেরম্যান আর সুদীপ্ত। প্রাণীটা গুহা

ছেড়ে বেরোতেই একটা ঘূর্ণি শুরু হল জলতলে। সব কিছু কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল! সে অস্পষ্টতা যখন কাটল তখন প্রাণীটা আর সেখানে নেই। হেরম্যান বললেন, 'প্রাণীটা কি পিছু ধাওয়া করল লোকটার?' তাঁর কথা শেষ হবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মৃদু কেঁপে উঠল বোটটা। সুদীপ্তরা তাকাল ডেকের দিকে। যেখান থেকে নোঙর নামানো হয়েছে সেখান থেকে নোঙর বেয়ে ওপরে উঠে আসছে একজন। সম্ভবত সেজন্যই মৃদু কেঁপে উঠল বোটটা। লোকটা সবে ডেকের রেলিং টপকে ভিতরে নামতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় বোটের গায়ের জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে থেকে উঠে এল দুটো বিশাল শুঁড়। মুহূর্তর মধ্যে তারা ডুবুরিকে পেঁচিয়ে ধরে রেলিং থেকে টেনে নামিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সমুদ্রের মধ্যে। সুদীপ্তরা ঘটনার আকস্মিকতায় এতটাই বিহ্বল হয়ে গেল যে কিছু সময় কী করবে তা বুঝে উঠতে পারল না। মনিটরের পর্দাটার দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সেটা কালো হয়ে গেছে। সম্ভবত অক্টোপাসের শুঁড়ের দাপাদাপিতে কোনো কিছু চাপা পড়েছে ক্যামেরার ওপর।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আরও কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ আবারও মৃদু দুলে উঠল বোট। কোথায় যেন একটা ধপ করে শব্দ হল! সম্বিত ফিরে পেয়ে হেরম্যান বললেন, 'চলো, বাইরে চলো। সবাইকে ডাকি। দেখি কাকে নিয়ে গেল অক্টোপাস?'

দরজা খুলে ডেকের দিকে ছুটে রাইখ, আকিরা আর মরগ্যানের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। আকিরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী হয়েছে? বোটের দুলুনিটা আমিও টের পেয়েছি। তাতেই আমার ঘুম ভাঙল। তারপর শুনলাম আপনাদের চিৎকার!'

হেরম্যান তাঁর কথার জবাব না দিয়ে প্রথমে ছুটলেন রাইখের কেবিনের দিকে। কেবিনের দরজা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। কিন্তু কেবিনের ভিতর কেউ নেই। হেরম্যান তারপর ছুটলেন ডেকের উল্টোপ্রান্তে মরগ্যানের কেবিনের দিকে। বেশ কয়েকবার তাঁর নাম ধরে ডাকার পর দরজা খুললেন তিনি। ঘুমচোখে ঈষৎ জড়ানো গলায় তিনি জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'বোট থেকে একজন জলে নেমেছিল। কেবিন থেকে আমরা দেখতে পেলাম সে জল থেকে ডেকে ওঠার সময় একজোড়া অক্টোপাসের শুঁড় তাকে জলে টেনে নিল!' তাঁরা যে দুজন লোককে পরপর জলে নামতে দেখেছিলেন বা মনিটরে দেখা দৃশ্যর কথা অবশ্য বললেন না হেরম্যান। মরগ্যান বিস্মিতভাবে বললেন, 'ও কাকে টেনে নিল?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'সম্ভবত রাইখকে। কারণ সে কেবিনে নেই!'

আকিরার মুখ যেন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি শুধু বললেন, 'উনি রাতে কেন জলে নামলেন?'

মরগ্যান বললেন, 'ও লোকটা বরাবরই সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে আমার। চলুন জলে আলো ফেলে দেখি।' বেশ কয়েকটা জোরালো টর্চ নিয়ে সবাই মিলে যাওয়া হল

ডেকের সেই জায়গাটাতে রেলিং-এর ধারে। আলো ফেলা হল জলে। নিস্তরঙ্গ কালো জল। কোথাও কিছুর চিহ্নমাত্র নেই। বোটের চারপাশের সমুদ্রে বেশ কিছুক্ষণ আলো ফেলে রাইখকে খোঁজার পর আকিরা বললেন, 'আলো না ফুটলে কিছু হবে না। এভাবে ডেকের ধারে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। আবার সেই দানবের শুঁড় যে-কোনো মুহূর্তে উঠে এসে আমাদের কাউকে টেনে নিয়ে যেতে পারে! আমরা বরং কেবিনে ফিরে আলো ফোটার অপেক্ষা করি।' আকিরার গলায় এবার স্পষ্টই ভয়ের আভাস ধরা দিল। ধীর পায়ে নিজেদের কেবিনে ফিরে গেল সবাই। কেবিনে ফিরে হেরম্যান বললেন, 'জলের তলায় যত বিপদই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকুক কাল আমি জলে নামবই। দেখি যদি রাইখের খোঁজ মেলে? তাছাড়া দ্বিতীয় লোকটা কে ছিল? সে কি গুহার মধ্যেই আছে? একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না,যে, ওই গুহাটা দানব অক্টোপাসের বাসস্থান হতে পারে বুঝেও রাইখ কেন ভিতরে ঢুকেছিল? তুমি আমার সঙ্গে জলে নেমে ক্যামেরাটা তুলে এনো। ওতেই তো ছবি তোলা হয়েছে দানব প্রাণীটার। সভ্য পৃথিবীর পণ্ডিত বিজ্ঞানীরা কিন্তু নানাভাবে ব্যাপারটাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চাইবে। ক্যামেরাটাও পরীক্ষা করবে। আমার কিছু হলে তুমি রয়ে যাবে ব্যাপারটা প্রমাণ করার জন্য।'

তাঁর কথা শুনে বিস্মিত সুদীপ্ত প্রথমে বলে উঠল, 'আপনি অক্টোপাসের গুহায় হানা দেবেন?' তারপর বলল, 'তবে আমিও আপনার সঙ্গী হব।'

বাকি রাতটা তারা জেগেই কাটিয়ে দিল। এক সময় ভোরের আলো ফুটল।

আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হতেই সুদীপ্ত-হেরম্যানসহ ডেকে বেরিয়ে এল সকলে। ভালো করে একবার বোটের চারপাশ খুঁজে দেখা হল। রাইখ যদি ভেসে ওঠে। কিন্তু তার চিহ্ন মিলল না কোথাও। হেরম্যান আকিরাকে বললেন, 'আমরা কিন্তু একবার জলে নামব। দেখি রাইখের কোনো সন্ধান মেলে কিনা।'

আকিরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না, জলে নামার দরকার নেই। যে গেছে সে গেছে। তার আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। আপনারা নামলে হয়তো আপনারাও ফিরবেন না।'

মরগ্যান বললেন, 'আমি আর এখানে থাকব না। বোট ছেড়ে দেব।'

হেরম্যান বললেন, 'রাইখের সঙ্গে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল। হয়তো সে অক্টোপাসের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আহত হয়ে পড়ে আছে।' মরগ্যান কথাটা শুনে কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'তবে তাড়াতাড়ি নামুন। আপনি ফিরলেই আমি রওনা দেব।'

জলে নামার জন্য তৈরি হয়ে নিল সুদীপ্তরা। ডুবুরির পোশাক পরার পর সুদীপ্ত কোমরে গুঁজে নিল একটা লম্বা ছুরি। আর হেরম্যানের হাতে ওশোর সেই হারপুন গানটা ধরিয়ে দিয়ে আকিরা বললেন, 'আশা করি আপনারা ঠিক মতো ফিরবেন।' তাঁর কথার জবাবে মৃদু হাসলেন হেরম্যান। তারপর ঝাঁপ দিলেন জলে। পরমুহূর্তে সুদীপ্তও তাঁকে অনুসরণ করল।

গভীর জলতল। পায়ের নীচে ঝিনুকের বিছানা পাতা। মাটিতে পা ঠেকার পর চারপাশে ভালো করে একবার তাকাল। আধো-অন্ধকারের মধ্যে জেগে আছে ডুবো পাহাড়ের তলদেশের গুহাগুলো। একটাও মাছের ঝাঁক কোথাও নেই। কেমন যেন থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে পাতালপুরীতে। হেরম্যান প্রথমে কোমরবন্ধনী থেকে দড়িটা খুলে ফেললেন। তাঁর দেখাদেখি সুদীপ্তও খুলে ফেলল সেটা। দড়ি এত লম্বা নয় যে তা নিয়ে গুহার ভিতর প্রবেশ করা যাবে। দুজনে মুক্ত হয়ে যাবার পর তারা এগোল সেই গুহাটার দিকে। গুহামুখের কিছুটা তফাতে এসে থমকে দাঁড়াল তারা। হেরম্যান ক্যামেরাটা তুলে নিলেন। সেটা অক্ষতই আছে। সম্ভবত অক্টোপাসের শুঁড়ের দাপটেই একরাশ ঝিনুক চাপা পড়ে গেছিল তার ওপর। ক্যামেরাটা তুলে নেবার পর হেরম্যান সুদীপ্তর উদ্দেশে ইশারা করলেন। অর্থাৎ 'এবার গুহায় ঢুকব।'

এক পা-এক পা করে তারা এগোতে যাচ্ছিল সেদিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের পিছনে একটা মৃদু জলোচ্ছ্বাস হল। চমকে উঠে পিছনে তাকিয়েই তারা দেখতে পেল ওপর থেকে একজন নীচে এসে পড়ল। তার পড়ার ভঙ্গি বলে দিল যে লোকটার সম্ভবত কোনো চেতনা নেই। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে সে আর নড়ছে না! সুদীপ্তরা এরপর চিনতে পারল লোকটাকে। আকিরা! যত দ্রুত সম্ভব তাঁর কাছে পৌঁছে গেল তারা। অনুমান সত্যি। আকিরা অচেতন! তিনি এভাবে নীচে নেমে এসে পড়লেন কীভাবে? সুদীপ্তরা মুহূর্তর মধ্যে নিজেদের কর্তব্য স্থির করে নিল। আকিরাকে জাপটে ধরে তারা যখন ভেসে উঠতে যাচ্ছে তখন তাদের মাথার ওপরের জলে একটা আলোড়ন তৈরি হল। সুদীপ্তদের বোটের প্রপেলার চালু হয়ে গেছে! তার জন্যই জলে ওই আলোড়ন! যথাসম্ভব দ্রুত ভেসে উঠলেও বোট তখন ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করেছে। যে ডুবো পাহাড়টার গায়ে বোটটা লাগানো ছিল তার থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাত সরে গেছে বোট। ওপরে ভেসে উঠে কোনোরকমে ডুবো পাহাড়ের একটা খাঁজের মধ্যে আকিরার অচৈতন্য দেহটা গুঁজে হেরম্যান চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মরগ্যান, আমাদের ফেলে কোথায় যাচ্ছেন?'

পাইলট কেবিন থেকে ভেসে এল মরগ্যানের অট্টহাসি।

ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে বোটটা। হঠাৎ সুদীপ্তর নজরে পড়ল বোটের সঙ্গে বাঁধা সেই লম্বা দড়ি দুটো। যা বাঁধা ছিল সুদীপ্তদের কোমরে, ভারহীন অবস্থায় সেগুলো জলের ওপর ভেসে উঠেছে। সুদীপ্ত সেই দড়ি লক্ষ করে আবার ঝাঁপ দিল জলে। তারপর দ্রুত সেই দড়ি ধরে এগোতে লাগল বোটের দিকে। চারপাশে ডুবো পাহাড় থাকায় এখনও বোট তেমন গতি পায়নি। অবশেষে সুদীপ্ত দড়ি ধরে উঠে এল বোটে। তারপর ছুটল পাইলট কেবিনের দিকে।

সুদীপ্ত যে এভাবে বোটে উঠে আসতে পারে তা মরগ্যানের ধারণা ছিল না। তাকে দেখামাত্রই তার হাসি মিলিয়ে গেল। বোটের গতি বাড়িয়ে দিল সে। এক হাতে হুইল ধরে অন্য হাতে কোমর থেকে একটা লম্বা জাহাজি পিস্তল বার করে সেটা সুদীপ্তর দিকে উঁচিয়ে লোকটা বলল, 'আমাকে বাধা দিলেই গুলি চালাব। প্রাণে বাঁচতে চাইলে জলে ঝাঁপ দাও।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুদীপ্ত। মরগ্যান আবার চিৎকার করে উঠল, 'ঝাঁপ দাও। নইলে গুলি চালাব।'

সুদীপ্ত বলল, 'না, আমি যাব না। আপনি আমাদের রেখে পালাচ্ছেন কেন?'

মরগ্যান বোটের গতি আরো বাড়িয়ে হিংস্রভাবে বলল, 'আমি কোনো কথার জবাব দেব না। দশ পর্যন্ত গুনব। তারপর গুলি চালাব। এক, দুই, তিন...'

সুদীপ্ত কি করবে তা বুঝতে পারছে না। মরগ্যান কি সত্যি গুলি চালাবে? মুহূর্ত কেটে চলেছে। মরগ্যান গুনে চলেছে—ছয়, সাত...

সে সাত পর্যন্ত গোনার পর হঠাৎই সুদীপ্তর নজর পড়ল বাইরে। সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে মরগ্যানের খেয়াল নেই তার বোট দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে এক বিশাল ডুবো পাহাড়ের দিকে!

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না সুদীপ্ত। একলাফে পাইলট কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে ডেক টপকে সে ঝাঁপ দিল জলে। শেষ মুহূর্তেও জলে ঝাঁপ দেবার সময়ও মরগ্যানের অট্টহাস্য শুনল সুদীপ্ত। মরগ্যান ভাবল সুদীপ্ত ভয়ে পালাল। কিন্তু মরগ্যান যখন সামনে তাকাল তখন তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে বোটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। জলে ভাসতে ভাসতে সুদীপ্ত দেখল বোটটা উল্কার গতিতে ছুটে গিয়ে পাঁচশো ফুট দূরে ডুবো পাহাড়টার গায়ে সজোরে ধাক্কা মেরে প্রথমে ছিটকে শূন্যে উঠে গেল। আর তারপরই তেলের ট্যাঙ্কে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়ে অত বড় বোটটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রে। বিস্ফোরণের অভিঘাত মনে হয় সমুদ্রের তলদেশেও পৌঁছেছিল। একঝাঁক মরা মাছ ভেসে উঠল ওপরে। চারপাশ শান্ত হবার পর সুদীপ্ত দেখার চেষ্টা করল মরগ্যানকে কোথাও দেখা যায় কিনা। না, তাকে দেখা গেল না। বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তার দেহ। শুধু তার বুট জুতোর একটা পাটি ভাসতে দেখল সে। অগত্যা সে এরপর সাঁতরে ফিরে চলল সেই ডুবো পাহাড়ের শীর্ষদেশের দিকে যেখানে রয়েছেন হেরম্যান আর আকিরা। হেরম্যান ইতিমধ্যে

আকিরাকে টেনে পাহাড়টার নিরাপদ জায়গাতে উঠিয়ে ফেলেছেন। সুদীপ্ত সাঁতরে পাহাড়টার গায়ে উঠতেই উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন হেরম্যান—'তুমি বেঁচে আছ!'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'বোটটা ধাক্কা খাবার আগেই জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। তবে মরগ্যান সম্ভবত বেঁচে নেই।' সংক্ষেপে ব্যাপারটা হেরম্যানকে বলল সুদীপ্ত। ঠিক এই সময় হুঁশ ফিরল আকিরার। একরাশ নোনা জল বমি করে আকিরা উঠে বসলেন। তিনি একটু ধাতস্থ হবার পর সুদীপ্ত বলল, 'আপনি জলে পড়লেন কীভাবে?'

আকিরা জবাব দিলেন, 'বোটের রেলিং ধরে ঝুঁকে আমি আপনাদের ভেসে ওঠার অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ছিটকে জলে পড়লাম। সম্ভবত মরগ্যান কিছু দিয়ে আঘাত করেছিল মাথায়।'

সুদীপ্ত এরপর সব ঘটনা ব্যক্ত করল আকিরাকে। তিনি শুনে বললেন, 'মরগ্যান হঠাৎ আমাদের মারার চেষ্টা করল কেন বোধগম্য হচ্ছে না!'

হেরম্যান বললেন, 'আপাতত আমাদের এই ডুবো পাহাড়ের মাথাতেই থাকতে হবে। যদি কোনো মুক্তো সংগ্রহকারী জাহাজ আমাদের উদ্ধার করে তো ভালো, নইলে ভাঙা বোটের ভাসতে থাকা কাঠগুলো দিয়ে একটা ভেলা বানিয়ে ভেসে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ দুটোই বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে ডুবো পাহাড়বেষ্টিত বলে কাঠগুলো বেশি দূর ভেসে যাবে না। আকিরা বললেন, 'ভেলা তৈরি হলে আমি আপনাদের পাড়ে নিয়ে যেতে পারব আশা করি। ভেলা তৈরির কাজ একটু বিশ্রাম নিয়ে শুরু করব। জলে নামার কাছিগুলো হয়তো খুঁজলে জলে পাওয়া যাবে।'

হেরম্যানের হঠাৎ নজরে পড়ল একটা জিনিসের ওপর। বিস্ফোরণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জাহাজের মাস্তুলটা ভাসতে ভাসতে তাদের ডুবো পাহাড়টার কাছে এসে পড়েছে। হেরম্যান বললেন, 'মাস্তুলটা টেনে তুলে ওর মাথায় আকিরার গায়ের লাল জামাটা বেঁধে নিশান বানিয়ে এই পাহাড়ের মাথার খাঁজে বসিয়ে দেই। যদি দূর থেকে সেটা অন্য কোনো বোটের নজরে পড়ে তারা আমাদের উদ্ধার করতে আসে। জামাটা দিতে আকিরা আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?'

আকিরা সঙ্গে সঙ্গে জামা খুলে ফেললেন। তারপর তিনজন মিলে জলে নেমে মাস্তুল দণ্ডটাকে ওপরে টেনে তোলা হল। আকিরার জামা বাঁধা হল মাস্তুলের মাথায়। সমুদ্রর ওপর জেগে থাকা ডুবো পাহাড়টার পরিধি আনুমানিক একশো ফুট হবে। উচ্চতা কুড়ি ফুট মতো। মাস্তুলটা নিয়ে একেবারে মাথায় উঠে এল সকলে। মাথাটায় একটু সমতল মতো জায়গা। উল্টোদিকের ঢাল ঘেঁষে একটা ছিদ্র মতো জায়গা নজরে এল সুদীপ্তদের। তার গায়ে একটা বেশ বড়ো গোলাকার পাথরও আছে। হেরম্যান বললেন, 'চলো ওই ফোকরে মাস্তুলের গোড়াটা ঢুকিয়ে পাথরটার গায়ে মাস্তুলটা হেলান দিয়ে দাঁড় করাই।'

পরিকল্পনা মতো পাথরটার কাছে গিয়ে তিনজন মিলে মাস্তুলটা বসানো হল সেই গর্তে। সেটাকে ভালো করে গর্তে গাঁথার জন্য চাপ দিতেই এরপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মাস্তুলটা হঠাৎই যেন অনেক গভীরে ঢুকে গেল, আর তার চাড় খেতে গর্তর

গায়ের বিরাট পাথরটা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে সমুদ্রের জলে ছিটকে পড়ল। সেই পাথরের আড়াল থেকে উন্মোচিত হল এক বিরাট গহ্বর। সুদীপ্তরা যেটাকে ছিদ্র মতো ভেবেছিল সেটা গহ্বরেরই অংশ। পাথর চাপা দেওয়া ছিল তার মুখে। মাথার ওপর থেকে সূর্যের আলো ঢুকছে গুহার মুখে। সেই আলোতে সুদীপ্তরা স্পষ্ট দেখতে পেল গুহার মুখ থেকে মানুষের হাতে তৈরি খাঁজকটা সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে নীচের দিকে। কী আছে এই গুহার ভিতর? প্রাচীন কোনো জলদস্যুর লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন? নীচে নামার পথে দেওয়ালের খাঁজে একজোড়া ডুবুরির ফ্লিপারও ওপর থেকে দেখতে পেল তারা। অর্থাৎ এ পথে মানুষের যাওয়া-আসা আছে!

একটু ভেবে নিয়ে হেরম্যান বললেন, 'চলো, দেখা যাক নীচে কী আছে।'

প্রথমে হেরম্যান, তারপর সুদীপ্ত, সবশেষে আকিরা। ধীরে ধীরে সবাই সে গুহায় প্রবেশ করে নীচে নামতে শুরু করল। অন্ধকার দূর করার জন্য মাথায় আটকানো ওয়াটার ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। ডুবুরির পোশাক। সিলিন্ডার খোলার সুযোগ তাদের হয়নি। শুধু ডুবো পাহাড়ে উঠে পায়ের ফ্লিপার খুলেছিল তারা। বেশ অনেকটা নীচে নামার পর হেরম্যান বললেন, 'আমরা প্রায় সমুদ্রতলে পৌঁছে গেছি।'

আর এই কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট বড় একটা হলঘরের মতো জায়গাতে তারা প্রবেশ করল। তাদের পায়ের নীচে ভেজা পাথর, দেওয়ালের গায়ে পুরু লবণের প্রলেপ। বোঝাই যাচ্ছে এ জায়গাতে জল ঢোকে। এ জায়গা সমুদ্রের তলদেশে ডুবো পাহাড়ের প্রাকৃতিক গুহা। পায়ের দিকের পাথুরে মাটি একদিকে বেশ ঢালু। সুদীপ্তরা দেখতে পেল, নানা অদ্ভুত যন্ত্রপাতি রাখা আছে গুহার মধ্যে। আর ঢালু দিকের অংশে রাখা আছে পনেরো ফুট মতো লম্বা একটা ছোট্ট সাবমেরিন।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল কাছ থেকে। সুদীপ্ত সে দিকে মাথাটা ঘোরাতেই তার মাথায় বাঁধা টর্চের আলোতে সে দেখতে পেল একটা মানুষ জলকাদা মাখা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। কোমর থেকে ছুরিটা খুলে সে ছুটে গেল লোকটার কাছে। আরে এ যে রাইখ! দড়িবাঁধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে! হেরম্যান আর আকিরাও এসে দাঁড়ালেন সে জায়গাতে। সুদীপ্ত দড়ির বাঁধন কেটে দিতেই রাইখ উঠে বসল। সুদীপ্তদের দেখে সে বলল, 'ও তোমরা! আমি ভাবলাম তারা আবার ফিরে এসেছে আমাকে শিকল বেঁধে ওই কঙ্কালটার মতো ওই গুহামুখে বসাবার জন্য।'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'তারা কারা?'

রাইখ জবাব দিল, 'মরগ্যান আর তার এক মুখোশধারী সঙ্গী।'

হেরম্যান বললেন, 'তোমাকে ডেকের রেলিং থেকে সেই দানব অক্টোপাস টেনে নিয়ে গেল দেখেছি। তার কবল থেকে তুমি মুক্ত হলে কীভাবে?' রাইখ একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, 'সেই অক্টোপাসটাই তো আমাকে এখানে টেনে আনল ডুবো পাহাড়ের সেই গুহার মধ্যে দিয়ে এ জায়গাতে। এটাই তো সেই দানব অক্টোপাসের বাসা।' এই বলে সুদীপ্তর হাত ধরে উঠে দাঁড়াল রাইখ।

হেরম্যান বললেন, 'এটা অক্টোপাসের বাসা?'

রাইখ বলল, 'হ্যাঁ। চলুন, সে এই গুহাতেই আছে। তবে তাকে দেখার পর আপনি কী বলবেন জানি না।'—এই বলে রাইখ এগোল গুহাটার অন্যপ্রান্তে। তার পিছন পিছন কিছুটা এগোবার পর টর্চের আলোতে তারা যা দেখতে পেল তাতে থমকে গেল সবাই। মেঝের এক জায়গাতে একটা বিরাট জলকুণ্ডের মতো জায়গাতে পড়ে আছে একটা অক্টোপাস। দেহটা তার কুণ্ডের ভিতর। শুঁড়গুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বাইরে। এক একটা শুঁড়ের দৈর্ঘ্য অন্তত কুড়ি ফুট হবে। কুৎসিত-কদাকার এক প্রাণী! হেরম্যান তার দিকে হারপুন গানটা তাগ করে বললেন, 'ও কি মরে গেছে?'

রাইখ বলল, 'ও জীবিত বা মৃত কোনোটাই নয়।' রাইখ এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটা শুঁড় তুলে ধরে বলল, 'এটা ধরে দেখুন।'

সুদীপ্ত আর হেরম্যান গিয়ে শুঁড়টাতে হাত দিয়েই বিস্মিত হয়ে গেল। আকিরাও হাত দিলেন তাতে।

রাইখ হেরম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে আশাহত করলাম বলে দুঃখিত। আসলে আপনার ওই দানব অক্টোপাস কৃত্রিম। পাম্পের সাহায্যে এর মধ্যে বাতাস ভরে একে জলতলের ওপরে তোলা হয়। তারপর যন্ত্রের সাহায্যে একে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাতাস বার করে আবার নীচে নামানো হয়।'

রাইখের কথা শুনে আকিরা বলে উঠলেন, 'এই রোবট অক্টোপাস আমি আগে জাপানের "সি-পার্কে" দেখেছি। এক দুটো বাহু মাত্র কাজ করে। যার সাহায্যে রাইখকে এখানে ধরে আনা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন জাপানিরা রোবট টেকনোলজিতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ?' রাইখ বলল, 'ঠিক তাই। ওর দুটো বাহু আমাকে এখানে ধরে আনল। তারপর মরগ্যান আর সেই মুখোশধারী আমাকে বাঁধল।' সুদীপ্ত দেখতে পেল গুহার অভ্যন্তরে অস্পষ্ট আলোতেও একটা আশাহত ভাব ফুটে উঠল হেরম্যানের মুখে। যার খোঁজে এত দূর আসা সে শেষে একটা রোবট!

ব্যাপারটা দেখে সুদীপ্তরও কম কষ্ট হল না। সে রাইখকে বলল, 'তুমি কি ব্যাপারটা জানতে? মাঝরাতে তুমিই বা জলে নেমে এই গুহাতে ঢুকেছিলে কেন? জলের নীচে ক্যামেরা পাতা হয়েছিল। আমরা সব দেখেছি।'

রাইখ জবাব দিল, 'গুহার ভিতর কিছু আছে তো কঙ্কালটা দেখে আমি অনুমান করেছিলাম। মরগ্যানকে জলে নামতে দেখে তার পিছু পিছু আমি নীচে নেমে গুহায় ঢুকলাম। ভিতরে ঢুকে অবশ্য তাকে দেখতে পাইনি। এই গুহাটা দেখে আমি যখন বোটে উঠতে যাচ্ছি তখনই অক্টোপাসের জালে পড়লম। সে আমাকে এখানে আনার পর অবশ্য মরগ্যান আর সেই মুখোশধারীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। আমাকে এখানে বেঁধে তোমরা যে পথ বেয়ে নীচে নামলে সে পথ দিয়ে মরগ্যান ওপরে উঠে গেল, আর এখানে আর একটা ছোট সাবমেরিন ছিল। সেটা ঠেলে নিয়ে গুহার বাইরে সম্ভবত সমুদ্রে ভেসে গেল মুখোশধারী। এর চেয়ে বেশি যা বলার তা পরে বলব তোমাদের।'

সুদীপ্ত বলল, 'তোমাকে রোবট অক্টোপাসটা ধরার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ধপ্ করে শব্দ হয়েছিল বোটে। এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। এই ডুবো পাহাড়ের গায়েই লাগানো ছিল আমাদের বোট। মরগ্যান এই গহ্বর থেকে ওপরে উঠে সম্ভবত পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে বোটে নেমে নিজের কেবিনে ঢুকেছিলেন। ওটা তারই শব্দ!

হেরম্যান বেশ বিমর্ষ স্বরে বললেন, 'কিন্তু এখন কী করণীয় আমাদের? আমাদের তো এ জায়গা থেকে মুক্তি পেতে হবে। পাহাড়ে ধাক্কা লেগে বোটে বিস্ফোরণ হয়েছে। মরগ্যান মারা গেছে।'

রাইখ প্রথমে হেরম্যানের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল সাবমেরিনের কাছে। সাবমেরিনের খাঁজ থেকে একটা ঢালু খাঁজ নেমে গেছে। ইস্পাতের তৈরি একটা বন্ধ দরজার দিকে। সেটা সম্ভবত একটা 'লক গেট'। তার ওপাশেই আর একটা টানেল আছে। তার ওপাশে আছে আর একটা লক গেট সেই গুহামুখের কিছুটা ভিতরে। প্রথমে এ গুহার লক গেট খুলে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে এই গেটটা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে এখানে জল না ঢোকে। তারপর গুহামুখের লক গেট খুলে বাইরে বার হয় লোক, ওই দূর নিয়ন্ত্রিত দানব অক্টোপাস বা সাবমেরিন। রাইখ জানাল এসব কথা।

এরপর রাইখ হেরম্যানের মাথার আলোটা নিয়ে সাবমেরিনের গেটটা খুলে ভিতরে ঢুকে কিছুক্ষণ কী সব পরীক্ষা করল। যান্ত্রিক শব্দও শোনা গেল জলযানটার ভিতর থেকে। সাবমেরিন থেকে নেমে এসে রাইখ বলল, 'এগুলো হল "স্পাই সাবমেরিন"। সমুদ্রের নীচে ছোট খাঁড়িতেও ঢুকতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান নৌসেনারা ব্যবহার করত। এই সাবমেরিন আমি চালাতে পারি।'

এরপর সে হেরম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা নিয়ে আমি বেরোব। মাত্র দুজন লোক বসতে পারে এই জলযানে। আমি বেরোবার পর এই লক গেট বন্ধ করে আপনারা ডুবো পাহাড়ের মাথায় অপেক্ষা করবেন। পাড় থেকে বোট নিয়ে এসে আমি উদ্ধার করে নিয়ে যাব। আশা করি সন্ধ্যার মধ্যেই সব মিটে যাবে। আমার সঙ্গে একজন সঙ্গী হতে পারেন। কে যাবেন বলুন?'

সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'আপনি অনুমতি দিলে আমি যেতে পারি ওর সঙ্গে।'

হেরম্যান বললেন, 'যাও। আমরা অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্য।'

রাইখ সুদীপ্তকে বলল, 'ডুবুরির পোশাকগুলো সঙ্গেই নাও। আর হেরম্যান, আপনি আপনার সিলিন্ডার আর মাস্কটা আমাকে দিন।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল রাইখ আর সুদীপ্ত। হাতল ঘুরিয়ে লক গেট ওপরে টেনে তোলা হল। সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নেমেছে ওপাশে, তার মাথায় আর একটা লক গেট। সুদীপ্তকে নিয়ে সাবমেরিনে উঠে বসার আগে রাইখ হেরম্যানকে বলল, 'আমরা এই গেটটা দিয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু গেটটা বন্ধ করে দেবেন, নইলে দ্বিতীয় গেটটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের জল গ্রাস করে নেবে এ জায়গা। আপনারা বাঁচবেন না।' আকিরা আর হেরম্যান বললেন, 'আচ্ছা'।

ডুবো জাহাজের ঢাকনা বন্ধ করে ইঞ্জিন চালু করতেই ঢাল বেয়ে সেটা সুড়ঙ্গে নেমে এগিয়ে গেল দ্বিতীয় লক গেটের দিকে। হেরম্যান আর আকিরা সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্তদের পিছনের গেটটা বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সুদীপ্তদের সামনের লক গেটটা খুলে গেল। তারা বুঝতে পারল আসলে পিছনের গেটটা বন্ধ করলেই সামনেরটা আপনা থেকেই খুলে যায়। সেটা খুলতেই প্রচণ্ড বেগে জল গ্রাস করে নিল সুড়ঙ্গ। ঢালু পথ বেয়ে সুদীপ্তদের দেখা সেই গুহামুখ দিয়ে বাইরে সমুদ্রতলে বেরিয়ে এল সাবমেরিন।

সাবমেরিনের সামনের কাচের আধার দিয়ে দৃশ্যমান হল সমুদ্রের তলদেশের সব কিছু। এ জায়গা সুদীপ্তদের পরিচিত। এখানে নামত তারা। পায়ের নীচে সাদা ঝিনুকের বিছানা। চারপাশে ডুবো পাহাড়, আধো-অন্ধকারে জেগে থাকা ডুবো পাহাড়ের ছোট-বড় গুহামুখ. মাটিতে গাঁথা সেই কঙ্কালটার ছিন্ন শিকলটাও চোখে পড়ল সুদীপ্তদের। সম্ভবত সেটা দেখেই রাইখ বলল, 'সেই কঙ্কালটাও তবে জলে ভেসে গেছে তাই না?'

সুদীপ্ত প্রত্যুত্তরে 'হ্যাঁ' বলাতে রাইখ যেন বিমর্ষভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

কিন্তু কোনদিকে যাওয়া যায়? চারপাশেই তো পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে ডুবো পাহাড়! বেশ কিছুক্ষণ সে জায়গাতে ছোট্ট জলযানটা ঘুরপাক খাবার পর শেষ পর্যন্ত পথ পাওয়া গেল। দুপাশে প্রবাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছাদহীন একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে সামনের দিকে। রাইখের সাবমেরিন সেই সুড়ঙ্গে ঢুকে এগোতে থাকল। রাইখ বলল, 'এ ধরনের প্রবাল প্রাচীরগুলো সমুদ্রের তলদেশে এক-এক সময় কুড়ি-পঁচিশ মাইলও লম্বা হয়। দেখি এ সুড়ঙ্গ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়?'

এঁকেবেঁকে এগিয়েছে প্রবাল প্রাচীর। তার মধ্যে মাঝে মাঝে মাছের বড় বড় ঝাঁক খেলা করছে। সাবমেরিন কাছে আসতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। সাবমেরিনটাকে নির্ঘাত কোনো বড় মাছ ভেবেছে তারা। একবার একটা প্রায় সাবমেরিনের আকারেরই বড় হাঙর প্রবাল সুড়ঙ্গে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। বারকয়েক সে তার নাক দিয়ে গুঁতো দিল সাবমেরিনের সামনের কাচের দেওয়ালে। ভিতরে বসেও সুদীপ্ত কেঁপে উঠল তার ভয়ংকর মুখগহ্বরে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি দেখে। যদি কাচের দেওয়াল ভেঙে যায় কী হবে? তবে সেসব কিছু ঘটল না। সাবমেরিনটা তার খাদ্যবস্তু নয় বুঝতে পেরে সে অন্য দিকে চলে গেল। এক জায়গাতে বেশ অনেক জায়গা জুড়ে উজ্জ্বল লাল বর্ণের পাথরের মতো কী যেন ছড়িয়ে আছে। রাইখ বলল, 'এগুলো মৃত প্রবাল কীট। জমে পাথর হয়ে গেছে। যে পাথর রত্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কত লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ এখানে পড়ে আছে কে জানে!' আর একবার চারপাশে দেখা গেল প্যারাশুটের

মতো জেলিফিশ আর দুষ্প্রাপ্য 'সি-হর্স'-এর ঝাঁক। এসব দেখে এত বিপদের মধ্যেও মোহিত হয়ে গেল সুদীপ্ত। মনে মনে সে ভাবল, নাইবা তাদের দেখা হল দানব অক্টোপাসের সঙ্গে, কিন্তু এই অজানা পৃথিবীর যে দৃশ্য সে দেখতে পাচ্ছে তা দেখার সৌভাগ্য ক-জন মানুষের ভাগ্যে হয়? রাইখের মুখ কিন্তু গম্ভীর। সে শুধু বলল, 'সম্ভবত ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা। সাবমেরিনের মিটার সংকেত দিচ্ছে আমরা ক্রমশ পাড়ের দিকে এগোচ্ছি।'

আরও বেশ কিছুটা পথ চলার পর যাত্রা শুরুতে প্রায় একঘণ্টা পর তারা একটা উন্মুক্ত স্থানে এসে পৌঁছল। তাদের কিছুটা তফাতে শুরু হয়েছে আর একটা টানেল বা সুড়ঙ্গ। সেটা দেখে একটু অবাক হল সুদীপ্তরা। না, সেটা প্রবাল প্রাচীরের সুড়ঙ্গ নয়। মোটা কাচ বা ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরি বর্তুলাকার ছাদঅলা চারপাশ ঢাকা স্বচ্ছ সুড়ঙ্গ। যে সুড়ঙ্গ দিয়ে "সি-পার্কে" চারপাশের উন্মুক্ত সমুদ্রর তলদেশ দেখানো হয় পর্যটকদের। থাইল্যান্ডে একটা সি-পার্কে বেড়াতে গিয়ে একবার এ ধরনের টানেলে নেমেছিল সুদীপ্ত। টানেলের মাথার ওপরের সামান্য কিছু অংশই জলতলের বাইরে জেগে আছে। সেখান থেকে বাইরের পৃথিবীর আলো প্রবেশ করছে টানেলে। বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে টানেলটা। আর এরপরই আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল তাদের। টানেলের কিছুটা তফাতে জলতলে সামুদ্রিক উদ্ভিদের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ছোট্ট সাবমেরিনের মাথা। আকারেও দেখতে সেই জলযানও ঠিক সুদীপ্তদের সাবমেরিনটার মতো। সেটা দেখামাত্রই রাইখ স্বগতোক্তি করল, 'আমার অনুমান তবে মিথ্যা নয়।'

'কী অনুমান?'

রাইখ বলল, 'পরে সব বলব। মাস্ক পরে তৈরি হয়ে নাও। জলে নেমে আমরা ওই টানেলে ঢুকব।' এই বলে সে নিজেও হেরম্যানের দেওয়া মাস্ক, সিলিন্ডার এসব পরতে লাগল। সমুদ্রের তলদেশে ধীরে ধীরে নেমে পড়ল সাবমেরিন। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল রাইখ আর সুদীপ্ত। চারপাশে খেলে বেড়াচ্ছে রঙিন মাছের ঝাঁক। তার মধ্যে দিয়ে সুদীপ্তরা এগোল টানেলের দিকে। স্টিলের ফ্রেমের খাঁচায় বসানো আছে টানেলটা। সেই খাঁচা বেয়ে টানেলের মাথায় উঠল দুজন। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাদের চোখে ধরা দিল সমুদ্রের বাইরের আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী। সূর্যের আলোতে ধাঁধিয়ে গেল সুদীপ্তর চোখ। কিন্তু বাইরে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল যে জায়গাটা শিকোকু সি-পার্ক। টানেলের মাথার ওপর একটা বৃত্তাকার দরজা পাওয়া গেল ভিতরে নামার জন্য। ম্যানহোলের মতো সেই দরজা দিয়ে টানেলের মধ্যে লাফিয়ে নামল তারা দুজন। তারপর টানেল ধরে এগোল সোজা সামনের দিকে। প্রায় দুশো ফুট লম্বা টানেলের শেষ প্রান্তে একটা কাচের ঘরের ভিতরে উপস্থিত হয়ে দেওয়ালের একপাশে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। কাচের দেওয়ালের ওপাশেই দেখা যাচ্ছে শিকোকু পার্কের সেই দানব অক্টোপাস! বিশাল ঘরের মতো এই নতুন অ্যাকোরিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে প্রাণীটাকে। অ্যাকোরিয়ামের উল্টোদিকের কাচের দেওয়ালের ওপাশে সমুদ্রের তলদেশ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে সেদিকের দেওয়ালে

মৃদু মৃদু শুঁড়ের ঝাপটা দিচ্ছে ভয়ংকর কুৎসিত প্রাণীটা। কাচের পর্দার ওপাশে সমুদ্র তাকে ডাকছে। প্রাণীটা হয়তো চেষ্টা করছে কাচের পর্দা ভেদ করে সমুদ্রে ফিরে যাবার জন্য। ঠিক যেমন খাঁচার পাখি তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে, ঠিক তেমনই প্রাণীটার ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ হল। সুদীপ্তরা দেখতে পেল কাচের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন শিকোকু পার্কের মালিক মিস্টার শিকোকু। সুদীপ্তদের সেখানে দেখে স্পষ্ট বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চোখে। আর তাঁকে দেখেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রাইখের। প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে শিকোকু রাইখকে বললেন, 'তুমি তাহলে এখানে পৌঁছে গেলে!' রাইখ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, এলাম। আমার জিনিসটা এবার আমাকে ফেরত দিন।'

'যদি না দিই?' প্রশ্ন করলেন শিকোকু।

রাইখ এবার সুদীপ্তকে চমকে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সুদীপ্তর কোমরে গোঁজা লম্বা ছোরাটা টেনে নিয়ে কর্কশভাবে বলল, 'না দিলে এটা তোমার বুকে ঢুকে যাবে। তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। আমার পূর্বপুরুষদের খুনের বদলা, আমাকে খুনের চেষ্টার বদলা এখনই নেব আমি। জিনিসটা আমাকে দিলে আমি তোমাকে শুধু পুলিশের হাতে তুলে দেব। আইনে তোমার যা বিচার হবার হবে। সেখানে হয়তো আইনের ফাঁক গলে তুমি মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু ওটা আমার হাতে না দিলে আর সে সুযোগ তুমি পাবে না।' এই বলে সে কয়েক পা এগিয়ে গেল শিকোকুর দিকে।

শিকোকু পিছু হটে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তাঁর মুখ। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে ধরাই যখন পড়ে গেছি তখন এত বছর আগলে রাখা জিনিসটা তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। ওটা কোথায় আছে জানো। ওই অক্টোপাসের খাবারের বাক্সের মধ্যে। ওর গায়ে দেখো শিকল লাগানো আছে। অ্যাকোরিয়ামের গায়ের স্টিলের ফ্রেমের গা বেয়ে ওপরে ওঠো। ওর ছাদে একটা গর্ত আছে। ওখান দিয়ে শিকলটা টেনে বাক্সটা তুলে নাও। ওখানে দিয়েই বাক্সটা ওঠানো-নামানো হয়।'

সুদীপ্তরা এবার খেয়াল করল যে সত্যিই একটা সরু শিকল বাক্সটা থেকে উঠে গেছে অ্যাকোরিয়াম ঘরের ছাদের দিকে। রাইখ বলল, 'আপনিই ওপরে উঠে তুলে আনুন বাক্সটা।'

শিকোকু এবার বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন, 'যে জিনিসটা আমি এত বছর আগলে রাখলাম, যার জন্য দেশ ছেড়ে এতদূরে আছি, এত বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি সেটা আমি কিছুতেই নিজে থেকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারব না। তুমি আমাকে খুন করলেও নয়। ওটা তোমাকে নিজের হাতে তুলে নিতে হবে।'

শিকোকুর কথা শুনে যেন ধন্দে পড়ে গেল রাইখ। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ছুরিটা সুদীপ্তর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'এই লোকটা তোমাদের সবাইকেই মারতে চেয়েছিল। ওকে পালাতে দেবে না। দরকার হলে ছুরি বসিয়ে দেবে। আমি জিনিসটা উঠিয়ে আনি।'—এই বলে সে অ্যাকোরিয়ামটার দিকে এগিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তর

মধ্যেই সে চড়ে বসল কাচের ঘরটার মাথায়।

রাইখ এরপর সম্ভবত নীচু হয়ে কাচের ঘরের মাথার ফোকর দিয়ে চেন ধরে বাক্সটা টেনে তুলতে যাচ্ছিল। সুদীপ্ত তাকিয়েছিল সেই দিকে। ঠিক সেই সময় শিকোকু অট্টহাস্য করে উঠলেন। তাঁর হাতে কখন যেন উঠে এসেছে একটা রিভলভার। তিনি সুদীপ্তকে বললেন, 'ছুরিটা ফেলে দিন। নইলে গুলি করে মারব দুজনকে।'

অগত্যা সুদীপ্ত ছুরিটা ফেলে দিল হাত থেকে। শিকোকু কুড়িয়ে নিলেন সেটা। বাঁচবার একটা শেষ চেষ্টা করার জন্য এরপর রাইখ ওপর থেকে শিকোকুর ওপর ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই শিকোকু দেওয়ালের গায়ে সম্ভবত একটা বোতাম টিপলেন। রাইখের পায়ের নীচের কাচের পাটাতন সরে গেল! সুদীপ্ত দেখতে পেল রাইখ ওপর থেকে অক্টোপাসের ঘরের নীচে আছড়ে পড়ল। শিকোকু আবার অট্টহাস্য করে বলে উঠলেন, 'দেখা যাক ও অক্টোপাসের কবল থেকে জিনিসটা ছিনিয়ে আনতে পারে কিনা।'

বিরাট ঘরের মতো কাচের জলাধার। লম্বা-চওড়া দু-দিকেই প্রায় তিরিশ ফুট হবে। উচ্চতা অন্তত পনেরো ফুট। তার মেঝেতে আছড়ে পড়ার পরই উঠে দাঁড়াল রাইখ। কিন্তু সে নিরস্ত্র। অক্টোপাসটা ফিরে তাকিয়েছে তার দিকে। তার শুঁড়গুলোও ধীরে ধীরে রাইখের দিকে ফিরছে। সুদীপ্ত অসহায়। তার দিকে শিকোকুর রিভলভারের নল তাগ করা। প্রথমে অক্টোপাসের একটা বাহু সাপের ফণার মতো এগোল রাইখের দিকে। রাইখ কাচের ঘরের এক কোণে সরে এল। তারপর দানবের আর একটা বাহু একদম তার কাছে চলে এল। হাতের আঘাতে রাইখ সেটা সরিয়ে দিল। এরপর পরপর বেশ কয়েকটা এমন ঘটনা ঘটল। ফাঁদে পড়া ইঁদুরকে যেমন বিড়াল মারার আগে একটু খেলিয়ে নেয়, তেমনই শিকারকে মারার আগে তাকে যেন একটু খেলিয়ে নিচ্ছে অক্টোপাসটা। বহুদিন পর কাউকে সে তার নাগালের মধ্যে পেয়েছে। তাই যেন একটু মজা করছে তাকে নিয়ে। সুদীপ্ত খেয়াল করল রাইখের অঙ্গ সঞ্চালন শ্লথ হয়ে আসছে। পিঠে সিলিন্ডার থাকলেও উত্তেজনায় অক্সিজেন মাস্কটা লাগাতে ভুলে গেছে। সুদীপ্ত চিৎকার করে উঠল, 'অক্সিজেন মাস্ক লাগাও! মাস্ক লাগাও!' কিন্তু তার কণ্ঠস্বর সম্ভবত রাইখের কানে পৌঁছল না। শিকোকু তাই দেখে অট্টহাস্য করে বললেন, 'অক্টোপাসটা ওকে ধরার পর আপনারও ব্যবস্থা করব। চিন্তা নেই।' সেই ভয়ংকর প্রাণীটাও মনে হয় এক সময় বুঝতে পারল যে তার শিকার অবসন্ন হয়ে পড়েছে। শিকারকে মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরার জন্য সে এরপর একসঙ্গে তার চার-পাঁচটা বাহু সাপের ফণার মতো তুলে ধরল রাইখের দিকে। সেই ভয়ংকর দৃশ্য না দেখার জন্য সুদীপ্ত অন্যদিকে মুখ ফেরাতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় রাইখ নিজেকে বাঁচাতে একটা শেষ চেষ্টা করল। পিঠ থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডারটা খুলে সেটা সজোরে ছুড়ে মারল অক্টোপাসটার দিকে। রাইখ লক্ষ্যভ্রষ্ট হল ঠিকই। কিন্তু কাচের দেওয়ালে সেটা আছড়ে পড়ে একটা ছোট বিস্ফোরণ ঘটাল। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল কাচের ঘরটা। সমুদ্রর জল মুহূর্তের মধ্যে সুদীপ্তরা যেখানে ছিল সেখানে প্রবেশ করে বাইরের সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সবাইকে।

বেশ কিছুক্ষণ জলের তোড়ে ওলোটপালোট খাবার পর অবশেষে মাটি খুঁজে পেল সুদীপ্ত। সে উঠে দাঁড়িয়ে অক্সিজেনের নল গুঁজে নিল নাকে। চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল রাইখ বা শিকোকু জলের তোড়ে কোনদিকে গেছে। প্রাথমিকভাবে কাউকে সে দেখতে পেল না। তাহলে কি তারা আরও দূরে ভেসে গেল? কাউকে না দেখে এরপর ওপরে ভেসে উঠতে যাচ্ছিল সুদীপ্ত। হয়তো রাইখ আর শিকোকু দুজনেই ওপরে উঠে গেছে। সুদীপ্তর সামনে একটা প্রবাল প্রাচীর। জলের তোড়ে এসে তার গায়েই আটকে গেছে সে। সুদীপ্ত ঠিক যখন ভেসে উঠতে যাচ্ছে তখনই হঠাৎ সেই প্রবাল প্রাচীরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন শিকোকু। তিনি তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। রিভলভার না থাকলেও তাঁর হাতে ধরা সুদীপ্তর সেই লম্বা ছুরি বা মেরিন নাইফটা। তারা দুজনেই জলতলে থাকলেও শিকোকুর চোখে ফুটে উঠেছে জিঘাংসা। কাছে এসে সুদীপ্তকে লক্ষ্য করে ছুরি চালাতে শুরু করলেন তিনি। সুদীপ্ত এদিক-ওদিক সরে গিয়ে সেই ছুরির আঘাত এড়াবার চেষ্টা করে যেতে লাগল। তবুও শেষরক্ষা হল না। হঠাৎই শিকোকুর লম্বা ছুরির আঘাতে কেটে গেল সুদীপ্তর অক্সিজেনের নলটা। সুদীপ্ত জাপানি ডুবুরি নয়। নলটা কেটে যেতেই তার দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন শিকোকু। তার আঘাত এড়াতে গিয়ে এক সময় মাটিতে পড়ে গেল সুদীপ্ত। শিকোকু চেপে বসলেন তার বুকের ওপর। অক্সিজেনের অভাবে অবসন্ন হয়ে পড়েছে সুদীপ্ত। শিকোকুকে বাধা দেবার শক্তি তখন আর তার নেই। সুদীপ্ত দেখল তার ওপর বসা শিকোকুর ছুরি-ধরা হাতটা ওপরে উঠল ছুরিটা সুদীপ্তর বুকে আমূল বসিয়ে দেবার জন্য। সুদীপ্ত অসহায়। এই বুঝি ছুরিটা নেমে আসে! ছুরিটা কিছুটা নেমে এল ঠিকই কিন্তু সেটা তার বুক স্পর্শ করার আগেই একটা হাত যেন কোথা থেকে এসে জাপটে ধরল শিকোকুর ছুরি-ধরা হাতসমেত দেহটা। যে হাতটা শিকোকুকে আলিঙ্গন করল সেটা মানুষের হাত নয়, অক্টোপাসের বাহু। সেই দানব ডলফিনি অক্টোপাসটা কোথা থেকে যেন আবির্ভূত হয়ে তার বাহুর আলিঙ্গনে এক ঝটকায় শিকোকুকে সুদীপ্তর বুকের ওপর থেকে তুলে নিয়ে অন্যদিকে এগোল। মৃত্যু আলিঙ্গনে ছটফট করতে লাগলেন শিকোকু। আর এরপরই রাইখ এসে অবসন্ন সুদীপ্তকে মাটিতে উঠিয়ে দাঁড় করাল। রাইখের হাতে ধরা অক্টোপাসের খাঁচার সেই বাক্সটা। ওপরে ভেসে ওঠার আগে তারা একবার তাকাল সামনের দিকে। তারা দেখল সেই দানব অক্টোপাসটা মিস্টার শিকোকুকে মৃত্যু আলিঙ্গনে জড়িয়ে হারিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের গভীরে দূর থেকে দূরে। একটা ক্ষীণ রক্তরেখা সে ছেড়ে রেখে যাচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে তার যাত্রাপথে। সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সূর্যালোকে ভেসে উঠল রাইখ আর সুদীপ্ত। এই প্রথম সুদীপ্ত অনুভব করল পৃথিবীর বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নেওয়াটা কত সৌভাগ্যের! কত আনন্দের!

পরিশিষ্ট ঃ মারমেড বিচের সেই হোটেলের ঘরে একটা টেবিল ঘিরে বসেছিল সুদীপ্ত, হেরম্যান, আকিরা আর রাইখ। বাইরে সকালের সূর্যস্নাতা তটরেখা। সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে সেখানে। নীল আকাশের নীচে সোনালি রোদ গায়ে মেখে সমুদ্রস্নান করছে টুরিস্টরা।

বেশ সুন্দর একটা দিন। আগের দিন বিকালে সরকারি রেসকিউ টিম নিয়ে সমুদ্রের গভীরে সেই ডুবো পাহাড় থেকে হেরম্যান আর আকিরাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। সুদীপ্তর এক-এক সময় মনে হচ্ছে যে গত কদিনের ঘটনা, সেই ডুবো পাহাড় ঘেরা জায়গা, সমুদ্রর তলদেশের সেই গুহামুখ, সেই গুহা, সেই অক্টোপাস, তার সঙ্গে রাইখের লড়াই, সুদীপ্তর বুকের ওপর বসে থাকা শিকোকুর উদ্যত ছুরি—এ সবই যেন একটা স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন মানে দুঃস্বপ্ন!

টেবিল ঘিরে চেয়ারে বসে কথা চলছিল। বক্তা মূলত রাইখ। শ্রোতা অন্যরা। রাইখ বলল, 'ওই দানব অক্টোপাস মিস্টার শিকোকুকে টেনে নিয়ে যাওয়ায় যে ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল তার সূচনা কিন্তু বহু বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান সাগরে। শিকোকুর ঠাকুর্দা আর আমার ঠাকুর্দা তখন একসঙ্গে কাজ করছেন জাপ-সমুদ্রে। হঠাৎ তাঁরা সমুদ্রর তলদেশ থেকে খুঁজে পেলেন এক দুমূর্ল্য জিনিস। উভয়ের পরিবারের সামান্য ক'জন লোক ছাড়া ব্যাপারটা প্রাথমিকভাবে না জানলেও কীভাবে যেন তা সরকারের কানে পৌঁছে গেল। জার্মান সরকার বলল যে যুদ্ধ মিটে গেলে সেটা সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রমাদ গুনলেন দুই ডুবুরি। কীভাবে রক্ষা করা যায় সেই জিনিসটা? তখনও যুদ্ধের যা গতিপ্রকৃতি তাতে জাপ-জার্মান জিততে চলেছে। পরে অবশ্য উল্টো ঘটনা ঘটেছিল। পরাজিত হয়েছিল জার্মানি। যাই হোক, সে সময়ে সেই দুই ডুবুরি মিলে ঠিক করলেন জিনিসটা নিয়ে দূরে পালাতে হবে। পালাতে হবে এমন দেশে যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে না। শিকোকুর ঠাকুর্দা ওশাকু আর আমার ঠাকুর্দা পাওয়েল রাইখ মিলে যে দেশটা নির্বাচন করলেন সেটা হল এই অস্ট্রেলিয়া। ওশাকু তার আগে এই অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতটে এসেছিলেন ডুবুরির কাজে মুক্তো সংগ্রহ করতে। এ জায়গা তাঁর চেনা ছিল। সেসময় জাপান সমুদ্রে মার্কিন বোমারু বিমান আর সাবমেরিনের হানা চলছে। সেই গোলযোগের সুযোগ নিয়ে সে জিনিসটা সঙ্গে করে একটা সাবমেরিনে তাঁরা দুজন পাড়ি দিলেন এই অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে। এখানে তাঁরা পৌঁছেও গেলেন। সামরিক বাহিনী ধারণা করল মার্কিন টর্পেডো হানায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। আমরা শুধু জানলাম তাঁরা বেঁচে আছেন। এখানে এসে মুক্তো সংগ্রহকারী ডুবুরিদের দলে মিশে গেলেন তাঁরা।'

একটানা কথাগুলো বলে একটু থামল রাইখ। তারপর আবার বলতে শুরু করল—'কিন্তু এখানে আসার এক বছরের মধ্যেই ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। শেষ চিঠিতে দাদু আমাদের লিখেছিলেন যে জিনিসটা তাঁরা বিক্রি করার চেষ্টা করছেন। সে কাজ মিটে গেলেই তিনি দেশে ফিরে আসবেন। ততদিনে অবশ্য যুদ্ধ থেমে গেছে। হিটলারের পতন হয়েছে। লাল ফৌজ মুক্ত করেছে জার্মানিকে। শেষ চিঠি তিনি পাঠিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই মারমেড সমুদ্রতট থেকেই। আর এরপর থেকেই ঠাকুর্দার সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আমাদের। তাঁর খোঁজ আমরা পেলাম না। আমাকে শিশু অবস্থায় রেখে আমার বাবা বছর কুড়ি পর আমার দাদুর সন্ধানে এখানে এসে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। এখন বুঝছি হয়তো তাঁকেও খুন করে শিকোকু বা তার

বাবা-ঠাকুর্দারা। তবে আমি আমার বাবার সন্ধান না পেলেও ঠাকুর্দার সন্ধান কিন্তু পেয়েছি...'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'কোথায় পেলে?'

রাইখ জবাব দিল, 'যে কঙ্কালটা গুহার মুখে ছিল সেটা আমার ঠাকুর্দার কঙ্কাল। ওঁর হাতের আংটিতে অক্টোপাসের ছবি আঁকা ছিল। বাবার মুখে শুনেছি ঠাকুর্দা ওই রকম একটা আংটি পরতেন। ওই কঙ্কালটার প্রতি টান থেকেই মাঝরাতে বোটের কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে ওই কঙ্কালটা দেখতে গেছিলাম আমি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। শিকোকুর লোক মরগ্যান কিন্তু আমি ভেবেই ছুরি মেরেছিল ওই ধীবরকে। তারপর ওই ছুরি কঙ্কালটার হাতে ধরিয়ে ব্যাপারটাকে ভৌতিক প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে আমরা সে জায়গা ছেড়ে চলে আসি। সমুদ্রতলের গুহামুখে ঠাকুর্দার কঙ্কালটা রাখা, বা রোবট অক্টোপাস,—এ সবই ছিল ওই অঞ্চল থেকে ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা। ওই গুহাতেই তো শিকোকু লুকিয়ে রেখেছিলেন জিনিসটা। মরগ্যানের পিছন পিছন গিয়ে আমি ওই গুহায় এক সিন্দুকের মধ্যে জিনিসটা খুঁজেও পেয়েছিলাম। রোবট অক্টোপাস দিয়ে ধরে আনার পর মুখোশধারী শিকোকু সেটা কেড়ে নেয়। শিকোকু মনে হয় আমাকে আগেই চিনতে পেরেছিল। তার হয়তো ধারণা হয়েছিল যে আমি ওই জিনিসটার খোঁজে এসেছি। তাই সে তার অনুচর মরগ্যানকে পাঠিয়েছিল আমাদের সঙ্গে।'

আকিরা জানতে চাইলেন, 'আপনাকে কীভাবে চিনল শিকোকু?'

রাইখ বলল, 'আমি তো আগের দিন গেছিলাম "সি-পার্কে"। সুদীপ্ত, আমি তোমাকে যে পারিবারিক ফোটোগ্রাফি দেখিয়েছিলাম সেটা ভালো করে খেয়াল করলে দেখলে বুঝতে যে আমার দাদুর চেহারার সঙ্গে বেশ মিল আছে আমার। সম্ভবত শিকোকু সেদিন আড়াল থেকে আমাকে দেখেছিল। আমার ঠাকুর্দাকে বা তার ছবিও হয়তো সে তার আগে দেখেছিল অথবা মিস্টার আকিরার কাছ থেকে জেনেছিল আমার নাম, দেশের কথা।'

আকিরা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাকে কথাপ্রসঙ্গে আপনাদের সবারই পরিচয় বলেছিলাম। তা শুনেও সন্দেহ হতে পারে তার মনে।'

রাইখ এরপর বলল, 'যাই হোক, যে-কোনো কারণেই শিকোকুর মনে সন্দেহ হয় আমার প্রতি। তাছাড়া, আপনারা যদি ওই গুহার সন্ধান পান সে ভয়ও কাজ করছিল তার মনে। তাই সে মরগ্যানকে পাঠায় আমাদের সঙ্গে। যেদিন আমরা সমুদ্রে যাত্রা করছি সেদিন 'সি-পার্কের' তোরণের সামনে শিকোকুকে দেখেও কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয়েছিল। আসলে শিকোকুর ঠাকুর্দার সঙ্গেও তার চেহারার একটা গঠনগত মিল ছিল। সুদীপ্ত, তোমাকে দেখানো ছবিটার মধ্যে ওশাকুও ছিল। মরগ্যানও কিন্তু দেখেছিল ছবিটা। নির্ঘাত সে-ও ছবির কাউকে চিনতে পারে। সেই ডুবুরি ছুরিকাহত হবার পর একটি জিনিস আমার ঘর থেকে খোয়া যায় তা হল ওই ছবি। এমনও হতে পারে যে ওটা দেখার পরই বোটের ওয়ারলেস সিস্টেমের মাধ্যমে মরগ্যান ব্যাপারটা শিকোকুকে

জানায়, আর তারপরই শিকোকু সাবমেরিনে করে ওই গুহায় হাজির হয় সেই জিনিসটা সরিয়ে ফেলার জন্য।'

রাইখের কথা শেষ হবার পর সবাই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হেরম্যান তার উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার সেই "জিনিস"টা কী বলবেন যদি আপনার আপত্তি না থাকে? শেষপর্যন্ত সে জিনিসটার কী গতি হল বলবেন?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর রাইখ বলে, 'সেটা বর্তমানে আমার হস্তগত। ভাবছি জিনিসটা এশিয়ার কোনো মিউজিয়ামে দান করে দেব আমার বাবা ও ঠাকুর্দার নামে। বহু লোক তবে দেখতে পারবে সেটা। জিনিসটা বিক্রি করলে অবশ্য অনেক টাকা পাওয়া যেত। আমি সমুদ্র-গবেষক। টাকাপয়সার ওপর তেমন লোভ নেই আমার। শিকোকু কিন্তু ওই গুহা থেকে জিনিসটা কেড়ে এনে সত্যি সত্যি ওই দানব অক্টোপাসের খাবারের বাক্সের ভিতর একটা খোপে সেটা লুকিয়ে রেখেছিল। জিনিসটা আপনাদের আমি দেখাচ্ছি।'—এই বলে রাইখ তার ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা বাক্স বার করে টেবিলের ওপর রেখে সেটা খুলল। বাক্সর ভিতর লাল ভেলভেটের বিছানার ওপর বসানো আছে কচ্ছপের ডিম বা পিংপং বলের আকৃতির নিটোল গোল একটা জিনিস! জানলা দিয়ে আসা সূর্যালোকে সেই গোলাকার বস্তুর গা-দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে কোমল রক্তিম আভা।

আকিরা প্রথম জিনিসটাকে চিনতে পেরে উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'আরে এ যে মুক্তো! এত বড় মুক্তো!'

রাইখ মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, মুক্তো। এই সেই ইতিহাস-বিখ্যাত মুক্তো 'স্টার অব দি ইস্ট'। জাপানি সমুদ্রতট থেকে যা তোলা হয়েছিল একদিন। তারপর সেটা হারিয়ে যায়...।'

সবাই হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই আশ্চর্য সুন্দর মুক্তোটার দিকে। এক সময় সুদীপ্ত বলে উঠল, 'এর একটা নতুন নামও দেওয়া যায়—"অক্টোপাসের মুক্তো"।'

'আ-আ-হু-উ-উ-ল...!' আধো ঘুমের মধ্যে শব্দটা যেন শুনতে পেলাম আমি। শঙ্খনাদের মতো গম্ভীর অথচ তীক্ষ্ণ একটা শব্দ। বার কয়েক যেন শব্দটা স্পষ্ট শুনলাম। শব্দটা সত্যি কিনা তা ভালো করে বোঝার আগেই ইরিয়ানের ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসলাম। একটা ছোট্ট পেট্রম্যাক্স জ্বলছে তাঁবুর এক কোণে। তাছাড়া বাইরে থেকে চাঁদের আলো তাঁবুর পাতলা কাপড় ভেদ করে ভিতরে ঢুকছে। আমরা দুজনেই মাটিতে শুয়েছিলাম। ধাক্কা খেয়ে উঠে বসে আমার মালয় কুলি ইরিয়ানের মুখের দিকে তাকাতেই দেখি তার মুখ যেন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই আমাকে সে ইশারায় চুপ থাকতে বলে তর্জনী নির্দেশ করল তাঁবুর মাথার দিকে।

প্রথমটা আমি সেদিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারলাম না। কয়েক মুহূর্ত লাগল চোখ সইয়ে নিতে। তারপর আমি দেখতে পেলাম একটা অদ্ভুত জিনিস। তাঁবুটা হালকা, পর্দাটা প্রায় স্বচ্ছ, সিল্কের তৈরি। সেই পর্দা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম তাঁবুর ঠিক মাথার ওপর ভাসছে একটা বিরাট বাদুড়! কিন্তু বাদুড় কি এত বড় হয়? তার দুটো ডানার বিস্তার যেন আমাদের পুরো তাঁবুটাকেই ঢেকে দিতে পারে। তাঁবুর মাথার ওপর পনেরো থেকে কুড়ি ফুট ওপরে মৃদু মৃদু ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে প্রাণীটা ভাসছে। মাঝে মাঝে তার ডানার ছায়া ঢেকে দিচ্ছে পুরো তাঁবুটাকেই। ঢেকে দিচ্ছে বাইরে মাথার ওপর অত বড় চাঁদটাকেও। অন্ধকার নেমে আসছে তাঁবুর ভিতর! আমার কানের পাশে ইরিয়ানের ভয়ার্ত গলা শুনতে পেলাম—সাহেব, আ-হুল!!

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল ইরিয়ানের মুখে আজ বিকালে শোনা গল্পটা। যে কারণে এখানে তাঁবু ফেলার মতো এত সুন্দর জায়গা পেয়েও ইরিয়ান তাঁবু খাটাতে ইতস্তত করছিল। তাহলে ওটা কি সত্যিই ইরিয়ানদের গল্পকথার উড়ুক্কু দানব আহুল? ওই শঙ্খের মতো তীক্ষ্ণ ধ্বনি স্বপ্নে নয়, সত্যি শুনলাম আমি! হতভম্বের মতো আমি তাকিয়ে রইলাম তাঁবুর ছাদের দিকে। ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম প্রাণীটাকে। মাথাটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না তার। ঘাড়ের ওপর ছুঁচলো কান দুটোই শুধু উঁকি মারছে। কারণ প্রাণীটা সম্ভবত তার মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে উড়তে উড়তে তাঁবুটা লক্ষ করছে।

আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। আর তারপরই প্রাণীটা যেন তাঁবুটাকে লক্ষ্য করেই নীচে নেমে আসতে লাগল। তার বিশাল ডানার ছায়াতে ঢেকে যেতে লাগল তাঁবুটা। ইরিয়ান আতঙ্কে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠল। উড়ুক্কু প্রাণীটা তাঁবুর প্রায় মাথায় নেমে

এসেছে! নিজের অজান্তেই পাশ থেকে কখন যে রিভলভারটা তুলে নিয়েছিলাম খেয়াল নেই। সে তাঁবুর ওপর নেমে আসতেই তাকে লক্ষ্য করে অটোমেটিক রিভলভার থেকে চালিয়ে দিলাম গুলি! রিভলভারের শব্দ আর প্রাণীটার ডানা ঝাপটানোর শব্দে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল রাত্রির নিস্তব্ধতা। ভয় পেয়ে কোথা থেকে যেন একদল পাখি কর্কশ শব্দে ডেকে উঠল! আর সেই উড়ন্ত প্রাণীটা যেন তাঁবুর ওপর থেকে ছিটকে পড়ল কোথাও। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাইরের পাহাড়-জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুলি আর অন্যান্য মিলিত শব্দ। তারপর বাইরের পৃথিবী আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে শুধু ভেসে আসতে লাগল ক্রেটারের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনার ঝরঝর শব্দ।

ইরিয়ানের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে তখনও ঠকঠক করে কাঁপছে। আমি হতভম্ব কম হইনি। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। আমার সাহস বরাবরই বেশি, হয়তো বা তাকে দুঃসাহসই বলা যায়। নইলে আমার মতো কোনো ধাতুবিদ এই শ্বাপদসঙ্কুল, আগ্নেয়পর্বত অধ্যুষিত জাভার জঙ্গলে একজন কুলি আর একটা রিভলভার সম্বল করে ধাতু খুঁজতে আসে?

আমি তাঁবুর বাইরে বেরুব। দেখতে হবে ব্যাপারটা কী। রিভলবারের ছ-টা গুলিই খালি করে দিয়েছিলাম। নতুন ম্যাগাজিন ভরে আমি উঠে তাঁবুর দরজার সামনে দাঁড়ালাম। সাবধানে পর্দা ফাঁক করে বাইরে তাকালাম। জ্যোৎস্না-বিধৌত পৃথিবী। কিছু দূরে ক্রেটারের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনাটা ঝলমল করছে চাঁদের আলোতে। তার আড়ালে সেই গুহামুখটাও যেন দেখা যাচ্ছে। এই ছোট্ট কালো আগ্নেয় পাহাড়টার ঠিক নীচেই আমাদের তাঁবু ছোট্ট একটা সমতল জায়গাতে। একদিকে পাহাড়, ঝরনা আর অন্য তিনদিকে বাঁশ, আর অন্যান্য গাছের ঘন জঙ্গল। ঝরনার জল একপাশের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে অন্য কোথাও। চারপাশে যতটা দেখা যায় দেখার চেষ্টা করলাম। মাথার ওপর চাঁদ হাসছে। শান্ত-সুন্দর পৃথিবী। কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা যেন নেহাতই স্বপ্ন।

তবুও সাবধানে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সব কিছু তো ঠিকঠাকই বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এরপরই কিছুটা তফাতে একটা জিনিস নজরে পড়ল আমার। জ্বালামুখ বা ক্রেটারের বাইরের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনাটা নীচে নেমে প্রথমে একটা ছোট্ট ডোবা মতো সৃষ্টি করেছে। তার পাড়ে তাঁবু থেকে আনুমানিক ষাট-সত্তর ফুট তফাতে কী যেন একটা নড়ছে! তবে জিনিসটা বিরাট কোনো প্রাণী নয়, ছোটখাটো কিছু হবে। যাই হোক, সাহসে ভর করে রিভলভার তাক করে এগোলাম সেদিকে।

তার কাছে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই হেসে ফেললাম আমি। না এটা 'আহুল' নয়, তবে একটা বাদুড়। তবে একটু বড় আকারের। আসলে চাঁদের আলোতে, সিনেমার পর্দার মতো তাঁবুর গায়ে তার ছায়াটা ছায়াবাজির মতো বড় আকারে ধরা দিয়ে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েছিল।

প্রাণীটা তখনও নড়ছে।

তাঁবুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ইরিয়ান বাইরে বেরিয়ে এসেছে। হাত নেড়ে তাকে ডাকতেই সে আমার কাছে এগিয়ে এল। তার হাতে ধরা আছে একটা ধারালো 'দা' বা 'বোলো'। চাঁদের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে সেটা। তবে তখনও তার মুখে আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ।

আমি প্রাণীটাকে দেখিয়ে তার উদ্দেশ্যে বললাম, এই যে তোমার 'আহুল' এখানে শুয়ে আছে।

প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ক্রমশই চওড়া হল তার হাসি। সে হাসি শুধু আতঙ্ক অবসানের জন্য নয়, অন্য একটা কারণও আছে তার পিছনে। ইরিয়ানরা বাদুড় খায়। আমাদের এই যাত্রা শুরুর দ্বিতীয় দিনে একটা বাদুড় মেরে পুড়িয়ে খেয়েছিল সে। ফল খায় বলে বাদুড়ের মাংস নাকি খুব সুস্বাদু হয়। যদিও বাদুড়ের মাংস খেতে আমার রুচি হয়নি, বরং ইরিয়ানের খাওয়া দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল। বাদুড়টার দিকে তাকিয়ে ইরিয়ান একটু লজ্জিতভাবে হেসে বলল, আসলে 'আ-হুলের' গল্প ছোটবেলা থেকে এত শুনেছি যে মনের মধ্যে গেঁথে আছে ব্যাপারটা। তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে তাঁবুর ভিতরে এটা নিয়ে ঢোকা চলবে না। যা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে প্রাণীটার গা থেকে। এটা নিয়ে গেলে বাকি রাতটা আর গন্ধে ঘুমানো যাবে না।

ইরিয়ান বলল, ঠিক আছে, ভিতরে নেব না।

এই বলে সে তার দা-টা বাগিয়ে বাদুড়টার আরও কাছে এগিয়ে গেল প্রাণীটার মৃত্যুযন্ত্রণা শেষ করার জন্য। কিন্তু প্রাণীটার দেহে তখনো মনে হয় কিছুটা জীবনীশক্তি অবশিষ্ট ছিল। ইরিয়ান তার ওপর ঝুঁকে পড়তেই সে হঠাৎ তার ভাঙা ডানা ঝাপটিয়ে মাটি ছেড়ে উঠে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে শেষ একবার পালানোর চেষ্টা করল। আবার একটা গুলি চালালাম আমি। আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। রিভলবারের শব্দ পাহাড়-জঙ্গলে অনুরণিত হল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। লক্ষ্য কিন্তু অব্যর্থ। তবে উড়ন্ত অবস্থায় গুলির অভিঘাতে প্রাণীটা ছিটকে গিয়ে পড়ল পঞ্চাশ ফুট দূরে পাথরের গা বেয়ে ঝরনাটা যেখান দিয়ে নামছে তার কাছে একটা পাথরের ওপর। তার আছড়ে পড়ার ধরন দেখেই বুঝলাম সে আর কোনোদিন উড়বে না। ডোবার পাড় বেয়ে পাথর বিছানো একটা রাস্তা আছে ঝরনার কাছে পৌঁছবার। চাঁদের আলোতে ঝরনার আড়ালের অন্ধকার গুহামুখটা এখন অনেকটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি ইরিয়ানকে বললাম—এবার তুমি তোমার কাজ করো। আমি শুতে চললাম। কাল ভোরেই রওনা হব। ক্রেটারের মাথায় উঠে দেখতে হবে রাস্তার কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে কিনা?

আমার কথা শুনে সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ভেজা পাথরের ওপর পা ফেলে ইরিয়ান এমনভাবে ঝরনার দিকে এগোল যে আমি বুঝতে পারলাম কাল ভোরে ওই হতভাগ্য বাদুড়টার চামড়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ইরিয়ান এগোল সেদিকে আর আমি এগোলাম তাঁবুর দিকে। ঘুমিয়ে নিতে হবে।

তাবুর মধ্যে পা রেখে হঠাৎই আমার একটা ব্যাপারে খটকা লাগল। আহুলরূপী উড়ন্ত প্রাণীটা নয় বাদুড়, কিন্তু সেই বিচিত্র শব্দটা! যে শব্দটা আমার কানে গিয়েছিল? সেটা কি তবে ঘুমন্ত অবস্থায় শোনা কল্পনা? ইরিয়ান কি শোনেনি সেই শব্দ?

এ ব্যাপারটা ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎই একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল বাইরে থেকে। আরে এ যে ইরিয়ানের আর্ত চিৎকার! মাটির ওপর পড়ে থাকা টর্চটা তুলে নিয়ে রিভলভার হাতে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ইরিয়ানের যেখানে থাকার কথা সে সেখানে নেই! সে জায়গার দিকে ছুটলাম আমি। ডোবার পাড়ে পিছল পাথরে পা রেখে কোনোরকমে পৌঁছে গেলাম ঝরনার সামনে। সেই বাদুড়টা এখনো একই জায়গাতে পড়ে আছে, কিন্তু ইরিয়ান কোথাও নেই! চারপাশে তাকে দেখতে না পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, ইরিয়ান? ইরিয়ান? আমার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ের গায়ে। আর এরপরই একটা অস্পষ্ট শব্দ পেলাম আমি। সে শব্দ সম্ভবত ঝরনার আড়ালে গুহামুখের ভিতর থেকে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি টর্চের আলো ফেললাম সে দিকে। ওপর থেকে নেমে আসা জলস্রোত ভেদ করে ওপাশে সামান্য কিছুটা আলো গিয়ে পৌঁছল গুহার ভিতরে। মুহূর্তের জন্য কেন জানি না মনে হল একজোড়া উজ্জ্বল লাল চোখ গুহার ভিতর থেকে চেয়ে আছে আমার দিকে। আর তারপরই সেই অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে জলস্তর ভেদ করে কী একটা জিনিস যেন ছিটকে বেরিয়ে এসে ঠং করে আমার কিছুটা তফাতে পাথরের ওপর পড়ল। জিনিসটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম আমি। কনুই থেকে ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষের একটা হাত! সে হাতে তখনো ধরা আছে একটা 'বোলো'! ইরিয়ানের 'দা' ধরা হাতটা! টর্চটা আমার হাত থেকে খসে পড়ার আগে আমি স্পষ্ট দেখলাম গুহার ভেতর থেকে লাল রঙের একটা ধারা যেন বাইরে এসে মিশছে ঝরনার জলের সঙ্গে! টর্চটা খসে পড়ল হাত থেকে। একটু তফাতেই মাটির ওপর পড়ে আছে ইরিয়ানের কাটা হাতটা। হঠাৎই যেন আতঙ্ক পেয়ে বসল আমাকে। ঝরনার আড়ালে গুহামুখ লক্ষ্য করে পরপর বেশ কয়েকটা গুলি ছুড়লাম, তারপর ছুটতে শুরু করলাম তাঁবুর দিকে।

তাহলে কি যে শব্দটা শুনে আমি উঠে বসেছিলাম সেটা সত্যি? ঝরনার আড়ালে গুহার ভিতর থেকে উঁকি দেওয়া চোখ দুটো কিসের?

সে ঘটনার পর ঘণ্টা পাঁচেক সময় কেটে গেছে। বাইরে আর কোনো শব্দ পাইনি। ঘড়ির কাঁটা বলছে ভোর হয়ে এল। দু-একটা পাখির ডাকও মনে হয় শোনা যাচ্ছে। দিনের আলো ভালো করে ফুটলেই এ জায়গা ত্যাগ করব আমি। ইরিয়ান নিশ্চয়ই আর ফিরবে না। একলাই এগোতে হবে আমাকে। আমার অনুমান উত্তর দিকে আর কিছুটা এগোলেই সমুদ্রর দেখা মিলে যাবে। হয়তো বা সেটা আর মাত্র একটা দিনের পথ...।

হাতে ধরা কাগজ থেকে উপরের অংশটা পাঠ করলেন হেরম্যান। লেখাগুলো একটা দিনলিপির শেষাংশ। মূল ডায়েরিটা অবশ্য নয়। সে ডায়েরি থেকে লেখাগুলো উঠিয়ে কাগজে টাইপ করা হয়েছে। একগোছা কাগজ হেরম্যানের হাতে। হেরম্যানের পড়া শেষ

হতেই টেবিলের ওপাশে বসা মাঝবয়সি লোকটা সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর অলিভিয়েরা নামক ওই ওলন্দাজ ধাতুবিদ সমুদ্রতীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। একদল মালয় জেলে জঙ্গলে ঢুকেছিল কাঠ আনতে। সমুদ্রতীর থেকে বেশ গভীরে একটা ছোট আগ্নেয় পর্বতের পাদদেশে ওই ভদ্রলোকের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ আবিষ্কার করে তারা। দেহের একটা বড় অংশ কোনো একটা প্রাণী খেয়ে গিয়েছিল। আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল তার কিছু জিনিসপত্র। ডায়েরিটাও ছিল তার মধ্যে। এই ডায়েরিটা দেখেই তাকে শনাক্ত করা হয়।

হেরম্যান জানতে চাইলেন, আসল ডায়েরিটা এখন কোথায়?

জাভা ক্রনিকালের বান্দুং দপ্তরের প্রধান মিস্টার আলি জবাব দিলেন, ওটা পুলিশের হেফাজতে আছে। তবে চিন্তা নেই, যে কাগজগুলো আপনাদের দিলাম তা হুবহু ওই ডায়েরি থেকে কপি করা। এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, আমাদের সংবাদপত্রের জাকার্তার হেড অফিস থেকে আমাকে আপনাদের সবরকম সাহায্য করতে বলা হয়েছে। আপনাদের সাংবাদিকের পরিচয়পত্রও তৈরি। কিন্তু একটা কথা, আপনারা দুজন নাকি আসলে ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্ট? এ শব্দটা আমার অজানা। এর মানেটা কী? আপনাদের অভিযানের বিবরণ যে আপনারা আমাদের হাতে তুলে দেবেন, সে মর্মে আমাদের কাগজের সঙ্গে চুক্তির কথাটাও আমার জানা। শুধু অভিযানের কারণ জানা নেই। হেড অফিস থেকে বলা হয়েছে, সেই গোপনীয় ব্যাপারটা আপনারাই আমাকে জানাবেন।

সুদীপ্ত এতক্ষণ চুপচাপ বসে মিস্টার আলি আর হেরম্যানের কথোপকথন শুনছিল। এবার সে হেরম্যানের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মিস্টার আলির উদ্দেশ্যে বলল, হ্যাঁ, আমরা ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্ট। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। ব্যাপারটা আপনাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলি। বিভিন্ন দেশের রূপকথা, লোকগাথা, উপকথায় বিভিন্ন অদ্ভুত প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। বাস্তবের ওইসব প্রাণীর উপস্থিতি সাক্ষ্যপ্রমাণসহ না মিললেও দীর্ঘদিন ধরে ওইসব প্রাণীর কথা শুনে আসছি আমরা। এই যেমন হিমালয়ের তুষার মানব বা 'ইয়েতি', আমেরিকার 'বিগফুট', আফ্রিকার 'সিংহ-মানুষ', মাদাগাস্কারের 'নরখাদক গাছ', স্কটল্যান্ডের 'লেকনেসির জলদানব' বা ভারতের লোকগাথার কথা-বলা পাখি 'ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী'। এমনকি 'টেরডাকটাইলের' মতো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর উপস্থিতি আজও বোর্নিওর জঙ্গলে আছে বলে অনেকের ধারণা। এইসব লোককথা-উপকথা বা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীকে বলা হয় 'ক্রিপটিড'। আর যাঁরা সেসব প্রাণী নিয়ে অনুসন্ধান করেন তাঁদের বলা হয় 'ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্ট'।

সুদীপ্তর কথা শুনে মিস্টার আলি অবাক হয়ে বললেন, বুঝলাম, তার মানে আপনারা এসেছেন 'আ-হুলের' খোঁজে! কিন্তু এসব ব্যাপার তো ফ্যান্টাসি! তার জন্য আপনারা একজন ইন্ডিয়ান, অন্যজন জার্মানি থেকে এই জাভায় ছুটে এসেছেন।

সুদীপ্ত হেসে বলল, ঠিক তাই। সত্যিই এক সময় ব্যাপারটাকে ফ্যান্টাসি ভাবত। অনেকে ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্টদের ধাপ্পাবাজ বলতেও ছাড়েননি। কিন্তু আজকে অনেকেই

আর এ ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে পারছেন না। ধরুন, এক সময় সমুদ্র অভিযানের গল্পে দানব অক্টোপাসের কথা শোনা যেত। যারা শুঁড়ে পেঁচিয়ে নৌকো ডুবিয়ে দিত। ব্যাপারটাকে অনেকে ভাবতেন অশিক্ষিত জেলেদের গল্প। ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্টরা জাপান সরকারের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরে গিয়ে সেই 'জায়েন্ট স্কুইডের' চলমান ছবি তুলে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। সিলিকান্থ মাছের দেখা মিলেছিল ৪৯ কোটি বছরের প্রাচীন জীবাশ্মে। বিজ্ঞানীরা মানতেনই না তার উপস্থিতির কথা। ১৯৩৮ সালে ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্টরা 'কোমোরোম' দ্বীপে গিয়ে প্রমাণ করলেন 'সিলকান্থ' এখনো বহাল তবিয়তে আছে। বিজ্ঞানীরা তখন ঢোঁক গিলে তার নাম দিলেন 'জীবন্ত জীবাশ্ম'। একইভাবে ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্টরা প্রমাণ করেছেন, গল্পগাথার স্তন্যপায়ী ডিমপাড়া প্রাণী তাসমেনিয়ার 'প্লাটিপাস', সমুদ্রের দানব হাঙর 'মেগামাউথ শার্ক'কে। এই আপনাদের ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাই ধরুন না, সুন্দাদ্বীপের জেলেরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছিল 'কোমোডো ড্রাগনের' উপস্থিতির কথা—বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটাকে বলতেন গাঁজাখুরি গল্প। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের দেখা মিলল। এমনকী মাত্র একশো বছর আগেও অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারুকে ইউরোপের লোকেরা গল্পগাথার প্রাণী ভাবত। প্রত্যেক গল্প বা কল্পনার পিছনেই কিন্তু কিছুটা সত্যি আছে। এমন হতেই পারে যে একদিন ইয়েতির বা বিগফুটের অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে পারে! প্রমাণ হতে পারে 'আহুল' বলে কিছু আছে!

একটানা কথাগুলো বলে সুদীপ্ত তাকাল হেরম্যানের দিকে। তাঁর মুখ দেখে সুদীপ্ত বুঝল তিনি বেশ খুশি হয়েছেন। মিস্টার আলি বিস্মিতভাবে বললেন, এত অদ্ভুত ব্যাপার আমার জানা ছিল না। এবার আমি পিনাকপাণিকে ডাকছি। ওর মাতৃভাষা 'বাহাম' কিন্তু ভালো ইংরেজি জানে। জঙ্গলটাও ভালো চেনে। ও আপনাদের একাধারে গাইড, একাধারে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করবে। ভীষণ সাহসী ও বিশ্বস্ত।

'পিনাকপাণি' শব্দটা শুনে প্রথমে খুব আশ্চর্য হল সুদীপ্ত। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল হাজার বছর আগে এই যবদ্বীপ ছিল হিন্দু সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সে ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। এখনো বহু হিন্দু বাস করে জাভা বা যবদ্বীপে। বহু প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায় এখানে। কাজেই পিনাকপাণি নামটা অস্বাভাবিক নয়।

বেল টিপলেন মিস্টার আলি। দরজা খুলে একজন শক্তপোক্ত মাঝবয়সি লোক ঘরে ঢুকল। কিন্তু তাকে দেখে চমকে উঠল সুদীপ্তরা। লোকটার কপাল, গালের বাঁ পাশটা যেন কেউ রাঁদা মেরে উঠিয়ে নিয়েছে! সে দিকে চোখ-কান কিছু নেই!

লোকটা এক চোখ দিয়ে সুদীপ্তদের কিছুক্ষণ দেখে একটু হেসে বলল, জঙ্গলে বাঘ ধরেছিল। অর্ধেক মুখ জরিমানা দিতে হল ঠিকই, কিন্তু তার মাথাটাও বাড়ি নিয়ে এলাম। সাহেবরা দেখতে চাইলে দেখাতে পারি।

বান্দুং জাভা তথা ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম প্রধান শহর। পশ্চিম জাভার প্রশাসনিক সদর দপ্তরও বটে। প্রচুর লোকজন, দোকানপাট, হাইরাইজ। তার মধ্যে আবার কোথাও কোথাও মাথা তুলে এখনো দাঁড়িয়ে আছে ডাচ গির্জা, ব্রিটিশ স্থাপত্য। এ শহরের মাঝখানে দাঁড়ালে বোঝাই যাবে না এ দ্বীপে কোথাও কোনো জঙ্গলের অস্তিত্ব আছে! পিনাক বলে লোকটা আসার পর জাভা ক্রনিকল-এর অফিসে বসেই অভিযানের প্রস্তুতির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা সেরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল তারা তিনজন। দুটো সরকারি অফিসে যেতে হল পারমিটের ব্যাপারে। রসদপত্রও বেশ কিছু কেনার ছিল। একটা হালকা অথচ বেশ মজবুত তাঁবুও কেনা হল। পিনাক লোকটা বেশ পরিশ্রমী ও চটপটে। সে সঙ্গে থাকায় কাজগুলো অনেক দ্রুত হল। তবে এসব করতে করতে বিকেল হয়ে গেল। বিকেলে হাতে কিছুটা সময় থাকায় তারা ঢু মারল বান্দুং মিউজিয়ামে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ইন্দোনেশিয়ায় মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব জাভায় ত্রিনিল গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫ লক্ষ বছরের প্রাচীন জাভা মানুষের ফসিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয়রা জাভা ও সুমাত্রায় প্রতিষ্ঠা করেছিল শ্রীবিজয় রাজ্যের। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবরা দখল নিতে শুরু করে এ জায়গার। তারপর একে একে আসে ওলন্দাজ ও ইংরেজরা। নানা জনগোষ্ঠীর বহু নিদর্শন রাখা আছে মিউজিয়ামে। সেখান থেকে সন্ধ্যাবেলা হোটেলে ফিরল সুদীপ্তরা। হেরম্যান বললেন, আজ ভালো করে ঘুমিয়ে নিতে হবে। পিনাক বলল, আগামীকাল হয়তো একটা লগ হাউস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার পরদিন থেকে কার্যত খোলা আকাশের নীচেই কাটাতে হবে আমাদের।

লম্বা অভিযানের আগে ঘুমটা খুবই জরুরি ব্যাপার। এটা নিজের অভিজ্ঞতাতেও প্রত্যক্ষ করেছে সুদীপ্ত। খাওয়া সেরে বেশ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল দুজন।

পরদিন ভোরে তারা দুজন যখন হোটেলের পোর্টিকোয় এসে দাঁড়াল তখন সূর্যদেব সবে উদয় হচ্ছেন। পিনাক গাড়ি নিয়ে ইতিমধ্যেই হাজির হয়ে গেছে। সুদীপ্তদের দেখে সে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। আগের দিন তার পরনে ছিল লুঙ্গি আর জামা। আজ সে একেবারে অন্য পোশাকে সজ্জিত। হাই হিল বুট, সামরিক লোকদের মতো জংলা ছাপ জামা প্যান্ট। কোমরে চওড়া বেল্ট থেকে একটা বোলো ঝুলছে। কাঁধে একটা দোনলা বন্দুক। সুদীপ্ত বন্দুকটার দিকে তাকাতেই পিনাক হেসে বলল, লাইসেন্সড আর্মস স্যার। মালয় জলদস্যুরা মাঝে মাঝে সমুদ্র থেকে উঠে এসে জঙ্গলে হানা দেয়। কাঠ ব্যবসায়ীদের

ধরে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ দাবি করে। আমি তো ওদের সঙ্গে জঙ্গলে যাই। তাই এক ব্যবসায়ী লাইসেন্সটা করিয়ে দিয়েছে। বন্দুকটাও তারই দেওয়া।

বন্দুকটা দেখে পিনাকের ওপর সুদীপ্তদের ভরসা আর একটু বাড়ল। যদিও হেরম্যানের কাছেও রিভলভার আছে এবং তা নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার পারমিট গতকালই সংগ্রহ করেছে তারা।

একটা ল্যান্ডরোভার। মালপত্র নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হয়ে গেল তারা। শহর ছাড়িয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরল গাড়ি। গাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। চালকের আসনে পিনাক। তাদের গন্তব্য হেলিমুন-সলক ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশপথ। এর মধ্যেই অবস্থিত সলক ও হেলিমুন-এ দুটি আগ্নেয় পর্বত। তার পাদদেশে গভীর জঙ্গল। সুদীপ্ত গতকাল ম্যাপে দেখছিল ও-অঞ্চলে ৩৮টি আগ্নেয় পর্বত আছে। তার মধ্যে কয়েকটি পঞ্চাশ-ষাট বছর পর পর অগ্নিবমন করে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এই পর্বতগুলো সাড়ে দশ মাইল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। সকল ন্যাশনাল পার্কের গায়েই মাউন্ট গেডে প্যাংগ্রাংগো ন্যাশনাল পার্ক। সলক ও প্যাংগ্রাংগো ন্যাশনাল পার্কের একটা বড় অংশ ভার্জিন ফরেস্ট। অর্থাৎ এখনো সেখানে মানুষের পা পড়েনি। কে বলতে পারে হয়তো সেখানে সত্যিই আছে সেই উড়ুক্কু দানব 'আহুল'। হয়তো সে অনাবিষ্কৃত কোনো পক্ষী প্রজাতি! হয়তো বা টেরোডাকটাইলেরই কোনো বংশধর। হয়তো কোনো অপার বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে সেই পর্বতকন্দরে গহীন জঙ্গলে! এসব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল সুদীপ্ত। যেতে যেতে হেরম্যান এক সময় বললেন, আমরা ঠিক যে জায়গাতে যেতে চাইছি সেখানে পৌঁছতে আনুমানিক চারদিন সময় লাগবে। আমরা যদি উল্টোদিক দিয়ে জলপথে সে জায়গায় পৌঁছবার চেষ্টা করতাম তাহলে হয়তো একটা দিন কম লাগত আমাদের। কিন্তু অলিভিয়েরার পথটাই অনুসরণ করতে চাই। ডায়েরিতে তার নিখুঁত বিবরণ আছে। তিনদিন চলার পর তিনি যে পথ হারিয়ে পৌঁছেছিলেন পর্বতগাত্রে সেই ঝরনার কাছে। যেখানে তিনি তাঁবু ফেলেছিলেন। সে জায়গাটা অবশ্য আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

এ কথা বলার পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্বগতোক্তি করলেন, বহু বছরের ব্যবধানে হলেও কী আশ্চর্য মিল!

সুদীপ্ত জানতে চাইল, আপনি কিসের মিলের কথা বলছেন?

হেরম্যান বললেন, আহুলের ব্যাপারটা প্রথমে বাইরের পৃথিবীর কাছে পৌঁছয় প্রকৃতিবিদ ড. এমারেস্ট বার্টেলের মাধ্যমে। এমারেস্ট ছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত অরিস্থলজিস্ট জি. বার্টলের ছেলে। এমারেস্ট ১৯২৫ সালে সলক মাউন্টেন এক্সপিডিশনে আসেন। তিনিও সলকের পাদদেশে চিজিংকল নদীর কাছাকাছি এক ঝরনার সামনে দেখতে পেয়েছিলেন ধূসর লোমে ঢাকা, তীক্ষ্ণ নখযুক্ত থাবাওয়ালা, উড়ন্ত প্রাণীর অবয়ব। আর ১৯২৭ সালের এক রাতে তাঁর কাঠের বাড়ির মাথায় ওপর থেকে ভেসে এসেছিল এক রক্ত জল-করা চিৎকার—আ-আ-হু-উ-উ-ল! এমারেস্ট তাঁর লেখায় বলেছেন, সেই ঝরনার আড়ালে একটা গুহা ছিল। আমার ধারণা যে প্রায় নব্বই বছর আগে এমারেস্টের

দেখা ঝরনাটা আর অলিভিয়েরার দেখা ঝরনাটা এক। একই জায়গাতে অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হন তাঁরা দুজন। আমি এই মিলের কথাই বলতে চাইছি। সত্যি কথা বলতে কী, মাস তিনেক আগে অলিভিয়েরা সংক্রান্ত ব্যাপারটা যখন আমি সংবাদপত্রে পড়ি, তখন এই মিলের ব্যাপারটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। এখনো করছে। তাহলে কি সত্যিই কিছু আছে সেখানে?

সুদীপ্ত এরপর বলল, যেদিন আপনি এখানে অভিযান করার ইচ্ছা আমাকে জানালেন সেদিন থেকেই আ-হুল সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। ইন্টারনেটে দেখলাম, কয়েকজন জীববিজ্ঞানীর অনুমান, ওই প্রাণী যদি সত্যি থেকে থাকে এবং তার বর্ণনা যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে সে সাড়ে ছ-কোটি বছর আগে এক বিরাট উড়ুক্কু সরীসৃপের বংশধর হতে পারে। কালিমান্তানের বোর্নিও ও অস্ট্রেলিয়াতে নাকি ও ধরনের উড়ন্ত সরীসৃপের বা ডাইনোসরের ফসিল মিলেছে। তাদেরও পাখা ও নখযুক্ত থাবা ছিল।

হেরম্যান শুনে বললেন, হতে পারে। বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে লক্ষ-কোটি বছরের আগের চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে এখনো বেশ কিছু প্রাণী টিকে আছে।

টুকটাক নানা কথা আলোচনা করতে করতে চলল তারা। পিছনে পড়ে রইল জনাকীর্ণ ব্যস্ত বান্দুং। সোজা এগিয়ে চলেছে রাস্তা। তার দু-পাশে কখনো চা বা কফির বাগিচা, কখনো মাইলের পর মাইল জুড়ে রবারের বাগান। দু-একটা লোক মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে সেসব বাগানে। তারা রবার গাছের গায়ে 'ট্যাপ' অর্থাৎ রস বার করছে। এক সময় রবার বাগান শেষ হয়ে রাস্তার দু-পাশে শুরু হল উন্মুক্ত প্রান্তর। মাথার ওপর সূর্যদেবও সুদীপ্তদের সঙ্গে এগিয়ে চলতে লাগলেন।

ঘণ্টা চারেক এগোবার পর পিনাক হঠাৎ তাদের উদ্দেশ্যে বলল, ওই যে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাকাল সুদীপ্তরা। নীল আকাশের গায়ে ছাই ছাই রঙের মেঘ ভাসছে, আর তার আড়াল থেকে উঁকি মারছে পর্বতমালা। মাউন্ট সলক!

একঘেয়ে যাত্রাপথে সুদীপ্তদের একটু ঝিমুনি এসেছিল। এবার নড়েচড়ে বসল তারা। ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল সেই পর্বতমালা। পূর্ব-পশ্চিমে দেখা যেতে লাগল আরও নানা পাহাড়। আর তাদের পাদদেশে একটা কালো রেখা ক্রমশ চওড়া হতে শুরু করল। অরণ্য! এ দ্বীপের সবচেয়ে গভীরতম অরণ্য। যার পোশাকি নাম সলক-প্যাংগ্রাংগো ন্যাশনাল পার্ক। সুদীপ্তদের গন্তব্য।

হেরম্যান পিনাকের কাছে জানতে চাইলেন, এখন জঙ্গলের অবস্থা কেমন?

পিনাক জবাব দিল, আজ অবধি তো ভালোই, কিন্তু কাল কী হবে কে জানে!

মানে?

সুদীপ্তর প্রশ্নের জবাবে পিনাক বলল, ওই যে আকাশের গায়ে ছাই ছাই মেঘ দেখছেন ওটা বর্ষার মেঘ। বর্ষাকাল মনে হয় এবার একটু তাড়াতাড়ি আসবে। এমনিতেই এটা বর্ষাবন বা রেন ফরেস্ট। মাউন্ট সলকের পাদদেশে এ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে

চিজিংকল ও তার নানা শাখানদী। বর্ষা নামলেই তারা ফুঁসে ওঠে। তখন নদী পার হওয়া দুষ্কর হয়। নদীগুলো চওড়ায় খুব ছোট, কিন্তু এত স্রোত যে বর্ষায় তারা বড় বড় পাথর ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

কাছে এগিয়ে আসতে লাগল মাউন্ট সলক ও তার পাদদেশের বনভূমি। সূর্যকিরণে রুপোর মতো দেখতে লাগছে মাউন্ট সলকের শিখরগুলো। কেউ যেন আকাশের গায়ে রুপালি বিদ্যুৎশিখা এঁকে রেখেছে। এ জন্যই মাউন্ট সলককে 'সিলভার মাউন্টেন' নামেও ডাকা হয়। আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর গাড়ি এসে থামল সলক প্যাংগ্র্যাংগো ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশ-তোরণে। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে হল সুদীপ্তদের। তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা হল। ফরেস্ট গার্ডরা স্থানীয় বাহামা ভাষায় বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাল পিনাকের সঙ্গে। কাগজ-কলমে লেখা আছে যে সুদীপ্তরা জাভা ক্রনিকাল দৈনিক সংবাদপত্রের হয়ে কাগজে লেখার জন্য জঙ্গলের জীববৈচিত্র্য দেখতে যাচ্ছে। অবশেষে এক সময় খুলে গেল জঙ্গলের প্রবেশ তোরণ। ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশ করল সুদীপ্তদের গাড়ি।

পিনাক গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, কাগজের লোক বলে ফরেস্ট গার্ডরা আমাদের বেশি বিরক্ত করল না। অনেক সময় ওরা চার-পাঁচ ঘণ্টাও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এখানে আটকে রাখে। ওদের কথাবার্তায় বুঝলাম যে গতকাল আর একটা দলও জঙ্গলে ঢুকেছে।

হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি কাঠের কারবারী? পিনাক উত্তর দিল, কাঠের কারবারীদের পারমিট দেওয়া হয় অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস। এটা জুন মাস। তারা জঙ্গলে ঢুকবে না। শুনলাম পাঁচজনের একটা ছোট দল ঢুকেছে জঙ্গলে। একজন সাহেব, আর বেশ কিছু যন্ত্রপাতি আছে তাদের সঙ্গে। হয়তো তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি। প্রথমে পিচরাস্তা তারপর এবড়ো-খেবড়ো মেঠো পথ। মাঝে মাঝে দু-একটা ক্ষুদ্রকায় নদী, তার ওপর কাঠের সাঁকো। সেসব পেরোতে পেরোতে দু-পাশের জঙ্গল ক্রমশ ঘন হয়ে উঠতে লাগল। গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে প্রবেশ করতে লাগল সুদীপ্তরা। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি। তাদের গায়ে পুরু শ্যাওলার আস্তরণ। কাঠ ব্যবসায়ীরা নাকি এভাবে গুঁড়িগুলোকে ফেলে রেখে তাদের 'সিজিনড' করে। বেলা দুটো নাগাদ তারা এসে উপস্থিত হল বেশ চওড়া এক নদীর সামনে। পিনাক বলল, গাড়ি আর যাবে না। ইতিমধ্যে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কুড়ি কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেছি। নদী পার হয়ে কোর এলাকায় পৌঁছব আমরা। তারপর পায়ে চলা পথ। নদীতে কোনো সাঁকো নেই। জল খুব সামান্য নদীতে। অসংখ্য বিরাট বড় গাছের গুঁড়ি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে নদীতে। নদীর দু-পাশে দুটো বড় গাছ থেকে নদীর ওপর একটা মোটা কাছি টাঙানো আছে। সেটা ধরে নদী পেরোতে হবে। গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে তা ভাগ করে পিঠে নিয়ে পার হয়ে প্রবেশ করল ওপাশের অরণ্যে। হেরম্যান বললেন, অলিভিয়েরার ডায়েরিতে লেখা আছে তিনিও এ পথে জঙ্গলে ঢুকেছিলেন।

পিনাক বলল, যে নদীটা আমরা পেরিয়ে এলাম তা সামান্য বর্ষা হলেই এত ফুঁসে ওঠে যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এ অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

হাঁটতে লাগল সুদীপ্তরা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর সূর্যদেবও পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করেছেন। বন ক্রমশ নিবিড় হয়ে আসছে। বিরাট বিরাট গাছ আকাশের দিকে উঠে গিয়ে যাত্রাপথের মাথায় তাদের ডালপালা দিয়ে চাঁদোয়া রচনা করেছে। গাছের গুঁড়িগুলোর ভেজা গায়ে নানা ধরনের ছত্রাক জন্মেছে। তাদের মধ্যে কিছুর আকার বিরাট বড় থালার মতো। মাঝে মাঝে ডালপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে মাউন্ট সলকের রুপোলি চুড়ো। আলো-আঁধারি পায়ে চলা পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ কাছেই একটা শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পিনাক। মুহূর্তের মধ্যে তার হাত চলে গেল কোমরে ঝোলানো বোলোর দিকে। কাছেই ডানদিকে একটা বিরাট ঝোপ প্রচণ্ড দুলে উঠল। আর তারপরই সেই ঝোপের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করল একটা কুৎসিত মুখ। লাল চোখ দিয়ে সে দেখছে অনুপ্রবেশকারীদের। কয়েক মুহূর্ত সেই প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে পিনাক স্বস্তির হাসি হেসে বলল, 'গিবন'। এ জঙ্গলে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় এ প্রাণী। বানর জাতীয় প্রাণীটা সুদীপ্তদের দেখার পর ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে একটা লতা ধরে দোল খেয়ে কাছেই একটা গাছের মাথায় উঠে গেল।

হেরম্যান জানতে চাইলেন, এ বনে হিংস্র প্রাণী কী কী আছে?

এ বনে বাঘ নেই। আমাকে বাঘে ধরেছিল সুমাত্রার জঙ্গলে। তবে পাইথন আছে। বিভিন্ন ধরনের লিজার্ড আছে। সে অর্থে তেমন অন্য কোনো বড় হিংস্র প্রাণী এ বনে নেই। কারণ...। কথাটা আর শেষ করল না পিনাক।

সুদীপ্ত বলল, কী কারণ?

পিনাক জবাব দিল, জানেন তো শক্তিধর হিংস্র প্রাণীরা কখনো এক জঙ্গলে থাকে না। যেমন একসঙ্গে বাঘ-সিংহ কখনো থাকে না। লোকে বলে এ জঙ্গলে আহুল আছে, তাই অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী এই বনে থাকে না। সে-ই এ বনের ভয়ংকরতম প্রাণী।

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, তুমি ওই প্রাণীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করো?

চোখে না দেখলেও ছোটবেলা থেকে গল্প শুনেছি প্রাণীটার। তাই অবিশ্বাসও করি না। আমি যমের সঙ্গে পাঞ্জা কষে এসেছি। আপনারা যে উদ্দেশ্যে এ বনে এসেছেন, তা জানলে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ রাজি হত না আপনাদের সঙ্গে আসার। এ দেশের লোকেরা খুব ভয় করে 'আ-হুল' শব্দটাকে। আমি একবার বেশ কয়েক বছর আগে জঙ্গলের মধ্যে এক কাঠুরের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। কী বীভৎস সেই দেহ! যেন কেউ ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করেছে তাকে। কে করল তার অমন অবস্থা? এ জঙ্গলে তো অন্য হিংস্র প্রাণী নেই! জবাব দিল পিনাক।

এগিয়ে চলল তারা তিনজন। পশ্চিম আকাশের ঢলতে শুরু করেছেন সূর্যদেব। সন্ধ্যা নামার কিছু আগে জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গাতে একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পেল। পিনাক বলল, ওটাই আমাদের রাত্রিবাসের জায়গা।

কাঠের মোটা মোটা গুঁড়ি দিয়ে তৈরি একটা বাড়ি। ছিরিছাদহীন বাড়িটাতে দরজা-জানলার কোনো অস্তিত্ব নেই। সুদীপ্তরা বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। হঠাৎ তাদের কানে এল চিৎকার—হল্ট!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুদীপ্তরা। প্রথমে তারা শব্দের উৎস বুঝতে পারল না। তারপর তারা দেখতে পেল তাদের কিছুটা তফাতে বাড়িটার গায়ের একটা গাঠের গুঁড়ির আড়াল থেকে একটা রাইফেলের নল বেরিয়ে আছে। তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে উঁকি দিল একটা মানুষের মাথা, তারপর তার শরীরটা।

রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল একজন লোক। আর তার পিছন পিছন আরও দুজন। তাদের হাতে ধরা আছে বোলো। প্রথম লোকটা বিদেশি, তামাটে, চশমা পরা, একটু ছোটখাটো চেহারা। পিছনের লোক দুজন সম্ভবত এদেশীয়। সোনালি চশমা পরা লোকটা রাইফেল উঁচিয়ে সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা কারা?

হেরম্যান কয়েক-পা সামনে এগিয়ে বললেন, আমরা জাভা ক্রনিকাল নামে একটা খবরের কাগজের লোক। জঙ্গল দেখতে এসেছি।

হেরম্যানের চেহারা দেখে আর কথা শোনার পর সেই লাল চুল সম্ভবত আশ্বস্ত হল। সে বলল, আমি একজন বিজ্ঞানী। গবেষণার কাজে এখানে এসেছি।

এই বলে সে কয়েক-পা এগিয়ে এসে হেরম্যানের উদ্দেশ্যে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনাদেরকে রাইফেলের নল উঁচিয়ে পরিচয় দিতে বলার জন্য দুঃখিত। আসলে আমি শুনেছি যে সমুদ্র থেকে উঠে এসে জলদস্যুরা মাঝে মাঝে এ বনে হানা দেয়। তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। আপনিও তো দেখছি আমার মতো বিদেশি। আপনার পরিচয়?

হেরম্যান জবাব দিলেন, আমি হেরম্যান। জার্মানি থেকে এসেছি। আর আমার এই বন্ধু সুদীপ্ত, ইন্ডিয়ান। সুদীপ্তও এরপর করমর্দন করল লোকটার সঙ্গে।

সে এবার সুদীপ্তদের উদ্দেশে বলল, আমার নাম নাগোয়া তানাকা। আমি জাপান থেকে এসেছি। তা আপনারা দুজন তো দেখছি বিদেশি। এখানকার কাগজের অফিসে চাকরি করেন নাকি?

হেরম্যান হেসে বললেন, না, ঠিক চাকরি করি না। আমি একজন প্রকৃতিবিদ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জঙ্গলে জীববৈচিত্র্য অনুসন্ধানের জন্য ঘুরে বেড়াই। এ জঙ্গলে নতুন কিছু তথ্য পেলে সেটা জাভা ক্রনিকালকে দেব এই শর্তে। তারা আমাদের এই অরণ্য

অভিযান স্পনসর্ড করছে। নিজের পরিচয় তিনি কৌশলে দিলেন।

হেরম্যানের কথা শুনে তানাকা বললেন, তাহলে আমরা তো প্রায় সমগোত্রীয়। আমি এসেছি এই প্রকৃতির আড়ালে যেসব প্রাণী লুকিয়ে থাকে তাদের সন্ধানে।

চমকে উঠলেন হেরম্যান, সুদীপ্ত। প্রকৃতির আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রাণী! এ ভদ্রলোকও কি 'আ-হুল'-এর সন্ধানে এখানে এসেছেন?

তানাকা এরপর হেসে বললেন, আসলে আমি একজন জীববিদ। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, 'এন্টেনোলজিস্ট'। কীটপতঙ্গ নিয়ে কাজ করি। সলকের পাদদেশের বর্ষাবনে নানা ধরনের পোকামাকড় মেলে। তারই খোঁজে সেদিকে যাচ্ছি। সুদীপ্তরা এবার আশ্বস্ত হল তার কথা শুনে।

তানাকা এরপর বললেন, আসুন, বাড়ির ভিতর আসুন। দুটো ঘর আছে। একটা ঘর আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি। অবশ্য কাল যদি এখানেই থাকেন পুরো বাড়িটাই ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ, কাল ভোরেই আমি সলকের দিকে যাত্রা শুরু করব।

হেরম্যান হেসে বললেন, আমরাও কাল থাকব না। আমাদেরও সলকের দিকে যাবার ইচ্ছা।

বাড়িটার ভিতরে ঢুকল সবাই। কাঠের তৈরি মেঝে। একটা ঘরের কোণায় তানাকাদের কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতি রাখা আছে। সে ঘরটা দেখিয়ে তিনি বললেন, আপনারা এ ঘরটা ব্যবহার করুন। আমার জিনিসগুলো আমি একটু পরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

তানাকা পাশের ঘরে চলে গেলেন। পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে রেখে সুদীপ্তরা সে ঘরে রাত্রিবাসের প্রস্তুতি শুরু করল। মেঝেতে শোবার জন্য ম্যাট পাতা হল। পিনাক স্টোভ জ্বালিয়ে ফেলল রান্না করার জন্য। ঘরের কোণায় আরো কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতির সঙ্গে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বা অনেকটা ঘাস ছাঁটার যন্ত্রর মতো দেখতে লম্বা হাতলঅলা, চাকা লাগানো একটা যন্ত্র রাখা আছে। জিনিসটা আসলে কী তা বোঝার জন্য সুদীপ্ত গিয়ে যন্ত্রটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। মাটির সমান্তরাল ছোট টেলিভিশনের পর্দার মতো একটা জিনিস যন্ত্রটাতে লাগানো। বেশ কিছু নানা ধরনের বোতামও আছে তার হাতলে। ইলেকট্রনিক গ্যাজেট। হেরম্যানও এগিয়ে এসে যন্ত্রটা দেখতে দেখতে যন্ত্রের গায়ে এক জায়গাতে আবিষ্কার করলেন একটা লেখা—রেডিও অ্যাক্টিভ ডিভাইস। হেরম্যান বললেন, এ যন্ত্রটা সাধারণত ধাতু অনুসন্ধান লাগে। মিস্টার তানাকার কী কাজে লাগে কে জানে!

সুদীপ্তরা এরপর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে লাল আবির গুলে সলকের মাথায় সূর্যাস্ত হচ্ছে। সুদীপ্তদের সামনের ফাঁকা জমির মাথার ওপর দিয়ে বিরাট একটা কাকাতুয়ার ঝাঁক উড়ে গেল জঙ্গলের দিকে। আশ্চর্য সুন্দর লাগছে চারপাশটা। হেরম্যান সুদীপ্তর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ক্রিপ্টিডের খোঁজে হিমালয় থেকে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে কত পরিশ্রম, কত বিপদকে অগ্রাহ্য করে ঘুরে বেড়াই আমরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধরাই থেকে যায় আমাদের ক্রিপ্টিড। কত লোক হাসাহাসি করে আমাদের পাগলামি

নিয়ে। এক এক সময় যখন সেসব ভাবি তখন মন খারাপ হয়ে যায়। পাহাড়-পর্বত বনে-জঙ্গলে না ঘুরে আমি তো বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি নিতে পারতাম। সে যোগ্যতা আমার ছিল। আর তা না হলে পারিবারিক ব্যবসা করে আরও অনেক টাকা করতে পারতাম। কিন্তু তারপরই আবার একটা কথা ভাবলে মন ভালো হয়ে যায়। এই যে আমরা এত দেশ ঘুরলাম, প্রকৃতির এত সৌন্দর্য দেখলাম, এত অভিজ্ঞতা হল, এ তো খুব কম মানুষেরই হয়। ঘরে বসে থাকলে কি প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য ধরা দিত? তোমার মনে আছে আফ্রিকার বুরুন্ডিতে সবুজ বানর খুঁজতে গিয়ে টাঙ্গানিকার তীরে সূর্যাস্ত দেখেছিলাম আমরা? হ্রদের জলে একদল জলহস্তী খেলে বেড়াচ্ছিল!

সুদীপ্ত হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ, মনে আছে। আপনার সঙ্গে যেবার হিমালয়ের বেসক্যাম্পে 'বরফ দেশের ছায়ামানুষ' খুঁজতে গিয়ে প্রথম পরিচয় হয়, সেই বেসক্যাম্প থেকে নন্দা দেবীর মাথায় সূর্যাস্ত দেখাও আমার মনে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করল তারা দুজন। তারপর হঠাৎই যেন সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকার নেমে এল চারপাশে।

ঘরে ফিরে এসে একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে নিয়ে অলিভিয়েরার ডায়েরি আর কাগজ-পেন্সিল নিয়ে কাজ করতে বসলেন হেরম্যান। আর সুদীপ্ত মনোনিবেশ করল এয়ারপোর্ট থেকে কেনা জাভার ইতিহাসের একটা হ্যান্ডবুকে। পিনাক রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে মিস্টার তানাকা আর তাঁর সঙ্গীদের টুকরো টুকরো কথাবার্তার শব্দ। সময় এগিয়ে চলল।

সে এক সোনালি অতীত! খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সুদীপ্তদের পূর্বপুরুষের মকরমুখী পালতোলা জাহাজে চেপে প্রথম একদিন পা রেখেছিল এই দ্বীপ রাজ্যে, কঠোর পরিশ্রমে ও বাহুবলে শ্বাপদসঙ্কুল দ্বীপমালায় সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল। সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেছিল সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবিজয় রাজ্য। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছিল এদেশে। দ্বাদশ শতকে সমগ্র দ্বীপরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা দখল করল পরাক্রমশালী মাজাপাহিত হিন্দু রাজারা। মহাকালের রথের চাকা বেয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব ও ভারতীয় মুসলমানরা এদেশে উপস্থিত হয়ে বালি দ্বীপ ছাড়া অন্যান্য দ্বীপে প্রতিষ্ঠা করল তাদের অধিকার। পতন ঘটল হিন্দু রাজাদের। চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগীজ বাণিজ্যপোত এসে ভিড়ল মশলা দ্বীপ বা মোল্লাকায়। দ্বীপটা ভালো লাগল তাদের। সেখানে রয়ে গেল তারা। তাদের কিছু লোক স্বদেশে ফিরে গিয়ে আরো লোকজন ডেকে আনল। তাদের সঙ্গে এল সঙিনঅলা বন্দুক, পারকামান পিস্তল, কামান, গোলাবারুদ। হঠাৎই একদিন তারা দখল নিয়ে ফেলল এদেশ। মাঝে কিছুদিন ইংরেজও শাসন করল দেশটা। ১৯৪২ সালে ওলন্দাজদের থেকে জাপান ছিনিয়ে নিল দেশটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পতন ঘটলে ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল পার্টি এদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করল...

সুদীপ্তর বেশ লাগছিল বইটা পড়তে। হঠাৎ হেরম্যানের গলার স্বরে মুখ তুলে তাকাল সুদীপ্ত।

এটা দেখো—এই বলে তিনি সুদীপ্তর হাতে একটা কাগজ তুলে দিলেন।

কাগজে আঁকা আছে একটা ম্যাপ। সুদীপ্ত জানতে চাইল, কিসের ম্যাপ এটা?

হেরম্যান জবাব দিলেন, আমাদের যাত্রাপথের। ঠিক যে পথ ধরে এগিয়েছিলেন অলিভিয়েরা। তাঁর ডায়েরির বিবরণ অনুসরণ করে এঁকে ফেললাম। তবে সেই পাহাড় আর ঝরনার অবস্থান এ ম্যাপে দেখানো নেই। পথ হারিয়েই তিনি সেই ঝরনার কাছে পৌঁছেছিলেন। আগের রাতে বাজ পড়ে তার কম্পাসটা খারাপ হয়ে যায়। ঝরনাটা সে জায়গা থেকে একদিনের পথ। ম্যাপটা যেখানে শেষ হয়েছে মাইল কুড়ি ব্যাসার্ধ নিয়ে চারপাশটা খুঁজলেই আশা করি ঝরনাটা পেয়ে যাব।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে ম্যাপটার খুঁটিনাটি সুদীপ্তকে বোঝালেন হেরম্যান। খাওয়া সারা হল তাদের। তারপর তারা তিনজনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। বাড়িটার সামনে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে, তার সামনে বসে আছেন মিস্টার তানাকা আর তাঁর দুজন লোক। সুদীপ্তদের দেখে তানাকা তাদের সেখানে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সুদীপ্তরাও গিয়ে বসল তানাকাদের কাছে। চারপাশে নিঝুম অরণ্য। আকাশের চাঁদটাকে বড্ড বেশি ফ্যাকাশে লাগছে। তার আলোতে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছগুলো।

মিস্টার তানাকাই প্রথমে মুখ খুললেন, কোন পথ ধরে এগোবেন আপনারা?

হেরম্যান জবাব দিলেন, পশ্চিমদিকে একটা মৃত নদীখাত আছে বলে শুনেছি। তার পাড় ধরেই এগোব ভাবছি। আপনারা?

তানাকা বললেন, আমরা একদম সোজা এগোব জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সলকের অধিত্যকায় যেখানে ছোট পাহাড়গুলো আছে সেখানে পৌঁছে কাজ শুরু করব আমি। ওই আগ্নেয়ভূমির নীচে নানা ধরনের পোকামাকড়ের সন্ধান মেলে।

হেরম্যান বললেন, হয়তো যাত্রাপথে আবার আমাদের দেখা হয়ে যাবে।

তানাকা বললেন, হ্যাঁ, তা হতেই পারে। আমাদের দু-দলের কাছেই বন্দুক আছে। তেমন কিছু প্রয়োজন হলে বন্দুক ছুড়ে আমরা পরস্পরকে ডাকতে পারব। সংকেতটা জানেন তো? ওয়ান-টু-থ্রি। অর্থাৎ ধরুন আমি একবার ফায়ার করলাম, আপনি তার জবাব দিলেন, তারপর আমি শেষ ফায়ার করে আপনাকে কাছে ডাকলাম।

হেরম্যান হেসে বললেন, হ্যাঁ, জানি। এটা ইন্টারন্যাশনাল এস.ও.এস. কোড।

তানাক বললেন, আমার ভয় বৃষ্টি নামলে। তাহলেই কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। শুনেছি এ জঙ্গলে বর্ষা খুব ভয়ংকর।

পিনাক বসেছিল সুদীপ্তর পাশেই। একটা শুনে সে বলল, হ্যাঁ সাহেব, এ বনে বর্ষা খুব ভয়ংকর। যেটা হয়তো আগের দিন পথ ছিল, পরদিনই সেটা ভয়ংকর নদী হয়ে যায়। পা পড়লেই আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কত প্রাণী যে সেসময় ভেসে যায়! প্রতি বর্ষায় নতুন নতুন নদীখাত তৈরি হয় এখানে। হ্যাঁ, বর্ষা মনে হয় এখানে এবার তাড়াতাড়ি নামবে।

তাড়াতাড়ি মানে? জানতে চাইলেন তানাকা।

পিনাক প্রথমে জবাব দিল, তাড়াতাড়ি মানে সাতদিনের মধ্যেও হতে পারে। সলকের মাথায় মেঘ জমতে শুরু করেছে। ওই যে দেখুন আকাশের ওদিকেও মেঘ দেখা যাচ্ছে।

পিনাকের কথা শুনে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আকাশের দিকে তাকাল সবাই। হ্যাঁ, সলকের দিকের আকাশটা কেমন যেন অস্পষ্ট। এক জায়গাতে একখণ্ড কালো মেঘও দাঁড়িয়ে আছে।

পিনাক তার অভিজ্ঞ চোখে মেঘটার দিকে তাকিয়ে বলল, ওই কালো মেঘটা অবশ্য স্থানীয় মেঘ। ক'দিনের মধ্যে ভেঙে গিয়ে জল ঝরাবে ওটা। বর্ষাবনে এমন হয়। তবে তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

সুদীপ্তরা তাকিয়েছিল সেই কালো মেঘটার দিকে, হঠাৎ মিস্টার তানাকার সঙ্গী দুজনের একজন বলে উঠল, সাহেব ওই দেখুন জঙ্গলের মাথায় অমন একটা কালো মেঘ। লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্যরা তাকাল সেদিকে। হ্যাঁ, জঙ্গলের মাথায় একখণ্ড কালো মেঘ যেন ভাসছে। তানাকা এরপর বললেন, আমার কাজ দিন সাতেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে আশা করি। আপনারা ক'দিন থাকবেন এ জঙ্গলে?

হেরম্যান জবাব দিলেন, আমাদের তেমন কিছু ঠিক নেই এখন। দেখা যাক...

তানাকা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনারা কি এ বনে নতুন কোনো প্রজাতির ব্যাঙের সন্ধানে এসেছেন? শুনেছি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রজাতির ব্যাঙ পাওয়া যায় এই বর্ষাবনে।

হেরম্যান হেসে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, পাওয়া যায়, তবে নতুন ধরনের যে-কোনো প্রাণীই আমাদের গবেষণার বিষয়।

কথাবার্তা চলছিল। সুদীপ্তর হঠাৎ চোখ পড়ল জঙ্গলের মাথায় সেই একখণ্ড কালো মেঘের দিকে। সুদীপ্তর কেন জানি মনে হল মেঘটা জঙ্গলের মাথার ওপর আরো যেন এগিয়ে এসেছে। আকাশে তেমন আলো নেই। তবু সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ্তর মনে হতে লাগল সেই মেঘটা যেন নড়ছে। আর এর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মেঘটা জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল সুদীপ্তদের দিকে। সে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাবার জন্য আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, কী ওটা?

সবাই তাকাল সেদিকে। তারপর মুহূর্তেই মিস্টার তানাকার একজন অনুচর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, গুলি চালাও সাহেব, গুলি চালাও।

কেউই তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাল লোকটার দিকে। উড়ন্ত মেঘটা তখন প্রায় ফাঁকা জমির মাথায় চলে এসেছে। সেই লোকটা আর দেরি করল না। মিস্টার তানাকার পাশে পড়ে থাকা রাইফেলটা তুলে নিয়ে গুলি চালিয়ে দিল সেই কালো মেঘটাকে লক্ষ্য করে। মুহূর্তের মধ্যে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে থেকে কর্কশ আর্তনাদ করে উঠল আতঙ্কিত কাকাতুয়ার ঝাঁক। আর সেই কালো মেঘটা ঝুপ করে খসে পড়ল অগ্নিকুণ্ডের কিছুটা তফাতে। সবাই ছুটে

গিয়ে দেখল ডানা ছড়িয়ে বিরাট একটা বাদুড় মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। ইন্দোনেশিয়ান জায়েন্ট ব্যাট!

প্রাণীটাকে দেখে মিস্টার তানাকা বিস্মিতভাবে তার সঙ্গীকে প্রশ্ন করলেন, এই নিরীহ প্রাণীটাকে দেখে ভয় পেয়ে গুলি চালালে কেন?

লোকটা তানাকার কথার জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে তাকিয়ে রইল মাটিতে পড়ে থাকা প্রাণীটার দিকে। তার দেহটা যেন মৃদু মৃদু কাঁপছে। সুদীপ্ত একবার তাকাল হেরম্যানের দিকে। তাঁর ঠোঁটের কোণে যেন আবছা হাসি ফুটে উঠেছে। তানাকা তাঁর প্রশ্নের জবাব না পেয়ে লোকটাকে তিরস্কার করে বললেন, বাদুড়ে তোমার এত ভয় জানা ছিল না! আমার দেশ হলে এ প্রাণী মারার অপরাধে তোমার কোর্ট মার্শাল হতো!

লোকটা এবারও তাঁর কথার কোনো জবাব দিল না।

মিস্টার তানাকা এরপর হেরম্যানের উদ্দেশ্যে বললেন, বেশ গল্প চলছিল, কিন্তু এই মূর্খ লোকটা এ প্রাণীটাকে মেরে আমার মেজাজটাই নষ্ট করে দিল। আমি দুঃখিত। কাল ভোরে সবাইকে বেরোতে হবে। এবার ঘরে ঢুকব।

সুদীপ্তরা ঘরে ফিরে এল। তারা শোয়ার বন্দোবস্ত করছে। ঠিক এমন সময় তাদের ঘরে ঢুকল মিস্টার তানাকার সেই সঙ্গী। সে বলল, সাহেব, যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে যাব।

ঘরের কোণ থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে লোকটা বেরোতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় হেরম্যান তার কাছে গিয়ে লোকটার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমি জানি তুমি কেন ভয় পেয়েছিলে।

লোকটা একটু অবাক হয়ে তাকাল হেরম্যানের দিকে।

হেরম্যান হেসে বললেন, তুমি ওই বাদুড়টাকে 'আহুল' ভেবেছিলে তাই না? এ জঙ্গলেই তো তার বাস? হেরম্যানের কথা শুনে তার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেরম্যান সুদীপ্তর উদ্দেশ্যে বললেন, এত মানুষ বিশ্বাস করে ব্যাপারটা! পুরোটাই কি একটা মিথ্যা ব্যাপার! দেখা যাক।

পরদিন সূর্যোদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল দুটো দল। মিস্যার তানাকা রওনা হলেন সোজা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সুদীপ্তরাও জঙ্গলের পথ ধরল ঠিকই কিন্তু তাদের প্রাথমিক গন্তব্য সেই নদীখাত। যে পথ ধরে এগিয়েছিলেন অলিভিয়েরা। ভোরের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ছে জঙ্গলের ভিতর। আলোর স্পর্শে প্রাণ ফিরে পেয়েছে জঙ্গল। সুদীপ্তদের মাথার ওপর এ-গাছ থেকে ও গাছে উড়ছে পাখির দল। প্যারোট গোত্রের পাখি সব। সাদা ঝুটি-অলা আমব্রেলা কাকাতুয়া। বিচিত্র মোলাক্কান কাকাতুয়া। লম্বা লেজ-অলা ব্লু-গোল্ড ম্যাকাও, আরও নানা ধরনের পাখি! তাদের কলরবে মুখরিত জঙ্গল। এক জায়গাতে গাছের মাথায় বসেছিল একটা গিবন পরিবার। আট-দশ জনের একটা দল। বানর জাতীয় প্রাণীরা বেশ কৌতূহলী হয়। বেশ কিছুটা পথ তারা গাছের ডাল বেয়ে চলল তাদের সঙ্গে। এ অভিজ্ঞতা সুদীপ্তদের আগেও হয়েছে আফ্রিকা গিয়ে। সেখানেও জঙ্গলে তাদের অনুসরণ করত বানর আর শিম্পাঞ্জির দল।

এক সময় বিরাট এক রবার বনের সামনে এসে তারা উপস্থিত হল। খুব ঘন বন। পিনাক তার বোলো হাতে নিল। গাছ কাটতে কাটতে তারা এগোল সামনের দিকে। সে পথে যেতে যেতে হেরম্যান বললেন, মালয় দেশের রবার বনেও ক্রিপটিড দেখা যায় তুমি জানো?

সুদীপ্ত বলল, তাই নাকি?

হেরম্যান বললেন, হ্যাঁ। তাদের বলে 'রোমশ মানুষ'। মালয়ের রবার বনে যারা ট্যাপ করতে যায় তারা অনেকেই তাদের দেখেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী তাদের আকৃতি সম্পূর্ণ মানুষের মতো। তবে তাদের মুখ-মাথা বাদামি রঙের পুরু লম্বা লোমে ঢাকা। তারা নিজেদের মধ্যে বাঁদরের মতো কিচিরমিচির করে কথা বলে। এদের একটা বিশেষত্ব হল, এদের লজ্জাবোধ আছে। লজ্জা নিবারণের জন্য কোমরে একখণ্ড গাছের ছাল পরে। কারো কারো ধারণা হল, ওই লোমে ঢাকা আজব মানুষরা হল আদিম মানুষ পিথোক্যানথ্রোপাস আর আধুনিক মানুষের মধ্যে মিসিং লিঙ্ক। গত পঞ্চাশ বছরে বারবার তারা দেখা দিয়েছে মানুষকে। তারপরই আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সুদীপ্ত মন্তব্য করল, যে সব ক্রিপটিডের কথা শোনা যায় তাদের একটা বড় অংশই কিন্তু মানুষ বা বাঁদর গোত্রের প্রাণী। এই যেমন হিমালয়ের ইয়েতি, আমেরিকার বিগফুট বা আপনার বলা মালয়ের রোমশ মানুষ।

হেরম্যান শুনে বললেন, হ্যাঁ, এরা প্রত্যেকেই মানুষের সমগোত্রীয় প্রাণী বলেই মনে

হয়। এ দেশের প্রতিবেশী থাইল্যান্ডের ঘন জঙ্গলে 'পিটং লুয়াং' নামের এক ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতি বানর আছে, যাদের মস্তিষ্ক, হাত-পায়ের গড়ন অবিকল মানুষের মতো। কথিত আছে সে দেশের রাজা চুলালঙ্কর্ন নাকি ওরকম একটা বানরকে তাঁর রাজদরবারে বালক ভৃত্যের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

নানা কথা আলোচনা করতে করতে তারা রবার বনটা পেরিয়ে এল। তারপর আবার বড় বড় গাছের জঙ্গল। সে জঙ্গল অতিক্রম করে আরও ঘণ্টাখানেকের পর তারা অবশেষে এসে পৌঁছল অলিভিয়ের কথিত সেই শুকনো নদীখাতের সামনে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানা আকারের অসংখ্য পাথরের টুকরো। সূর্য ঠিক মাথার ওপর। তার আলোতে ঝলমল করছে মাটিতে শুয়ে থাকা সাদা নুড়ি-পাথর। খাতের বাঁ দিকটা ঢালু হয়ে হারিয়ে গেছে জঙ্গলের বাঁকে। সম্ভবত সেটা গিয়ে মিশেছে টিজিডেংকল নদীর সঙ্গে। আর ডান দিকটা চড়াই বেয়ে সোজা উঠে গেছে সলক পর্বতমালার দিকে। এ জায়গা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সলক-হেলিমুন পর্বতশৃঙ্গ আর তার আশপাশের পাহাড়গুলো। সেদিকে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, ওই পাহাড়গুলোর পাদদেশের জঙ্গলে আমাদের পৌঁছতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে সেই ঝরনা। যেখানে সেই উড়ন্ত দানবের ডেরা।

নদীখাতের দুপাশে জঙ্গল। যে দিক থেকে নদী নেমেছে, চড়াই বেয়ে এগিয়ে চলল তারা। প্রকৃতি রাস্তা বিছিয়ে রেখেছে পাথরের। তার ওপর পা ফেলে ফেলে এগোতে হচ্ছে। প্রথমে হাঁটছিল পিনাক, তার কিছুটা তফাতে সুদীপ্তরা। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে সুদীপ্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল এক দিকে। নদীখাতে বিরাট বড় একটা পাথরের ফাঁকে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে প্রকাণ্ড এক ময়াল সাপ। বনে পথ চলতে অভ্যস্ত পিনাকের সতর্ক চোখে সে ধরা পড়ে গেছে। হেরম্যান কোমর থেকে রিভলভারটা খুলে নিলেন। সাপটা অবশ্য সুদীপ্তদের কিছু করল না। একবার শুধু মাথা তুলে সুদীপ্তদের দেখে তার চেরা জিভটা বাতাসে ছুড়ল, তারপর আবার কুণ্ডলীর মধ্যে মাথা গুঁজল। সে জায়গাটা সাবধানে পেরোবার পর হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, সকল পাহাড় হল সরীসৃপ গোত্রের প্রাণীদের আঁতুড়ঘর। এমন হতে পারে আহুল কোনো উড়ন্ত ডাইনোসর। সরীসৃপদের মধ্যে কুমির কয়েক কোটি বছরের প্রাচীন প্রাণী। হয়তো তার মতো এ প্রাণীরও কোনো বিবর্তন হয়নি। তবে এ অভিযানে আমাদের বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশি। কারণ, এর আগে আমরা যেসব ক্রিপটিডের অনুসন্ধানে গিয়েছি, তাদের দেখা পাই বা না-পাই তারা কেউই হিংস্র ছিল না। আ-হুল সম্বন্ধে যা জনশ্রুতি তাতে শেষ পর্যন্ত তার খোঁজ পেলে কী হবে বলা যায় না।

সুদীপ্ত বলল, আমরা যদি প্রাণীটার সন্ধান পাই, আর শেষ অবধি তাকে খাঁচায় পুরে সভ্য পৃথিবীতে হাজির করতে পারি তবে সেটা বিরাট ব্যাপার হবে। সময়ও এগিয়ে চলতে লাগল তাদের সঙ্গে। ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল সলক, আর তার গায়ে লাগানো ছোট ছোট পাহাড়গুলো। চড়াই ভেঙে সেই উপত্যকায় উঠছে সুদীপ্তরা। ক্রমশই স্পষ্ট

হচ্ছে উপত্যকার জঙ্গলের কালো রেখা। সারাদিন ধরে চলার পর শেষ বিকেলে সলকের উপত্যকায় পৌঁছে গেল তারা। বেশ অনেকটা উপরে উঠে আসতে হয়েছে তাদের। জায়গাটার চারপাশে অনুচ্চ পাহাড়ের সারি। তার খাঁজে খাঁজে ঘন বাঁশ আর অন্যান্য গাছের জঙ্গল। নদীখাতটা সেই পাহাড়গুলোর ফাঁক গলে হারিয়ে গেছে সলকের দিকে। সুদীপ্তরা যেখানে এসে থামল সেখানে আরও দুটো শীর্ণ নদীখাত এসে মিশেছে মূল খাতের সঙ্গে। সে জায়গার একপাশে ঘন জঙ্গল, অন্যদিকে একটা পাথুরে জমি। স্থির হল সেই উঁচু জমিটার নীচে জঙ্গলের পাশে তাঁবু ফেলা হবে। হেরম্যান বললেন, অলিভিয়েরার ডায়েরিতে এ জায়গারও উল্লেখ আছে।

পিনাক তাঁবু খাটাতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ শেষ হল তার। হেরম্যান আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতঘড়ি দেখে বললেন, সূর্য ডুবতে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি আছে। ওই উঁচু জমিটার ওপরে উঠে জায়গাটা একটু দেখা যাক।

তাঁবুর ভিতর মালপত্র সব নামিয়ে রেখে পাথরের খাঁজ বেয়ে বেয়ে এক সময় তারা পৌঁছে গেল সেই উঁচু জমিতে। সামনের অনেকটা অংশ সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সলকের কোণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে অসংখ্য ছোটখাটো পাহাড়। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গলপূর্ণ উপত্যকাগুলো। তার স্থানে স্থানে পাথরপূর্ণ মরা নদীখাত রুপালি রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। নদীখাতগুলোর দু-পাশেই জঙ্গল।

হেরম্যান বললেন, ওই দ্যাখো, দূরে ওই যে জায়গায় দুটো নদীখাত এসে মিশেছে, ও জায়গা পর্যন্ত ডায়েরিতে উল্লেখ আছে। পশ্চিম দিকের নদীখাত ধরে অলিভিয়েরা এগিয়েছিলেন, তারপর পথ হারিয়েছিলেন। আশা করছি কাল দুপুরের মধ্যে সে জায়গাতে পৌঁছে যাব। যে ছোট ছোট উপত্যকাগুলো সামনের পাহাড়গুলোর আড়ালে আছে, তার কোনোটাতেই উপস্থিত হয়েছিলেন অলিভিয়েরা।

সে জায়গাতে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের পরদিনের যাত্রাপথ নিয়ে আলোচনা করল তারা তিনজন। সূর্য ঢলতে শুরু করেছে সলকের আড়ালে। সুদীপ্তকে হেরম্যান বললেন, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? গতকাল সূর্যাস্তের সময় কত পাখি ডাকছিল, কিন্তু এখানে একটাও পাখি ডাকছে না, চারপাশ কেমন যেন নিঝুম! থমথমে! এটা হতেই পারে এ জায়গা আহুলের ডেরা কাছাকাছি বলে এখানে কোনো পাখি নেই!

সুদীপ্ত বলল, হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি।

সন্ধ্যা নামবে। সেই উঁচু জায়গা থেকে নামার পথ ধরল। কিন্তু তাঁবুর সামনে পৌঁছেই অবাক হয়ে গেল সকলে। তাদের জিনিসপত্র তারা তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু সেসব জিনিসপত্র বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে! আর এরপরই তাদের কানে এল কিছু তীক্ষ্ণ শব্দ 'উ-উ-প! হু-উ-প, উ-উ-প-হু-উ-উ-প!

ওরাং ওটাং! আফ্রিকা ছাড়া বাইরের পৃথিবীতে একমাত্র ইন্দোনেশিয়ার জাভা বোর্নিওতেই দেখা মেলে এদের। তাঁবুটা কেন লণ্ডভণ্ড বুঝতে অসুবিধে হল না সুদীপ্তদের। তাদের কারো হাতে খাবারের ক্যান, অন্যান্য জিনিসপত্র। গোটা দশেক প্রাণীর একটা

দল। কাছেই একটা বড় গাছের ডালে বসে উৎসুকভাবে দেখছে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনকে। আর এরপরই একটা জিনিস দেখে সুদীপ্তরা চমকে গেল। পিনাক তার রাইফেলটা তাঁবুর ভিতর রেখে গিয়েছিল। সেটা টেনে নিয়ে গেছে একটা ওরাং-ওটাং। গাছের ডালে বসে দু-পায়ে বাঁটটাকে আঁকড়ে ধরে ব্যারেলটাকে কামড়াচ্ছে সে! অন্ধকার নেমে আসছে। প্রাণীগুলো নিশ্চয়ই এখনই অরণ্যের গভীরে উধাও হয়ে যাবে। রাইফেলটা যদি সঙ্গে নিয়ে যায় তাহলে বিপত্তি। প্রাণীটা সম্ভবত ওই জিনিসটাকে গাছের ডাল জাতীয় কিছু ভেবেছে।

সুদীপ্তরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। ওরাং-ওটাংটা নিবিষ্ট মনে রাইফেলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। তার বাঁটে, নলে, চামড়ার ফিতেতে কামড় বসাচ্ছে।

হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, প্রাণীটাকে গুলি করে নীচে নামানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। খারাপ লাগলেও কাজটা করতে হবে। কোমর থেকে রিভলভার বার করলেন হেরম্যান।

কিন্তু ওরাং-ওটাংটার ভাগ্য মনে হয় আগে থেকেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। অপ্রিয় কাজটা আর করতে হল না তাঁকে। লোডেড রাইফেলের সেফটি ক্যাচ খুলে গিয়েছিল কোনোভাবে। প্রাণীটার পায়ের আঙুলের চাপ লাগল ট্রিগারে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে উঠল রাইফেল। ওরাং-ওটাং-এর দল সেই শব্দে ভয় পেয়ে দুড়দাড় করে ছুটে পালাল। আর সেই হতভাগ্য প্রাণীটা রাইফেল সমেত গাছ থেকে খসে পড়ে কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে স্থির হয়ে গেল।

সুদীপ্তরা সেই গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। রাইফেলের স্ট্র্যাপটা মৃত প্রাণীটার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। পিনাক সেটা ছাড়িয়ে রাইফেলটা তুলে নিল।

গাছের তলায় জানোয়াররা আরও যে দু-একটা খাবারের ক্যান ফেলে গিয়েছিল সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাঁবুর কাছে ফিরতে যাচ্ছিল সবাই, হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল রাইফেলের শব্দ। হেরম্যান বললেন, ফায়ার টু! মিস্টার তানাকা সম্ভবত জানতে চাইলেন, আমরা বিপদগ্রস্ত কিনা? জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সোজা পথ ধরেছিল ওরা। আমার অনুমান ওদের দলটা আমাদের থেকে মাইল পাঁচেক এগিয়ে আছে। আমরা একবার ফায়ার করলেই ওরা আমাদের অনুসন্ধান করবে। এরপর হেরম্যান বললেন, ওরাং-ওটাংটা যখন মারাই পড়ল, তখন এটাকে নিয়ে একটা কাজ করলে হয় না।

কী কাজ? জানতে চাইল সুদীপ্ত।

তিনি বললেন, জঙ্গলের বাতাসে রক্তের গন্ধ অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ায়। আমরা যে জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি এটা আহুলের ডেরা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বিশেষত উড়ন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে তো নয়ই। এ প্রাণীটাকে তো টোপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। হয়তো ভাগ্যদেবী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন!

সুদীপ্ত বলল, তা হতে পারে। তবে অন্ধকার নামছে, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। সুদীপ্তরা তাদের সঙ্গে বেশ প্রমাণ মাপের একটা ফোল্ডিং খাঁচা এনেছে। সেটা হালকা কিন্তু বেশ মজবুত। তার গায়ে সেন্সার বসানো আছে। কোনো প্রাণী আটকে পড়লে দূরে থাকা খাঁচার মালিকের কাছে থাকা একটা ছোট্ট যন্ত্র ব্যাপারটা তাকে জানিয়ে দেবে।

খাঁচাটা বার করা হল। তাঁবুর থেকে বেশ কিছুটা দূরে সেই উঁচু জায়গার ঢালে উন্মুক্ত আকাশের নীচে খাঁচাটা ঠিকমতো বসানো হল। ওরাং-ওটাং-এর দেহটাকে তুলে এনে তার ভিতর রাখল পিনাক। দশ ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া খাঁচাটা। এ খাঁচার আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এর মাথার দিকটা খোলা। ভিতরে কেউ নামলে মাথার ওপর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। ঝাঁপটা ঠিকমতো বন্ধ হচ্ছে কিনা, হেরম্যান তা বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করলেন। কাজ শেষ করে সুদীপ্তরা যখন তাঁবুর সামনে ফিরল, ঠিক তখনই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল উপত্যকাতে। তাঁবুতে শুকনো খাবার দিয়ে রাতের খাওয়া সারল তারা। হেরম্যান বললেন, আজ থেকেই পালা করে ঘুমাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বলা যায় না, প্রাণীটা হয়তো এসে হানা দিল তাঁবুতে। সেই মতো ঠিক হল, রাতের প্রথম অংশ জাগবেন হেরম্যান, শেষ অংশে পিনাক। খাওয়া সেরে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করল সবাই। বাইরেটা কী নিঝুম! ঝিঁঝি পোকার ডাকও শোনা যাচ্ছে না। হেরম্যানকে পাহারায় রেখে একসময় শুয়ে পড়ল সুদীপ্ত।

তখন সম্ভবত মাঝরাত। হেরম্যানের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে উঠে বসল সুদীপ্ত। সে দেখল হেরম্যান আর পিনাকের চোখে-মুখে উত্তেজনার স্পষ্ট ছাপ। হেরম্যানের হাতে ধরা ছোট্ট একটা যন্ত্র থেকে বিপবিপ শব্দ আসছে। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হল না তার। আর তারপর তারা তিনজনে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল। মেঘ ঢেকে রেখেছে চাঁদটাকে। প্রথমে প্রায় কিছুই চোখে পড়ল না তাদের। তারপর হঠাৎই কয়েক মুহূর্তের জন্য মেঘ কিছুটা সরে গেল। অস্পষ্ট আলোতে তারা দূর থেকে দেখতে পেল, খাঁচার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু ছায়ামূর্তি! কারা ওরা!

সুদীপ্তরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল সেই জীবগুলোকে। কিছুটা যেন ঝুঁকে হাঁটছে তারা। বেশ কিছুক্ষণ তাদের দেখার পর পিনাক-মন্তব্য করল, আমার ধারণা সেই ওরাং-ওটাংগুলো আবার ফিরে এসেছে। খুব সামাজিক প্রাণী এরা। জঙ্গলের মধ্যে মৃত সঙ্গীর দেহ আগলে বড় বাঁদর জাতীয় প্রাণীরা দিনের পর দিন বসে থাকে এ ঘটনা আমি শুনেছি। হয়তো মৃত প্রাণীটাকে দেখতে গিয়ে আর একটা কোনো প্রাণী ফাঁদে পড়েছে।

অস্পষ্ট আলোতে সেই দো-পেয়ে ছায়ামূর্তিগুলোকে দেখে সুদীপ্তদেরও একই ধারণা হল। হেরম্যান বললেন, তাহলে এখন আর ওখানে গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালে যা করার তা করা যাবে।

তাঁবুর ভিতরে ফিরে এল সবাই। বাকি রাতটা নিরুপদ্রবেই কেটে গেল।

ভোর হল একসময়। তাঁবু থেকে বাইরে এসে সুদীপ্তরা খাঁচাটার কাছে গিয়ে বেশ অবাক হয়ে গেল। খাঁচাটার ভিতর নতুন কোনো প্রাণী তো নেই-ই, এমনকী মৃত ওরাং-ওটাংটার দেহটাও নেই! খাঁচা পরীক্ষা করে বোঝা গেল তার ঝাঁপটা পড়ে খাঁচার মুখ বন্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটাকে আবার ঠেলে ওপর দিকে তুলে ফাঁক করা হয়েছে। বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খাঁচার কব্জাগুলো। যে প্রাণীটা খাঁচাতে ঢুকেছিল সে ওই ফাঁক গলে মৃত প্রাণীটাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে।

সাধারণ ইতর শ্রেণির প্রাণীর এমন বুদ্ধি হয় না, কিন্তু ওরাং-ওটাং, শিম্পাঞ্জিরা হাতের ব্যবহার জানে, কোনো কিছু ছুড়ে মারতেও জানে, কোনো কোনো প্রজাতি গাছের ডালকে লাঠির মতো ব্যবহার করতেও পারে। দলবদ্ধভাবে খাঁচাটা নাড়াচাড়া করতে করতে কোনোভাবে হয়তো ওরা বুঝতে পেরেছিল যে খাঁচার দরজাটা ওপর দিকে খোলে। তারপর সবাই মিলে টেনে ফাঁক করেছে দরজা। যাই হোক, খাঁচাটা এবার খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে। আজ সন্ধ্যার আগে আমাদের সলকের পাদদেশে ওই উপত্যকার কাছে পৌঁছতে হবে।

তিনজন মিলে চটপট খুলে ফেলল খাঁচাটা। সেটা নিয়ে এরপর তারা যখন তাঁবুর দিকে পৌঁছতে যাচ্ছে ঠিক তখনই কিছুটা তফাতে মাটির ওপর সাদা মতো একটা ছোট্ট জিনিস পড়ে থাকতে দেখে হেরম্যান সেটা কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বললেন, আরে এ কী?

ইঞ্চি ছয় লম্বা একটা হাড়। খুব মসৃণ চকচকে তার বাইরেটা। ভিতরটা সম্ভবত ফাঁপা। একটা ছিদ্রও আছে। হাড়টা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সেটা তিনি তুলে দিলেন সুদীপ্তর হাতে। সে-ও দেখল সেটা। খুব মসৃণ তার গা-টা। পিনাক জিনিসটা দেখে বলল, এটা বড় বানর জাতীয় প্রাণীরই হাড় হবে। রোদ-জলে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে থাকতে ওর গা-টা অমন মসৃণ হয়েছে। ঠিক যেভাবে নুড়ি-পাথর মসৃণ হয়।

হেরম্যান জিনিসটা আর একবার হাতে নিয়ে সেটা পরীক্ষা করে মন্তব্য করলেন, পিনাক ঠিকই বলছে, এটা কোনো বানর গোত্রের প্রাণীরই হাতের হাড় হবে। হয়তো ওরাং-ওটাংগুলো এটা কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল, অথবা জিনিসটা এখানেই পড়েছিল আমরা খেয়াল করিনি। এই বলে তিনি হাড়টা ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পিনাক বলল, ফেলবেন না, ওটা আমাকে দিন, আমি ওটা দিয়ে ছুরির হাতল বানাব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁবু গুটিয়ে এদিনের যাত্রা শুরু করল তারা। নুড়ি-পাথর বিছানো পথ ভেঙে ক্রমশ ওপরের দিকে তারা এগোতে শুরু করল। দিনটা আজ কেমন অন্যরকম।

সলকের মাথাটা ছাই রঙের মেঘে ঢাকা। বাতাসে একটা গুমোট ভাব। বেলা বাড়ছে, কিন্তু সলকের মেঘ কাটছে না। উঁচু জায়গাগুলো থেকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সলকের পাদদেশে ছোট ছোট পাহাড়, তার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেওয়া জঙ্গল, মৃত নদীখাত, কিন্তু এ সবই যেন কেমন থমথমে। একটা পাখির ডাকও কানে আসেনি সকাল থেকে। যেন প্রাণের কোনো অস্তিত্ব নেই এ তল্লাটে!

ঘণ্টা পাঁচেক এক নাগাড়ে চলল তারা। গুমোট গরমে গায়ের জামা ভিজে জবজব করছে। সবার পিঠেই আছে মালপত্র। তার ওপর আবার উদয় হয়েছে একঝাঁক মাছি। ভনভন শব্দে সঙ্গে চলছে তারা। বিরক্তিকর ব্যাপার! অবশেষে এক জায়গাতে থেমে পিঠ থেকে ব্যাগপত্তর নামালেন হেরম্যান। কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম প্রয়োজন। অবশ্য এখন তারা উপত্যকার প্রবেশমুখে পৌঁছে গেছে। সামনে দুটো অনুচ্চ পাহাড়। তার মধ্যে দিয়ে নদীখাত ধরে উপত্যকায় ঢুকতে হবে। সুদীপ্তরা বেশ উঁচুতে উঠে এসেছে। তাদের ফেলে আসা যাত্রাপথের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে সে জায়গা থেকে। হেরম্যান রুটি চিবুতে চিবুতে বললেন, সলকের পাদদেশে আমরা যেসব ছোট ছোট পাহাড় দেখছি সেগুলোও কিন্তু আসলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্বালামুখ। অগ্ন্যুৎপাতের সময় মূল জ্বালামুখের আশপাশেও মাটি ফুঁড়ে অনেক জায়গা থেকে লাভাস্রোত বেরিয়ে আসে। তবে বহু বছর ধরে মাটি জমতে জমতে ক্রেটারগুলো বুজে গেছে।

পিনাক বলল, কিন্তু সলকের মাথার মেঘটা বড় সুবিধার মনে হচ্ছে না। দাঁড়ান একটা জিনিস দেখি...

এই বলে সে তার সঙ্গে আনা একটা মুখবন্ধ মাটির হাঁড়ি প্রথমে মাটিতে নামিয়ে রাখল। পিনাকের নিজস্ব জিনিস এটা। হাঁড়ির মুখে ঢাকা দেওয়া পর্দাটা সে সরাতেই বেশ অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। পিনাকের সঙ্গে এই পাত্রটাকে তারা আগে দেখে জলের পাত্র ভেবেছিল। পাত্রর ভিতর জল আছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে একটা মাগুর জাতীয় মাছ! হেরম্যান বিস্মিতভাবে বললেন, কী হবে এটা দিয়ে?

পিনাক হেসে বলল, আপনারা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমাদের তো ওসব দামি জিনিস কেনার পয়সা নেই। আমাদের নিজেদেরও অনেক সময় একলা জঙ্গলে পাহাড়ে আসতে হয়, তখন এসব জিনিস আমাদের যন্ত্রপাতির কাজ করে।

কিছুদূরে মাটিতে পাথরের ফাঁকে সামান্য জায়গা নিয়ে ফুটখানেক গভীর জল জমে আছে। পিনাক হাঁড়িটা নিয়ে সেখানে এগোল। তার পিছনে কৌতূহলী সুদীপ্তরা।

জায়গাটায় পৌঁছে মাছটাকে বার করে সেই অতিক্ষুদ্র ডোবার মতো জায়গাতে ছেড়ে দিয়ে পিনাক বলল, মাগুর গাছ, পিঁপড়ে এসব প্রাণী আবহাওয়ার আগাম পরিবর্তন, যেমন বৃষ্টিপাত, ভূমিকম্প, এসব বুঝতে পারে। তবে আপনারা মাছটাকে দেখে কিছু বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আমি পারব। এর জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন হয়।

মাছটা ছাড়া পেয়েই প্রথমে বেশ কয়েকবার লাফিয়ে উঠল জলের মধ্যে। তারপর এদিক-ওদিক একটু ছোটাছুটি করে জলতলে স্থির হয়ে ভাসতে থাকল। পিনাক তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে। তার প্রতিটা নড়াচড়া সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট তাকে দেখল সে। তারপর বলল, হ্যাঁ, কিছু একটা হবে। ক্রমশ ওপরে উঠে আসছে মাছটা। হয়তো বৃষ্টিপাত বা অন্য কিছু।

হেরম্যান বললেন, হ্যাঁ তাহলে হয়তো বৃষ্টি নামবে। বাতাসে কেমন একটা গুমোট ভাব!

পিনাক সেই জল থেকে মাছটা তুলে নিয়ে আবার পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার যাত্রা শুরু করল তারা। তারা প্রবেশ করতে শুরু করল উপত্যকার ভিতর।

ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা এ জায়গা যেন বাইরের পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। পাহাড়গুলোর ঢালে গভীর জঙ্গল। কোথাও বাঁশ গাছের দুর্ভেদ্য প্রাচীর, কোথাও আবার বর্ষাবনের আদিম বিরাট বিরাট গাছ আকাশের দিকে মাথা তুলে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ভার্জিন রেন ফরেস্ট। ওসব জঙ্গলে সভ্য মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি কোনোদিন। সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না সেখানে। গাছগুলোর গায়ে শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। বিচিত্র ধরনের পরজীবী ছত্রাক ফুলের মতো ফুটে আছে তার গায়ে। পৃথিবীর মধ্যেই অন্য এক পৃথিবী যেন ঘুমিয়ে আছে এখানে। কখনো বোলো দিয়ে গাছ কেটে, কখনো জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উপত্যকার গভীরে প্রবেশ করতে লাগল তারা। শেষ দুপুরে তারা একটা পাহাড়ের ঢালে কিছুটা উন্মুক্ত স্থানে এসে দাঁড়াল। তাদের চারদিকে গভীর জঙ্গল ছাওয়া নানা পাহাড়ের ঢাল। একটা পাহাড়ের দু-পাশ দিয়ে দুটো নদীখাত নেমেছে। একটা নদীখাত শুষ্ক, অন্যটায় তিরতির করে সামান্য জল বইছে।

হেরম্যান বললেন, ঠিক এ জায়গা পর্যন্ত বিবরণ অলিভিয়েরার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করা আছে। এর পরই তিনি পথ হারিয়ে অবশেষে সেই ঝরনার সামনে এক বিকেলে তাঁবু ফেলেছিলেন। ঠিক সে জায়গাটা সম্ভবত একদিনের পথ। যে খাতটা দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে, সে পথই ধরব আমরা। এমন হতে পারে এ পথটাই আমাদের পৌঁছে দেবে সেই ঝরনার কাছে। সুদীপ্ত সহমত জানাল তাঁর কথায়। সে-পথেই এগোল তারা। আরও নিবিড় জঙ্গল, আরও নিস্তব্ধতা চারপাশে।

এগোচ্ছিল তারা। হঠাৎই সেই নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে যেতে লাগল প্রচণ্ড শব্দে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। রাইফেলের শব্দ! একটা নয় বেশ কয়েকটা শব্দ হল পরপর। আর সেই শব্দগুলো চারপাশের পাহাড়ের ঢালে ধাক্কা খেয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল উপত্যকায়।

হেরম্যান বললেন, শব্দটা আসছে আমাদের ডানদিকের পাহাড়ের ঢাল থেকে। সম্ভবত তানাকারা আছেন ওখানে। গুলি চালিয়ে দেখি কোনো প্রত্যুত্তর পাই কিনা?

হেরম্যানের ইঙ্গিতে পিনাক কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে নিয়ে একটা ফায়ার করল। কেঁপে উঠল চারপাশের পাহাড়। সে শব্দও প্রতিধ্বনিত হল কিছুক্ষণ। তারপর সব কিছু

আবার শান্ত হয়ে গেল। ওপাশ থেকে কোনো সাড়া মিলল না। হেরম্যান বললেন, ব্যাপারটা কী হল বোঝা গেল না। চলো তাহলে আমরা আমাদের মতোই এগোই। এগোতে যাচ্ছিল সুদীপ্তরা। কিন্তু তারা এরপর একটু অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। ডানপাশের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জঙ্গল ভেঙে কী যেন নেমে আসছে তাদের দিকে। অদ্ভুত খচমচ একটা শব্দ! পিনাকের রাইফেলের নল সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে ঘুরে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাহাড়ের ঢালে জঙ্গলের আড়াল থেকে আবির্ভূত হল একটা মানুষ! তার সামনে পড়েছিল বেশ বড় একটা পাথর। দ্রুতবেগে নামতে নামতে নিজের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সে পাথরটার ওপর পড়ল। তারপর একটা ডিগবাজি খেয়ে ওপর থেকে ছিটকে পড়ল সুদীপ্তদের কিছুটা তফাতে। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল লোকটার কাছে। হেরম্যান বিস্মিতভাবে বলে উঠলেন, আরে এ যে মিস্টার তানাকার সঙ্গী দুজনের একজন!

সুদীপ্তরাও চিনতে পারল তাকে। লোকটার সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। না, পাথরে ধাক্কা খেয়ে ওপর থেকে পড়ার জন্য নয়। কেউ যেন তার শরীর ধারালো ছুরি দিয়ে ফালা করে চিরেছে! লোকটার চোখের মণি দুটো যেন আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার বুকটা হাপরের মতো উঠছে-নামছে।

হেরম্যান তার ওপর ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ অবস্থা কীভাবে হল? মিস্টার তানাকা কোথায়?

লোকটা প্রত্যুত্তরে অতিকষ্টে ডান হাতটা তুলে ঢালের মাথার ওপরের জঙ্গলটা যেন একবার দেখাবার চেষ্টা করল। আর তারপরই তার হাতটা বুকের ওপর নেমে এল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে লোকটার দেহ স্থির হয়ে গেল। তার ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখের মণি দুটো শুধু চেয়ে রইল পাহাড়ের মাথার ওপর কুয়াশা মাখা জঙ্গলের দিকে। উত্তেজিত হেরম্যান বলে উঠলেন, লোকটার এ অবস্থা কে করল? এ কি তাহলে 'আ-হুল'-এর শিকার? অতবার রাইফেলের শব্দ তাহলে কোনো লড়াইয়ের শব্দ ছিল! মিস্টার তানাকাও তাহলে বিপদগ্রস্ত! তার খোঁজ করতে হবে আমাদের। এটা মানবতার ব্যাপার। এই বলে পিনাকের রাইফেলটা হাতে নিলেন তিনি, আর সুদীপ্তকে ধরিয়ে দিলেন তার রিভলভার।

পাহাড়ের সেই ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সবাই। প্রথমে রাইফেল হাতে হেরম্যান, তারপর সুদীপ্ত, সব শেষে বোলো হাতে পিনাক। দু-পাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আলো-আঁধারি খেলা করছে তার ভিতর। কেমন যেন ভেজা-স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ চারদিকে। কিছুটা এগোবার পর একটা অদ্ভুত শব্দ কানে আসতে লাগল তাদের। পিনাক বলল, ওগুলো আসলে বর্ষাবনের ব্যাঙের ডাক। বিভিন্ন সুরে একসঙ্গে অনেকগুলো ব্যাঙ ডাকছে বলে অদ্ভুত শোনাচ্ছে শব্দটা। এরপর সত্যিই এক জায়গাতে একসঙ্গে নানা আকারের নানা ধরনের বেশ কিছু ব্যাঙ চোখে পড়ল। যেন এই নির্জন বনে মিটিং বসিয়েছে ব্যাঙের দল! যত ওপরে উঠতে লাগল চোখে পড়তে লাগল অজস্র ব্যাঙ।

হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, তোমাকে মনে হয় বলেছিলাম যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রজাতির ব্যাঙ এই সলক মাউন্টেনে পাওয়া যায়। এবার চাক্ষুস করলাম ব্যাপারটা!

কিন্তু মিস্টার তানাকা বা তাঁর অপর সঙ্গীর দেখা নেই কোথাও। এদিকে বেলা ক্রমশ পড়ে আসছে। সলকের পাদদেশের এই জঙ্গলের অস্পষ্টতা ক্রমশ বাড়ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে যাবে জঙ্গল। হেরম্যান বললেন, পাহাড়ের মাথায় উঠে আজকের মতো তাঁবু ফেলব আমরা। তারপর কাল সূর্যের আলো ফুটলে যা করার তা করা যাবে।

সূর্য ডোবার কিছু সময় আগে অবশেষে সুদীপ্তরা উঠে এল সেই পাহাড়ের মাথার ওপর। সেখানে বেশ কিছুটা জায়গা সমতল। আদিম মহাবৃক্ষরাজি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তার ফাঁক দিয়ে সলকের মাথায় সূর্যাস্ত দেখা যাচ্ছে। বাতাস বেশ ঠান্ডা এ জায়গাতে। সুদীপ্তরা ঠিক করল জঙ্গলের ভিতর গাছগুলোর নীচে কোনো সুবিধামতো জায়গা বেছে তাঁবু ফেলবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমা পাতার রাশি যেন পায়ের তলায় পুরু গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। সেই পাতা মাড়িয়ে তারা প্রবেশ করল পাহাড়ের মাথার জঙ্গলে তাঁবু ফেলার স্থান নির্বাচনের জন্য। কিছুটা এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তিনজন। গাছের ফাঁক গলে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গাতে শেষ বিকেলের আলো এসে পড়েছে সিনেমার ফোকাসের মতো। সেখানে পড়ে আছে একটা লাল রুকস্যাক ব্যাগ! আরে এই ব্যাগটাই তো গতদিন যাত্রা শুরুর সময় মিস্টার তানাকার পিঠে ছিল! তার মানে, তানাকা হয়তো এখানেই কোথাও থাকতে পারেন! ব্যাগটা দেখে সুদীপ্তরা এগোল সেদিকে। তাদের পায়ের তলায় পুরু পাতার রাশি। গোড়ালি, পায়ের পাতা ঢুকে যাচ্ছে তার মধ্যে। ব্যাগটার কাছে পৌঁছে হেরম্যান সেটা তুলে নিলেন। সুদীপ্তরা গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল তানাকাকে কোথাও দেখা যায় কিনা। হেরম্যান হাঁক দিলেন, মিস্টার তানাকা আপনি কোথায়? কিন্তু কোনো জবাব মিলল না।

আর এরপরই হঠাৎ একটা পাখির ডাক কানে এল তাদের।—কুইক-কু, কুইক-কু...।

একটা খচমচ শব্দের সঙ্গে চারপাশের পাতাগুলো যেন মন্ত্রবলে মাটি থেকে কিছুটা ওপরে উঠে এল। সুদীপ্তরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাতার রাশি তাদের জাপ্টে ধরে মাটি থেকে শূন্যে উঠিয়ে নিল। নাগরদোলায় ওপরে ওঠার মতো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা ওপরে উঠে গিয়ে সবাই মিলে জট পাকিয়ে মাটির অন্তত তিরিশ ফুট ওপরে দড়ির জালে পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকল। এমনভাবে তারা আটকে গেছে যে হাত-পাও নাড়ানো যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা বুঝতে বেশ কিছুটা সময় লাগল সুদীপ্তদের। তারপর তারা দেখতে পেল গাছের গুঁড়িগুলোর আড়াল থেকে এক এক করে বেরিয়ে আসছে কালো কালো বেশ কিছু মানুষ। পরনে তাদের লেংটির মতো নামমাত্র পোশাক। মুখে সাদা রং মাখা। হাতে তির-ধনুক। সেগুলো তাক করে আছে শূন্যে দুলতে থাকা সুদীপ্তদের দিকে। হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, এরা অসভ্য জনজাতি হবে। বাঁচতে হলে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

একে একে বেরিয়ে এল লোকগুলো। একজনের কাঁধে একটা মরা ওরাং-ওটাং। সংখ্যায় তারা অন্তত তিরিশজন হবে। তাদের মধ্যে একজন ওপর দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কী একটা নির্দেশ দিল। সুদীপ্তরা এবার খেয়াল করল বেশ কিছু লোক গাছের মাথাতেও বসে আছে। যারা জালের দড়ি টেনে তাদের ওপরে উঠিয়েছে। জালটা নামতে শুরু করল এরপর। সুদীপ্তরা ভূমি স্পর্শ করল এরপর। সুদীপ্তরা ভূমি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে নীচের লোকগুলোর বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হয়ে এল। সবার হাতেই উদ্যত তির ধনুক। মুহূর্তের মধ্যেই পিনকুশন বানিয়ে দিতে পারে সুদীপ্তদের। কয়েকজন এগিয়ে এল সুদীপ্তদের কাছে। জাল থেকে তাদের বার করে দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধতে শুরু করল। এতগুলো লোকের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না বলে তাদের কাজে তারা তিনজন কেউ বাধা দিল না। তাদের কাজ শেষ হবার পর ভিড়ের মধ্য থেকে সর্দার গোছের একটা লোক এসে দাঁড়াল সুদীপ্তদের সামনে। তারও মুখে সাদা রং মাখা, পরনে লেংটি। তবে তার অন্য একটা বিশেষত্ব আছে। লোকটার সারা দেহে উল্কি আঁকা। ব্যাঙের ছবি। অজস্র ব্যাঙ যেন লেপটে আছে লোকটার শরীরে!

সে লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করল সুদীপ্তদের। হেরম্যানের লাল চুল-অলা মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে সম্ভবত পরীক্ষা করে নিল তার চুলটা আসল কিনা! তারপর সে অন্য নির্দেশ দিল সঙ্গীদের। তিনটে লম্বা গাছের ডাল আনা হল। তার একটাতে সুদীপ্তদের বেঁধে ফেলে ডালগুলোকে কাঁধে তুলে নিল লোকগুলো। শিকার করা পশুদের দেহ যেমনভাবে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক সেভাবে লোকগুলো সুদীপ্তদের ঝুলিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল এরপর। সলকের আড়ালে তখন সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার নামছে উপত্যকায়।

আবার চাঁদ উঠল একসময়। ফ্যাকাশে পাণ্ডুর চাঁদ। লোকগুলোর ছোটার বিরাম নেই। জঙ্গল, পাহাড়-উপত্যকা ভেদ করে ছুটে চলেছে তারা। মাঝে মাঝে শুধু কাঁধ বদল করার জন্য মুহূর্তের জন্য থামছে, আবার ছুটছে। আধো অন্ধকারে সেই লোকগুলোকে প্রেতের মতো লাগছে। সুদীপ্তরা যেন প্রেতলোকের যাত্রী। প্রেতবাহকেরা বহন করে নিয়ে চলেছে তাদের। সুদীপ্তর মনে হতে লাগল সে যেন একটা স্বপ্ন দেখছে। অন্ধকারের মধ্যেই যুগ যুগ ধরে দুলতে দুলতে ছুটে চলেছে সে। কিন্তু কোথায় চলেছে তা তাদের জানা নেই। একসময় সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই চোখে-মুখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হল। মাথা নীচু অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে দেহের সব রক্ত এসে জমতে শুরু করেছে তার মুখে।

সুদীপ্ত জ্ঞান হারিয়েছিল। সে যখন আবার চোখ মেলল তখন ভোরের আলো ফুটেছে। সুদীপ্তরা কোথায় কতদূর এসেছে তা তাদের জানা নেই। এটুকু সে বুঝতে পারল লোকগুলো একটা পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঝুলন্ত অবস্থায় পাহাড়ের ঠিক নীচে একটা জলাশয়ও চোখে পড়ল তার।

পাহাড়ের মাথায় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াল লোকগুলো। তারপর পাহাড়ের মাথায় একটা বিরাট গহ্বর বেয়ে নীচে নামতে লাগল সুদীপ্তদের নিয়ে। বেশ অনেকটা নামার পর

একটা তাকের মতো জায়গায় এসে দাঁড়াল সবাই। সেই লাঠিগুলো থেকে সুদীপ্তদের বাঁধন খুলে ধাক্কা মেরে তাদের তিনজনকে নীচে ফেলে লোকগুলো আবার ওপরে উঠে এল।

লোকগুলো চলে যাবার পর তারা বেশ কিছুক্ষণ মড়ার মতো শুয়ে রইল। সারা শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। উঠবার শক্তি তাদের ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে একে একে উঠে বসল সবাই। সুদীপ্ত, হেরম্যান, পিনাক...প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে বেশ একটা চওড়া গর্তের মধ্যে আটক করা হয়েছে তাদের। মাথার ওপরে ফাঁকা জায়গা দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন সলকের ধূসর আকাশ দেখা যাচ্ছে।

গর্তর ভিতরটা ভেজা স্যাঁতসেঁতে। গর্তের মাথার ঠিক ওপরেই একটা গাছ আছে। বছরের পর বছর ধরে গর্তের মধ্যে খসে পড়া রাশি রাশি পাতা তলদেশে পুরু একটা আস্তরণ তৈরি করেছে। তার ওপর ফেলা হয়েছিল সুদীপ্তদের। ফলে পতনজনিত কারণে চোট লাগেনি তাদের।

হেরম্যানই প্রথম মুখ খুললেন। চারপাশটা ভালো করে দেখে নিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন, সম্ভবত কোনো একটা ক্রেটারের ভিতর ওরা আমাদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

সুদীপ্ত বলল, জংলিগুলো আমাদের নিয়ে কী করবে বলে মনে হয়?

হেরম্যান জবাব দিলেন, ক্যানিবল হলে আমাদের মেরে খাবে। তবে জাভার জঙ্গলে ক্যানিবল আছে বলে শুনিনি।

পিনাক বলল, আমিও জঙ্গলে অনেক ঘুরেছি। এ জঙ্গলে মানুষখেকো মানুষের কথা আমিও শুনিনি। আমরা যখন ধরা পড়লাম তখনই ওরা আমাদের মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তা না করে এত পরিশ্রম করে ওরা যখন আমাদের এতটা পথ বহন করে আনল, তখন এর পিছনে তাদের নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে।

হেরম্যান আর সুদীপ্তরও মনে হল পিনাকের অনুমান ঠিক।

সুদীপ্ত বলল, কিন্তু এখন কী করব আমরা?

হেরম্যান বললেন, আপাতত তো কিছু করার দেখছি না। এই মুহূর্তে পালাবার কোনো উপায় নেই। আমাদের হাত বাঁধা। ওপরে ওঠা যাবে না। তাছাড়া গর্তের বাইরে নিশ্চয়ই ওরা পাহারা দিচ্ছে। হাতিয়ার ছাড়া কীভাবে মোকাবিলা করব ওদের?

পিনাক বলল, হাত দুটো যদি কোনোভাবে খুলতে পারি তবে মরার আগে দু-চারটাকে মেরে ফেলব। এ হাতেই বাঘের টুঁটি চেপে ধরেছিলাম আমি।

লোকগুলোর প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশ ফুটে উঠেছে পিনাকের মুখে। এরপর পিনাক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পাথুরে দেওয়ালের গায়ে তার হাতটা জোরে ঘরতে লাগল।

ঘাসের শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে সুদীপ্তদের হাত। এ দড়ি সহজে ছেঁড়ার নয়। দড়ি আর পাথরের ঘষাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই পিনাকের হাতের ছাল উঠে রক্ত বেরোতে শুরু করল। কিন্তু পিনাকের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। পাগলের মতো সে হাতটা ঘষছে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় পিনাক কি শেষে পাগল হয়ে গেল? হেরম্যান তাকে নিবৃত্ত করার জন্য বলে উঠলেন, এ তুমি কী করছ পিনাক! শান্ত হও।

পিনাক তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে মাথার ওপর ওঠানো হাত দুটো পাথরের গায়ে ঘষেই যেতে লাগল। তার দড়িবাঁধা ক্ষতবিক্ষত কব্জি থেকে রক্তের ধারা মাটিতে পড়তে লাগল। পিনাক হয়তো সত্যি পাগল হয়ে গেছে। তাকে থামানো দরকার, এই ভেবে উঠে দাঁড়াল সুদীপ্ত। ঠিক সেই সময় পট্ করে একটা শব্দ হল। মাথার ওপর থেকে তার রক্তাক্ত হাতটা নামিয়ে আনিল পিনাক। অসহ্য যন্ত্রণাতেও তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ধন্য তার ক্ষমতা, সহ্যশক্তি, দড়িটা ছিঁড়ে গেছে।

অবাক হয়ে সুদীপ্ত পিনাকের মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর তাকাল পিনাক যেখানে হাত ঘষছিল সে জায়গাতে। পাথুরে দেওয়ালের গায়ে সে জায়গাতে পিনাকের হাতের এক টুকরো চামড়া লেগে আছে।

পিনাক মাটিতে বসে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁফিয়ে নিয়ে হেসে বলল, বাঘের কামড় সহ্য করেছি তার তুলনায় এ আর কী যন্ত্রণা! তবে আঙুলগুলো অসাড় হয়ে গেছে। ঠিক হতে একটু সময় লাগবে।

সত্যি এ লোকটা বড় অদ্ভুত। সুদীপ্ত আর হেরম্যান অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। পিনাক তারপর সুদীপ্তদের দিকে এগিয়ে এল দড়ির বাঁধন খোলবার জন্য। হেরম্যান তাকে বললেন, তোমাকে বেশি কষ্ট করতে হবে না। আমার বুটের মধ্যে একটা ছুরি লুকোনো আছে। ডান পা-টা পিনাকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। পিনাক ছুরিটা বার করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সুদীপ্তদের বন্ধনমুক্ত করল। নিজের হাতটা পেটের কাছে নামাতেই জামার নীচে একটা জিনিসের স্পর্শ অনুভব করে সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলে উঠল, আপনার রিভলভারটা আমার জামার তলায় কোমরে রয়ে গেছে! উত্তেজনায় ব্যাপারটা খেয়াল করিনি!

হেরম্যান শুনে বলে উঠলেন, যাক, ছুরি আর রিভলভারটা যখন আছে তখন মরতে হলে তার আগে লড়াই দেওয়া যাবে। ওরা রাইফেল-বন্দুক চালাতে জানে না। পিনাকের রাইফেল সে জায়গাতেই ছেড়ে এসেছে ওরা।

আর আমার হাতটাও আছে। বন্দুক-রাইফেলের চেয়ে কম ভয়ংকর নয়।—এই বলে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখাল পিনাক। এত কষ্টের মধ্যেও তার কথা শুনে হেসে ফেলল সুদীপ্তরা। হেরম্যান তাকে বললেন, হ্যাঁ, একদম ঠিক কথা। এরপর তিনি বললেন,

দড়িগুলোকে আবার হাতের মধ্যে পেঁচিয়ে ফেলতে হবে। যাতে জংলিগুলো কিছু বুঝতে না পারে। বাঁধন খুলে যাওয়ায় আর রিভলভারটা থাকায় বেশ ভরসা পাচ্ছি।

কীভাবে মুক্তির উপায় খোঁজা যায় তা নিয়ে আলোচনা করছিল সুদীপ্তরা। হঠাৎ তাদের মনে হল ক্রেটারের ভিতর আলো যেন ধীরে ধীরে কমে আসছে। মাথার ওপর তাকাতেই তারা দেখতে পেল সলকের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে! পিনাক বলল, বৃষ্টি নামবে!

তার কথাই কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যি হল। আকাশ থেকে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামতে শুরু করল গর্তের ভিতর। প্রথম এক ফোঁটা, দু-ফোঁটা। তারপর ঝমঝম করে।

পিনাক বলল, বর্ষাবনের বৃষ্টি প্রথম দু-একদিন নামবে, থামবে। তারপর থেকে শুরু হয় টানা বৃষ্টি। পাহাড়ি নদীগুলো দু-দিনেই ফুলে-ফেঁপে ওঠে। বৃষ্টিতে সব কিছু মুছে যায় তখন।

হেরম্যান বললেন, এই বৃষ্টির সুযোগটা তো কাজে লাগানো যেতে পারে। যদি ওরা অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকে তবে পালাতে পারি আমরা। ওপরটা দেখে এলে হয়।

তার কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সুদীপ্ত। যেদিক দিয়ে তাদের নীচে নামানো হয়েছে সেদিকে পাথুরে দেওয়ালের গায়ে ধাপ মতো আছে। সুদীপ্তকে দেখে হেরম্যানও উঠে দাঁড়ালেন। সেই দেওয়ালটার কাছে এগিয়ে দাঁড়ালেন দুজন। হেরম্যানের কাঁধে পা রেখে সুদীপ্ত পৌঁছে গেল নীচের তাকটাতে। তারপর ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। বাইরের পৃথিবীর বৃষ্টির জল এবার ওপর থেকেও দেওয়ালের গা বেয়ে নামতে শুরু করেছে। যে-কোনো মুহূর্তে হাত-পা পিছলে যেতে পারে। অতি সাবধানে ওপরে উঠতে লাগল সে। নীচে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন হেরম্যান আর পিনাক।

বেশ কষ্ট করেই সুদীপ্ত গর্তের মুখের কাছে উঠল। সে ইশারা করলেই হেরম্যানরা ওপরে উঠতে শুরু করবে। অতি সন্তর্পণে বাইরে তাকাল সুদীপ্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের আশাভঙ্গ হল। প্রবল বর্ষণের মধ্যেও গর্ত আগলে বসে আছে দলটা। একজনকে তো সে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে! ব্যাপারটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার নামতে শুরু করল।

গর্তের নীচে বসে বসে সারাদিন ধরে তিনজন ভিজতে লাগল। মাঝে দু-একবার গর্তের ওপর থেকে কয়েকজন উঁকি দিয়ে দেখল তাদের। বিকেল নাগাদ অবশেষে বৃষ্টি থামল। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল একটা দানা পড়েনি পেটে। তার ওপর টানা বৃষ্টিতে ভেজা। শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে তিনজনের। বৃষ্টিটা হওয়াতে অবশ্য তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভব হয়েছে।

বৃষ্টি থামার কিছু পরই বেশ কয়েকজন নীচে নামতে শুরু করল। নীচে নামার পর তাদের ঘিরে ধরে তির দিয়ে খুঁচিয়ে ওপরে ওঠার জন্য সুদীপ্তদের ইঙ্গিত করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সঙ্গে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এল তারা। একটা দড়ি দিয়ে

তাদের তিনজনকে বেঁধে ধাক্কা মেরে মাটিতে বসিয়ে তির-ধনুক হাতে পাহারায় বসল ক'জন জংলি। কিছুটা তফাতে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। তার ওপর ঝলসাচ্ছে চামড়া সমেত একটা ওরাং-ওটাং-এর দেহ। মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ বেরোচ্ছে। সে জায়গাটা ঘিরে বসে আছে সেই উল্কি আঁকা জংলি আর বাকিরা।

সুদীপ্ত চারপাশে ভালো করে তাকাল। অনুচ্চ পাহাড়টার নীচে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। তার গায়ে একটা জলা। সেই জলাটা মনে হয় ব্যাঙে ভর্তি। এত ওপর থেকেও ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। এরপর ওপরে মাথার দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল সুদীপ্ত। বর্ষণসিক্ত সলকের আকাশ। জল পেয়ে শৃঙ্গগুলো যেন ঝলমল করছে। পাদদেশের ঘন জঙ্গল যেন পান্না-সবুজ রং ধরেছে। আর এ সবের মাথার ওপর শেষ বিকেলে একটা রামধনু দেখা যাচ্ছে! কী আশ্চর্য সুন্দর সেই দৃশ্য! হেরম্যান সেদিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে তারিফ করে বললেন, এবার মরলেও ক্ষতি নেই। মরার আগে এমন দৃশ্য দেখার সৌভাগ্যই বা ক'জনের হয়! সব কিছু ভুলে তারা বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেই অপার্থিব সৌন্দর্যের দিকে।

এক সময় সলকের মাথায় সূর্য ডুবে গেল। মুছে গেল রামধনু। আঁধার নেমে আসতে লাগল উপত্যকায়। ওরাং-ওটাং-এর মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে। আগুন থেকে সেটা নামিয়ে ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে সেই উল্কি আঁকা লোকটা তার সঙ্গীদের মধ্যে পোড়া মাংস বিতরণ শুরু করল। শুরু হল তাদের ভোজসভা।

পিনাক বলল, এরা আমাদেরও পুড়িয়ে খাবে কিনা কে জানে?

হেরম্যান বললেন, দেখা যাক কী হয়। অন্ধকার না নামলে পালাবার চেষ্টা করা যাবে না। হাত তো খোলাই। তেমন হলে লড়ব।

সুদীপ্তদের সামনে বসেই ওরাং-ওটাং-এর পোড়া মাংস বেশ তৃপ্তি করে চেবাচ্ছিল। হঠাৎ তার মুখে শক্ত একটা জিনিসে কামড় পড়তেই সে সেটা থুঃ করে মুখ থেকে বাইরে ফেলল। সেই ছোট্ট চকচকে জিনিসটা গড়িয়ে এসে থামল সুদীপ্তদের পায়ের কাছে। রাইফেলের বুলেট!

হেরম্যান বললেন, এ ওরাং-ওটাংটা আমাদের সেই প্রাণীটাই। এ মাংস ওদের খুব প্রিয় দেখছি। তাহলে সেদিন খাঁচার চারপাশে অন্ধকারে যাদের ঘুরতে দেখেছিলাম তারা আসলে এ লোকগুলোই। খাঁচার ঝাঁপ ঠেলে এরাই প্রাণীটাকে নিয়ে গিয়েছিল! বুলেট রয়ে গিয়েছিল প্রাণীটার দেহে।

সেই জান্তব ভোজসভা যখন শেষ হল তার বহুক্ষণ আগেই অন্ধকার নেমে গেছে। আবছা চাঁদ উঠতে শুরু করেছে সলকের মাথায়। ভোজ শেষে পরিতৃপ্ত জংলিরা সবাই উঠে দাঁড়াল। সুদীপ্তদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সেই উল্কিঅলা অসভ্যটা কী যেন নির্দেশ দিল সঙ্গীদের। অগ্নিকুণ্ড থেকে মশাল জ্বালিয়ে নিল তারা। সুদীপ্তদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে ঢাল বেয়ে নীচে নামা শুরু হল।

নীচে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটার দু-পাশে ঘন জঙ্গল, একপাশে পাহাড়ের ঢাল, আর

ঠিক তার বিপরীত ফাঁকা জায়গার শেষে বদ্ধ জলাশয়টা। পৃথিবীর সব ভেক যেন আজ এসে জমা হয়েছে বদ্ধ জলাটাতে। একটানা কোলাহলের সঙ্গে জলের ওপর তারা লাফাচ্ছে। প্রথম বৃষ্টির জল পেয়ে তাদের যেন আনন্দের সীমা নেই। তবে বড্ড নোংরা জায়গা। ভ্যাপসা পচা গন্ধ উঠছে জলা থেকে। ফাঁকা জায়গার ঠিক মাঝখানে বেশ কয়েকটা খুঁটি পোঁতা। সেখানে সুদীপ্তদের নিয়ে দাঁড় করানোর পর জংলি সর্দারটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল। তারপর তাদের তিনজনের কোমরে দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত করে একটা খুঁটির সঙ্গে দাঁড় করিয়ে বাঁধল। লোকগুলো এরপর আকাশের দিকে একবার ভালো করে তাকাল। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে পিনাক বলল, আকাশ মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। আবার বৃষ্টি নামবে।

জংলিগুলোর কাজ শেষ হবার পর সর্দার একটু ঝুঁকে পড়ে নিজের কোমরে কী যেন খুঁজে দুর্বোধ্য ভাষায় কী একটা বলল তার সঙ্গীদের। তারা যেন বেশ উত্তেজিত হল সর্দারের কথা শুনে। দুজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটল পাহাড়ের মাথায়, কিছুক্ষণ পর আবার খালি হাতে ফিরেও এল। উল্কিঅলা লোকটা কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করল অন্য জংলিদের সঙ্গে। আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাতে লাগল। তাদের কথার ধরন দেখে সুদীপ্তরা অনুমান করল তারা বেশ উত্তেজিত। চাঁদ উঠল আকাশে। তবে মাঝে মাঝে ভাসমান মেঘ ঢেকে দিচ্ছে তাকে। লোকগুলো যেন চাঁদ ওঠার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সুদীপ্তদের খুঁটির মধ্যে বেঁধে রেখে দলবেঁধে তারা এগোল জলার দিকে। জলার পাড়ে ভেজা মাটিতে মশালগুলো পুঁতে জলে নামল তারা। পাড়ের দিকে খুব বেশি জল নেই। হাঁটু সমান জল হবে। সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেকটা ব্যাঙের মতোই দু-পা ফাঁক করে অদ্ভুতভাবে বসল লোকগুলো। তারপর ঠিক ব্যাঙের মতোই জলা থেকে আকাশের দিকে মাথা তুলে তারা অদ্ভুত স্বরে ডাকতে লাগল! তাদের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে হেরম্যান-সুদীপ্তরা বেশ অবাক হয়ে গেল।

সুদীপ্তদের যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছে সেখান থেকে জলার দূরত্ব অন্তত দেড়শো ফুট হবে। হেরম্যান বললেন, আমাদের ডানপাশের জঙ্গলে যদি ঢুকে পড়ে যায় তবে পালাবার একটা উপায় হতে পারে। রাতে ওদের তির-ধনুক তেমন কাজ দেবে না।

পিনাক বলল, আর কিছু সময়ের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। এই বলে হাতের বাঁধন খুলে সে সন্তর্পণে ছুরি বার করল কোমরের দড়ির বাঁধন কাটার জন্য।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত স্বরে ডেকে চলেছে অসভ্য মানুষগুলো। কখনো একটানা, কখনো বা থেমে থেমে। জঙ্গলের আদিম অসভ্য মানুষদের অদ্ভুত সব রীতি থাকে। সুদীপ্তর মনে হল আকাশের দিকে তাকিয়ে ওই অদ্ভুতভাবে লোকগুলো হয়তো আকাশদেব বা বর্ষার আরাধনা করছে। কিন্তু খুঁটির সঙ্গে কেন তাদের এমনভাবে বাঁধা হল সেটা বুঝতে পারছে না। ঘণ্টাতিনেক সময় এভাবে কেটে গেল। সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশও মেঘে ঢেকে গেল। তারপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নামল। ব্যাঙের

ডাক আর অসভ্যদের অদ্ভুত চিৎকার আরও যেন বেড়ে গেল। হেরম্যান বলল, তৈরি হয়ে থাকো। আমি বললেই জঙ্গলের দিকে দৌড়বে।

দেখতে দেখতে কিছু সময়ের মধ্যেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির শব্দ, ব্যাঙের কলতান, অসভ্যদের চিৎকারে মুখরিত হয় উঠল জায়গাটা। বৃষ্টির জলে মশালগুলো নিভে গেল। মেঘ মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদের ক্ষীণ আলোটুকুও। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডেকে যাচ্ছে পৃথিবী। ঠিক তেমনই একবার মেঘ ঢেকে দিল চাঁদকে। আর কেন যেন ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাঙের ডাক, অসভ্যদের শব্দ সব থেমে গেল। হেরম্যান শুধু বললেন, দৌড়াও। অমনি সুদীপ্তরা ছুটতে শুরু করল জঙ্গলের দিকে।

সুদীপ্ত সব শেষে ছুটছিল। তারা তখন জঙ্গলের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। হঠাৎই মেঘ সরে গেল। পলায়মান সুদীপ্তদের দেখতে পেয়ে কয়েকজন জংলি জল ছেড়ে উঠে চিৎকার করে পিছু ধাওয়া করল তাদের। জঙ্গলে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তে সুদীপ্তর হঠাৎ মনে হল একখণ্ড কালো মেঘ যেন আকাশ থেকে নেমে এসে তার মাথার ওপর দিয়ে জলার দিকে উড়ে গেল। তার সঙ্গে একটা উৎকট পচা গন্ধও মুহূর্তের জন্য তার নাকে এসে লাগল। আর তারপরই তাকে অনুসরণকারী একজন অসভ্য মানুষের রক্ত জল-করা আর্তনাদ তার কানে এল। কিন্তু ব্যাপারটা কী হল তা ফিরে দেখার মতো সুযোগ সুদীপ্তর ছিল না। হেরম্যানদের পিছন পিছন সে-ও জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সেই নাম-না-জানা জঙ্গলে, অন্ধকারের মধ্যে গাছে ধাক্কা খেতে খেতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তারা ছুটতে লাগল বৃষ্টির মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

কতক্ষণ, কোন দিকে ছুটছে হুঁশ ছিল না সুদীপ্তদের। এক সময় থামল তারা। জঙ্গল অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। ঢালু হয়ে তা আবার নীচের দিকে নেমেছে। বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে জিরিয়ে নিল সকলে। হেরম্যান তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো আবার এগোতে হবে।

আবার তারা এগোতে শুরু করল। তবে এবার আর দৌড়ে নয়। শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, ধীর পদক্ষেপে ঢাল বেয়ে নামতে লাগল তারা। এক সময় আকাশে শুকতারা ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে আবছা আলো যেন দেখা দিতে লাগল পশ্চিম আকাশে।

আলো যখন ভালো করে ফুটল তখন সুদীপ্তরা দেখতে পেল তাদের সামনেই একটা বেশ বড় পাহাড়। এ পাহাড়ের বিশেষত্ব হল পাহাড়টা প্রায় খাড়া ওপর দিকে উঠে গেছে। পাদদেশে গভীর জঙ্গল থাকলেও তার গা-টা ন্যাড়া। বড় বড় পাথরখণ্ড দাঁত বার করে আছে তার গা থেকে।

কাছেই একটা টিলার ওপর উঠল তারা। জঙ্গলের ভিতর একটা নদীখাত চোখে পড়ল তাদের। হেরম্যান বললেন, আমরা সম্ভবত উপত্যকাটির ঠিক মাঝখানে অবস্থান করছি। এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। জংলিগুলো আমাদের পিছু ধাওয়া করতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ ছুটলেও আসলে খুব বেশি পথ অতিক্রম করতে পারিনি আমরা। ওই ন্যাড়া পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে ওপাশের উপত্যকায় পৌঁছলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

সুদীপ্ত বলল, আহুলের সন্ধানে কি তবে ইতি টানলাম আমরা?

হেরম্যান বিষণ্ণ হেসে বললেন, আমাদের যা ছিল তা সবকিছুই জংলিগুলোর হাতে খোয়ালাম। এভাবে তো আর জঙ্গলে ঘোরা যাবে না। এখন যদি প্রাণীটা নিজে থেকে আমাদের দেখা দেয় সে অন্য কথা।

টিলার ওপর কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সুদীপ্তরা আবার সামনের জঙ্গলে ঢুকল পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে এই উপত্যকার বাইরে যাবার জন্য।

কিছুটা পথ এগোবার পর জঙ্গলের মধ্যে একটা নদীখাত চোখে পড়ল তাদের। তিরতির করে জল বয়ে চলেছে তাতে। গোড়ালি পর্যন্ত জল। তিনজনেই সেই জলে নেমে মুখে-হাতে জল দিল, জলপান করে কিছুটা সুস্থবোধ করল। পিনাক বলল, এই পাহাড়টার কোথাও একটা জলের উৎস আছে। সেখান থেকেই জলটা আসছে।

সুদীপ্ত বলল, এটা কালকের বৃষ্টির জলও তো হতে পারে। হয়তো পাহাড় ধুয়ে নীচে নেমে এসেছে।

পিনাক বলল, উপত্যকার এ অংশে খুব বেশি বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় না। দেখুন, এখানকার গাছের পাতাগুলো ধূসর, ধুলোমাখা। বৃষ্টির জল ধুলো মুছতে পারেনি। তাছাড়া নদীর জল স্বচ্ছ। প্রথম বৃষ্টির জল ঘোলা হয়। সব আবর্জনা ধুয়ে সে জল নদীতে নামে।

পিনাকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হেরম্যান হঠাৎ এক ঝটকায় সুদীপ্তর কোমর থেকে রিভলভারটা টেনে নিয়ে সামনের দিকে তাক করলেন। নদীর মাঝখানে বেশ বড় একটা পাথরের চাঁই পড়ে আছে। হেরম্যানের দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদীপ্ত দেখতে

পেল, তার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা মানুষের মাথা!

পিনাকও ছুরিটা খুলে হাতে নিল। লোকটা অসভ্য-জংলি হলে তার সঙ্গীরাও নিশ্চয় কাছাকাছি আছে!

কিছুক্ষণ উভয়পক্ষই পরস্পরের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর পাথরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তার হাতেও ধরা আছে একটা তির-ধনুক। তিরের আগায় ছটফট করছে একটা মাছ।

কিন্তু এ লোকটা তো জংলি নয়, পরনে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক হলেও লোকটা ইউরোপিয়ান। মাথায় একরাশ সোনালি চুল। রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেলেও লোকটা যে বেশ ফরসা তা বোঝা যাচ্ছে। এই নাম-গোত্রহীন পাহাড়ি অরণ্যপ্রদেশে সভ্য মানুষ? সুদীপ্তরা তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। লোকটার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

লোকটাই প্রথমে মুখ খুলল, তোমরা কারা? কীভাবে এখানে এলে?

হেরম্যান জবাব দিলেন, আমরা প্রকৃতিবিদ। সলকের রেইন ফরেস্ট দেখতে এসে জংলিদের হাতে ধরা পড়েছিলাম। তারপর পালিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। আপনি?

লোকটা জবাব দিল, আমার নাম অলিভিয়েরা! একজন ওলন্দাজ ধাতুবিদ।

অলিভিয়েরা! নাম শুনে চমকে উঠল সবাই। দিনে দুপুরে তারা ভূত দেখছে না তো?

বিস্মিত হেরম্যান বলে উঠলেন, আপনি বেঁচে আছেন? খবরের কাগজে আপনার কথা বেরিয়েছিল। আপনার ডায়েরি আর দেহাংশ পাওয়া গিয়েছিল। সবাই তো জানে আপনি মারা গেছেন!

লোকটা জবাব দিল, সেটা ভাবাই স্বাভাবিক। তবে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এখনো বেঁচে আছি। এখানে অন্য কোনো পশুপাখি পাওয়া যায় না। নদীর পাথরের খাঁজে ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায়। আমার আস্তানা ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে প্রাণ হাতে করে দিনের বেলা মাঝে মাঝে এখানে আসি। তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

হেরম্যান বললেন, কিন্তু আপনার দেহ তো জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল! শনাক্তকরণও হয়েছিল! তবে?

অলিভিয়েরা বললেন, ওটা আমার দেহ নয়। সম্ভবত তার গায়ে আমার পোশাক ও জিনিসপত্র দেখে এবং সে লোকও একজন ইউরোপিয়ান বলে লোকে তা আমার দেহ বলে মনে করেছে। ভালো করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারত সে লোকের সঙ্গে বয়সের ফারাক অনেক। তবে আমি সত্যিই অলিভিয়েরা। এই দেখুন। ডান বাহুটা দেখালেন তিনি। সেখানে উল্কি লেখা—অলিভিয়েরা।

তাহলে তিনি কে? জানতে চাইল সুদীপ্ত।

অলিভিয়েরা নামেরা লোকটা বলল, সে অনেক কথা। কিন্তু এখানে থাকা আমাদের উচিত হবে না। অসভ্য জংলিগুলো এখানে যে-কোনো সময় আপনাদের পিছু ধাওয়া

করে চলে আসতে পারে। এই উপত্যকাটা ওদেরই এলাকা। আর কথা বলা যাবে না এখানে। আপনারা আমার সঙ্গে চলুন। তাছাড়া আমার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন আরও একজন। তিনিও আমার কথা শুনতে উদ্‌গ্রীব। আমরা পাঁচজন আগে একত্রিত হই, তারপর এই মৃত্যু উপত্যকা থেকে পালাতে হবে আমাদের।

কে তিনি? হেরম্যান প্রশ্ন করলেন।

জল ছেড়ে পাড়ের দিকে এগোতে এগোতে অলিভিয়েরা বললেন, তিনিও আমাদের মতোই জংলিদের হাত থেকে পালিয়ে এখানে এসেছেন। একজন প্রকৃতিবিদ। জাপানি ভদ্রলোক। নাম বলছেন, মিস্টার তানাকা।

মিস্টার তানাকা? এ পথে আসার সময় তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গী একজনকে আমরা মরতে দেখেছি, তিনি আপনার ওখানে আছেন? বলে উঠল সুদীপ্ত।

অলিভিয়েরা বললেন, হ্যাঁ। তিনিই। আপনাদের সমগোত্রীয় লোক। গতকালই তিনি এসেছেন। তাঁকে রেখে আমি খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম।

জল থেকে উঠে সুদীপ্তরা অনুসরণ করল তাঁকে।

নদীর একটু তফাতেই গভীর বন। চারজন ঢুকল সে বনে। হেরম্যান এগোতে এগোতে নিজেদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিয়ে দিল তাঁকে। তাঁর ডায়েরি যে সুদীপ্ত আর হেরম্যানকে এখানে আসার জন্য আকৃষ্ট করেছে হেরম্যান সেটাও জানিয়ে দিলেন তাঁকে। লোকটা শুধু তাঁর ডায়েরির কথা শুনে অস্পষ্টভাবে হাসলেন, তারপর সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে আর আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে এগোলেন বনের মধ্যে দিয়ে।

বিরাট বিরাট গাছ। চার-পাঁচজন মানুষও একসঙ্গে বেড় দিয়ে সেই গাছগুলোর গুঁড়ি ধরতে পারবে না। গাছগুলো তাদের ডালপালা মেলে সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। তবে গাছগুলোর নীচের অংশে বিশ-ত্রিশ ফুট ওপর পর্যন্ত গাছের গুঁড়ি দেখা যায় না। বর্ষাবনের অসংখ্য লতাগুল্ম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে তাদের। অনেকটা কচুপাতার মতো বিরাট বিরাট পাতাঅলা লতাগুল্মের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে গুঁড়িগুলো। ঠিক তেমনই একটা গাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন অলিভিয়েরা। গাছের গুঁড়ির গায়ের পাতাগুলো সরাতেই সুদীপ্তরা অবাক হয়ে গেল। বেশ বড় একটা গহ্বর আছে সেখানে।

অলিভিয়েরা সুদীপ্তদের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। আরও অবাক হলেন। আমিও অবাক হয়েছিলাম। এর ভিতর দিয়েই আমাদের রাস্তা। আসুন...। —এই বলে তিনি মাথা নীচু করে প্রবেশ করলেন গাছের গুঁড়ির মধ্যে।

গুঁড়ির ভিতর থেকে সংকীর্ণ সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে নীচের দিকে। মনুষ্যসৃষ্ট সিঁড়ি। অলিভিয়েরার পিছন পিছন অতি কষ্টে সেই সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা নীচে নামল সুদীপ্তরা। দেওয়াল হাতড়ে একটা মশাল বার করে অলিভিয়েরা সেটা জ্বালালেন। আলোকিত হয়ে উঠল সেই গহ্বর। সামনে একটা লোহার দরজা। সেটা খুলে সুদীপ্তদের নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি। সামনে একটা সুড়ঙ্গ। পাথুরে মেঝে, দেওয়াল, ছাদ। সংকীর্ণ

সুড়ঙ্গটা সোজা হয়ে চলে গেছে সামনের দিকে।

হেরম্যান বিস্মিতভাবে বললেন, কারা বানিয়েছিল এ সুড়ঙ্গ? সুমাত্রা-জাভাতে জঙ্গলে অনেক সময় প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্ন দেখা যায়। মন্দির, সুড়ঙ্গ এসব। আমরা কয়েক বছর আগে সুন্দা দ্বীপমালায় এমনই এক মন্দির, প্রাচীন সুড়ঙ্গ দেখেছিলাম, এটা তেমনই কিছু কি? এ সুড়ঙ্গ কোথায় গেছে?

অলিভিয়েরা বললেন, এ সুড়ঙ্গটা প্রাচীন ঠিকই। তবে অত প্রাচীন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনারা এ সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল। এক কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গপথ সোজা চলে গেছে ওই কালো পাহাড়টার দিকে এক জায়গাতে। এরপর আর কোনো কথা না বলে অলিভিয়েরা এগোলেন সে সুড়ঙ্গ ধরে।

মাটির নীচে থাকার কারণে সাধারণত সুড়ঙ্গ ঠান্ডা হয়, কিন্তু সুড়ঙ্গপথ যত এগোতে লাগল গরম তত বাড়তে লাগল। চলতে চলতে অলিভিয়েরা স্বগতোক্তির স্বরে একবার বললেন, আমি তো অনেকদিন এখানে বন্দিজীবন কাটাচ্ছি। মাটির নীচে এত গরম কিন্তু আগে ছিল না। হয়তো বাইরে প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে এমন ঘটেছে।

হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে মিস্টার তানাকার দেখা ঠিক কীভাবে হল?

তিনি জবাব দিলেন, এখানে কিছু প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গও আছে। তার সঙ্গে এ সুড়ঙ্গের যোগ আছে। পাহাড়ের গায়ে তেমনই এক প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ বা গুহায় প্রাণ বাঁচাতে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। তারপর তিনি পৌঁছে যান আমার কাছে। গতকাল রাতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমার।

অলিভিয়েরাকে অনুসরণ করে এরপর নিশ্চিতভাবে তারা এগিয়ে চলল সেই সুড়ঙ্গপথে। প্রায় সোজাই এগিয়েছে সুড়ঙ্গটা। মাঝে মাঝে কিছু লোহার গরাদঅলা দরজাও আছে। কোনোটার পাল্লা ঠেলে সরিয়ে এগোতে হচ্ছে, কোনোটার আবার দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে মরচে পড়ে ক্ষয়ে গিয়ে পাথুরে দেওয়ালের গা থেকে ঝুলছে। বেশ অনেকটা পথ এগোবার পর সুড়ঙ্গের গায়ে বেশ কিছু ছোট ছোট ঘরও মাঝে মাঝে চোখে পড়তে লাগল। কয়েদখানার মতো কুঠুরি। দরজায় লোহার গরাদ বসানো। সুড়ঙ্গের মধ্যে এরপর নানা ধরনের লোহার যন্ত্রাংশও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে দেখতে পেল তারা। এমনকী এক জায়গাতে লোহার বাসনপত্রও পড়ে আছে। তবে সবই অনেক পুরনো জিনিস। ধুলো আর মাকড়সার জালে ঢাকা। সুড়ঙ্গ দিয়ে যাবার সময় মশালের আলোতে একটা গরাদঅলা ঘরের ভিতর দরজার সামনেই ধুলোমাখা বেশ কিছু কঙ্কাল দেখতে পেয়ে সুদীপ্ত চমকে উঠে বলল, এগুলি কাদের কঙ্কাল?

অলিভিয়েরা জবাব দিলেন, সম্ভবত ওই অসভ্য জংলিদের। এক সময় এখানে তারা আটক ছিল। সব বলছি পরে। আরও কিছু ঘরে অমন কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছি।

একসময় সুড়ঙ্গ শেষ হল। সুদীপ্তরা এসে উপস্থিত হল একটা বড় ঘরে। নানা ধরনের ধাতব যন্ত্রাংশ, বড় বড় টেবিল, কাচের পাত্র ছড়িয়ে রয়েছে সে ঘরে। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত জিনিসপত্র সব। সুদীপ্তর মনে হল, একসময় এ ঘরটা কোনো গবেষণাগার

বা ওই ধরনের কোনো ঘর ছিল। এমনই বেশ ক'টা ঘর পর পর পার হয়ে অবশেষে তারা এসে দাঁড়াল একটা ঘরে। সে ঘরের চারদিকে বেশ কয়েকটা লোহার গরাদঅলা দরজা আছে। অফিস রুমের মতো ঘরটাতে বেশ কিছু প্রাচীন আসবাবপত্রও আছে। এ ঘরটা সম্ভবত ব্যবহার হয়। ঘরের দেওয়ালের গায়ে একটা মশাল জ্বলছে। সে ঘরেই একটা চেয়ারে বসেছিলেন মিস্টার তানাকা। অলিভিয়েরার সঙ্গে সুদীপ্তদের দেখতে পেয়ে তিনি বিস্মিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

হেরম্যান তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে এই অদ্ভুত জায়গাতে আমাদের দেখা হবে ভাবিনি।

মিস্টার তানাকা করমর্দন করে নিস্পৃহ স্বরে বললেন, এখানে দেখা হবে আমিও ভাবিনি। পরশু বিকেলে একটা পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলের ভিতর অসভ্য জংলিদের পাল্লায় পড়লাম। আমার সঙ্গী দুজন সম্ভবত মারা পড়েছে। আমি এখানে চলে এসেছি। কথাগুলো বলে চেয়ারে বসে পড়লেন তানাকা। সুদীপ্ত তাঁকে দেখে ঠিক বুঝতে পারল না যে তাদের আগমনে তিনি ঠিক খুশি হয়েছেন কিনা। এমনও হতে পারে যে মানসিক উত্তেজনা আর ক্লান্তিতে তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

তানাকার আশপাশেই বদল সবাই। হেরম্যান তানাকার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার মতো আমাদেরও একই অবস্থা। আপনার এক কুলির দুরবস্থা দেখে আপনাকে খুঁজতে গিয়ে জংলিদের ফাঁদে ধরা পড়লাম। তারা আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে পালিয়ে এসেছি।

মিস্টার তানাকা যেন খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করলেন না সে কথায়। অলিভিয়েরার উদ্দেশে তিনি বললেন, আমরা কীভাবে এখানে এসেছি তা তো আপনি শুনেছেন। কিন্তু আপনার এখানে আসা কীভাবে, কেন, কীভাবে আপনি একলা এখানে দিন কাটাচ্ছেন তা আমার জানা হয়নি। অনুগ্রহ করে সেটা এবার বলুন।

মিস্টার তানাকা অনুগ্রহ শব্দটা ব্যবহার করলেও অলিভিয়েরার প্রতি তাঁর কথাগুলো সুদীপ্তর কানে অনেকটা নির্দেশের মতোই শোনাল।

অলিভিয়েরা বললেন, সে কাহিনি বলার আগে বলে নিই আমরা যত দ্রুত সম্ভব এ তল্লাট ছেড়ে যেতে পারি ততই মঙ্গল। সম্ভব হলে আজ দিনের আলো থাকতে থাকতেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি। দক্ষিণ দিকে সমুদ্র একদিনের পথ। একটা খাঁড়ি আছে সেখানে। কাঠুরেদের নৌকা সেখানে যাওয়া-আসা করে। আমি একবার সে জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। পাঁচজন একসঙ্গে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা কম হবে।

এ কথা বলার পর অলিভিয়েরা শুরু করলেন তাঁর সেই কাহিনি। অভিযানের প্রথম দিন থেকেই তিনি শুরু করলেন তাঁর কথা। মন দিয়ে তাঁর কথা সবাই শুনতে লাগল। তার একটা অংশ সুদীপ্তদের জানা। নির্জন পার্বত্য উপত্যকায় সেই রাতের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করার পর অলিভিয়েরা সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ পর্যন্ত ঘটনা হয়তো আপনারা আমার ডায়েরির মাধ্যমে জেনে থাকতে পারেন' তারপর আর

লেখার সুযোগ হয়নি, কারণ, আমার কলমটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। যাই হোক তার পরের ঘটনা বলি—

যে রাতে আমি আমার সঙ্গী ইরিয়ানকে হারালাম সেই বিভীষিকাময় রাত্রির অবশেষে পরিসমাপ্ত হল। সে রাত আমি তাঁবুর মধ্যে ডায়েরি লিখেই কাটিয়েছিলাম। পরদিন ভোরের আলো ফোঁটার পর বাইরে বেরোলাম। সব কিছু শান্তই মনে হচ্ছে। কালো পাহাড়টার মাথা থেকে ঝরনার জল নেমে আসছে। তার আড়ালে সেই গুহাটাও দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। ঠিক করেছিলাম কালো পাহাড়টা অর্থাৎ ক্রেটারের মাথায় উঠে দেখব কোনো দিকে কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা, কিন্তু দিনের আলোতে ভালো করে দেখলাম পাহাড়ের গা-টা খুবই মসৃণ, শুধু ঝরনা যেখানে নেমেছে সেখানে পাথরের গায়ে কিছু ধাপ আছে। আমি ঠিক করলাম সেদিক দিয়ে একবার ওপরে ওঠার চেষ্টা করব। যদি ওপাশের ঢালে কোনো পথ পাওয়া যায়। তাঁবুতে ফিরে এসে অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সঙ্গে নিলাম। তারপর এসে দাঁড়ালাম সেই ঝরনার জল-জমা ডোবাটার সামনে। ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে গুহার গায়ে পাথরের খাঁজ বেয়ে আমাকে ওপরে উঠতে হবে। যা আছে কপালে বলে আমি এগোতে যাচ্ছি হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সেই ডোবার ভিতর থেকে উঠে দাঁড়াল দুজন প্রায় উলঙ্গ, মুখে উল্কি আঁকা মানুষ! তাদের একজনের হাতে তির-ধনুক, অন্যজনের হাতে ইরিয়ানের মতো কর্তিত হাতসমেত বোলোটা। জল ছেড়ে তারা উঠে আসতে লাগল আমার দিকে। কিছু একটা হতে চলেছে অনুমান করে আমি রাইফেলটা কাঁধ থেকে হাতে নিতে না নিতেই তির-ধনুক হাতে লোকটা তির চালিয়ে দিল আমাকে লক্ষ করে। তিরটা এসে বিঁধল আমার ঊরুতে। আমিও গুলি চালিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাঙের মতো ডিগবাজি খেয়ে জলে ছিটকে পড়ল লোকটা। অপর জংলিটা ইরিয়ানের হাতসুদ্ধ দা-টা আমার দিকে ছুড়ে মারল, কিন্তু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আমি আবারও গুলি চালালাম। মাটিতে পড়ার আগে সে অদ্ভুত স্বরে ডেকে আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যেন ডোবাটার ওপাশের জঙ্গলের ভিতর থেকে হাজারে হাজারে ব্যাঙ একসঙ্গে ডেকে উঠল! জঙ্গলের বাইরে আবির্ভূত হল মুখে সাদা রং মাখা আরও কিছু মানুষ। ডোবাতে ঝাঁপ দিল তারা সাঁতরে এপারে এসে আমাকে ধরার জন্য। এতজন মানুষের সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। তাই প্রাণভয়ে তিরটা হাঁটু থেকে কোনোরকমে বার করে নিয়ে আমি ছুটলাম জঙ্গলের দিকে। দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করতে করতে আমার পিছনে ছুটে আসতে লাগল জংলিরা। সে এক উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটা! পিঠে ব্যাগ, পায়ে তিরের ক্ষত। বেশ কিছুক্ষণ ছোটার পর জংলিরা যখন আমাকে একটা পাথুরে দেওয়ালের কাছে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছে ঠিক তখনই সেই পাথুরে দেওয়ালের গায়ে একটা গুহামুখ দেখতে পেলাম। আমার কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে একটা তির এসে টাং করে পাথরের দেওয়ালে লাগল। আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে আমি কোনোরকমে বাঁচার শেষ চেষ্টা করে নিজের দেহটা অন্ধকার গুহার মধ্যে ছুড়ে দিলাম। আর তার পরই আমার মনে

হল গুহার নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে যেন টেনে নিল আমাকে। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে পড়ে গেল আগের রাতে সেই ঝরনার আড়ালে টর্চের আলোতে দেখা সেই ছায়াটার কথা! তাহলে কি সেই? অসীম আতঙ্কে জ্ঞান হারালাম আমি। এ পর্যন্ত কথাগুলো বলে অলিভিয়েরা থামলেন।

সবাই চুপ করে শুনছে তাঁর কথা। তিনি থামতেই মিস্টার তানাকা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তারপর? তারপর?

অলিভিয়েরা দম নিয়ে বললেন, তারপর আমার জ্ঞান ফিরল, তখন দেখলাম আমি এ ঘরে শুয়ে আছি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ। আমি প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার পরনে পোশাক দেখে আশ্বস্ত হলাম। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে লোকটা জানাল তার নাম 'ভন হার্জেল'। আমি এখন নিরাপদ। জংলিরা এখানে ঢুকবে না। তারপর সে জানতে চাইল যে আমি জার্মান নই তো? আমি আমার পরিচয় দিলাম। তারপর জানতে চাইলাম জঙ্গলের মধ্যে এ জায়গাটা কোথায়? সে তখন আমাকে এক অদ্ভুত ব্যাপার জানাল। সেই প্রথম দিন তার পরবর্তীকালে তার সঙ্গে আলাপচারিতায় এ জায়গা সম্বন্ধে আমি যা জানতে পেরেছিলাম তা সংক্ষেপে বলি। আপনারা হয়তো জানেন ১৯৪২ সালে জাপানিরা এই দ্বীপরাষ্ট্রের দখল নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান হাত মেলায় জার্মানির সঙ্গে। তার প্রাক্কালে হিটলার নারকীয় হত্যালীলা চালাচ্ছিল জার্মানি জুড়ে। শুধু গ্যাস চেম্বারের মাধ্যমেই নয়, আরও নতুন নতুন কৌশলে কীভাবে মানুষ মারা যায় তার জন্য পরীক্ষা চালাচ্ছিল হিটলারের অনুগত সামরিক কর্তারা। সেই পরীক্ষার জন্যই জাপানের অধিকৃত এই দ্বীপরাষ্ট্রে দুর্গম অরণ্যের মধ্যে আগ্নেয় পর্বতের পাদদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা এই ক্যাম্প ও গবেষণাগার গড়ে তোলে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে কীভাবে মানুষ মারা যায় তাই নিয়ে পরীক্ষা করা হত এখানে। প্রথমে নাকি এই দ্বীপরাষ্ট্রের বোর্নিওর গভীর জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয় একদল অসভ্য বর্বর জনগোষ্ঠীকে। তারপর আকাশপথে জার্মানি থেকে আনা হতে থাকে দু-চারজন করে ইহুদিকে। বহু অসভ্য জাতীয় মানুষ এবং ইহুদি হিটলারের এই পরীক্ষাগারে তার বাহিনীর হাতে প্রাণ দেয়। হার্জেল ছিল ইহুদি। তার বাবা ছিলেন একজন 'রাব্বি' বা ধর্মপ্রচারক। নাৎসি বাহিনী যখন তাকে আর তার বাবাকে এখানে ধরে আনে তখন হার্জেলের বয়স চোদ্দো বছর। কিন্তু কপাল কিছুটা ভালো বলতে হবে হার্জেলদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একদম অন্তিম লগ্নে তারা এখানে আসে। সময়ের চাকা ঘুরে গেল, পরাজিত হতে শুরু করলেন হিটলার। হার্জেলদের এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যেই একদিন হঠাৎ জার্মানরা রাতের অন্ধকারে এ তল্লাট ছেড়ে পাড়ি জমাল তাদের দেশে। এখানে পড়ে রইল হতভাগ্য কিছু ইহুদি, আর বোর্নিও থেকে আনা সেই অসভ্য আদিম কিছু লোক। জার্মানরা চলে যাবার পরই সেই অসভ্যরা হঠাৎ কীভাবে যেন মুক্ত হয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর হল অন্য সমস্যা। ইহুদিরা মুক্ত হয়ে বাইরে আসতেই তথাকথিত জংলিরা আক্রমণ করে বসল তাদের। কারণ নাৎসি জার্মান আর ইহুদিদের মধ্যে পার্থক্য বোঝার

ক্ষমতা ছিল না তাদের। সবাই যে সাদা চামড়া। অসভ্য জংলিদের অসম্ভব ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল সাদা চামড়ার মানুষদের প্রতি। জনা পঁচিশ ইহুদি ছিলেন ক্যাম্পে। তার মধ্যে অধিকাংশই মারা পড়লেন জংলিদের আক্রমণে বিভিন্ন সময় পালাতে গিয়ে। তার মধ্যে হার্জেলের বাবাও ছিলেন। এরপর আবির্ভাব হল এক উড়ুক্কু আতঙ্কের। তার কবলে মারা পড়ল কেউ কেউ। একসময় বেঁচে রইল শুধু হার্জেল। জংলি আর সেই উড়ুক্কু দানবের জন্য বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছবার পথ বন্ধ হয়ে গেল তার। হার্জেলের কাছে শুনেছি সেই উড়ুক্কু প্রাণী নাকি বহুদিন আগে থেকেই এ তল্লাটের বাসিন্দা। নাৎসি জার্মানরাও নাকি সে কারণে রাত্রে সুড়ঙ্গের বাইরে বেরুত না। হার্জেল বিগত প্রায় তিরিশ বছর এখানেই কাটিয়েছেন। তার শেষ সঙ্গীর মৃত্যু হয় তিরিশ বছর আগে।

মিস্টার তানাকা বললেন, ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু এখানে আসার পর কী ঘটল সেটা বলুন?

অলিভিয়েরা আবার বলতে শুরু করলেন, আমার পায়ের ক্ষতটা বিষিয়ে উঠেছিল। ক'দিন লাগল আমার সুস্থ হতে। তারপর হার্জেলের সঙ্গে আমি আলোচনা শুরু করলাম এখান থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়ে। হার্জেল প্রথমে রাজি হচ্ছিল না। একলা থাকতে থাকতে সম্ভবত তার মাথায় একটু গণ্ডগোল হয়েছিল। তাছাড়া তার স্মৃতিতে নাৎসি অত্যাচারেরও স্মৃতি ছিল। মাঝে মাঝে সে এখানে এত বছর আছে তা-ও ভুলে যেত। সে ভাবত বাইরে বেরোলে সে শুধু জংলি বা উড়ুক্কু দানব নয়, নাৎসি জার্মানদের খপ্পরেও পড়তে পারে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সে রাজি হল। সমুদ্রের দিকে যাবার রাস্তাটা তার জানা ছিল। এই সুড়ঙ্গপথ ধরে একটা রাস্তা আছে। সে রাস্তা ধরে একদিন ভোরে আমরা বাইরে বেরোলাম। তারপর চলতে শুরু করলাম সমুদ্রের দিকে। সারা দিনটা জঙ্গলের মধ্যে চলার সময় নিরুপদ্রবেই কাটল আমাদের। সূর্য ডোবার কিছু আগে আমরা এই উপত্যকার একদম শেষ সীমানায় একটা টিলার মাথায় পৌঁছলাম। সেখান থেকে শেষ বিকেলের আলোতে দিকচক্রবাল বরাবর একটা রুপালি দাগ দেখতে পেলাম। ওখানেই সমুদ্রের খাঁড়িটা। টিলার বিপরীত দিকের ঢাল বেয়ে নামলেই সমতল ভূমি। তা আমাদের পৌঁছে দেবে সমুদ্রের কাছে। মুক্তির আনন্দে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। টিলার মাথার ওপর হাত পঞ্চাশেক সমতল জায়গাতে গা ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটা বড় ঝাঁকড়া গাছ। আমরা সেখানেই রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নিলাম।

বেশ বড় বড় প্রাচীন গাছ। তারই একটা গুঁড়ির নীচে বসলাম দুজন। অন্ধকার নামল, চাঁদও উঠল একসময়। দুজন মিলে নানা গল্প করতে লাগলাম। অনেকটা নিশ্চিন্ত আমরা। ভালো করে হেলান দিয়ে আরাম করে বসার জন্য বৃদ্ধ হার্জেল একসময় আমার কিছুটা তফাতে আর একটা গাছের নীচে বসল। চাঁদ ওঠার কিছু পর থেকেই বাতাসে একটা পচা গন্ধ পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে গন্ধটা তীব্র হচ্ছিল। হার্জেলও পেয়েছিল গন্ধটা। সে বলল, সম্ভবত কাছে কোথাও ছোটখাটো প্রাণী মরেছে। গন্ধটা তারই।

যাই হোক কথা বলতে বলতে পথশ্রমের ক্লান্তিতে আমার একটু ঢুলুনি মতো এসেছিল। হঠাৎ আমার মনে হল কিছুটা তফাতে একটা গাছের মাথার ওপরের দিকের একটা অংশ যেন হঠাৎই ওপর থেকে নীচে নেমে এল। তীব্র পচা একটা দুর্গন্ধে ভরে উঠল বাতাস। ভালো করে চোখ কচলে তাকাতেই দেখি হার্জেল নেই। আর তার পরই শুনতে পেলাম ভারী মতো কী একটা জিনিস টিলার ভিতরের দিকে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। হার্জেল কি টিলার কিনারা থেকে ঘুম চোখে নীচে পড়ে গেল? সেই শব্দকে অনুসরণ করে কিছুটা নীচে নামতেই আমি চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম তাকে। তার মুণ্ডুহীন ধড়টা একটা গাছের তলায় পড়ে আছে। কী বীভৎস সেই দৃশ্য! আর এরপরই ওপর থেকে আমার সামনে ধপ করে খসে পড়ল একটা গোলাকার বস্তু। হার্জেলের মাথা। চমকে উঠে ওপরে তাকাতেই দেখি গাছের মাথার একটা অংশ দুলছে। অন্ধকার থেকে একজোড়া লাল চোখ যেন নীচে নেমে আসার আগে আমাকে দেখছে! এরপর আমার আর কিছু ভালো করে দেখার অবস্থা ছিল না। ছুটতে শুরু করলাম আমি। কোন দিকে কোথায় যাচ্ছি জানা ছিল না। খালি মনে হচ্ছিল এই বুঝি আকাশ থেকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উড়ন্ত মৃত্যু। কিছুটা কাকতালীয়ভাবেই আমি পরদিন বিকেলবেলা দেখতে পেলাম এই সুড়ঙ্গমুখ। যা দিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলাম আমি আর হার্জেল। আমি আবার ঢুকে পড়লাম এখানে। এই উপত্যকার প্রহরী হার্জেলকে আর পালাতে দিল না। একলা হয়ে গেলাম আমি। একটানা কথাগুলো বলে অলিভিয়েরা চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলেন।

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। তানাকা এরপর প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, নাৎসিরা বন্দিদের ওপর কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করত তা জানা আছে আপনার? হার্জেল কিছু বলেছে এ ব্যাপারে?

অলিভিয়েরা কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপভাবে তাকিয়ে রইলেন তানাকার দিকে। তারপর সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন—'না'। হেরম্যান এবার প্রশ্ন করলেন, উড়ন্ত দানবটার সম্বন্ধে হার্জেল আপনাকে কী তথ্য জানিয়েছেন?

অলিভিয়েরা বললেন, হার্জেল নিজে সম্ভবত প্রাণীটাকে মৃত্যুর আগে চাক্ষুষ করেননি। তবে তার ডাক বহু বছর ধরেই শুনেছেন। পুরনো কারারক্ষী ও তার মতো হতভাগ্য বন্দিদের মুখ থেকে কিছু কিছু কথা তিনি শুনেছিলেন। একবার একজন ইহুদি বাইরে বেরিয়ে জংলিদের খপ্পরে পড়ে। কিছুদিন সে জংলিদের হাতে বন্দি থাকার পর আবার

এই বাঙ্কারে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। সে হার্জেলকে বলেছিল, প্রাণীটা কালো পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে থাকে। জংলিরা তাকে দেবতা জ্ঞানে অথবা ভয়ে পুজো করে। জংলিরা তার উদ্দেশ্যে মানুষ ভেট দেয়। জংলিদের ডাকে সাড়া দিয়ে গুহা থেকে হিংস্র প্রাণীটা বেরিয়ে আসে। তবে দিনের বেলা সে বেরোয় না। একবার বাইরে এলে খাবার তার চাই-ই। নইলে জংলিদের কারো প্রাণ যাবার সম্ভাবনা থাকে। যে কারণে জংলিরা রাতের বেলা ডোবা বা নদীর জলে গলা ডুবিয়ে বসে আত্মগোপন করে। তবে একবার আহার গ্রহণ করলে, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ একটা মানুষ খেলে দিন দশেক নাকি বাইরে বেরোয় না প্রাণীটা। যদি না তাকে জংলিরা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানায়। জংলিগুলো ও-ক'টা দিন রাতে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দিনের বেলায় কখনো সে বাইরে আসে না। হার্জেল বলছিল, শীতকালে প্রাণীটার ডাক কখনো সে শোনেনি। হয়তো সে সেসময় অন্য কোথাও চলে যায় বা শীতঘুমে কাটায়। হেরম্যান মন্তব্য করলেন, প্রাণীটার মধ্যে সরীসৃপ শ্রেণির অনেক বৈশিষ্ট্য আছে দেখছি! দিনে বাইরে না আসা, অন্ধকার গুহায় থাকা, একবার খাদ্যগ্রহণ করে কিছুদিন চুপচাপ থাকা, শীতঘুম! আচ্ছা আপনার কী ধারণা প্রাণীটার সম্বন্ধে?

অলিভিয়েরা বললেন, হার্জেল এ ব্যাপারে দুরকম কথা বলেছে আমাকে। এক, এখানে জার্মানদের ঘাঁটি তৈরির অনেক আগে থেকেই নাকি প্রাণীটা এখানে থাকে। দুই, বোর্নিওর জঙ্গল থেকে শুধু মানুষ নয়, বেশ কিছু পশুপাখিও আনা হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। হতে পারে এ প্রাণীটা তাদেরই কেউ। হার্জেল এসব গল্প অন্য বন্দিদের মুখ থেকে শুনেছিল। এক পুরনো কারারক্ষী নাকি আবার বন্দিদের এসব বলেছিল। তবে এখানে একটা সুড়ঙ্গে বেশ কিছু বড় বড় খাঁচা রাখা আছে। আমিও সেগুলো দেখেছি। অলিভিয়েরার কথা শুনতে শুনতে সুদীপ্তর চোখে ভেসে উঠল রাতের দৃশ্যটা! সুদীপ্তদের খুঁটিতে বেঁধে রেখে সেই নোংরা ডোবাতে ব্যাঙের মতো বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে জংলিগুলো ডেকে চলেছে! তার মানে তার কাছেই সুদীপ্তদের বলি চড়াচ্ছিল জংলিরা! শেষ পর্যন্ত ওদেরই কেউ গেছে হিংস্র প্রাণীটার পেটে! জঙ্গলে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে সুদীপ্ত তারই আর্তনাদ শুনেছিল।

সুদীপ্ত এবার জিজ্ঞেস করল, এই অসভ্য জংলিগুলো আসলে কোথায় থাকে?

তিনি উত্তর দিলেন, হার্জেল বলেছিল, এই অসভ্য উপজাতিরা নাকি মুক্ত হয়ে প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল এ উপত্যকার ঠিক বাইরে সলক আর হেলিমুনের মধ্যবর্তী এক উপত্যকায়। সেখানেই তাদের গ্রাম। নারী ও শিশুরা সেখানেই থাকে। সেই রুক্ষ জায়গাতে কোনো খাবার পাওয়া যায় না। তাই পুরুষরা এখান থেকে খাবার সংগ্রহ করে। এখানেও তেমন পশু-পাখি পাওয়া যায় না। জংলিদের প্রধান খাদ্য ব্যাঙ। আমি দিনেরবেলায় একদিন জঙ্গলের মধ্যে জংলিদের ফেলে রাখা স্তূপাকৃতি ব্যাঙ দেখেছি। হার্জেল বলেছিল ওই উড়ন্ত দানবটা নাকি ব্যাঙও খায়। যে লোক জংলিদের কবল থেকে পালিয়ে এসেছিল সে নাকি জংলিদের প্রাণীটার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ উৎসর্গ করতে দেখেছিল।

হেরম্যান এরপর প্রশ্ন করলেন, জংলিরা ঠিক কী কৌশলে ওই প্রাণীটাকে গুহার বাইরে আনে? শুধুই জলার মধ্যে বসে উদ্ভট গান গেয়ে? সে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে।

অলিভিয়েরা এ প্রশ্নের উত্তরে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিস্টার তানাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ রুক্ষভাবেই বললেন, এসব হাবিজাবি গালগল্প নিয়ে গবেষণা থামান। যে প্রাণীকে কেউ দেখেনি তার সম্বন্ধে আলোচনায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই। 'হয়তো', আর 'নাকি', 'বোধহয়'—এসব শব্দের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করে যাচ্ছে আপনারা! জংলিদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে কীভাবে এখান থেকে দ্রুত পালানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করুন। জংলিগুলো হয়তো আমাদের খুঁজতে খুঁজতে এখানেও ঢুকে পড়তে পারে!

অলিভিয়েরা তানাকার দিকে তাকিয়ে বললেন আপনি একজন জীববিদ অথচ এই অদ্ভুত প্রাণীর ব্যাপারে আপনার কোনো আগ্রহ নেই?

তানাকা বললেন, ওসব আষাঢ়ে প্রাণী নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমরা এতজন জোয়ান লোক আছি, অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী এলে তার মোকাবিলা করা যাবে। সঙ্গে তো আগ্নেয়াস্ত্রও আছে। —এই বলে তিনি জামার ভিতর থেকে একটা রিভলভার বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

অলিভিয়েরা বললেন, তাহলে আজ রাতেই এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া যেতে পারে। সুড়ঙ্গ পথটা বেশ অনেক লম্বা। সেটা পেরিয়ে ভোরের আলো ফুটলে বাইরে বেরোব। সেই ভয়টা দিনের বেলায় থাকবে না। আর সুড়ঙ্গ পথে জংলিদের থেকে বেশ কিছুটা তফাতেও চলে যাব। জংলিরা সাধারণত দিনেরবেলা কালো পাহাড়টার ওপাশের জলায় ব্যাঙ শিকার করে। মাটির নীচ দিয়ে কালো পাহাড়ের পাশটা অতিক্রম করে তাদের উল্টোদিকে আমরা যাব।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর অলিভিয়েরার প্রস্তাবেই সম্মত হল সবাই। ঠিক হল মধ্যরাতে সুড়ঙ্গ পথ ধরে বাইরে বেরোবার জন্য রওনা হবে তারা।

অলিভিয়েরা বেশ কিছু মাছ ধরেছিলেন তাই দিয়েই দুপুরের ভোজনপর্ব সাঙ্গ হল। মাটির নীচে এ জায়গাতে একটাই সমস্যা। প্রচণ্ড গরম লাগছে। অলিভিয়েরা বললেন, মাটির নীচে এ জায়গাতে এত গরম কিন্তু ছিল না। ক'দিন ধরে এ ব্যাপারটা লক্ষ করছি। সে গরমে ঘুমানো সম্ভব নয়। খাওয়া সেরে ঘণ্টা পাঁচেক বিশ্রাম নিল সবাই। সুদীপ্তদের অনেক ধকল গেছে। কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠল তারা। বাইরের পৃথিবীর আলো ভূগর্ভের এই কক্ষে প্রবেশ না করলেও ঘড়ি দেখে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল যে বাইরে বিকেল হয়ে গেছে। তানাকা একসময় বললেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই নাৎসি ক্যাম্পটা একটা ঐতিহাসিক স্মারক। আর কোনোদিন তো এখানে আসা হবে না। অলিভিয়েরা, আপনি কি এ জায়গাটার সুড়ঙ্গগুলো আমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন?

সুদীপ্তরও প্রস্তাবটা মনে ধরল। সে বলল, হ্যাঁ, আমিও একটু দেখে নিতে চাই জায়গাটা।

অলিভিয়েরা বললেন, হ্যাঁ চলুন।

আশপাশের সুড়ঙ্গ যেগুলো হার্জেল আমাকে চিনিয়েছিল সেগুলো আপনাদের আমি দেখাতে পারব।

দুটো মশাল জ্বালানো হল। তার একটা হাতে নিলেন অলিভিয়েরা অন্যটা তানাকা।

ঘরের চারপাশে বেশ ক'টা সুড়ঙ্গমুখ আছে। অলিভিয়েরা তারই একটাতে ঢুকলেন সবাইকে নিয়ে। লম্বা বারান্দার মতো সুড়ঙ্গ সোজা এগিয়েছে। কিছুটা এগিয়েই দুপাশে খুপরি খুপরি ঘর। লোহার গরাদ বসানো সামনে। চলতে চলতে অলিভিয়েরা বললেন, এই খোপের মতো ঘরগুলোতে বন্দিদের রাখা হত। কত করুণ ইতিহাস যে এসব ঘরে জমা হয়ে আছে এখানে তা কে জানে! মশালের আলো পিছলে যাচ্ছে মাকড়শার জাল আর ধুলো মাখা ঘরগুলোর ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে এই সুড়ঙ্গ থেকে অন্যদিকেও রাস্তা গেছে। তাদের সামনেও লোহার গরাদ বসানো। সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, এ সব রাস্তা কোথায় গেছে? আচ্ছা, এসব রাস্তা ধরে জংলিরাও তো ভিতরে আসতে পারে?

অলিভিয়েরা জবাব দিলেন, সব রাস্তা কোথায় গেছে আমার জানা নেই। হার্জেল থাকলে হয়তো বা বলতে পারত। না, জংলিরা সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢোকে না। হার্জেলের মুখে শুনেছি তাদের নাকি ধারণা যে একবার ভিতরে ঢুকলে আবার তারা বন্দি হয়ে যাবে। বেশ কয়েকটা ঘরে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানা যন্ত্রপাতিও চোখে পড়ল। ধুলো মেখে অতীতের সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে সব। আরও কিছুটা এগিয়ে সুড়ঙ্গর একটা বাঁকের মতো জায়গাতে থামল সবাই। সেখানে সুড়ঙ্গের গায়ে একটা বেশ বড় ঘর। অলিভিয়েরা গরাদের উপর বাইরে থেকে মশালটা তুলে ধরতেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল ভিতরে দেওয়ালে র‍্যাকের গায়ে টাঙানো আছে বেশ কয়েকটা ধুলো মাখা রাইফেল। নাৎসিদের ফেলে যাওয়া জিনিস। সম্ভবত এ ঘরটা তাদের অস্ত্রাগার ছিল। তানাকা হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, এ অস্ত্রগুলো তো এখনো কর্মক্ষম থাকতে পারে। তাহলে তো আমাদের কাজে লাগবে। আপনি জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন? অলিভিয়েরা বললেন, না দেখিনি। আমি আর হার্জেল এই লোহার দরজাটা একবার খোলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বহু বছর না খোলার ফলে এমনভাবে মাটির সঙ্গে এটা এঁটে বসেছে যে খুলতে পারিনি।

সুদীপ্ত ভালো করে দেখল দরজাটা। ঝাঁপের মতো দরজা। ঠেলে ওপরে ওঠাতে হয়। লোহার দরজাটা মাথারা ওপর ধরে রাখার জন্য মোটা লোহার শিকল লাগানো আছে গায়ে। সেটা পাথুরে দেওয়ালের গায়ে লোহার আংটায় আটকে দিতে হয়। ওই শিকলটাই আবার গরাদ নীচে নামানো অবস্থায় বাইরে থেকে দরজা বন্ধর কাজ করে। দরজার বাইরে কিছুটা তফাতে মেঝেতে বসানো লোহার খুঁটিতে সেটা পরিয়ে দিলে দরজা আর খোলা যাবে না। শিকলটা এখন সে অবস্থাতেই রাখা আছে।

তানাকা এরপর বললেন, আর্মির অস্ত্র তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। আমাদের ভাগ্য ভালো হতেও পারে। এতজন লোক আছি, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক ঝাঁপটা ওপরে তোলা যায় কিনা? এই বলে তিনি তার হাতের মশালটা দেওয়ালের খাঁজে রেখে নীচু হয়ে

মেঝের খোঁটা থেকে শিকলটা খুললেন। তারপর ঝুঁকে পড়লেন দরজা ঠেলে ওপরে ওঠানোর জন্য। অলিভিয়েরা হেরম্যানের হাতে মশালটা দিলেন। তিনি আর সুদীপ্তও এবার ঝুঁকে পড়ে হাত লাগালেন তানাকার সঙ্গে। বহুদিন অব্যবহারের ফলে এমনভাবে এঁটে গেছে ঝাঁপ যে তিনজনে মিলে চেষ্টা করেও সেটা ওপরে তোলা যাচ্ছে না। পিনাক প্রাথমিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। ঝাঁপ ওঠানো যাচ্ছে না দেখে সে সুদীপ্তকে বলল, আপনি উঠুন আমি দেখছি।

সরে এল সুদীপ্ত। পিনাক ঝুঁকে পড়ার আগে জামার নীচে কোমরে গোজা সেই হাড়ের টুকরোটা বার করে সুদীপ্তর হাতে দিয়ে বলল, এটা আপনার কাছে রাখুন, নইলে ঝুঁকতে গেলে লাগবে।

সেই হাড়ের টুকরোটা এখনো যত্ন করে রেখেছে পিনাক। বাক্যব্যয় না করে সুদীপ্ত সেটা নিজের জামার তলায় গুঁজে নিল। পিনাক ঝুঁকে পড়ল ঝাঁপের ওপর।

সত্যি শক্তি আছে লোকটার! লোহার ঝাঁপটা ওপরে তোলার জন্য কয়েকবার ঝাঁকুনি দিতেই একটা ধাতব শব্দ করে বহু বছরের আড়মোড়া ভেঙে ঝাঁপটা ওপরে উঠে এল। এরপর অতি সহজেই ওপরে গেল ঝাঁপ। তার গায়ের লোহার শেকল দেওয়ালের গায়ে আটকে দেওয়া হল। শূন্যে ঝুলে রইল লোহার গরাদ-অলা ঝাঁপ। ঘরের ভিতর প্রবেশ করল সবাই।

র‍্যাক থেকে রাইফেলগুলো নামিয়ে হেরম্যান, অলিভিয়েরা আর তানাকা পরীক্ষা করতে লাগলেন। হেরম্যান বললেন, জিনিসগুলো মোটামুটি ঠিক আছে। তেল দিয়ে ব্যারেলগুলো পরিষ্কার করলে হয়তো এগুলো ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে।

অলিভিয়েরা বললেন, একটা ঘরে আমি অনেক ক'টা মুখবন্ধ তেলের ড্রাম দেখেছি। একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আর এরপরই মশালের আলোতে ঘরের কোণে একটা মেশিনগান চোখে পড়ল। তার গা থেকে ঝুলছে ধুলোমাখা কার্তুজের বেল্ট। মাকড়শার জাল সরিয়ে সবাই এগিয়ে গেল ঘরের কোণে। অলিভিয়েরা জিনিসটা দেখে বললেন, আমি এ জিনিস চালাতে পারি। ডিফেন্স ট্রেনিং নেবার সময় চালানো শিখেছিলাম।

উৎসাহিত হয়ে সবাই ঝুঁকে পড়ল জিনিসটার ওপর। তানাকা বললেন, দাঁড়ান, আর একটা মশাল আনি। এই বলে তিনি পা বাড়ালেন ঘরের বাইরে।

অলিভিয়েরা ধুলো ঝাড়তে শুরু করলেন জিনিসটা থেকে। সবাই মেশিনগানটার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে ঘটাং করে শব্দ হল পিছনে। চমকে উঠে তাকাতেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল লোহার ঝাঁপটা পড়ে গেছে। তার ওপাশে রয়েছেন তানাকা। আংটা থেকে শিকলটা কি খসে গেল? ঝাঁপটা তুলবার জন্য এগিয়ে গেল সবাই। অলিভিয়েরা, হেরম্যান আর পিনাক ঝাঁপের নীচের অংশ ধরে ওঠাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঝাঁপটা উঠল না। আর এরপরই তারা দেখতে পেল সেই লোহার মোটা শিকলটা বাইরের কিছুটা দূরে মেঝের ওপর লোহার খুঁটিতে আটকানো আছে। বাইরে মশাল

হাতে দাঁড়িয়ে আছেন তানাকা। তাঁর ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি ফুটে উঠেছে।

অলিভিয়েরা তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, শিকলটা খোঁটায় আপনি আটকালেন নাকি! ওটা খুলুন। ঝাঁপটা ওঠানো যাচ্ছে না।

তানাকার হাসিটা এবার চওড়া হল। তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিই আটকালাম। আপনারা ভিতরে থাকুন, আমি এবার চলি।

অলিভিয়েরা বিস্মিতভাবে বললেন, তার মানে?

তানাকা অলিভিয়েরার উদ্দেশে বললেন, আমি সেখানে যাব। যার সন্ধানে আপনি আর আমি দুজনেই সম্ভবত এখানে এসেছিলাম।

একথা বলার পর তিনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে সেটা মেলে ধরে অলিভিয়েরার উদ্দেশে বললেন, তবে এখানকার নকশাটা এত সহজে পেয়ে যাব ভাবিনি! আমি দুঃখিত, আপনারা অবর্তমানে আপনার জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে এটা পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, এই সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় এই ক্রশ চিহ্ন দেওয়া জায়গাটাই তো সেই জায়গা তাই না? ম্যাপটাকে তানাকা দরজার বাইরে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আরো ভালোভাবে মেলে ধরলেন।

তানাকা কী বলছেন তা কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না সুদীপ্তদের। তবে অলিভিয়েরার মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বলে মনে হল। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, তাহলে আপনি জীববিদ নন? আপনিও এরই সন্ধানে এসেছিলেন?

তানাকা চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিলেন, না আমি জীববিদ্ নই, আমি একজন ধাতুবিদ্। সামরিক বিভাগে চাকরি করতাম। একদিন পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে এ জায়গার সন্ধান পেয়ে গেলাম। সে সময় জার্মানি আর জাপান একপক্ষে ছিল। আর এ জায়গা ছিল জাপানের দখলে। কাজেই তাদের না জানিয়ে হিটলারের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। তবে আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিই। এই ম্যাপটা আমার কাজ আরও সহজ করে দিল।

অলিভিয়েরা এবার বলে উঠলেন, ঠিক আছে, দরজা খোলার ব্যবস্থা করুন। এ কৃতিত্ব আমরা দুজনেই নেব। তেমন হলে আপনিই নেবেন।

তানাকা বললেন, আমি বিশ্বাস করি না কাউকে। কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখতে চাই না। এ খনির আবিষ্কর্তা হিসাবে আমিই ব্যাপারটা ইন্দোনেশিয়া সরকারকে জানাব। অর্থ, খ্যাতি, যশ সব হবে। তবে কথা দিলাম আপনাকেও বঞ্চিত করব না আমি। আপনার আত্মত্যাগ আমি স্মরণে রাখব। ওই পাহাড়টার নাম দেব 'অলিভিয়েরা হিল'।

অলিভিয়েরা গরাদ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, শিকলটা খুলুন, শিকলটা খুলুন, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?

হেরম্যানও তানাকার উদ্দেশে বললেন, আপনি কী করছেন? আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া থাকলে দরজা খুলে শান্তভাবে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন। আমরা আপনার মতো এখানে কোনো ধাতুর সন্ধানে আসিনি। সোনা, রুপোতে আমাদের আগ্রহ নেই। আমরা জীববিদ।

তানাকা প্রথমে হেরম্যানের উদ্দেশে বললেন, জানি আপনারা জীববিদ। এখানে আপনারা কী খুঁজতে এসেছেন? আ-হুল? ও-প্রাণীর কোনো অস্তিত্ব নেই এখানে। এ জায়গার ধারে-কাছে যাতে কেউ না আসে তাই জার্মানরা ব্যাপারটা রটিয়েছিল। এ বনে বিরাট বড় এক ধরনের প্যাঁচা থাকে—'উভ আউল'। তাকেই লোক 'আ-হুল' বলে ভয় পায়। তবে সে বেচারা নেহাতই নিরীহ জীব। আমি দুঃখিত। ভাগ্য আপনাদের এখানে এনে ফেলেছে। এটাও আমি সামরিক নথি থেকেই জেনেছি। মৃত্যুর আগে সত্যিই আপনারা জেনে গেলেন। তারপর তিনি অলিভিয়েরার উদ্দেশে বললেন, চলি বন্ধু। কথা দিলাম ওই পাহাড়ের নাম হবে, 'অলিভিয়েরা হিল'। অলিভিয়েরা চিৎকার করে উঠলেন, তুমি পাগল হয়ে গেছ! সেখানে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু! দরজা খোলো! তানাকা অট্টহাস্য করে উঠলেন। মশালের আলোয় তার মুখটা পাগলের মতো লাগছে। দু-চোখে ফুটে উঠেছে লোভ। সুদীপ্তদের ডাকাডাকি অগ্রাহ্য করে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর অট্টহাসি মিলিয়ে গেল সুড়ঙ্গপথে।

তানাকা চলে যাবার পর অলিভিয়েরা কিছুক্ষণ গরাদে মাথা রেখে মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুদীপ্তরা হতভম্ব। হেরম্যান অলিভিয়েরার পিঠে হাত রেখে বললেন, ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বলুন আমাদের। এখান থেকে আমাদের তো বেরোবার উপায় খুঁজতে হবে।

মুখ তুললেন অলিভিয়েরা। তারপর সুদীপ্তদের উদ্দেশে বললেন, আমি একটা ব্যাপার আপনাদের কাছে গোপন করলেও আমার নাম, পরিচয়, এখানে কীভাবে এলাম, হার্জেলের ঘটনা, কোনো ব্যাপারেই এক বিন্দু মিথ্যা বলিনি।

হেরম্যান বললেন, আপত্তি না থাকলে বলবেন সেই গোপনীয় ব্যাপারটা কী?

অলিভিয়েরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, এখানে একটা দুর্মূল্য ধাতুর খনি আছে। যার খবর কেউ রাখে না।

ধাতুর খনি! সোনার খনি নাকি? সুদীপ্ত উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করল।

অলিভিয়েরা বললেন, না সোনা নয়। হয়তো বা আরও দুর্মূল্য ধাতু। তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনি। যে ধাতু দিয়ে পরীক্ষা চালানো হত বন্দিদের ওপর।

কী ধাতু? এ জন্যই যাত্রাপথে তানাকার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার কাছে 'রেডিয়ো অ্যাকটিভ ডিভাইস' দেখেছিলাম,

'মলিবডেনম'। ওই কালো পাহাড়টা আসলে আগ্নেয় পাহাড়। ওর নীচে মলিবডেনম

আছে। কোনো কালে অগ্নি উদ্‌গীরণের সময় মাটির নীচ থেকে উঠে এসেছিল ওই ধাতু। এখান থেকে একটা রাস্তা সেই খনিতে চলে গেছে। আমি অবশ্য যাইনি সেখানে। এ ব্যাপারটা জানতামও না। ঘটনাচক্রে অসভ্যদের তাড়া খেয়ে এখানে চলে আসি। হার্জেলই আমাকে ব্যাপারটা জানায়। হার্জেল একটা ম্যাপও আমাকে দিয়েছিল, যেটা তানাকা নিয়ে গেলেন।

হেরম্যান এরপর তাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আহুল প্রসঙ্গে তানাকা যা বলে গেলেন তা কি সত্যি?

অলিভিয়েরা বিমর্ষভাবে জবাব দিলেন, ইরিয়ান আর হার্জেলের মৃত্যু আমি দেখেছি, সেই ভয়ংকর চোখ দুটো দেখেছি। এখন সেটা যদি অন্য কোনো হিংস্র প্রাণীর চোখ হয় তবে...।

হেরম্যান একটু চুপ করে থেকে মৃদু হতাশভাবে যেন বললেন, হয়তো বা তাই হবে। এখন আমাদের বেরোবার পথ খুঁজতে হবে।

সুদীপ্ত হেরম্যানের কথা শুনে বুঝতে পারল যে তানাকার কথা আর অলিভিয়েরার অস্পষ্ট উত্তর হতাশার ছাপ ফেলেছে হেরম্যানের মনে। সুদীপ্ত বলল, এবার চেষ্টা করা যাক, কোনোভাবে দরজা খোলা যায় কিনা।

কাজ শুরু হল। গরাদের বাইরে খোঁটাটা অনেক দূরে। সে পর্যন্ত হাত পৌঁছবে না। গরাদের ফাঁক গলিয়ে হাত বাড়িয়ে লোহার শেকলটা টেনে ঝাঁকিয়ে চেষ্টা করা হল সেটা খোলার। কিন্তু পিনাকের আসুরিক শক্তিও ব্যর্থ হল শেষ পর্যন্ত। প্রচণ্ড গরম লাগছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে সবার শরীর। অলিভিয়েরা আবার বললেন, এতদিন এই মাটির নীচে আছি, এত প্রচণ্ড গরম কিন্তু কোনোদিন দেখিনি।

সবাই মাটিতে বসে ভাবতে লাগল কী করা যায়? মাটিটাও যেন তেতে উঠছে।

কিছুক্ষণ ভাবার পর অলিভিয়েরা বললেন, শেষ একটা চেষ্টা করা যায়। গরাদগুলো লোহার প্যানেলের ওপর যেখানে বসানো সেখানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটা গরাদও যদি খোলা যায় তার ফাঁক গলে সুদীপ্ত বাইরে যেতে পারবে।

কিন্তু কী দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবেন? জানতে চাইল সুদীপ্ত।

অলিভিয়েরা বললেন, কার্তুজের বারুদ দিয়ে এভাবে ছোট বিস্ফোরণ ঘটাতে দেখেছি।

বাইরে বেরিয়ে যদি জংলিদের মুখোমুখি হতে হয় তবে এই কার্তুজগুলোই শেষ ভরসা ছিল। কিন্তু এ ঘরের বাইরে যাবার এটাই শেষ চেষ্টা। অগত্যা অলিভিয়েরার রাইফেল আর হেরম্যানের কার্তুজের খোল থেকে বারুদ বার করে নেওয়া হল। রিভলভারের কার্তুজ শুধু শেষ সম্বল হিসাবে রাখল সুদীপ্ত। অলিভিয়েরা জামা ছিঁড়লেন। তা দিয়ে বারুদের পুঁটলি বানিয়ে সেটা গুঁজে দেওয়া হল দুর্বলতম গরাদটার গর্তে। ঘরের এক কোণে সরে এল সবাই। পিনাক পলতেতে আগুন দিয়ে সরে এল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটল প্রচণ্ড শব্দে। ধোঁয়ায় ভরে গেল সারা ঘর। বিস্ফোরণের শব্দ অনুরণতি হতে থাকল বাইরের অলিন্দে। ধোঁয়া কমলে কাশতে কাশতে গরাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সবাই। হ্যাঁ, সেই

গরাদের জোড়ের মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গেছে, তবে সম্পূর্ণ খোলেনি। তবে কি বাইরে বেরোনো যাবে না! আবার একটা নিরাশা তৈরি হল। গা থেকে জামা খুলে ফেলল পিনাক। মশালের আলোতে তার পেশিগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন তা পাথর কুঁদে তৈরি। নীচু হয়ে বসে একটা ভয়ংকর শপথ উচ্চারণ করে পিনাক তার দেহের সব শক্তি দিয়ে গরাদ ধরে টান দিল। কড়াং করে ধাতব শব্দ তুলে গরাদটা নীচ থেকে খুলে গেল! উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সবাই। অলিভিয়েরা পিনাকের ঘর্মাক্ত দেহ জড়িয়ে ধরে বললেন, যদি এখান থেকে সভ্য পৃথিবীতে ফিরতে পারি তবে এই শর্তে সরকারকে ওই খনির খবর দেব, যেন তাঁরা ওই পাহাড়ের নাম 'পিনাক হিল' রাখেন।

পিনাক হাসল তার কথা শুনে। সে বলল, আমরা কি আর অতবড় মানুষ সাহেব! আপনাদের ভালোবাসাই যথেষ্ট। গরাদের ফাঁক গলে বাইরে এসে শিকলটা খোঁটা থেকে খুলে ফেলল সুদীপ্ত। ঝাঁপ উঠিয়ে বাইরে এল সবাই। তারপর ফিরে এল সে ঘরটাতে। যেখানে তাদের জিনিসপত্র রাখা আছে।

ঘরটাতে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল সবাই। খুব গরম লাগছে। যাত্রাপথের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সঙ্গে নিল তারা। তারপর আর রাত বাড়ার অপেক্ষা না করে বাইরে যাবার জন্য আবার সুড়ঙ্গে পা বাড়ানো হল।

যে ঘরে তারা কিছুক্ষণ আগে বন্দি ছিল তার পাশ দিয়ে সুদীপ্তরা সোজা এগোল। অলিভিয়েরা বললেন, এ পথটাই সোজা বাইরে নিয়ে যাবে। সুড়ঙ্গটার দু-পাশ থেকে অন্য নানা পথ বেরিয়েছে। আধঘণ্টা চলার পর হঠাৎই তাদের একটা বন্ধ দরজার সামনে থামতে হল। পুরু ইস্পাতের পাত লাগানো দরজা। ওপাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। অলিভিয়েরা বিস্মিতভাবে বললেন, দরজাটা তো খোলা ছিল, বন্ধ কেন?

মশালটা তিনি নীচে নামালেন। মেঝের ধুলোতে জেগে আছে জুতো পরা পায়ের ছাপ! তানাকার পায়ের ছাপ! দরজাটা অনেক টানাটানি করেও শেষ পর্যন্ত খোলা গেল না। অলিভিয়েরা বললেন, ওপাশ থেকে তানাকা বন্ধ করে দিয়েছেন এ দরজা। ওপাশে কিছুদূর এগোবার পর ডানদিকে আর একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে। সেটা চলে গেছে সোজা সেই খনিতে। হার্জেল আমাদের বাইরে থেকে সুড়ঙ্গটা দেখিয়েছিল। ম্যাপ দেখে তানাকা ঠিক পথেই যাচ্ছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যে—কী আছে জানি না!

হেরম্যান বললেন, আমরা এখন কী করব? আমাদের ভাগ্য লিখন কি এখানেই থাকা?

অলিভিয়েরা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আরও দুটো পথ আমার জানা আছে। একটা পথ নদীর দিকে সেই গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়েছে। যে পথে আপনারা এসেছিলেন এখানে। তবে সে পথে বেরোলে আমরা জংলিদের হাতের মধ্যেই থাকব। বিপদ হতে পারে। আর একটা পথে আমি যাইনি কোনোদিন। হার্জেল দেখিয়েছিল সে পথটা। সেটা নাকি একটু ঘুরপথে বহু দূরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

কিছুক্ষণ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, দ্বিতীয় পথটাই ধরা হবে। সেই মতো আবার কিছুটা পিছিয়ে এসে সুদীপ্তরা প্রবেশ করল নতুন এক সুড়ঙ্গপথে।

এ যেন এক অন্তহীন চলা! সুদীপ্তরা মশাল জ্বেলে এগোতে লাগল। কখনো সোজা, কখনো এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সুড়ঙ্গ। পাথুরে মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ। বহু বছর কোনো পদচিহ্ন পড়েনি এ সুড়ঙ্গে। মাঝে মাঝে মাথার ওপর থেকে পাথরের চাঙড় খসে পড়েছে। সেগুলো সরিয়ে এগোতে হচ্ছে। ধুলোতে মাখামাখি সবাই। দেখে মনে হচ্ছে তারা নির্ঘাত কোনো প্রেতাত্মা। যুগ যুগ ধরে তারা পদচারণা করছে সলক উপত্যকার পাদদেশের এই সুড়ঙ্গে। শ্বাস নিতে মাঝে মাঝে কষ্ট হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা যত এগোতে লাগল, গরম যেন তত বাড়তে লাগল। গায়ের জামা খুলে ফেলল সবাই। হেরম্যান বললেন, বাইরে পৌঁছে যাবার আগেই সিদ্ধ হয়ে যাব মনে হয়। তবু তারা মুক্তির সন্ধানে এগোতে থাকল।

কতক্ষণ চলেছে খেয়াল ছিল না সুদীপ্তদের। হঠাৎ বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে অলিভিয়েরা ঘড়ি দেখে বললেন, রাত শেষ হতে চলল, আর কতটা পথ এগোতে হবে কে জানে! এবার একটু বিশ্রাম নিতে হবে। তার মানে সুড়ঙ্গপথে সুদীপ্তরা সারা রাত হেঁটেছে। এবার সত্যিই একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। তারা ধুলোমাখা মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। আধ ঘণ্টা মতো বসে থাকার পর জল খেয়ে সবাই উঠে দাঁড়াল। শুরু হল আবার চলা। আরো কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ পিনাকের সতর্ক কান সবাইকে থামিয়ে দিল। কোথায় যেন একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে? কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শব্দের উৎস স্পষ্ট হয়ে গেল। বাঁকের ওপাশ থেকে কেউ যেন খচমচ শব্দ করে ছুটে আসছে! সে কে? সেই উড়ন্ত দানব নাকি? জংলিরা কেউ?

সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের গা ঘেষে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। সুদীপ্ত রিভলভারের একটা মাত্র কার্তুজ সম্বল করে প্রস্তুত হল আগন্তুকের মোকাবিলা করার জন্য। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাঁকের মুখে আবির্ভূত হল এক ছায়ামূর্তি। মেঝেতে একটা পাথরের খণ্ড পড়েছিল। টলমল পায়ে বাঁক ফিরতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ে সেই ছায়ামূর্তি আর্তনাদ করে উঠল, হায় ঈশ্বর!

পিনাক মশালটা তুলে ধরল। আরে এ যে তানাকা!

সবাই ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার দেহ! ছিন্নভিন্ন পোশাক! কেউ যেন ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে চিরেছে তাকে। বীভৎস দৃশ্য। হাঁফাতে হাঁফাতে তানাকা বললেন, জল দাও, জল!

সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি বোতল থেকে জল ঢেলে দিল তার মুখে। অলিভিয়েরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনার এ অবস্থা কীভাবে হল? আপনি কি সেখানে পৌঁছেছিলেন? প্রচণ্ড যন্ত্রণাতেও যেন আবছা হাসি ফুটে উঠল তানাকার ঠোঁটে। তিনি বললেন, হ্যাঁ পৌঁছেছিলাম। আমি আবিষ্কার করেছি সে গুহা।

হেরম্যান বললেন, আপনি কী দেখলেন সেখানে?

তানাকা দম নিয়ে বললেন, ম্যাপটা পৌঁছে দিয়েছিল সে গুহাতে। বিরাট বড় গুহা। মাথার অনেক উঁচুতে ছাদ। বাইরে দিনের আলো তখন ফুটেছে। দেওয়ালের গায়ে একটা

ফোঁকর দিয়ে বাইরে একটা ঝরনা নামতে দেখা যাচ্ছে ঠিক সেই গর্তর গা বেয়েই। বাইরে আলো দেখা যাচ্ছিল। গুহাটার মেঝেতে অনেক গর্ত। ঝরনার জল কিছুটা চুঁইয়ে ভিতর ঢুকে সেই গর্তগুলোকে ছোট ছোট ডোবাতে পরিণত করেছে। দেখলাম সেই ডোবার জলগুলো টগবগ করে ফুটছে! অসহ্য গরম গুহার ভিতর। যেন চামড়া জ্বলে যাচ্ছে। আমি দেখতে লাগলাম খনিটা। প্রচণ্ড দুর্গন্ধ খনির ভিতর। মাংস-পঁচা গন্ধ! রুমাল বার করে আমি নাক চাপা দিতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই...। তানাকা কথা বন্ধ করলেন, অলিভিয়েরা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তখন কী?

বিস্ফারিত চোখে তানাকা বললেন, তখনই আমি গুহার আধো অন্ধকারে দেখতে পেলাম প্রাণীটাকে। যার কথা আমি বিশ্বাস করিনি। কী বীভৎস তাকে দেখতে! এ পৃথিবীর চেনা কোনো প্রাণীর সঙ্গে তার মিল নেই। দেওয়ালের গায়ে একটা থাকের গায়ে ডানা ছড়িয়ে বসে ভাঁটার মতো চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে সে। ঠিক যেভাবে ইঁদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পেঁচা তাকে দেখে। আবারও থেমে গেলেন তিনি। হাঁপ ধরছে। সুদীপ্ত কয়েক ফোঁটা জল দিল তার মুখে। তারপর তিনি বললেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার বার করে মুহূর্তের মধ্যে ক'টা গুলি চালিয়ে দিলাম প্রাণীটার বুক লক্ষ্য করে। 'আ-হু-উ-উ-ল'! তীক্ষ্ণ চিৎকার করে থাকের ওপর থেকে নীচে জলে পড়ে গেল গুলিবিদ্ধ প্রাণীটা। সে ছটফট করছে। আরও দুটো গুলি ছিল, সে দুটো দিয়ে প্রাণীটার যন্ত্রণা আমি শেষ করতে যাচ্ছি ঠিক তখনই আমার মাথার ওপর থেকে নেমে এল একটা ছায়া! কালো ছাদের সঙ্গে মিশে ছিল সে। আমি খেয়াল করতে পারিনি। কথা থামিয়ে আতঙ্কে চোখ বন্ধ করলেন তানাকা। তার শরীর থরথর করে কাঁপছে।

অলিভিয়েরা উত্তেজনায় বলে উঠলেন, তারপর? তারপর?

অতিকষ্টে আবার চোখ মেললেন তানাকা। কাঁপা কাঁপা হাতে হাতটা উঠিয়ে অলিভিয়েরার হাতটা ধরে বললেন, তারপর কী হল আমাকে দেখে বুঝতে পারছ না? পালিয়ে এলাম ঠিকই, তবে আমি বাঁচব না। একটা শেষ অনুরোধ। খনিটা আমি খুঁজে পেয়েছি। তুমি বেঁচে ফিরলে ও পাহাড়ের নাম রেখো 'তানাকা হিল'। কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা খসে পড়ল অলিভিয়েরার হাত থেকে। একটু কেঁপে উঠে চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেল তার দেহ।

হেরম্যান আক্ষেপের স্বরে বললেন, লোভ মানুষকে শেষ করে। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নাম-যশের মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা তার পিছু ধাওয়া করে। তানাকার শেষ অনুরোধ তার প্রমাণ।

অলিভিয়েরা বললেন, এ লোকটাই আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তবে মৃত্যুপথ-যাত্রীর শেষ অনুরোধ আমি রাখার চেষ্টা করব। —এই বলে তিনি তানাকার পকেট হাতড়ে রক্তমাখা ম্যাপটা বার করে নিলেন। হেরম্যান স্বগতোক্তি করলেন, তার মানে প্রাণীটা সত্যিই আছে! একটা নয়, দুটো! অথবা তার বেশি! তানাকার দেহটা যত্ন করে সুড়ঙ্গর একপাশে শোয়ানো হল। তারপর আবার সামনে এগোল সবাই। কিছুটা

এগিয়ে দেখা গেল পাশ থেকে একটা সুড়ঙ্গ এসে মিলেছে সুদীপ্তদের পথের সঙ্গে। দেওয়ালের গায়ে টাটকা রক্তের ছাপ লেগে আছে। অলিভিয়েরা বললেন, তানাকা এ পথ দিয়েই আমাদের সুড়ঙ্গে এসেছিলেন। এই ছোট সুড়ঙ্গটা সম্ভবত কালো পাহাড়ের নীচে সেই খনি-গুহাতে গেছে। সেই সুড়ঙ্গের দিকে তাকিয়ে আবার সুদীপ্তরা নিজেদের পথ ধরে চলতে লাগল। পিছনে পড়ে রইলেন তানাকা।

আরো ঘণ্টাখানেক সময় পেরিয়ে গেল। অসহ্য গরম যেন আর সহ্য হচ্ছে না। দেওয়ালে হাত ছোঁয়ালে যেন ছেঁকা লাগছে। সুড়ঙ্গর বদ্ধ বাতাস এত গরম হয়ে গেছে যে শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। অলিভিয়েরা আক্ষেপের সুরে একবার বলে উঠলেন, এখানেই না আমাদের শেষ পর্যন্ত সমাধি হয়ে যায়! বাইরে পৌঁছতে এত দেরি হবার তো কথা নয়!

হেরম্যান বললেন, হার্জেলের ম্যাপটা একবার দেখুন না?

অলিভিয়েরা ম্যাপটা বার করলেন। হেরম্যান ঝুঁকে পড়লেন তার ওপর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সুদীপ্তর দিকে মুখ তুলে হেরম্যান বললেন, বাইরে যাবার রাস্তাটা আমরা আজ সকালে পিছনে ফেলে এসেছি। তানাকার সঙ্গে আমাদের শেষ সাক্ষাৎ যেখানে হয় সেখানে বাঁকের মুখে আর একটা সুড়ঙ্গ ছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় পথ ভুল করে ফেলেছি আমরা! সারাদিন ধরে সুড়ঙ্গর মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছি।

সুদীপ্ত বলল, এ সুড়ঙ্গ তবে কোথায় শেষ হয়েছে?

অলিভিয়েরা জবাব দিলেন, কালো পাহাড়টার কাছে কোনো এক জায়গাতে। তবে এ পথ শেষ হয়ে এসেছে মনে হয়। পিছনে ফেরার আর কোনো প্রশ্ন নেই, তা সম্ভবও নয়। হেরম্যান বললেন, কপালে যা আছে হবে, সামনেই এগোব।

সুদীপ্তরা আবার হাঁটতে শুরু করল। কিছুটা এগোতেই মশালের আলোতে এক অদ্ভুত দৃশ্য পেল তারা। সারা মাটি ঢেকে গেছে অজস্র পিঁপড়ে আর পোকায়। তাদের স্রোত এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। এমনকী দেওয়াল বেয়ে সেদিকে এগোচ্ছে মাকড়সারাও। প্রচণ্ড গরমে মাটির নীচ থেকে, দেওয়ালের ফাটল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কীটপতঙ্গের ঝাঁক। পিনাক সে দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটতে চলেছে।

এরপর একটা বাঁক ফিরতেই সুড়ঙ্গর উন্মুক্ত মুখ দেখা গেল! ঝাঁকে ঝাঁকে পোকামাকড় সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। সুদীপ্তরা সাবধানে উঁকি দিল। বিকেল হতে চলেছে বাইরে। উল্টোদিকে চোখে পড়ছে সেই কালো পাহাড়টা। তার মাথার ওপর থেকে ঝরনা নেমে এসেছে। এত দূর থেকে ঠিক সেটার অবস্থান অনুমান করতে পারল না সুদীপ্তরা। অলিভিয়েরা বললেন, এই সেই জায়গা যেখানে আমি তাঁবু ফেলেছিলাম!

সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে বাইরেটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল সবাই। না, কোথাও কোনো জংলিকে দেখা যাচ্ছে না। তবে চারদিকে কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। সলকের মাথাটা ছাই রঙের মেঘে ঢাকা। তার চুড়ো দেখা যাচ্ছে না। বাইরের বাতাস সুড়ঙ্গর মতো গরম না হলেও সেখানেও বাতাসে গুমোট ভাব। পিনাক আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, এই মেঘটা সত্যিই বর্ষার মেঘ। আজ-কালের মধ্যেই বর্ষা নামবে!

সুদীপ্ত বলল, সে জন্যই কি পোকা-মাকড়গুলো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে?

পিনাক জবাব দিল, তা হতে পারে, আবার ভূমিকম্প হবারও সম্ভাবনা আছে।

হেরম্যান বললেন, আজ রাতে বৃষ্টি নামলেই ভালো। আমাদের পালানোর সুবিধা হবে।

অলিভিয়েরা বললেন, কী করবেন? জংলিগুলোকে তো দেখা যাচ্ছে না। বাইরে বেরিয়ে জঙ্গলের কিছুটা তফাতে ওই গিরিশিরার ভগ্নাবশেষে গা ঢাকা দেওয়া যেতে পারে প্রথমে। তারপর অন্ধকার নামলে জঙ্গলে ঢুকব। নাকি একেবারে রাত নামার জন্য অপেক্ষা করবেন?

সুড়ঙ্গমুখের ঠিক বিপরীত দিকে কালো পাহাড়টা। তার থেকে একটু কোণাকুণিভাবে মাটির ওপর ছোট টিপির মতো জেগে আছে পাহাড়েরই একটা অংশ। দেখতে অনেকটা নীচু প্রাচীরের মতো। ঝরনার জল নীচে নেমে যে জলাটা সৃষ্টি করেছে, সেটা সুদীপ্তদের ডানদিকে। বাঁদিকে পাথুরে দেওয়াল অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়ে জঙ্গলের কিনারে শেষ হয়েছে। কিছুটা ঘাস জমি পেরিয়েই তারপর জঙ্গল। সুড়ঙ্গর মুখ থেকে সেই পাথুরে দেওয়ালও অন্তত পাঁচশো মিটার। সেটাও ঘাসজমি। বুকে হেঁটে সেটা পেরোতে হবে। নইলে দূর থেকে তাদের কেউ দেখে ফেলতে পারে। সুড়ঙ্গর মাথার ওপরই রয়েছে একটা টিলা।

হেরম্যান বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, রাতে বেরোলে অন্য সমস্যা হতে পারে। প্রাণীটা বা প্রাণীগুলো যদি গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসে তখন সামনের ফাঁকা জমি পেরোনো যাবে না। জংলিরাও এদিকে চলে আসতে পারে। আর পিনাকের কথামতো যদি ভূমিকম্প হয় তবে পাথর চাপা পড়ে মরব আমরা। তার চেয়ে চারদিক দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়াই ভালো।

অবস্থা খতিয়ে দেখে শেষ পর্যন্ত হেরম্যানের প্রস্তাবেই সায় দিল সবাই।

ঠিক হল, দুজন দুজন করে বাইরে বেরোনো হবে। সম্বল বলতে সুদীপ্তর কাছে থাকা রিভলভারের একটামাত্র গুলি।

হেরম্যান আর অলিভিয়েরার কাছে দুটো ছুরি আছে। ঠিক হল, প্রথমে বাইরে যাবেন হেরম্যান আর পিনাক। তাদের গুহার মধ্যে থেকে রিভলভার হাতে পাহারা দেবে সুদীপ্ত। পাথুরে দেওয়ালটার ওপাশে পৌঁছে রুমাল নাড়িয়ে সংকেত দিলে সুদীপ্তরা বাইরে আসবে।

শেষবারের মতো একবার ভালোভাবে দেখে নিয়ে হেরম্যান আর পিনাক বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। ঘাসজমির মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে তারা এগোতে লাগলেন পাথরের প্রাচীরটার দিকে। উদ্যত রিভলভার হাতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল সুদীপ্ত। শ্বাসরুদ্ধ করা মুহূর্ত। এই বুঝি জংলিদের কোলাহল শোনা যায়! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না। নির্বিঘ্নেই হেরম্যানরা পৌঁছে গেলেন ঘাসজমির ওপাশে পাথুরে দেওয়ালের আড়ালে। সেখানে পৌঁছে হেরম্যান সংকেত করলেন। সুদীপ্তরাও বেরিয়ে পড়ল তারপর। শেষ পর্যন্ত তারাও পৌঁছে গেল পাথুরে দেওয়ালের আড়ালে।

সেখানে তারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। ভালো করে চারদিক দেখে নিল। না, কেউ কোথাও নেই। এবার এগোতে হবে জঙ্গলের দিকে। সূর্য হাঁটতে শুরু করেছে সলকের আড়ালে। দিন শেষ হতে চলেছে। সলকের মাথায় আরও মেঘ জমতে শুরু করেছে। ধূসর থেকে তারা কালো বর্ণ ধারণ করছে ক্রমশ।

এরপর আবার বুকে হেঁটে জঙ্গলের দিকে যাবার পালা। এবারও প্রথমে হেরম্যান আর পিনাক বুকে হেঁটে এগোতে শুরু করল জঙ্গলের দিকে। তাদেরকে কিছুটা তফাতে অনুসরণ করল সুদীপ্তরা। সামনের দুজনের সঙ্গে পিছনের দুজনের হাত-পঞ্চাশ মতো ব্যবধান। মাটি খুব গরম। হাতে, পিঠে যেন ছেঁকা লেগে যাচ্ছে। জমিটা ঢালু, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গর্ত আছে। ঝরনার জল, বা দুদিন আগের বৃষ্টির জল জমা হয়েছে সেই ডোবাগুলোতে। সুদীপ্তরা সেই ডোবাগুলোর পাশ দিয়ে বুকে হেঁটে যেতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করল। বুড়বুড়ি কাটছে জল। প্রচণ্ড উত্তাপে ফুটতে শুরু করেছে ডোবার জল!

এগোচ্ছিল সুদীপ্তরা। কিন্তু হঠাৎ সামনে হেরম্যানেরা যেখানে এগোচ্ছিল, ঠিক সেখানে ঘাসজমি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল দুজন জংলি। সম্ভবত হেরম্যান আর তারা পরস্পরকে দেখে ফেলেছে! সুদীপ্তদের দিকে পিছন ফিরে জংলি দুজনের একজন ধনুকে তির লাগাতে গেল। ঠিক সেই সময় ঘাসজমি থেকে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে তার ঘাড় চেপে ধরল। বেশ কিছুটা দূর থেকেও সুদীপ্তদের কানে একটা শব্দ এল—মট! জংলিটা ঘাসবনে লুটিয়ে পড়ল। দ্বিতীয় জংলিটা হতবাক হয়ে গেছিল ব্যাপারটা দেখে। সে পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার হাত চেপে ধরল পিনাক। হেরম্যান ততক্ষণে তার পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে। স্থান-কাল ভুলে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে সুদীপ্তরাও। একটা ঝটাপটি শুরু হল দ্বিতীয় জংলিটা আর পিনাকের মধ্যে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে পিনাক তাকে মাথায় উঠিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলল। তারপর হেরম্যান আর পিনাক ছুটতে শুরু করল জঙ্গলের দিকে। কিন্তু মাটিতে পড়ার পরই দ্বিতীয় লোকটা অদ্ভুত স্বরে আর্তনাদ করে উঠল। সুদীপ্তরাও জঙ্গলের

দিকে ছুটতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একদল জংলি। তাদের প্রথমেই নজর পড়ল সুদীপ্তদের ওপর। হেরম্যানরা তখন ঢুকে পড়েছে অন্যদিকের জঙ্গলে। জংলিরা সুদীপ্তদের দেখামাত্রই জান্তব আক্রোশে চিৎকার করে উঠল। জঙ্গলের দিকে এগোবার কোনো উপায় নেই। সুদীপ্তরা একটু বাঁক নিয়ে তিরের মতো ছুটল কাছেই একটা পাথুরে দেওয়ালের দিকে। সুদীপ্তদের পাশ দিয়ে শিসের মতো শব্দে করে হাওয়া কেটে বেরিয়ে গেল জংলিদের বেশ কয়েকটা তির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পৌঁছে গেল সেই পাথুরে দেওয়ালের আড়ালে। সুদীপ্তদের পিছনে একটু কোণাকুণি বেশ খানিকটা তফাতে সেই কালো পাহাড় আর গুহামুখের অবস্থান। দেওয়ালের দিকে অর্ধবৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করে এগিয়ে আসতে লাগল জংলিদের দলটা। তাদের সবার আগে তির উঁচিয়ে ব্যাঙের উল্কি গায়ে আঁকা সর্দারটা। তার ঠোঁটের কোণে যেন হাসি ফুটে উঠেছে! সুদীপ্তরা বুঝতে পারল তারা এবার ফাঁদে পড়ে গেছে। গর্ত থেকে ইঁদুর টেনে বার করার মতো টেনে বার করে তাদের হত্যা করবে জংলিরা। হেরম্যানদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তারা বেরিয়ে এসে এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না।

জংলিরা ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে দেওয়ালের দিকে। বৃত্ত ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সর্দারটা এক সময় দেওয়ালের হাত কুড়ি সামনে চলে এল। শেষ বিকেলের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। সে মুখে ফুটে উঠেছে জিঘাংসা। শ্বাপদের মুখও এত হিংস্র হয় না। তার অনুচরদের চোখেও জান্তব দৃষ্টি। সুদীপ্তদের ঘিরে ফেলেছে তারা। মরার আগে অন্তত একটা কিছু শেষ চেষ্টা করতে হবে। একদম কাছে এসে গেছে জংলিটা। রিভলভার বার করে মুহূর্তের জন্য সর্দারটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিল সুদীপ্ত। অব্যর্থ লক্ষ্য। বীভৎস আর্তনাদ করে মাটি ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল লোকটা। তারপর শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক তির ছুটে এল সুদীপ্তদের দিকে। একটা তির সুদীপ্তর মাথার চুল ছুঁয়ে উড়ে গেল আকাশের দিকে। গুলি চালিয়েই সে বসে পড়েছিল। এক মুহূর্ত সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারল সে। অন্য তিরগুলো পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আগুনের ফুলকি তুলে ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। তবে সর্দারের মৃত্যু দেখে কয়েক পা পিছু হটে দাঁড়াল জংলিগুলো। ধনুকে তির লাগিয়ে পাথুরে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তারা সুদীপ্তদের মাথা তোলার প্রতীক্ষা করতে লাগল। সুদীপ্তরাও দেওয়ালের ফাঁকের ফাটল দিয়ে তাদের দেখতে লাগল। সুদীপ্ত চাপাস্বরে অলিভিয়েরাকে বলল, আমাদের পিছনটাও তো অরক্ষিত। ওরা যদি ঘুরপথে আমাদের পিছনে আসে তাহলে আর কিছু করার নেই।

অলিভিয়েরা বললেন, ও পথে ওরা সম্ভবত আসবে না। কারণ তাহলে গুহার সামনে দিয়ে ওদের আসতে হবে। ও জায়গাটা ওরাও ভয় করে। নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা ওই পথও ধরত। অন্ধকার নামলে আমরা সোজা ছুটব জঙ্গলের দিকে। তারপর অদৃষ্টে যা আছে হবে।

বাতাসে গরমের ভাব আরও বেড়ে চলেছে। দু-দলই নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে

প্রতীক্ষা করছে। জংলিরা সর্দারের হত্যাকারীদের কিছুতেই পালাতে দেবে না। কখন তারা বাইরে বেরোবে জংলিরা তার প্রতীক্ষা করছে। আর সুদীপ্তরা প্রতীক্ষা করছে অন্ধকার নামলে জংলিদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার। মেঘ জমছে সলকের মাথায়। এক সময় সূর্য ডুবল সলকের আড়ালে। নামতে শুরু করল অন্ধকার। কিন্তু জংলিরা সম্ভবত সুদীপ্তদের মতলব অনুমান করতে পারল। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বেশ কয়েকটা মশাল জ্বালিয়ে ফেলল। আলোকিত হয়ে উঠল সামনেটা। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে আর অন্ধকারে পালানো সম্ভব নয়। মশালের আলোতে মুখে সাদা রং আর বিচিত্র রং-মাখা অসভ্য বর্বর লোকগুলো ঠিক যেন প্রেতমূর্তি। মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে সুদীপ্তদের নিয়ে যেতে এসেছে তারা। সময় এগিয়ে চলল।

চাঁদ উঠল একসময়। মেঘের আড়ালে ফ্যাকাশে চাঁদ। গরম আরও বাড়ছে। থমথমে বাতাসে কী একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসতে লাগল। অলিভিয়েরা বললেন, সম্ভবত গন্ধকের গন্ধ। কোথা থেকে আসছে কে জানে! সুদীপ্তদের মনে হল জংলিদের মধ্যে একসময় একটু চঞ্চলতা দেখা দিল। তারা দু-একজন মুঠো ভর্তি মাটি তুলে নিয়ে শুঁকতে থাকল। কয়েকজন সুদীপ্তদের পিছনে কালো পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল! তারপর কয়েক পা আরও এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল।

অলিভিয়েরা বলল, ওদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে অধৈর্য হয়ে উঠছে তারা। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে এগিয়ে আসবে আক্রমণের জন্য।

কার্তুজ শেষ। তবুও সুদীপ্ত কিছুটা অবচেতনেই তার জামার নীচে হাত দিল কোনো অস্ত্র আছে কিনা তা দেখার জন্য। একটা লম্বা শক্ত জিনিসে তার হাত ঠেকল। সুদীপ্ত সেটা বার করল। এই অবস্থার মধ্যেও সেটা দেখে হাসি পেল সুদীপ্তর। সেই হাড়ের টুকরোটা! অলিভিয়েরা বলল, এটা কী?

সুদীপ্ত সেটা তার হাতে দিয়ে বলল, একটা হাড়ের টুকরো। আমরা পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সম্ভবত জংলিদের কিছু হবে। পিনাক এই ফাঁপা হাড়টা দিয়ে ছুরির হাতল বানাবে ভেবেছিল।

জংলিদের জিনিস! হাড়টাকে আবছা আলোতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে হঠাৎই যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল অলিভিয়েরার চোখ। বিড়বিড় করে তিনি বললেন, হার্জেল আমাকে এমন একটা জিনিসের কথা বলেছিল। হয়তো এটাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

কীভাবে? প্রশ্নটা করেই সুদীপ্ত দেওয়ালের ফোকর দিয়ে দেখতে পেল জংলিরা মশাল হাতে এগিয়ে আসছে দেওয়ালের দিকে। সে চাপাস্বরে অলিভিয়েরাকে সতর্ক করল, ওরা এগিয়ে আসছে!

অলিভিয়েরা একবার সেই ফাটল দিয়ে দেখল তাদের। তারপর সেই ফাঁপা হাড়ের টুকরোটাতে মুখ দিয়ে জোরে ফুঁ দিতেই সুদীপ্ত চমকে গেল। একটা তীক্ষ্ণ গম্ভীর শব্দ বেরিয়ে এল সেই হাড়ের টুকরো থেকে—'আ-হু-উ-উ-ল!'

শব্দটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জংলিরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অলিভিয়েরা আবার ফুঁ দিলেন। আবার বাতাসে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল—'আ-হু-উ-উ-ল!'

আর এর পরই যেন কালো পাহাড়ের দিক থেকে একটা তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর ভেসে এল—'আ-হু-উ-উ-ল...!'

আতঙ্ক ফুটে উঠল জংলিদের চোখে। সামনে না এগিয়ে এবার তারা পিছনে ফিরে দৌড়তে শুরু করল।

সুদীপ্তদের পিছনে পাহাড়ের দিকে একটা অস্পষ্ট শব্দ হল। অলিভিয়েরা সুদীপ্তর হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন—শুয়ে পড়ুন! দেওয়ালের গা ঘেঁষে অন্ধকারে শুয়ে পড়ল দুজনে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই পাহাড়ের দিক থেকে ডানা মেলে একটা কালো ছায়া উড়ে এল। গন্ধকের গন্ধ ছাপিয়ে পুতি গন্ধে ভরে উঠল আকাশ। বিশ্রী দুর্গন্ধ! মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় মুহূর্তের জন্য একবার তার হিংস্র লাল চোখ আর ছুরির মতো নখওলা থাবাগুলো সুদীপ্ত যেন দেখতে পেল। কি বীভৎস সেগুলো! উড়ন্ত দানবটা সুদীপ্তদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে দেওয়াল ডিঙিয়ে গিয়ে পড়ল পলায়মান জংলিদের মাঝখানে। প্রচণ্ড আর্তনাদ শুরু হল জংলিদের মধ্যে। সাথীহারা ক্রুদ্ধ প্রাণীটা প্রচণ্ড আক্রোশে ফালা ফালা করে চিরছে তাদেরকে। অলিভিয়েরা সুদীপ্তকে বলল, উঠে পড়ুন, এবার পালাতে হবে। দুজনে মিলে সেই পাথুরে দেওয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড় লাগাল জঙ্গলের যে অংশে হেরম্যানরা তাদের প্রতীক্ষায় আছেন সে দিকে। জঙ্গলের ভিতরে ঢুকেই দেখা হলো তাদের সঙ্গে। হেরম্যান আর পিনাক দীর্ঘক্ষণ ধরে জঙ্গলের আড়াল থেকে লক্ষ করছিল এই ভয়ংকর চিত্রনাট্য। সুদীপ্তকে জড়িয়ে ধরলেন হেরম্যান। তারপর আর সময় নষ্ট না করে চারজনেই জঙ্গল ভেঙে ছুটতে শুরু করল। পিছন থেকে ভেসে আসতে লাগল জংলিদের অস্পষ্ট আতর্নাদ।

বেশ কিছুটা ছোটার পর হেরম্যান অলিভিয়েরাকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রাণীটার ডাক আপনি নকল করলেন কীভাবে? অলিভিয়েরা সেই হাড়ের টুকরোটা দেখিয়ে বললেন, এই ফাঁপা হাড়টা আসলে একটা বাঁশি। আ-হুলের ডাক বার হয়। জংলিরা এটা বাজিয়ে তাকে গুহার বাইরে ডাকত। ভাগ্যক্রমে এটা আপনাদের হাতে আসে। হার্জেল আমাকে বলেছিল এ বাঁশির কথা। সে ব্যাপারটা শুনেছিল জংলিদের হাত থেকে পালিয়ে আসা বন্দিদের থেকে।

হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, যে রাতে জংলিরা জলার পাড়ে আমাদের নিয়ে গেল সেদিন বাঁশিটা ওদের কাছে থাকলে প্রাণীটাকে ডাকার জন্য ওদের অত সাধ্যসাধনা করতে হতো না। আমরাও বাঁচতাম না। মনে আছে ওদের সর্দারটা নিজের পোশাকের মধ্যে কী যেন খুঁজছিল? সম্ভবত এই বাঁশিটাই।

এ কথা বলার পর হেরম্যান অলিভিয়েরাকে জিজ্ঞেস করলেন, বেঁচে ফিরলে কালো পাহাড়টার কী নাম দেবেন? জংলিরা সম্ভবত আর আমাদের অনুসরণ করবে না।

অলিভিয়েরা হেরম্যানের কথার কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে সুদীপ্তদের পায়ের তলার মাটি যেন মৃদু কেঁপে উঠল। আর তার পরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের

শব্দে কেঁপে উঠল পৃথিবী। আকাশ লাল হয়ে উঠল। সুদীপ্তরা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল দূরে পিছনে ফেলে আসা কালো পাহাড়টার মাথাটা উড়ে গেছে। লক্ষ-কোটি তুবড়ি, রংমশাল যেন ফোয়ারার মতো নির্গত হচ্ছে সেখান থেকে। অগ্ন্যুৎপাত! দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে থাকার পর জেগে উঠেছে কালো পাহাড়টা।

অলিভিয়েরা মন্তব্য করলেন, কেন মাটি এত গরম হচ্ছিল, বাতাসে গন্ধকের গন্ধ ভাসছিল এবার বোঝা যাচ্ছে। অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সুদীপ্তরা দ্রুত এগিয়ে চলল দূর থেকে দূরে। শেষ রাতে বাঁধ ভাঙা বৃষ্টি নামল সলকের পাদদেশে। সেই কালো পাহাড়, সেই দুঃস্বপ্নের জগৎকে তখন সুদীপ্তরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছে।

পরিশিষ্ট ঃ বর্ষাবনের বৃষ্টি! যেমন ভয়ংকর, তেমনই আশ্চর্য সুন্দর তার রূপ। সলকের গা বেয়ে দুর্বার গতিতে নেমে আসা জলধারাগুলো ভরিয়ে তুলছে নদীখাতগুলোকে। জলস্রোত পাথরে ধাক্কা খেয়ে পাক খেতে খেতে উল্কার বেগে ছুটে চলেছে। তাতে পড়লে খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে সুদীপ্তরা। আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গাছগুলো তাদের ধূসরতা মুছে বৃষ্টির জলে সবুজে সবুজ হয়ে উঠছে। বড় বড় গাছগুলোর মাথা আন্দোলিত হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন আনন্দ উল্লাস করছে তারা। এ এক অদ্ভুত সৌন্দর্য। সারাদিন চলল বৃষ্টি। এগিয়ে চলল সুদীপ্তরা। চলতে চলতে অলিভিয়েরাকে হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, প্রাণীটা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কী?

অলিভিয়েরা বললেন, এমন হতে পারে প্রাণীটা তেজস্ক্রিয়তার ফলে এমন রূপ ধারণ করেছে।

দিন শেষ হল এক সময়। রাত এল। সেই রাতও শেষ হতে চলল এক সময়। শেষ রাতে একটা টিলার ওপর উঠতেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল সমুদ্র। বৃষ্টি তখন একটু থেমেছে। চাঁদের আলোতে দেখা যাচ্ছে সলকের তুষার ধবল শৃঙ্গ। অপূর্ব দৃশ্য। হঠাৎ পিনাক আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, ওই দেখুন!

সুদীপ্তরা তাকিয়ে দেখল তাদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে উড়ে যাচ্ছে বাদুড়ের মতো এক প্রাণী। কিন্তু বাদুড় অত বড় হয় না! সেই প্রাণীটাই হবে!

হেরম্যান সেদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, সমুদ্রর ওপাশেই তো বোর্নিও তাই না? হয়তো প্রাণীটা ওখান থেকেই এসেছিল। সাথীহারা, বাসাহারা প্রাণীটা হয়তো ফিরে যাচ্ছে তার আদি বাসস্থান বোর্নিওর জঙ্গলে।

অন্ধকার আকাশে সমুদ্রের ওপর দিয়ে হারিয়ে গেল প্রাণীটা। অলিভিয়েরা একটা শব্দ করলেন এরপর। 'আহু-উ-ল' নয়, 'অ্যাহয়!' এ শব্দ করে জলযানকে ডাকে নাবিকরা। প্রত্যুত্তরে সমুদ্র থেকে ভেসে এল সেই শব্দ অ্যাহয়, অ্যাহয়! একটা জেলে ডিঙি এগিয়ে আসছে পাড়ের দিকে। ঢাল বেয়ে সুদীপ্তরা নামতে শুরু করল সমুদ্রের দিকে। হেরম্যান সুদীপ্তকে বলল, এরপর ভাবছি মাদগাস্কারা যাব। সেখানে নাকি শুনেছি মানুষখেকো গাছ আছে...ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল জেলে-ডিঙিটা। সুদীপ্ত জবাব দিল আমিও যাব।

—
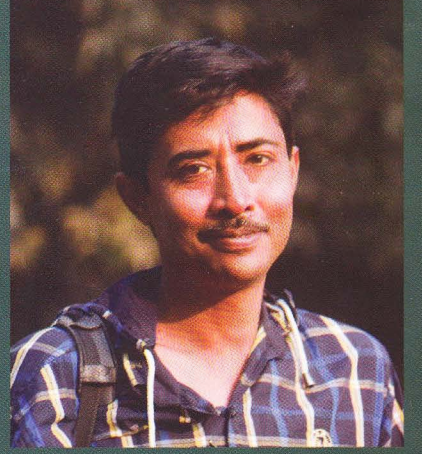
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, জন্ম ১৯৭৩ কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ। বর্তমান বাসস্থান কাঁচরাপাড়া। কিশোর সাহিত্যের নিয়মিত লেখক। সন্দেশ, আনন্দমেলা, কিশোর ভারতী, শুকতারা প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত শিশু-কিশোর পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। বড়দের জন্যও লেখেন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টি। তার সুদীপ্ত-হেরম্যানের উপন্যাস অনূদিত হয়েছে ইংরেজিতেও। জনপ্রিয় এফ.এম. চ্যানেলগুলোতে পরিবেশিত হয়েছে একাধিক গল্পর নাট্যরূপ। শখ-আড্ডা, ভ্রমণ।
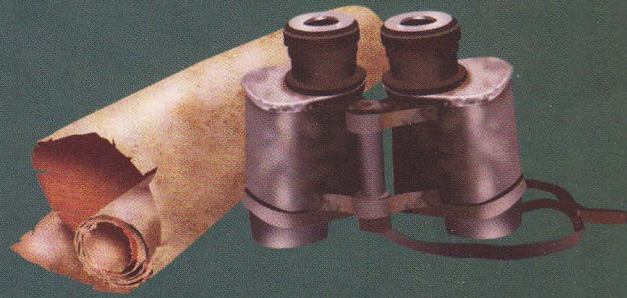
আফ্রিকার গ্রেট রিফট্ উপত্যকার সিংহ আর
বিষমাখানো তির হাতে পিগমি অধ্যুষিত বনাঞ্চল,
ভয়ংকর কমোডো ড্রাগনের দ্বীপ,
মিশরের জাদুকরী দেবী 'থথ'-এর প্রাচীন মন্দির,
অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতলে অক্টোপাসের গুহা,
আবার কখনো বা বোর্নিওর মৃত আগ্নেয়গিরির কন্দর!
অদেখা পৃথিবী, অদেখা মানুষ,
বিচিত্র প্রাণীর খোঁজে সুদীপ্ত-হেরম্যানের
পাঁচটি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস
এক মলাটে সংকলিত।

9 788129 524898